মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে

[সুরাওয়াদি থেকে বিধানচন্দ্র পর্যন্ত :: ১৯৪৭-১৯৬২]

সরোজ চক্রবর্তী

প্রাপ্তিস্থান :

দে বুক ষ্টোর

১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট

কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

ফোন : ৩৪ ৫০৩৫

প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারি ১৯৬৭

প্রকাশক :

সরোজ চক্রবর্তী

৫০ই মতিলাল নেহেরু রোড

কলিকাতা ৭০০০২৯

(ফোন : ৪৭ ৭১৬১)

মুদ্রক :

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায়

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড

কলিকাতা ৭০০০০৯

প্রচ্ছদ :

শ্রীরণেন মুখোপাধ্যায়

সহধর্মিণী

শ্রীমতী দেবকুমারী দেবী

কল্যাণীয়াসু

ভূমিকা

এই গ্রন্থের মূল লেখক শ্রীসরোজ চক্রবর্তী স্বাধীনতা প্রাপ্তির কাল থেকে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে তাঁদের ব্যক্তিগত সহায়করূপে কাজ করার দুর্লভ কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। আর এইভাবেই তাঁর সুযোগ হয়েছিল বাংলার বেশ কয়েকজন প্রখ্যাত রাজনৈতিক নেতার সংস্পর্শে আসবার। এবং বলতে দ্বিধা নেই, এই স্মৃতিকথা লিখতে তিনি তাঁর এই অভিজ্ঞতাকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়েছেন। আলোচ্য গ্রন্থখানি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ ঘটনাবলীর প্রামাণ্য চিত্রই শুধু নয়, এতে আছে ভারতবিখ্যাত কয়েকজন রাজনৈতিক নেতার বেশ কিছু মূল্যবান চিঠি। এই চিঠিগুলো অমূল্য, কারণ এগুলি স্বাধীনোত্তর ভারতের ইতিহাসের এমন বহু দিকের ওপর আলোকপাত করেছে, যা সাধারণ মানুষের মোটেই জানা ছিল না। তা ছাড়া, এই সময়কার বাংলার কোনো লিখিত ইতিহাস না থাকায়, এর মূল্য আরও অসাধারণ হয়ে উঠেছে, আর সেজন্য ইতিহাসের একটি আকর-গ্রন্থ হিসাবেও এ-গ্রন্থখানি অপরিসীম মূল্যবান হতে বাধ্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মাত্র সাড়ে পাঁচ মাস মুখ্যমন্ত্রিত্ব করবার পর শ্রীপ্রফুল্ল ঘোষ কোন্ পরিস্থিতির আবর্তে পড়ে পদত্যাগ করেছিলেন, সে-সম্পর্কে লেখক বেশ প্রাঞ্জল বর্ণনা দিয়েছেন। এর থেকেও চিত্তাকর্ষক এবং ঐতিহাসিক মূল্যে আরও মূল্যবান হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীরূপে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বহু ঘটনাবলী, যা লেখক তাঁর গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। আজকের দিনে সম্ভবত খুব অল্প লোকই জানেন যে, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ডাঃ রায়কে সরিয়ে দেবার একটা চক্রান্ত হয়েছিল এবং তাঁর পদত্যাগ করার প্রশ্নও উঠেছিল একসময়। মুখ্যমন্ত্রীরূপে ডাঃ রায়ের যে ভাবমূর্তি, তার ওপর নতুনভাবে আলোকপাত করতে পারে এমন অজস্র ঘটনাবলীর মধ্যে আমি উল্লেখ করতে পারি পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের ব্যাপারে তিনি যে ভূমিকা নিয়েছিলেন তার কথা, বলতে পারি জাতীয় সঙ্গীতরূপে 'জনগণমন অধিনায়ক'-এর বদলে 'বন্দে মাতরম্' কে গ্রহণ করাবার জন্য তিনি যে দৃঢ়তা প্রদর্শন করেছিলেন, তার কথা।

সব মিলিয়ে এই গ্রন্থের পাঠক অবশ্যই স্বীকার করবেন যে লেখক আমাদের দিয়েছেন বহু চিত্তাকর্ষক রাজনৈতিক খবর, মতামত এবং ঘটনাবলী, যা সাধারণভাবে কারুরই জানা ছিল না, এবং এর মধ্য দিয়ে তিনি মহৎ একটা কাজ করলেন, স্বাধীনতা প্রাপ্তি যুগের একটা যথাযথ ইতিহাস লিখে গেলেন, আজকের দিনে যার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। গ্রন্থখানিকে বর্তমান বাংলা, তথা বহুলাংশে বর্তমান ভারতের ইতিহাস-রচনার ক্ষেত্রে একটি অতি মূল্যবান আকর-গ্রন্থ বলে অভিনন্দিত করতে আমার যে একটুও দ্বিধা নেই এ-কথা বলতে পারি।

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

মুখবন্ধ

আমার মতো মানুষ, যে কখনো কোনো বই লেখবার কল্পনাও করেনি, তার পক্ষে এই সুকঠিন বিষয়বস্তু নিয়ে লেখার জগতে প্রথম পদক্ষেপ একটি দুঃসাহসিক কাজ সন্দেহ নেই। তা সত্ত্বেও কেন যে এই দুরূহ কর্মে সাহসে বুক বেঁধে এগিয়ে গিয়েছিলাম, সে সম্পর্কে বোধ হয় একটি কৈফিয়ৎ দেওয়া দরকার।

আমার পরম সৌভাগ্যের বিষয় ছিল এই যে, আমি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশটুকুতেই বাংলার মুখ্যমন্ত্রীদের সান্নিধ্যে এসে, তাঁদের সুসময়ে এবং দুঃসময়ে, তাঁদের জানবার সুযোগ পেয়েছিলাম। আমি সেই দুর্লভ সুযোগ লাভ করার অধিকারী হয়েছিলাম, যে সুযোগ আমাকে দিয়েছিল তাঁদের চিন্তার অংশ নিতে, তাঁদের মনের গতি পর্যবেক্ষণ করতে, তাঁদের হৃদয়ের স্পন্দন অনুভব করতে, আর সর্বোপরি আমার জীবিকার প্রয়োজনে তাঁদের কথাগুলি মনে রাখা শুধু নয়, লিপিবদ্ধও করতে। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থখানি অনেকটা ঘটনাপঞ্জীর ক্রমবিন্যাসের আকারে লেখা হলেও, এতে প্রধান প্রধান ঘটনা, স্বাধীনতা-প্রাপ্তির সময় থেকে শুরু করে ১৯৬২-র মাঝামাঝি কাল পর্যন্ত, মোটামুটি বিস্তৃত আকারে বিবৃত হয়েছে। এর মধ্যে যাঁদের কার্যাবলীর বিবরণ রয়েছে, তাঁরা হলেন অবিভক্ত বাংলার শেষ মুখ্যমন্ত্রী হাসান শহীদ সুরাওয়ার্দি, পশ্চিমবঙ্গের প্রথম ও দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী যথাক্রমে প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও বিধানচন্দ্র রায়।

এই গ্রন্থ রচনার সময় আমি জনৈক ইংরেজ ঐতিহাসিকের সেই বিখ্যাত উক্তিটি ভুলি নি। তিনি বলেছিলেন, "যে কোনো মূর্খ ই হঠাৎ একখানা নিদারুণ মূল্যবান বই লিখে ফেলতে পারে, যদি সে এইটুকু মাত্র বলে, কী সে শুনেছে; আর এই শোনা কথাগুলোই যদি সে অকপটে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলতে পারে।"

আমার অভিলাষ ছিল বইখানা একটি মাত্র খণ্ডে শেষ করবো কিন্তু বাস্তবে দেখলাম, তা অসম্ভব। কয়েকজন সাংবাদিক বন্ধু প্রায়ই আমার ঘরে ঢুকে বলতেন, মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে থেকে আপনার যে বিপুল অভিজ্ঞতা হয়েছে, সেটা লিখে ফেলুন। তাঁদের মতে অতীত ও বর্তমানের মধ্যে আমি শেষতম

সংযোগস্বরূপ, কারণ বাংলার সমস্ত মুখ্যমন্ত্রীদের অধীনে তাঁদের সান্নিধ্যে থেকে কাজ করেছি অবিচ্ছেদ্য প্রায় ত্রিশ বছর সময় ধরে।

তা সে যাই হোক, কাজে নেমে দেখি, এ যে অন্তহীন ব্যাপার! মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে আমাকে ঘাঁটতে হয়েছে সমসাময়িক পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠা, সরকারী নথি, চিঠি, ফাইল, আর গোপন খাতাপত্র। এসব আমাকে করতে হয়েছে আমার সরকারী কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে। আমার সরকারী কাজকর্ম হচ্ছে মূলতঃ আমাদের সদাব্যস্ত মুখ্যমন্ত্রীকে ঘিরে, যেজন্য প্রায়ই আমাদের মহাকরণে কাটাতে হয় রাত্রিবেলা অফিস ছুটি হয়ে যাবার পরেও। অবশেষে আমাদের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায় আমাকে বললেন, এত বছরের একটানা ঘটনাবলী একসঙ্গে না লিখে বরং স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের কার্যকালটাকে বিবৃত করুন।

এই বইতে পণ্ডিত জওহরলাল ও ডাঃ বিধানচন্দ্রের পরস্পরকে লিখিত বহু পত্রাবলীর অনুলিপি রয়েছে। পাঠকরা লক্ষ্য করবেন, দেশ-বিভাগ ঘটবার সময় যেসব নিদারুণ সমস্যার উদয় হয়েছিল, তা নিয়ে এই দুই বিচক্ষণ নেতার মধ্যে চিঠির মাধ্যমে কিভাবে মত-বিনিময় হয়েছিল। একটা সপ্তাহ শেষ হয়েছে কি না হয়েছে, অমনি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে একগুচ্ছ চিঠি এসে হাজির হতো, আর তার উত্তরও যেতো অমনি সঙ্গে সঙ্গে, মুহূর্তমাত্র দেরি না করে। আমার যৌবনকালে এইসব চিঠি আমার মন বিশেষভাবে স্পর্শ করতো বিষয়বস্তুর গাম্ভীর্যের গুণে, তা সে প্রশাসনিক বিষয়েই লেখা হোক, অথবা রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত স্তরেই লেখা হোক। আমাকে সব থেকে অভিভূত করতো তখন, যখন দেখতাম তাঁর এই চিঠিপত্রে যে মনোভঙ্গি ব্যক্ত হয়েছে, তার সঙ্গে তাঁর নেতৃত্ব-জীবনের ভাবধারার কোন সংঘাত নেই। এটি তিনি বজায় রেখেছিলেন, রাজনীতিবিদ্‌দের মধ্যে যা খুবই দুর্লভ। আর ডাঃ রায়ের চিঠিগুলি হচ্ছে বাহুল্যবর্জিত, বিজ্ঞজনোচিত এবং সাবলীল। এঁরা দুজনেই সমস্যাগুলির মোকাবিলা করেছিলেন একটা উঁচু স্তর থেকে। নেহেরু বাংলাকে তাঁর বন্ধুর সক্ষম হাতে ছেড়ে দিয়ে যেমন নিশ্চিন্ত থাকতেন, তেমনি ডাঃ রায় সংকটের মুহূর্তে গিয়ে দাঁড়াতেন নেহেরুর পাশে তাঁকে মদত দিতে। এর সাক্ষ্য পাওয়া যাবে এই বইয়ের বহু চিঠির মধ্যে। এই দুজন নেতার মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল অচ্ছেদ্য এবং তা সময়ের ঢেউ উত্তীর্ণ হয়ে আমৃত্যু অম্লান ছিল। এই

পটভূমিকাতেই আমি এতকাল পরে এই পত্ররূপ হীরকখণ্ডগুলি আজকের মানুষদের, এবং আজকের কেন, ভবিষ্যতের মানুষদের হাতে তুলে দিচ্ছি, যা থেকে তাঁরা তাঁদের চিন্তাধারা গড়ে তুলবার পথে কিছু পাথেয় পেলেও পেতে পারবেন। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে ডাঃ রায় যা ছিলেন, তা অতুলনীয়। সব থেকে বেশি সময় ধরে (একাদিক্রমে সাড়ে চৌদ্দ বছর) তিনি বাংলার সাড়ে তিন কোটি মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে গেছেন। পরিকল্পনা-রচনাকারী হিসাবে তাঁর গুণাবলী সারা দেশ জুড়ে আদৃত, এবং শুধু তা-ই নয়, আগামীকালের প্রশাসকদের কাছে তিনিই এ-বিষয়ে আদর্শস্থানীয় হয়ে থাকবেন। এ-কথা ভেবে এই বইয়ের বেশি অংশ জুড়ে আমি তাঁরই কথা না লিখে পারিনি।

তখনকার দিনে একটি প্রশ্ন নিয়ে খুবই আলোচনার ঝড় উঠতো, নেহেরু ডাঃ রায়ের ওপর বেশি প্রভাব বিস্তার করতেন, না ডাঃ রায় নেহেরুর ওপর বেশি প্রভাব বিস্তার করতেন? আমার উত্তর হচ্ছে এই যে, নেহেরুর কাছ থেকে ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধা চাইবার মতো ডাঃ রায়ের কিছু ছিল না। প্যাটেলের মৃত্যুর পর ডাঃ রায়কে কেন্দ্রে প্যাটেলের স্থলাভিষিক্ত (অর্থাৎ নেহেরুর পরেই দ্বিতীয় ব্যক্তি) হবার জন্য নেহেরু প্রচুর চাপ দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর নিজের রাজ্যের জনগণের সেবা করার একান্ত আগ্রহ তাঁকে সে উচ্চপদ নিতে প্রলুব্ধ করতে পারেনি। উপরন্তু, তাঁর স্বপ্নের বাংলাকে গঠন করার জন্য নেহেরুকে তিনি উপরোধ-অনুরোধের বন্যায় অস্থির করে তুলতেন, আর নেহেরুও সাধারণতঃ সে আহ্বানে সাড়া দিতে কার্পণ্য করেন নি।

ইতিহাস ও রাজনীতির যাঁরা ছাত্র, এ বই যদি তাঁদের এদিকে আরও গবেষণা করতে আগ্রহী করে তোলে, তাহলেই আমি নিজেকে পুরস্কৃত মনে করবো।

সরোজ চক্রবর্তী

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

প্রখ্যাত সাহিত্যিক শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে বর্তমান গ্রন্থখানি রচনার ব্যাপারে আমার ঋণ সর্বাধিক। তাঁর সর্বপ্রকার এবং অক্লান্ত সাহায্য না পেলে, তাঁর ভাষা-বিন্যাসের স্পর্শ না পেলে এই বই আমার পক্ষে লেখা দুরূহ হতো। তাছাড়া, পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত ও প্রুফ সংশোধনেও তিনি সমান সাহায্য করে গেছেন, একথা না বললে সত্যের অপলাপ করা হয়।

এই সঙ্গে আমার অন্তরের একান্ত কৃতজ্ঞতা জানাই অর্থ ও শ্রমমন্ত্রী ডাঃ গোপালদাস নাগ মহাশয়কেও। তিনি এই বাংলা সংস্করণটির প্রকাশ-ব্যবস্থায় যে ভাবে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে উদ্যোগী হয়েছিলেন, তা আমার কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর সক্রিয় সাহায্য না পেলে এ বই যে প্রকাশিত হতে পারতো না, এ-বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

আর আমার অপরিশোধ্য ঋণ রইলো যাঁদের কাছে, তাঁরা হলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিব শ্রীবিনয়রঞ্জন গুপ্ত এবং স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক) বিভাগের যুগ্মসচিব শ্রী এস. বি. মজুমদার। তাঁরা পাণ্ডুলিপি বহুলাংশে পড়ে দেখেছেন এবং রাজ্য সরকারের তরফ থেকে অনুমতি দিয়েছেন নেহেরু-বিধানচন্দ্র পত্রাবলী প্রকাশ করতে। এ-ছাড়া যাঁর কাজে আমি নানাবিধ পরামর্শ ও সহায়তার জন্য ঋণী তিনি হলেন অর্থ বিভাগের যুগ্ম-সচিব শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ পাল।

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেডের শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায় মহাশয়ের সাহায্য না পেলে এই পুস্তক ছাপার চেষ্টা হতে হয়ত আমাকে বিরত থাকতে হত। এর জন্য আমি শ্রীগুহ রায় মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞ।

গ্রন্থকার

সন্ধ্যাবেলায় প্রদীপ জ্বালবার আগে সল্‌তে পাকানোর একটা ব্যাপার আছে। আমারও হয়েছে তাই। আসল ঘটনাগুলো বলবার আগে ঐ সল্‌তে-পাকানোর মতো একটা ভূমিকা না করে নিলে চলছে না।

প্রবীণরা মনে করতে পারবেন, ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট দেশ যেদিন স্বাধীন হল, সেদিনও কলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রতিধ্বনি একেবারে মিলিয়ে যায় নি। তাঁরা আরও মনে করতে পারবেন, কলকাতার বেলেঘাটা অঞ্চলই সেদিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল দাঙ্গা-হাঙ্গামার কেন্দ্রবিশেষ। মহাত্মা গান্ধী কলকাতায় এলেন তাই এই বেলেঘাটাতেই আস্তানা নিলেন এক মুসলমান ব্যবসায়ীর একতলা বাড়িতে। হিন্দু আর মুসলমানদের মধ্যে সব তিক্ততার রেশ মিলিয়ে গিয়ে যাতে আবার প্রীতির সম্পর্কটা গড়ে ওঠে, এটাই ছিল তাঁর একান্ত ইচ্ছা। আর, এই কাজে তাঁর পাশে এসে সেদিন দাঁড়ালেন হাসান শহীদ সুরাওয়ার্দি, অবিভক্ত বাংলার শেষ মুখ্যমন্ত্রী।

বাংলাদেশ ভাগ হয়ে গেছে, পশ্চিমবঙ্গের প্রথম ছায়া-মন্ত্রিসভাও তৈরি হয়ে গেছে ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের নেতৃত্বে। এঁরা সুরাওয়ার্দি মন্ত্রিসভার কাছ থেকে দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন। মন্ত্রিসভার দুটি শাখাই তখন এক সঙ্গে কাজ করছিল। নবগঠিত পুর্বপাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় যতক্ষণ না নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হচ্ছে, ততক্ষণ এখানকার মন্ত্রিসভার মুসলমান সদস্যরা নিজেদের স্বার্থ দেখতে লাগলেন। নথি আর অস্থাবর সম্পত্তি অদল-বদল করার ব্যাপার নিয়ে 'রাজ্য-বিভাগ-পর্ষদ' গঠিত হয়েছিল দুই সম্প্রদায়েরই সরকারী কর্মচারীদের নিয়ে।

এই রকম পরিস্থিতিতেই সুরাওয়ার্দি গিয়ে পড়েছিলেন গান্ধীজীর কাছে। দেশ-ভাগের আগে কলকাতায় যে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিল, তার দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্রীরূপে সুরাওয়ার্দি সাহেব এড়াতে পারেন না। তাই বেলেঘাটায় গান্ধীজীর কাছে গিয়ে তাঁর কাজে ব্রতী হওয়ার মধ্য দিয়ে তিনি বোধহয় নিজের ভুলই সংশোধন করতে চেয়েছিলেন।

আমি ঠিক এই রকম অবস্থাতেই সুরাওয়ার্দি সাহেবের কাছে গিয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু কেমন করে গিয়ে পড়েছিলাম, সেটাই হল আমার ঐ সল্‌তে-পাকানোর পর্ব।

ছোটবেলায় এমন এক পরিবারে মানুষ হয়েছিলাম, যেখানে নবজাগ্রত জাতীয়তার স্রোত এসে স্পর্শ করেছিল। আমার মায়ের বাবা, অর্থাৎ আমার দাদামশাই ছিলেন হরিদাস হালদার। কালীঘাটের কালীমন্দিরের সেবাইত হলেও পারিবারিক রক্ষণশীলতার গণ্ডী পেরিয়ে তিনি ডাক্তারী পড়তে গিয়েছিলেন। ডাক্তারী পাস করার পর দক্ষিণ কলকাতার খুব নামকরা ডাক্তার হয়েছিলেন তিনি। ছাত্র হিসেবে মেডিক্যাল কলেজে স্যার নীলরতন সরকারের সিনিয়র ছিলেন। কিন্তু সেটাই বড়ো কথা নয়। বড়ো কথা, তিনি সেদিনকার স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে দূরে থাকতে পারেন নি। তাছাড়া মানুষটি ছিলেন অতি দরদী, গরীব-দুঃখীদের জন্য তাঁর প্রাণ কাঁদতো, এদের জন্য অকাতরে খরচ করতে তাঁর কখনো কুণ্ঠা ছিল না। এ হেন যে মানুষ, তাঁর সংযোগ ছিল প্রথম দিকে বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর মতো নেতাদের সঙ্গে, আর তারপরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতিদের সঙ্গে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলতে পারি। বঙ্গভঙ্গ নিবারণের জন্য যে সব নেতারা সেদিন তৎপর ছিলেন, তাঁরা একটি জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র বার করার দরকার বোধ করছিলেন। কিন্তু কাগজ বার করার টাকা কোথায়? বিপিনচন্দ্র পাল মশাই আমার দাদামশাইয়ের কাছে কথাটা পাড়তেই তিনি তৎক্ষণাৎ পাঁচশ' টাকা চাঁদা হিসাবে তাঁর হাতে দিয়েছিলেন। ১৯০৬ সালে প্রখ্যাত 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকা এইভাবেই তার যাত্রা শুরু করেছিল; আমার দাদামশাই টাকা দিয়েছিলেন তাঁর সম্পত্তির কিছু অংশ বাঁধা রেখে [দ্রষ্টব্য : এ. বি. পুরাণী-লিখিত "দি লাইফ অব শ্রীঅরবিন্দ" গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ১০১]।

তাঁর সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলা যায়। তাঁর লেখা একখানা ব্যঙ্গ-কৌতুকের বই, "গোবর গণেশের গবেষণা" তখনকার দিনে খুবই নাম করেছিল। যদিও শেষের দিকে তিনি গান্ধীজীর ভক্ত হয়ে অহিংসার পথ ধরেছিলেন, কিন্তু প্রথম জীবনে যে তাঁর সঙ্গে সহিংস দেশসেবকদের যোগ ছিল, সে-কথা অস্বীকার করা যায় না। একটি ঘটনার কথা বলেই তাঁর প্রসঙ্গ শেষ

করছি। শুনেছিলাম, পুলিশ যখন মানিকতলা সার্চ করে বারীন্দ্র ঘোষ, উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, উল্লাসকর দত্ত প্রভৃতিদের গ্রেপ্তার করল,—এবং তার জের টেনে শ্রীঅরবিন্দকেও,—তখন আমার দাদামশায়ও রক্ষা পেতেন না, যদি না আমার দিদিমা বুদ্ধি করে একটা উপায় বার করতেন। শুনেছি সে-সময় বোমা তৈরির মশলা হিসাবে আমাদের অর্থাৎ দাদামশায়ের কালীঘাটের বাড়িতে প্রচুর পিকরিক এসিড মজুদ ছিল। আমার দিদিমা রাতারাতি সেগুলি নিজের হাতে করে সরিয়ে নিয়ে কাছের এক পুকুরে ফেলে দিয়েছিলেন। আর সেই পুকুরে এতো পিকরিক এসিড পড়েছিল যে সব মাছ মরে গিয়ে জলের ওপর ভেসে উঠেছিল। কিন্তু সে যাক, আমি শুনেছিলাম পুলিশ নাকি সত্যিই এসেছিল আমাদের বাড়ি সার্চ করতে। কিছু পায় নি তাই রক্ষে, নইলে কী যে হতো কে জানে! অবশ্য কথায় বলে, বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। পুলিশ চলে গেলেও প্রতিবেশীরা ভয়ে আর দাদামশায়ের কাছে ঘেঁসতো না। একরকম নিঃসঙ্গ জীবন। সে-সময় যে সব রাজনৈতিক বন্ধুরা তাঁর কাছে এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে দেশবন্ধু ছিলেন অন্যতম।

যাই হোক, দাদামশায়ের মতো মানুষের কাছে থাকার জন্যই বোধহয় আমার তরুণ বয়সে যে-ইচ্ছাটা জেগেছিল, সেটা হচ্ছে, সাংবাদিক হওয়ার ইচ্ছা। এ জন্য সর্টহ্যাণ্ডও শিখতে শুরু করে দিয়েছিলাম তখন, কারণ, সর্টহ্যাণ্ড না জানলে রিপোর্টার হবো কী করে? আর রিপোর্টার হতে পারলেই তো জাতীয় নেতাদের কাছাকাছি হবার সুযোগ পাওয়া যাবে!

মনে আছে, ১৯৩২ সালের মাঝামাঝি বিপিনচন্দ্র পালের জামাই সুরেশচন্দ্র দেব আমাকে ফ্রি প্রেস অব ইণ্ডিয়ার তখনকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক বিধুভূষণ সেনগুপ্তের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন।

আমার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে বিধুবাবু প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন,—সর্টহ্যাণ্ড জানো?

সবিনয় উত্তর করলাম,—শিখছি।

বিধুবাবু বললেন,—শেখো, ওটা না জানলে কী করে চলবে?

বেশি কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, আমি রিপোর্টারের তালিম নিতে লাগলাম তাঁর কাছ থেকে। এর পাঁচ বছর পরে যখন আমি সাংবাদিকতা ছেড়ে দেই, তখন এ কথা সবাই বলেছিলেন যে, সাংবাদিক হিসাবে তাঁর প্রত্যাশা আমি অপূর্ণ রাখি নি।

'ফ্রি প্রেস' তখন ছিল আট নম্বর ডালহাউসি স্কোয়ারের (বি-বা-দী বাগ) দোতলায় দুটি মাত্র ঘর নিয়ে। জাতীয়তাবাদী সংস্থা বলে কংগ্রেসী নেতাদের পৃষ্ঠপোষকতা পেলেও প্রায়ই অর্থকষ্টে পড়তো। তখনকার দিনে জাতীয়তাবাদী সংবাদ-সংস্থা বা সংবাদপত্রের সাংবাদিকরা যে বেতন পেতেন, তার পরিমাণ শুনলে আজকের মানুষ অবাক্ হয়ে যাবেন। রবি চৌধুরীকে দেখেছি, পরে যিনি অমৃতবাজার পত্রিকার নিউজ এডিটর হিসাবে নাম করেছিলেন, তিনি তখনকার দিনে একজন সিনিয়র সাব এডিটর (পার্ট-টাইম)-রূপে মাইনে পেতেন মাসিক মাত্র ২৫ থেকে ৩০ টাকা। ভাবতে পারা যায়? অথচ সাংবাদিকদের তখন ছিল পথের ওপর পায়ে পায়ে কাঁটা-বিছানো। সহজে কেউ ও পথে পা-ও বাড়াতেন না। সংবাদপত্রের ব্যাপারে আইনকানুনও ছিল কঠোর, পান থেকে চুণ খসলেই জরিমানা অথবা জেল।

যাই হোক, পাঁচ বছর সাংবাদিক জীবন যাপন করার পর হঠাৎ এলো পরিবর্তন। প্রবীণেরা ১৯৩৭ সালের নির্বাচন আর তারপরে বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক্ সাহেব কর্তৃক মন্ত্রিসভা গঠনের কথা নিশ্চয় মনে করতে পারবেন। সে সময় বিধানসভার অধ্যক্ষ বা স্পীকার নির্বাচিত হয়েছিলেন আজিজুল হক, আর বাংলার লেজিসলেটিভ কাউন্সিল বা প্রাদেশিক আইন সভার সভাপতি হয়েছিলেন সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র। দেশবন্ধুর শিষ্য এবং সুভাষ-চন্দ্রের বিশেষ অন্তরঙ্গ এই সত্যেন্দ্রবাবু আমাকে চিনতেন সাংবাদিক হিসাবে। তাঁর ব্যক্তিগত কর্মচারী বা পার্সোনাল অ্যাসিসট্যান্ট হিসাবে আমাকে কাছে টেনে নিলেন। ছিলাম সাংবাদিক, হলাম সরকারী কর্মচারী।

এই ভাবে দিন যায়। তখনকার দিনের রাজনৈতিক আবর্তের কথা বিশদ করে বলে লাভ নেই। দেশ স্বাধীন আর দেশ-ভাগ,—তার স্মৃতি প্রবীণরা ভুলবেন কেমন করে? গান্ধীজীর বেলেঘাটার বাসায় যখন সুরাওয়ার্দি যেতে শুরু করেছিলেন, ঠিক সেই রকম কোনো একটি দিনে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিব সুকুমার সেন আমাকে সুরাওয়ার্দি সাহেবের পি-এ হিসাবে কাজ করার আদেশ দিয়ে পাঠালেন। আর এই আদেশের সঙ্গে সঙ্গে আমার ঐ সল্‌ডে-পাকানোর পর্বও শেষ হয়ে গেল।

বলা বাহুল্য, মন না চাইলেও শেষ পর্যন্ত যেতে হলো তাঁর কাছে, তাঁর বাড়িতে। ৪০ নম্বর থিয়েটার রোড। দুপুর গড়িয়ে তখন বিকেল, আমাকে

দোতলায় তাঁর শোবার ঘরের লাগোয়া ঢাকা বারান্দায় নিয়ে যাওয়া হল। খানিকক্ষণ পরে তাঁকে দেখতে পেলাম। ঘর থেকে বেরিয়ে আসছেন, পরনে সাদা পায়জামা আর চিকনের কাজ-করা পাঞ্জাবী। নমস্কার করলাম। অবাক্ হয়ে তাকালেন আমার দিকে, বললেন,—আপনি কে?

পরিচয় দিলাম।

উনি অল্প একটু হাসলেন, বললেন,—আমি আর আপনাদের মুখ্যমন্ত্রী নই, কিন্তু তবুও যে আমার কাজ করে দেবার জন্য আপনাকে পাঠিয়েছেন চীফ সেক্রেটারী, এজন্য তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ। আপনি বসুন।

আমাকে পাশে বসিয়ে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন কী কী আমাকে করতে হবে; আর কতক্ষণ তাঁর সঙ্গে থাকতে হবে।

খুব সহজ কথাবার্তা। সহজেই যেন কাছে টেনে নিলেন আমাকে। বললেন,—গান্ধীজীর কাছে আমাকে প্রায়ই যেতে হয়, জানেন ত? আপনাকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে।

বলেই আবার একটু হাসলেন,—না-না সভায় যখন যাবো, তখন নয়, সভায়-টভায় আপনার না থাকলেও চলবে।

সুরাওয়ার্দি সাহেবের সান্নিধ্যে সে-ই আমার প্রথম দিন। উনি কিন্তু তখনই ছাড়লেন না, শোবার ঘর থেকে একরাশ চিঠির একটি তাড়া নিয়ে এসে আমাকে সেগুলির উত্তর লিখিয়ে দিতে লাগলেন মুখে মুখে।

আমি অবশ্য জানতাম তিনি ছিলেন ব্যারিস্টার, আর অক্স্ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ইংরেজীর উপর ওঁর দখলও ছিল অসাধারণ। না থেমে সহজেই ডিক্টেশন দিয়ে যেতে পারতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তাঁর মুখে অমন চমৎকার ইংরেজী শোনাও একটা অভিজ্ঞতা বৈ কি! গত দশ বছর ধরে তাঁকে দূর থেকে দেখেছি প্রথমে মন্ত্রী হিসাবে, পরে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে,—কিন্তু কখনো কাছে আসবার সুযোগ হয় নি। এবার যখন সেটা হয়েছে, তখন তাঁকে আরও ঘনিষ্টভাবে জানবার সৌভাগ্য আমার নিশ্চয়ই হবে। ভাবলাম, এটাও কি কম লাভ?

রাত যখন প্রায় আটটা, তখন তাঁর ডিক্টেশন-দেওয়া উত্তরগুলি একেবারে টাইপ পর্যন্ত হয়ে গেলো। ওগুলোকে একবার ভাল করে দেখে নিয়ে সই করলেন তিনি। তারপরে বললেন,—আজ এখন বাড়ি যান, কাল সকাল

আটটায় আসবেন, আপনাকে নিয়ে যাবো গান্ধীজীর কাছে। না মশাই, আপনি যে কাজের লোক আছেন, এ কথা স্বীকার করতেই হয়।

কিন্তু এর মধ্যে একটা কথা বলতে আমার ভুল হয়ে গিয়েছিল। চায়ের সময় হলে ওঁর বেয়ারা ট্রেতে করে ওঁর জন্য চা আর বিস্কুট নিয়ে এসেছিল। চায়ে চুমুক দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করলেন,—আপনাকে চা দিয়ে গিয়েছিলো ত?

আমি কথাটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করতেই উনি বলে উঠলেন,—তার মানে, দেয় নি। বেয়ারা?

বেয়ারা ওঁর ডাক শুনে কাছে আসতেই প্রচণ্ড ধমক। বললেন,—এবার থেকে আমার সঙ্গে ওঁরও খাবার আনবে। বুঝেছো?

বলতে বাধা নেই যতদিন ওঁর কাছে ছিলাম, ততদিন এই হুকুম তামিল করতে বেয়ারার কোন দিন ভুল হয় নি।

প্রসঙ্গত বলা দরকার, কলকাতা তখনো খুনোখুনির ঘটনা থেকে একেবারে মুক্ত হয় নি, এধারে-ওধারে অতর্কিতে তখনো কিছু কিছু ছুরি মারামারি চলছিলো। আমি সেদিন রাত্রে যখন ৪০নং থিয়েটার রোডের বাড়ি থেকে বেরুলাম, তখন রাস্তা একেবারে নির্জন হয়ে গেছে; এসপ্লানেড এলাকায় হাঙ্গামা হওয়ায় বাস-ট্রাম আগেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। প্রায় আড়াই মাইল পথ হেঁটে যখন বাড়ি ফিরলাম, তখন রাত্ত গভীর।

পরদিন সকালবেলা পৌছতেই দেখি, সুরাওয়ার্দি সাহেব পোষাক-আশাক প'রে একেবারে তৈরি হয়ে আছেন; রোজ রোজ যেমন যান, তেমনি তখ্খুনি যাবেন গান্ধীজীর আস্তানায়। ৪০নং থিয়েটার রোডের বাড়ির নিচের তলায় থাকতেন সুরাওয়ার্দি সাহেবের বাবা স্যার জাহিদ সুরাওয়ার্দি, আর তাঁর বিমাতা, যিনি হিন্দু ছিলেন বলে আমি কানাঘুষো শুনেছিলাম। স্যার জাহিদ তখন স্থবির, ঘর থেকে বেরোতে পারেন না বললেই হয়। সুরাওয়ার্দি সাহেব করতেন কী, বাড়ি থেকে বেরোবার আগে বাপ-মাকে প্রণাম করতেন মাটিতে দণ্ডবৎ হয়ে—পা ছুঁয়ে, তার পরে খানিকক্ষণ বসে তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন। সেদিন আমি শুনলাম, তিনি তাঁদের ঘরে বসে গান্ধীজীর প্রার্থনা-গীতি আবৃত্তি করছেন,—'রঘুপতি রাঘব রাজা রাম / পতিতপাবন সীতারাম।'

সুরাওয়ার্দি সেই সময় বঙ্গের এপার ওপার দুপারের সংখ্যালঘুদের রক্ষা করার ব্যাপারে প্রাণমন ঢেলে দিয়েছিলেন। পূর্ববঙ্গের নেতাদের ওপর তাঁর

বেলেঘাটা শিবিরে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে অবিভক্ত বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জনাব হাসান শহীদ সুরাবর্দি

প্রভাব ছিল খুবই। আর সেই প্রভাব খাটিয়েই তিনি তাঁদের বোঝাতে চেষ্টা করছিলেন—ওপারে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা বজায় না রাখলে এপারের সংখ্যা-লঘুদের নিরাপত্তা থাকবে না। এই বিষয়ে আমাকে ডিক্টেশন দিয়ে তিনি যুক্তপ্রদেশের মুসলিম লীগ নেতা খলিকুজ্জমানকে চিঠি লিখেছিলেন। খলিকুজ্জমানের প্রদেশে এই সংখ্যালঘু সমস্যা ছিল বহুদিনের। সেই অভিজ্ঞতার আলোয় তিনি কী উপদেশ দিতে পারেন, সেটা জানবার জন্যই সুরাওয়ার্দি সাহেবের এই চিঠি। কলকাতায় সুরাওয়ার্দি ভবতোষ দাশগুপ্ত নামে এক যুবনেতাকে দিয়ে 'শান্তিসেনা' গঠন করেছিলেন। সত্যি কথা বলতে কী, কলকাতা ও আশপাশের এলাকায় সাম্প্রদায়িক প্রীতি ফিরিয়ে আনতে এই 'শান্তিসেনা' দারুণ কাজ করেছিল। এই প্রসঙ্গে এক বিকেলের কথা মনে পড়ছে। সুরাওয়ার্দি বেলেঘাটায় যাবেন গান্ধীজীর আস্তানায়। ড্রাইভার তাঁর প্রিয় বিরাট বুইকখানা গাড়িবারান্দায় এনে হাজির করলো। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে এই গাড়িখানাই সব সময় ব্যবহার করতে দেখেছি তাঁকে। কিন্তু সেদিন গাড়িটা দেখে তিনি একটু থমকে দাঁড়ালেন, তাঁর লম্বা-চওড়া পাঠান ড্রাইভারটিকে বললেন,—এতো বড়ো গাড়ি নিয়ে গান্ধীজীর কাছে যাবো কী হে, অ্যাঁ? ছোট গাড়ি নিয়ে এসো।

এরপর থেকে তিনি তাঁর ছোট গাড়িই ব্যবহার করতে লাগলেন। তাঁর পাঠান দেহরক্ষী বসতো ড্রাইভারের কাছে, আমি বসতাম পিছনে, তাঁর পাশে।

গান্ধীজীর আস্তানায় কখনো কখনো গভীর রাত পর্যন্ত থেকে যেতেন তিনি। পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষও নিয়মিত আসতেন গান্ধীজীর কাছে। আমি দেখতাম, ডঃ ঘোষ সুরাওয়ার্দি সাহেবের সঙ্গে প্রশাসন-সম্পর্কে আলোচনা করে তাঁর মতামত জেনে নিচ্ছেন।

যাই হোক, যেদিন রাত্রের কথা বলছিলাম, সেদিন সুরাওয়ার্দি সাহেবকে গান্ধীজীর আস্তানায় দুধ, মুড়ি আর গুড় খেতে দেওয়া হলো। তিনি খুব তারিফ করে খেলেন, আমার জন্যও এক বাটি আনিয়ে নিলেন। তারপর ওখান থেকে যখন আমরা বার হলাম, তখন মধ্যরাত্রি পার হয়ে গেছে। গাড়ি যখন থিয়েটার রোডে ঢুকছে, তখন তিনি বললেন,—আপনি কোথায় থাকেন? চলুন, আগে আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

আমি কথাটা শুনে আঁতকে উঠেছিলাম। আমার পাড়া কালীঘাটের অবস্থা আমি ভালো করেই জানি, সেখানে সারা রাত শিখ, বাঙালী আর বিহারী ছেলেরা পালা করে পাহারা দিয়ে বেড়ায়। তারা যদি গাড়ির মধ্যে সুরাওয়ার্দি সাহেবকে দেখে ফেলে, তাহলে যে কী সর্বনাশ হতে পারে তা কল্পনাও করা যায় না। আমি তাড়াতাড়ি বললাম,—স্যর, ওপারের হিন্দু আর এপারের মুসলমানদের পক্ষে আপনার জীবন মহামূল্যবান্। যদি এই নির্জন রাত্রে আপনাকে কেউ চিনতে পেরে কোনো অঘটন ঘটায়? আপনি দয়া করে যাবেন না।

সুরাওয়ার্দি এক মুহূর্ত চুপ করে কথাটা ভাবলেন, তারপর ড্রাইভারকে বললেন,—তাই হোক। আমাকে আমার বাড়িতে আগে নামিয়ে তারপর ওঁকে পৌঁছে দিয়ে এসো।

আমি নিশ্চিন্ত হলাম।

সুরাওয়ার্দি সাহেবের বিষয়ে কিছু বলতে গেলে তাঁর ব্যাপারে আমার প্রথম বিস্ময়ের কথাটাই বার বার বলতে ইচ্ছা করে। ওঁর বাড়িতে প্রথম যখন যাই, তখন তাঁর গৃহস্থালীতে মুসলমান কর্মচারীদেরই দেখতে পাবো, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু অবাক হয়ে দেখলাম, ব্যাপারটা আদৌ তা নয়। তাঁর সব থেকে খাস বেয়ারাটিই ছিল হিন্দু, ওড়িষ্যার লোক, নাম হচ্ছে শিবু। বিধানচন্দ্র রায়ের খাস বেয়ারা কার্তিকের যে স্থান ছিল তাঁর মনিবের জীবনে, শিবুরও ঠিক তাই ছিল সুরাওয়ার্দি সাহেবের কাছে। তাঁর পোশাক-আশাক থেকে শুরু করে কখন কী খাবেন তার ব্যবস্থা ঠিক রাখা, প্রয়োজনমাফিক জরুরি জিনিসপত্র এগিয়ে দেওয়া ইত্যাদি সব ব্যাপারেই ছিল ঐ শিবু। তাঁরও যেমন শিবুকে নইলে চলতো না, শিবুরও বোধ হয় তাঁকে নইলে চলতো না। এ ছাড়া আরও আছে, তাঁর নাপিত ছিল হিন্দু। তাঁর ব্যক্তিগত যে ব্যবসাপত্র ছিল, সে ব্যাপারে দেখাশোনা করবার জন্য যাঁরা ছিলেন, অবাক হয়ে লক্ষ্য করেছিলাম, তাঁরাও ছিলেন হিন্দু, মুসলমান নন।

তাঁর ব্যক্তিগত আরও কয়েকটা দিক আমার নজরে পড়েছিল। তাঁর প্রথম পক্ষের বড়ো মেয়ে মাঝে মাঝে তাঁর বাচ্চাটাকে নিয়ে স্বামীর সঙ্গে বাপের বাড়িতে এসে কিছুদিন থেকে যেতেন। তাঁদের কাছে পেয়ে মানুষটির মধ্যে ফুটে উঠতো এক অপূর্ব স্নেহময় রূপ। বাচ্চাটাকে নিয়ে তো খুবই আদর

করতেন সব সময়। আবার কখনো দেখেছি, সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরে অনেক রাত্রি পর্যন্ত ইংরেজি রেকর্ড বাজিয়ে গান শুনছেন এক মনে, অথবা একা একা ক্লাবে গেছেন সন্ধ্যাটা কাটিয়ে আসতে।

কিন্তু থাক এ সব ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ। যা বলছিলাম তা-ই বলি। গান্ধীজী কলকাতায় তখনকার মতো সাম্প্রদায়িক প্রীতি ও শান্তি ফিরিয়ে এনে সদলবলে দিল্লী চলে গেলেন। ওদিকে সুরাওয়ার্দি শরৎ বসুর সঙ্গে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠনের চেষ্টা করতে গিয়েছিলেন বলে পাকিস্তানের স্রষ্টা জিন্না-সাহেবের কোপদৃষ্টিতে পড়েছিলেন। তার ওপরে জিন্নার আস্থাভাজন ব্যক্তি ছিলেন নাজিমুদ্দিন। সুতরাং নবগঠিত পুর্ব পাকিস্তানের কর্তৃত্ব পেলেন তিনি, সুরাওয়ার্দি নন।

এই সময়ে পাঞ্জাবের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়ে। দুই সম্প্রদায়ের উদ্বাস্তুরাই পুর্ব অথবা পশ্চিম পাঞ্জাবে দলে দলে হাজির হতে লাগলো। জঘন্য পাশবিকতা আর গণহত্যার বিবরণ কলকাতায় বসে আমরা শুনতে লাগলাম। শুধু আমরা কেন, সারা ভারতবর্ষই উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগলো। এবং এ সব শুনে সুরাওয়ার্দি তৎক্ষণাৎ পাঞ্জাব যাবেন স্থির করলেন, আমাকেও বললেন সে-কথা। শোনা গেল, ব্রিটিশ হাই কমিশনারের ব্যক্তিগত প্লেনখানা পরদিন সকালে দিল্লী রওনা হচ্ছে। সুরাওয়ার্দি এই প্লেনে তাঁর জন্য একটি সীট রেখে দিতে কমিশনারের অফিসকে অনুরোধ জানালেন। উনি যেখানে যেতেন সেখানেই পি-এ বা ব্যক্তিগত সহকারীকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া ওঁর অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। আমি তাই ওঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমি কি সঙ্গে যাবো স্যর?

উনি বললেন, না-না,—যা অবস্থা শুনছি, সেখানে আপনার যাওয়া ঠিক হবে না।

যাই হোক, পরদিন সকালে ওঁর বাড়ি গিয়ে দেখি, ওঁর অনুগত বহু হিন্দু ও মুসলমান ওঁকে বিদায় জানাবার জন্য হাজির হয়েছেন। উনিও সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মা-বাবাকে নমস্কার করে, দমদম বিমান বন্দরের দিকে রওনা হয়ে গেলেন। সারাটা পথ চুপচাপ। দমদমে গাড়ি থেকে নেমে নির্দিষ্ট বিমানটির দিকে এগিয়ে চললেন। আমাকে ইঙ্গিত করলেন তাঁর 'ব্রিফ-কেস্'টি নিয়ে তাঁর পিছনে পিছনে আসতে। প্লেনের কাছে ব্রিটিশ হাইকমিশনার ও তাঁর লোকজন দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে সম্ভাষণাদি শেষ করে আমার

বলেছি, ৩০শে জুলাইয়ের বৈঠকে বড়লাট নিজে যোগদান করেছিলেন। এ-বৈঠকে তিনি বলেছিলেন, নতুন দুটি দেশের গঠনের কাজ ১৫ আগস্টের মধ্যে সেরে ফেলতেই হবে। এর মধ্যে বিভাগজনিত খুঁটিনাটিগুলো সেরে ফেলা বা মিটিয়ে ফেলা অবশ্যই সম্ভব নয়। কিন্তু তাহলেও একটি নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া দরকার। এবং এ-তারিখটি বেঁধে দেওয়া হলো ১৯৪৮-এর ৩১শে মার্চ। এই দিনটির মধ্যে দেশ-বিভাগের সব কাজ শেষ হওয়া চাই।

কিন্তু এসব খুঁটিনাটিতে আমাদের কাজ নেই। এ প্রসঙ্গে আমাদের এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, বাংলা ও পাঞ্জাব ভাগ করে তার সীমারেখা ঠিক করে দেবার জন্য দুটি বাউণ্ডারী কমিশন গঠন করা হলো, তার মধ্যে বাংলার ব্যাপারে ছিলেন স্যর র‍্যাডক্লিফের নেতৃত্বে কলকাতা হাইকোর্টের চারজন বিচারপতি, বিজন মুখোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বিশ্বাস, আবু সালেহ, মহঃ আক্রম এবং এস. এ. রহমান।

আর ওদিকে, যে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা তৈরি হলো ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে, তাতে ডঃ ঘোষ যাঁদের নেবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, তাঁরা হলেন, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় (চোখের অসুখ সারাতে তিনি তখন আমেরিকায়), ডঃ সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, নিকুঞ্জ মাইতি, যাদবেন্দ্র পাঁজা, কমলকৃষ্ণ রায়, হেম নস্কর, রাধানাথ দাস, কালীপদ মুখোপাধ্যায় এবং মোহিনী বর্মণ। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কেও তিনি মন্ত্রিসভায় চেয়েছিলেন। কিন্তু শ্যামাপ্রসাদ যাননি। ডঃ ঘোষের বয়স তখন ৫৭, অবিবাহিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কেমিস্ট্রিতে ফার্স্ট ক্লাশ পাবার পর ডক্টরেট হয়ে তিনি ১৯২০ সালে কলকাতা মিণ্ট-এ অ্যাসে মাস্টারের উচ্চ পদে যোগ দেন, যে পদে তাঁর আগে কোন ভারতীয় বসতে পারেননি। কিন্তু গান্ধীজীর ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি কাজ ছেড়ে কংগ্রেসের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

নিষ্ঠাবান্ এই কর্মী মানুষটিকে দিয়েই স্বাধীন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীত্বের কাজ শুরু হলো। তাঁর মন্ত্রিসভায় ডাঃ রায় যোগ দিতে পারবেন না বলে তাঁকে চিঠিতে জানিয়ে দিয়েছেন। ওদিকে শোনা গেল, ডাঃ রায়কে উত্তরপ্রদেশের গভর্নর বা রাজ্যপাল করা হয়েছে। ডাঃ রায় অবশ্য তখনো রয়েছেন আমেরিকায়। পশ্চিমবাংলার গভর্নর হয়ে আসছেন চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী।

পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ

১৫ আগস্ট স্বাধীনতা ঘোষিত হবার দুদিন পরে র‍্যাডক্লিফের রায় বেরুলো। বঙ্গবিভাগের কথা নতুন করে বলার দরকার নেই, তবে তখন খুলনাকে দেওয়া হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে, মুর্শিদাবাদকে পাকিস্তানে। পরে এটা আবার ঠিক করে নেওয়া হয়। মুর্শিদাবাদ ফিরে আসে, আর খুলনা চলে যায়।

ডঃ ঘোষের মন্ত্রিসভার সামনে প্রথমেই যে দুটো জিনিস চ্যালেঞ্জের আকারে দেখা দেয়, তা হলো একদিকে সাম্প্রদায়িকতা, অন্যদিকে কমিউনিষ্টদের কাজকর্ম। তাদের শ্লোগান ছিল, এ আজাদী ঝুটা হায়, ভুলো মৎ।

বলা বাহুল্য, এই দুই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে ডঃ ঘোষ পেছ-পা হননি। মন্ত্রী হবার পরই তিনি প্রায় প্রত্যেকটি জেলা ঘুরে জনসভায় দাঁড়িয়ে তাঁর বক্তব্য ভালোভাবে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি জোর দিতে লাগলেন সাম্প্রদায়িক প্রীতির ওপর। তিনি বলতেন, সবার জন্যই সমান সুযোগ করে দেওয়া হবে, গরীবদের অবস্থার উন্নতি করা হবে, আর যাঁরা পুঁজিপতি, তাঁদের বলছি গরীব আর অসহায়দের সাহায্যে যদি আপনারা এগিয়ে না আসেন, তাহলে আপনাদের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে যেতে পারে।

জেলায় জেলায় গিয়ে তিনি উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে বসতেন, তাঁদের বোঝাতেন আর বলতেন, বুরোক্রেসি ত্যাগ করুন, নতুন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিন।

স্থানীয় লোকেরা দলে দলে আসতো তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। তাদের কথা তিনি মন দিয়ে শুনতেন এবং কর্তাদের সম্পর্কে কোন নালিশ কানে এলে তা নিয়ে খোঁজ-খবর করতেন। খবর সত্যি হলে তাঁদের তৎক্ষণাৎ বদলি করে দিতে একটুও দ্বিধা করতেন না। এই রকম অবস্থায় একজন এস-পির কী অবস্থা হয়েছিল শুনুন। তিনি কাজের লোক, কিন্তু খুব মদ খেতেন। এঁর প্রমোশন ছিল সামনে, কিন্তু ডঃ ঘোষ তাঁর প্রমোশন আটকে তাঁকে অন্য জায়গায় বদলি করে দিলেন। কিন্তু এটা করবার আগে তিনি ভদ্রলোককে ডেকে পাঠালেন, বললেন, আপনি মদ খাওয়া ছাড়বেন কিনা ?

ভদ্রলোক বললেন, কথা দিচ্ছি স্যর, অবশ্যই ছাড়বো।

মাস দুই পরে খোঁজ নিয়ে যখন জানলেন, সত্যিই ভদ্রলোক আর মদ ছোঁননি, তখন তাঁকে তাঁর প্রাপ্য প্রমোশন দিয়ে হেড কোয়ার্টারে নিয়ে এলেন।

কিন্তু এ-সব ধরনের কাজ ছাড়াও ডঃ ঘোষ যেটা করতে বদ্ধপরিকর

হয়েছিলেন, সেটা হলো সরকারী কাঠামো থেকে দুর্নীতি দূর করা, আর কালোবাজারীদের শায়েস্তা করা। শুনেছিলাম, গোপন সংবাদ পেয়ে তিনি নিজেই উত্তর কলকাতার এক ময়দা-কলে গিয়ে হাজির হয়ে দেখেন ব্যাগভর্তি সব তেঁতুল-বিচি মজুদ হয়েছে, এগুলি ময়দার সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হবে। সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো আটক করে কল-মালিককে শাস্তি দিতে তিনি দ্বিধা করেননি। এ ছাড়া, পুলিশের নিচু তলায় দুর্নীতি দূর করার চেষ্টাও তাঁর একটা কীর্তি।

এক কথায় বলা যায়, ডঃ ঘোষ প্রশাসক হিসাবে ছিলেন খুবই দৃঢ় এবং দক্ষ। প্রশাসনের দিক থেকে তিনি তাঁর পার্টির বন্ধুদের হস্তক্ষেপ সহ্য করতেন না।

কিন্তু এই দক্ষতা এবং দৃঢ়তা থাকা সত্ত্বেও মাত্র সাড়ে পাঁচ মাস পরে তাঁকে গদী ছাড়তে হয়েছিল কেন, এটা ভাববার বিষয়। আমার মনে হয়, তাঁর এই দৃঢ়তাই এর কারণ। তিনি যে নীতি নিয়ে চলতেন, সেটা হলো এই যে, সব কিছু চলবে আইনমাফিক। যত চাপই আসুক না কেন, এই নীতি থেকে তিনি একটুও টলতে চান নি। বড়ো বড়ো ব্যবসায়ী একদিকে, অন্যদিকে কায়েমী স্বার্থ,—এই দুইয়ের সাঁড়াশী আক্রমণে শেষ পর্যন্ত তাঁকে চলে যেতে হয়েছিল। আমার মনে আছে, একদিন সন্ধ্যাবেলা তাঁর থিয়েটার রোডের বাড়িতে তাঁদের পার্টির একদল লোক এসে দাবি করতে থাকেন, কতগুলি লোককে অপরাধী হিসাবে আটক করা হয়েছে, তাদের ছেড়ে দিতে হবে, তাদের ওপর থেকে মামলাও তুলে নিতে হবে।

সে সময় তাঁর কাছে বসেছিলেন তাঁর একান্ত সচিব হাজরা এবং চীফ সেক্রেটারি। কিন্তু ডঃ ঘোষ তাঁদের কথা একেবারেই কানে নিলেন না, উল্টে বললেন,—অপরাধ প্রমাণিত হলে শাস্তি তাদের পেতে হবেই, তা তারা পার্টির লোকই হোক আর যা-ই হোক।

ডঃ ঘোষ যখন কিছুতেই তাঁদের কথা শুনলেন না, তখন তাঁরা এই বলে শাসিয়ে গেলেন, যাঁরা তাঁকে ক্ষমতায় তুলেছেন, তাঁদের কথা যখন তিনি শুনলেন না, তখন তাঁকে পস্তাতে হবে! এক কথায়, এই প্রত্যাখ্যানের মূল্য তাঁকে দিতেই হবে।

যাই হোক, আমার কথায় আমি ফিরে আসি। কাজের ব্যাপারে দেখেছি, ডঃ ঘোষ একেবারে ঘড়ি ধরে কাজ করার মানুষ। সকালে ঠিক সাড়ে নটায়

মহাকরণে আসতেন, যেতেন সন্ধ্যা ছটায়। অফিসেই হোক আর বাড়িতেই হোক যাঁরা দেখা করতে আসতেন, তাঁদের জন্য সময় বেঁধে-দেওয়া থাকতো। ফলে হতো কী যখন তিনি আফিসের কাজে বিভাগীয় সচিবদের সঙ্গে কথা বলতেন, তখন অন্য কেউ এসে ঢুকে পড়ে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারতো না। আমি এ-ও লক্ষ্য করেছি, তিনি খুব তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন। ফাইল ছেড়ে দিতে দেরি করতেন না, বা অফিসের কাজ ফেলেও রাখতেন না। আরও একটা জিনিষ তিনি করতেন, সেটা হলো, প্রত্যেক ফাইলই মিঃ হাজরাকে পরীক্ষা করতে দিতেন। তারপরে মিঃ হাজরার নোট আর বিভাগীয় নোট,—এই দুই মিলিয়ে দেখে, তারপরে নিজের সিদ্ধান্ত নিতেন। আরও একটা ব্যাপার তাঁর ছিল, যেটা ডঃ রায়ের ছিলো না, বিভাগীয় প্রধানদের টপ্‌কে অধস্তন কর্মচারীদের তাঁর কাছে সরাসরি আসতে তিনি কখনই অনুমতি দিতেন না।

ডঃ ঘোষ আরও কয়েকটি কাজ করেছিলেন, যাকে বিপ্লবাত্মক বলা চলে। প্রথম হচ্ছে, অফিসের কাজে যতদূর সম্ভব বাংলাভাষার প্রচলন। তাঁর নির্দেশে চীফ সেক্রেটারি হুকুম দিয়েছিলেন, যেখানে ডিক্‌টেশন দিতে হবে বা অনেক কপি করতে হবে, এমন সব নোট ছাড়া আর সব ক্ষেত্রেই বাংলায় নোট্‌ লেখা চালু করতে হবে। তাঁর আর একটি কাজ হচ্ছে করপোরেশন থেকে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচন প্রথা একেবারে তুলে দেওয়া। এ ছাড়া, সরকারী কর্মচারীদের মধ্য থেকে দুর্নীতি দূর করবার জন্য তিনি নিয়ম করে দিয়েছিলেন যে, কোনো সরকারী কর্মচারী ঘোড়দৌড় বা স্টক-এক্সচেঞ্জের বাজী ধরার ব্যাপারে অংশ নিতে পারবেন না। এই নিয়মটা করার দরকার হয়ে পড়েছিল। সরকারী কর্মচারীদের কেউ কেউ তাঁদের আয়ের উৎস হিসাবে প্রায়ই নজির দিতেন যে, তিনি ঘোড়দৌড় বা স্টক এক্সচেঞ্জের বাজী ধরে ঐ আয়টা করেছেন।

ডঃ ঘোষ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ও নেতা হিসাবে বিধানসভার মাত্র একটি সেশনেই অংশ নিতে পেরেছিলেন। ১৯৪৭-এর একুশে নভেম্বরের বিধানসভার অধিবেশনে পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের অভিনন্দন জানানো হয়, শ্রদ্ধা জানানো হয় শহীদদের এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামের সৈনিকদের ; হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক প্রীতি ফিরিয়ে আনবার ব্যাপারে গান্ধীজী যা করেছেন, তার জন্য

তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়, আর কৃতজ্ঞতা জানানো হয় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর উদ্দেশে, ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অসামান্য অবদানের কথা মনে রেখে।

সেদিন বিধানসভার ভিতরে যথোচিত গাম্ভীর্য ও প্রশান্তি বজায় থাকলেও বাইরের অবস্থা ছিল অন্যরকম। প্রায় দু হাজারের মতো কৃষকদের এক জনতা এসেছিল মন্ত্রিসভাকে অভিনন্দন ও তাদের কিছু দাবি জানাতে, কিন্তু পুলিশ তাদের আটকে দিয়েছে এসপ্লানেড ইস্ট-এ, বিধানসভার দিকে আসতে দেয় নি। আমাকে তখন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে থাকতে বলা হয়েছিল, যদি তাঁর কোনো কিছু দরকার-টরকার পড়ে, এইজন্য। আমি দেখলাম, ভূপেশ গুপ্ত আর কে. বি. রায় মুখ্যমন্ত্রীর ঘরের দিকে এগিয়ে আসছেন। আমি ওঁদের নিয়ে গেলাম মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে। ভূপেশবাবুরা অনুরোধ জানালেন, মিছিলটাকে বিধানসভায় আসতে দেওয়া হোক।

না, তা হতে পারে না,—ডঃ ঘোষ দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন,—শান্তিপূর্ণ মিছিলই হোক আর যা-ই হোক, বন্ধুত্বের মনোভাবই থাকুক আর শত্রুতার মনোভাবই থাকুক,—বিধানসভার অধিবেশন যখন চলছে, তখন কোনো মিছিলকেই আমি আসতে দিতে পারি না। বরং ওদের যেতে বলুন মনুমেণ্টের নিচে, আমি সেখানে গিয়ে তাঁদের সামনে দাঁড়াবো, কথা বলবো, কথা শুনবো, কিন্তু এখানে নয়।

ওদিকে ছাত্রদের একটা মিছিল আসছিল, সেটাকেও আটকে দেওয়া হয়েছে। তারা কর্ডন ভাঙবার চেষ্টা করায় পুলিশের সঙ্গে তাদের একটু সংঘর্ষও বেধেছিল। বিধানসভায় তখন কম্যুনিস্ট সদস্য ছিলেন মাত্র দুজন, তার মধ্যে একজন হচ্ছেন শ্রীজ্যোতি বসু। তাঁরা দুজন পরদিন বিধানসভায় পুলিশের কাজের নিন্দা করে প্রস্তাব আনতে চাইলেন। উত্তরে ডঃ ঘোষ বললেন, আমি খবর পেয়েছি সন্ত্রাস সৃষ্টি করে কিছু রাজনৈতিক কর্মী ক্ষমতা দখল করতে চাইছে। কিন্তু সেটা হবে না, সমস্ত শক্তি দিয়ে আমরা তার প্রতিরোধ করবো।

শুধু এই-ই নয়, বিধানসভায় সব থেকে জরুরী যে বিলটি তিনি আনলেন, সেটা হলো ওয়েস্টবেঙ্গল স্পেশাল পাওয়ার বিল। এটা আনার সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিবাদের ঝড় বয়ে গেল, সমালোচনার ঢেউ জেগে উঠলো। এমন কী পাকিস্তান থেকে কিরণশঙ্কর রায়ও এর প্রতিবাদ জানালেন। পূর্ব পাকিস্তানে কংগ্রেস

অ্যাসেমব্লী পার্টির নেতা ছিলেন তিনি। তাঁর মতে এর ফলে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের বিপদ হতে পারে। ডঃ ঘোষ এই বিলটির নাম বদলে রাখলেন 'ওয়েস্ট বেঙ্গল সিকিওরিটি বিল' এবং সঙ্গে সঙ্গে এই আশ্বাস দিলেন যে, এটা দিয়ে রাজনৈতিক বিরোধীদলকে চেপে দেওয়া হবে না, বা সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা হবে না। এটার উদ্দেশ্য অন্য। যারা সাবোটাজ করতে চায়, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধাতে চায় বা বিদেশী শক্তির হয়ে গোয়েন্দাগিরি করতে চায়,—এ বিল তাদের শায়েস্তা করবার জন্য।

কিন্তু আবার নিজের কথায় ফিরে আসি। ১০ই ডিসেম্বর আমি প্রথম দেখলাম পুলিশের গুলিচালনা, যার ফলে মারা গেল শিশির মণ্ডল। শিশির মণ্ডল ছিল রিলিফ এ্যাণ্ড ওয়েলফেয়ার অ্যাম্বুলেন্স কোর-এর লোক। ঘটনাটা গোড়া থেকেই বলি। উত্তেজিত এক ছাত্রমিছিল ঠেকাবার জন্য প্রচুর পুলিশী আয়োজন করা হয়েছিল, জারী করা হয়েছিল ১৪৪ ধারা। কিন্তু এই ধারা তারা অমান্য করে এগিয়ে আসে গভর্ণমেণ্ট হাউস ওয়েস্ট থেকে আর হাইকোর্টের ধার থেকে। টাউন হলের সিঁড়ি তারা অধিকার করে বসেও থাকে। কিন্তু তারা যদি শান্তিপূর্ণ অবস্থায় থাকতো, তাহলে কোন কথা ছিল না। তারা পুলিশের ওপর ইঁট-পাটকেল ছুঁড়তে থাকে। ফলে যা হয়, পুলিশের লাঠি-চার্জ আর টিয়ার-গ্যাস। বিক্ষোভকারীরা তখন এলোমেলো হয়ে টাউন হলে আর এ-জি বেঙ্গলের অফিসের ভিতরে ঢুকে আশ্রয় নেয়। আমরা যারা দাঁড়িয়েছিলাম অ্যাসেমব্লী বিল্ডিং-এর উত্তরের ব্যালকনিতে, দেখছিলাম, সমস্ত জায়গাটা ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে আর টিয়ার গ্যাসের জ্বালায় আমাদের চোখ দিয়ে জল পড়ছে। পুলিশ কমিশনার এস. এন. চ্যাটার্জী নিজে দাঁড়িয়ে থেকে পুলিশ ব্যবস্থার তদারক করছিলেন, হোম সেক্রেটারি বা স্বরাষ্ট্র সচিব রঞ্জিৎ গুপ্তও ছিলেন কাছে। কিন্তু উত্তেজিত জনতাকে ঠেকাবে কে? অ্যাসেমব্লীর মাঠে ইট পড়তে লাগলো, পাথর পড়তে লাগলো। এই রকম অবস্থায় পুলিশকে গুলি ছোঁড়ার নির্দেশ দেওয়া হলো! অবস্থা আয়ত্তে এলো, ১০০ জনকে গ্রেপ্তার করলো পুলিশ, তার মধ্যে আহত ২৩ জন।

এই ঘটনার বিবরণ পরে বিধানসভায় দিতে গিয়ে ডঃ ঘোষ বললেন,—এটা আর কিছুই নয়, গভীর একটা ষড়যন্ত্রের অংশ মাত্র। কিছু লোক জোর করে ক্ষমতা দখল করতে চাইছে।

যাইহোক, কংগ্রেস অ্যাসেম্বলী পার্টি তাড়াতাড়ি একটা মিটিং করে স্থির করলেন যে, ঐ বিলটি নিয়ে আর এগুনো ঠিক হবে না, ওটা বরং জনসাধারণের মতামত চাওয়ার জন্য ছেপে বিলি করা হোক।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে পণ্ডিত নেহেরু এলেন কলকাতায়, বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের বাৎসরিক সভায় ভাষণ দিতে। মন্ত্রিসভা এ সুযোগ ছাড়লেন না, তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে ঘটনার শেষ পরিস্থিতি বুঝিয়ে বললেন তাঁরা। কেন্দ্র থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলও প্লেনে করে চলে এলেন মুখ্যমন্ত্রীর আমন্ত্রণে, ময়দানের এক বিরাট জনসভায় তিনি ভাষণও দিলেন, বললেন—এই মন্ত্রিসভাকে আপনারা দুই বা তিন বছরের সুযোগ দিন, যাতে তাঁরা তাঁদের প্রোগ্রাম মতো কাজ করে যেতে পারেন।

আমার মনে আছে মিটিং-এর পর বল্লভভাই প্যাটেল চলে এলেন মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন ৮ নং থিয়েটার রোডে। ঘরে বসে ঘণ্টাখানেক ধরে দুই নেতা কথা-বার্তা বলতে লাগলেন। আমি দাঁড়িয়েছিলাম ঘরের বাইরে। পরে যখন চায়ের সময় হলো, তখন ডঃ ঘোষের নির্দেশে চা ও কিছু জলখাবারের ব্যবস্থা করতে হলো আমাকে। সর্দার প্যাটেলের খুব কাছে সেদিন আমি যেতে পেরেছিলাম। বিস্তারিত বলে লাভ নেই, দেখেছিলাম প্যাটেলজী কলা খেতে খুব পছন্দ করেন। অন্য খাবারের থেকে কলাই তিনি বেছে বেছে খেলেন বেশি।

যাই হোক, বিরোধিতা সত্ত্বেও সেই সিকিওরিটি বিলটি পাশ হয়ে গেল ৪ঠা জানুয়ারী ১৯৪৮ সালে। পক্ষে ছিল ৪৭ ভোট, বিপক্ষে বারো। কিন্তু তার পরের দিন সকালে কলকাতার লোক কাগজ খুলে যা দেখলো, তাতে অবাক হয়ে গেল। খবর বেরিয়েছিল, ডঃ ঘোষ মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করছেন। কংগ্রেস লেজিসলেটিভ পার্টির ২৫ জন সভ্য তাঁকে গিয়ে বলেন, দেশের মুখ চেয়ে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে একটি জোরালো মন্ত্রিসভা এখন গঠন করা দরকার। তাঁদের অনুরোধ শুনেই ডঃ ঘোষ এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছেন। অথচ, তার আগের দিন তাঁর অতো কাছে থেকেও খবরটা আমি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারি নি, যদিও নানারকম কানাঘুষো কানে আসছিল।

১৫ই জানুয়ারি সন্ধ্যাবেলা পনেরো মিনিটের একটি সংক্ষিপ্ত মিটিংয়ে বসে কংগ্রেস অ্যাসেম্বলী পার্টি ডঃ ঘোষের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করলেন এবং ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে নেতা নির্বাচিত করলেন। বিগত ১লা নভেম্বর ডাঃ রায়

ফিরে এসেছিলেন আমেরিকা থেকে কিন্তু তিনি উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপালের পদ নেননি। ১৫ই জানুয়ারির ঐ মিটিংয়ের সময় ডাঃ রায় কলকাতায় ছিলেন না, তিনি ছিলেন দিল্লীতে, গান্ধীজীর পাশে। গান্ধীজী তখন হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের জন্য অনশন করছিলেন এবং এটাই ছিল তাঁর জীবনের শেষ অনশন। ডঃ ঘোষ অবশ্য ঐ সভার সিদ্ধান্তের পরেই মুখ্যমন্ত্রীরূপে তাঁর পদত্যাগপত্র পেশ করেন তখনকার রাজ্যপাল শ্রীরাজাগোপালাচারির কাছে।

পরদিন সকালে ডঃ ঘোষ আমাকে ডেকে বললেন,—চলো হে আমার সঙ্গে রাইটার্স বিল্ডিং-এ, আজই ত আমার শেষ দিন!

রাইটার্সে এসে জরুরী ফাইলগুলোর কাজ শেষ করে ডঃ ঘোষ ডেকে পাঠালেন চীফ সেক্রেটারিকে। এবং আমার সামনেই তাঁকে বললেন,—চক্রবর্তী যদি চায় ত ওকে বিধানবাবুর কাছে কাজ করতে দেবেন, এই অনুরোধ রইল আপনার কাছে।

বলা বাহুল্য, এই অনুরোধের অমর্যাদা করা হয় নি, আমি বিধানচন্দ্রের কাছে কাজ করার সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়েছিলাম।

কিন্তু যাক সে কথা। পরদিন ৮নং থিয়েটার রোডের বাড়িখানা অন্য চেহারা নিয়ে দেখা দিল চোখের সামনে। সারি সারি গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতো, লোক-জনের অন্ত ছিল না। আজ সব কই? না আছে গাড়ির মেলা, না আছে লোকের ভীড়। ডঃ ঘোষ তাঁর জিনিসপত্র গুছিয়ে নিচ্ছিলেন। এখান থেকে তিনি চলে যাবেন গড়িয়াহাট রোডের একটি ছোট্ট একতলা বাড়িতে। দেখতে দেখতে যাবার সময় যখন সত্যিই ঘনিয়ে এলো, তখন দেখি নিচের তলায় একটি তরুণী মেয়ে তার সঙ্গীর সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে তার এক জোড়া খদ্দরের ধুতি। ডঃ ঘোষের জন্য নিজের হাতে সে বুনে এনেছে। ডঃ ঘোষ কোন অবস্থাতেই কখনো কারুর উপহার নিতেন না মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন। এবার একটু হেসে মেয়েটির সামনে হাত পাতলেন, বললেন,—দাও, এখন আর আমি মুখ্যমন্ত্রী নই।

আমি সেদিন যখন তাঁর সঙ্গে ৮নং থিয়েটার রোডের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম, তখন মনটা খুবই ভারাক্রান্ত ছিল। আমার সৌভাগ্য, আমি তাঁর স্নেহ পেয়েছিলাম। তাই এই ছাড়াছাড়িটা মন মেনে নিতে চাইছিল না। মনে হচ্ছিল, এই শেষ দেখা, আর ওঁর সঙ্গে দেখা হবে না কোনদিন।

কিন্তু ভাগ্যবিধাতা মনে মনে হেসেছিলেন। দেখা হলো তাঁর সঙ্গে আবার রাইটার্স বিল্ডিংয়ে, কুড়ি বছর পরে. তিনি তখন এসেছেন খাদ্যমন্ত্রী হয়ে, প্রথম যুক্তরাষ্ট্র মন্ত্রিসভার অন্যতম সভ্য হয়ে। তখনকার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের ঘরেই তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল। তিনি আমাকে ঠিকই চিনতে পারলেন, আমাকে দেখে একটু হাসলেন, বললেন,—ভালো আছো ত?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

কিন্তু কথায়-কথায় এগিয়ে এসেছি, আবার পিছিয়ে যেতে হবে। ডঃ ঘোষের বিদায় এবং ডাঃ রায়ের আবির্ভাব।

॥ ৩ ॥ ॥ ১৯৪৮ ॥

ডাঃ রায় সম্পর্কে পণ্ডিত নেহেরু বলতেন,—তিনি নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান-বিশেষ। আবার কেউ বা বলতেন,—হিতকারী একনায়ক। আসলে তাঁর সম্পর্কে নানাজনে নানা ব্যাখ্যা করে গেছেন। একই সত্তায় তিনি ছিলেন বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী। চিকিৎসক হিসাবে তাঁর কৃতিত্ব ও হাতযশের তুলনা ছিল না। কিন্তু উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপালের পদ গ্রহণ না করে তিনি যখন সমস্যাসংকুল পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীত্বের কাঁটার মুকুট মাথায় তুলে নিলেন, তখন থেকে শুরু করে, অর্থাৎ ১৯৪৮-এর তেইশে জানুয়ারি, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মদিনে, সকাল নটা পনেরো মিনিটে শপথ-গ্রহণের সময় থেকে, ১৯৬২ সালের ১লা জুলাই বেলা ১২ টার সময় পর্যন্ত একটানা সাড়ে চৌদ্দ বছর, তাঁর প্রচণ্ড কর্মধারা ও সৃষ্টিশীল মানসিকতার যে প্রকাশ ঘটেছে,—তা এককথায়, বিস্ময়কর। আসলে মুখ্যমন্ত্রীরূপে তাঁর জীবনের যে কাহিনীর শুরু, তা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গেরই বিভিন্নমুখী উন্নয়নের কাহিনী।

ডাঃ রায় বলতেন,—আমার জীবন-গঠনের মূলে রয়েছেন প্রধানত তিন জন। এক জন হচ্ছেন কর্ণেল লিউকিস, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ইংরেজ প্রিন্সিপাল। আমার চিকিৎসা-বিদ্যার ভিৎ তৈরি করে দিয়েছিলেন তিনিই। আর আমার রাজনীতির গুরু হচ্ছেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, তাঁর কাছেই আমার রাজনীতি আর সংসদীয় কার্যকলাপের হাতেখড়ি। এর পরে আসে তৃতীয় ব্যক্তির কথা। ইনি হচ্ছেন মহাত্মা গান্ধী। তাঁর সত্য ও অহিংসার নীতি আমাকে যে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল সন্দেহ নেই। তাঁর কাছে আমি এ-ও

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে লেডী মাউণ্টব্যাটেন

শিখেছিলাম, নিজের জীবনেই হোক আর রাষ্ট্রের ব্যাপারেই হোক, দৈনন্দিন সমস্যা বিষয়ে কী করে এই নীতির প্রয়োগ করা সম্ভব।

বিধানচন্দ্র জন্মেছিলেন পাটনায় ১৮৮২ সালে। প্রথম জীবনটা তাঁর কেটেছিল অসচ্ছলতার মধ্যে। স্বাস্থ্যও তাঁর তখন ছিল খুব খারাপ। বলতেন,—রূপোর চামচে মুখে নিয়ে তো জন্মাইনি, তাই আমার ছাত্র জীবনের পথ ফুল-বিছানো ছিল না।

পড়তেন মেডিক্যাল কলেজে। বাবা যা কষ্টেসৃষ্টে পাঠাতেন, তাতে কুলোতো না। তাই বাইরের রোগীদের জন্য আংশিক নার্সিংয়ের কাজ নিয়ে বাড়তি কিছু কিছু রোজগার করে নিতে হতো। এই যাঁর আর্থিক অবস্থা, তিনি বিলেতে গিয়ে সেন্ট বার্থোলোমিউ কলেজে তিন বছর ধরে কী কষ্ট করে যে পড়াশোনা চালিয়েছিলেন, তা সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু সেই অশেষ দুঃখকষ্টের শেষে পেয়েছিলেন জয়ের মালা। একই বছরে এম-আর-সি-পি ও এফ-আর-সি-এস চিকিৎসা-বিদ্যার দুটি শ্রেষ্ঠ ডিগ্রি নিয়ে একটি রেকর্ডই করে এসেছিলেন তিনি। এ কী কম কৃতিত্বের কথা?

বিধানবাবুর চিকিৎসক জীবনের সাফল্যের কথা নিয়ে পুঁথি বাড়াতে চাই না, রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁর প্রবেশ ১৯২৩ সালে, তখন তাঁর বয়স ৪২ বছর। প্রবীণেরা মনে করতে পারবেন, দেশবন্ধুর সাহায্যে তিনি তখনকার বাংলার সিংহ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জনক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁরই ব্যারাকপুর কেন্দ্রে বিপুল ভোটে হারিয়ে দিয়ে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা বা বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে প্রবেশ করেছিলেন। তিনি দাঁড়িয়েছিলেন নির্দল প্রার্থী হিসাবে, কিন্তু দেশবন্ধুর স্বরাজ্য পার্টি তাঁকে সাহায্য করেছিল। সাহায্য করেছিলেন স্বয়ং দেশবন্ধু। বিধানবাবু নির্দল হলেও তাই কাউন্সিলে বসতেন স্বরাজ্য পার্টির সঙ্গে, এবং সবসময় তাঁদের সমর্থন করতেন। দেশবন্ধু ও বিধান-চন্দ্রের সম্পর্ক এই সব ব্যাপারের মধ্য দিয়ে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। আর সেজন্যই বোধহয় দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর গান্ধীজী তাঁকেই দেশবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্টের সেক্রেটারি-ট্রাস্টি করে দেন। দেশবন্ধুর বাসভবনে গড়ে উঠেছিল চিত্তরঞ্জন সেবাসদন ও চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতাল। আর এই প্রতিষ্ঠান-দুটির গড়ে-ওঠা থেকে শুরু করে, এর উন্নয়ন ও বিস্তার,—সবই সম্ভবপর হয়েছিল দেশবন্ধু-শিষ্য বিধানচন্দ্রের অনেক দিনের ঐকান্তিক চেষ্টায়।

সংসদীয় কাজকর্মের দিক থেকে দেখতে গেলে, তখনকার দিনে বিধানচন্দ্র কাউন্সিলের সভ্য হিসাবে বাংলার শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে যা করতে পেরেছিলেন, তা-ও উপেক্ষা করার নয়। বিশেষ করে বাজেটের ব্যাপারে তাঁর তীক্ষ্ণদৃষ্টি সব ফাঁকি বা গোঁজামিল চট করে ধরে ফেলে সবার বিস্ময়ের সৃষ্টি করতো। কাউন্সিলে ডাঃ রায় প্রথম যে উল্লেখযোগ্য ভাষণ দেন, তা হলো কাউন্সিলের অধ্যক্ষ কুমার শিবশেখরেশ্বর রায়ের অপসারণের জন্য বীরেন্দ্রনাথ শাসমল যে প্রস্তাব এনেছিলেন, তার সমর্থনে। কিন্তু সংসদীয় দক্ষতার দিক থেকে তিনি সব থেকে নাম করলেন ১৯২৭ সালে, যখন তিনি নিজেই দুটি অনাস্থা প্রস্তাব আনলেন দুজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে, এঁরা হলেন ব্যোমকেশ চক্রবর্তী ও আবদুল হালিম গজনভী। তাঁর ভাষণের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তাতে ব্যক্তিগত কোনো আক্রমণ ছিল না। এবং তাঁর ভাষণ নিষ্ফল হয় নি, মন্ত্রী দুজনকেই পদত্যাগ করতে হয়েছিল। এই পদত্যাগকেই তখন সবাই আখ্যা দিয়েছিল,—গজ-চক্রবর্তীর পতন।

দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর স্বরাজ্য পার্টির নেতা হয়েছিলেন জে. এম. সেনগুপ্ত এবং উপনেতা বা ডেপুটি লীডার হয়েছিলেন ডাঃ রায়। কিন্তু এরপর কংগ্রেস যখন অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেয়, তখন তিনি সেই ডাকে সাড়া দিয়ে কাউন্সিলের সদস্যপদ ত্যাগ করেন। এবং তারপরেই তাঁকে দেখি কলকাতা মহানগরীর সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করতে। স্বয়ং নেতাজী সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাবে তিনি কলকাতা করপোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাঁর প্রশাসনের অভিজ্ঞতার শুরু হয়েছিল এইভাবেই।

এরপরে তিনি অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে আরও জড়িয়ে পড়লেন। ১৯৩৩ সালে নেতাজী এবং জে. এম. সেনগুপ্তের মতো নেতারা গেলেন জেলে। তাঁদের পরে তাঁরই ওপর এসে পড়লো এই আন্দোলন-পরিচালনার ভার। ডাঃ রায় আবার কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিরও সভ্য ছিলেন। এই সময় তাঁকে কারাবরণ করতে হয়েছিলো। সে-ও এক নাটকীয় কাহিনী। জেলে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু অসুস্থ হয়ে পড়েছেন শোনা গেল। গলা দিয়ে তাঁর রক্ত উঠছে। শুনে কলকাতা থেকে রওনা হলেন ডাঃ রায়, আর দিল্লী থেকে রওনা হলেন ডাঃ এম. এ. আনসারি। তাঁরা পণ্ডিতজীকে পরীক্ষা করে উত্তরপ্রদেশ সরকারকে একটি স্মারকলিপি পাঠালেন। মৌলানা আবুল কালাম আজাদের

পরে ডাঃ আন্সারিই কংগ্রেস-সভাপতি হিসাবে কাজ করছিলেন। তিনি জরুরী কাজে ফিরে গেলেন দিল্লী, আর ডাঃ রায় অপেক্ষা করতে লাগলেন এলাহাবাদে, যুক্তপ্রদেশ সরকার স্মারকলিপির কী উত্তর দেন, তা শোনবার জন্য। পণ্ডিতজীর স্বাস্থ্যের যা অবস্থা, তাতে অবিলম্বে তাঁকে মুক্তি দেওয়া দরকার। কিন্তু পরদিন কাগজে যা দেখলেন, তার সুর ভিন্ন। সরকার গোটা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিকেই বে-আইনী ঘোষণা করে দিয়েছেন। কলকাতায় ফিরে আসার বদলে ডাঃ রায় তাই তাড়াতাড়ি চলে গেলেন দিল্লী, সবার সঙ্গে পরামর্শ করতে। কিন্তু সেখানেই তিনি গ্রেপ্তার হলেন ডাঃ আন্সারি, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, বিঠলভাই প্যাটেল প্রভৃতিদের সঙ্গে। বিচার হলো ১৯৩০এর ২৬ আগস্ট, দিল্লী জেলের ইয়োরোপীয়ান ওয়ার্ডে। এক ম্যাজিস্ট্রেট করলেন বিচার, তাঁদের প্রত্যেকের ছ মাসের জেল হয়ে গেল। ডাঃ রায় দশ দিন কাটালেন দিল্লী জেলে, তারপরে তাঁকে নিয়ে আসা হলো কলকাতায়, আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে।

এই ঘটনার আঠারো বছর পরে কলকাতা যখন সমারোহে নেতাজীর জন্মদিন পালন করছে, তখন রাজ্যপাল রাজাগোপালাচারীর কাছে শপথ-পাঠ করার পর বিধানচন্দ্র তাঁর মন্ত্রিসভা গঠন করলেন। তার পরে যিনি শপথ নিয়েছিলেন, তিনি হচ্ছেন নলিনীরঞ্জন সরকার। তিনি কলকাতার বিরাট ব্যবসায়ী ও ১৯৩৭-এ ফজলুল হক মন্ত্রিসভার একজন মন্ত্রী ছিলেন, পরে বড়লাটের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সভ্যও হয়েছিলেন। আর যাঁরা শপথ নিলেন, তাঁরা হচ্ছেন,—হরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, বিমলচন্দ্র সিংহ, ভূপতি মজুমদার, প্রফুল্লচন্দ্র সেন, নীহারেন্দু দত্তমজুমদার, মোহিনীমোহন বর্মন, কালীপদ মুখোপাধ্যায়, যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা ও হেমচন্দ্র নস্কর।

এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, ডঃ ঘোষকে বিধানবাবু তাঁর মন্ত্রিসভায় আনবার খুবই চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু নানা কারণে ডঃ ঘোষ আসেননি। এলে কী হতো বলা যায় না, কিন্তু পরবর্তী ঘটনায় দেখা গেছে, এঁরা দুজনে পরস্পরের কাছ থেকে ক্রমেই দূরে সরে গেছেন। শেষ পর্যন্ত ঘটনা এমন দাঁড়িয়েছিল যে, ডঃ ঘোষ তাঁর গ্রুপের সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দেবেন সেনকে নিয়ে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে নতুন দল গঠন করেছিলেন, যার নাম দিয়েছিলেন,—প্রজা সোসালিস্ট পার্টি। এঁরা কংগ্রেসের বিপক্ষদল হিসাবে কাজ করতেন।

যাই হোক, ডাঃ রায় সেদিন বলেছিলেন,—আমি কোন গ্রুপের নই, সবাই মিলে একত্র হয়ে আমাকে নির্বাচিত করেছেন। আসলে, এদেশের এখনকার গোলমালটা হচ্ছে এই দলবাজীর জন্য, পরস্পরের মধ্যে হিংসা আর রেষারেষির জন্য, অবিশ্বাস আর সন্দেহের জন্য। আমি চাই এ সবের উর্ধ্বে উঠে সবাই একযোগে কাজ করুন। আর এই ঐক্যের প্রেরণাই আমার মন্ত্রিসভাকে একটি সুসংহত ও গতিশীল মন্ত্রিসভা করে তুলবে।

ডাঃ রায় নিজে নিয়েছিলেন স্বরাষ্ট্র, স্বাস্থ্য ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন দপ্তর। আর মন্ত্রিসভায় ডাঃ রায়ের পরেই যাঁর স্থান ছিল তখন নির্দিষ্ট, সেই নলিনী রঞ্জন সরকারকে দিয়েছিলেন অর্থ এবং শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের ভার। ডাঃ রায় একবার ইয়োরোপে গেলে এই নলিনীবাবুই তখন মুখ্যমন্ত্রীর কাজ চালিয়েছিলেন।

এইবার মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে ডাঃ রায়ের কাজকর্মের কথায় আসা যাক। প্রথমেই যেটার উপর তাঁর চোখ পড়েছিল, সেটা হচ্ছে হাওড়ার দুটো পাটকলের মাসাবধিকাল লক্-আউট অবস্থায় থাকার ঘটনা। এর ফলে বসে গিয়েছিল কুড়ি হাজার শ্রমিক। এর ব্যবস্থা করেই তিনি ডেকে পাঠালেন সিভিল সাপ্লাইয়ের কমিশনার কান্তি বসাক আই-সি-এসকে। ডাঃ রায় বললেন, —নোট্ দিন। এ-রাজ্যের খাদ্যপরিস্থিতির পুরো ছবিটা আমি দেখতে চাই।

এর পরে চীফ সেক্রেটারি সব বিভাগেরই প্রধানদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন। এসবই হলো ডাঃ রায়ের রাইটার্সে আসার প্রথম দিনের ঘটনা। তিনি তাঁর সরকারের নীতি হিসাবে ঘোষণা করলেন,—জনগণের প্রয়োজন মেটানোই আমাদের কাজ। তার মধ্যে প্রথমটাই হচ্ছে আমাদের খাদ্য-বস্ত্র সমস্যার সমাধান করার কাজ। পরের কাজ হচ্ছে, এই যে বিপুল-সংখ্যক মানুষ এসেছেন পুর্ববঙ্গ থেকে (তখনকার হিসাবে প্রায় দশলক্ষ উদ্বাস্তু) এঁদের ঠিকমতো কাজে লাগানো। তারপরের কাজ হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তে যাঁরা বাস করেন, তাঁদের মধ্য থেকে আতঙ্ক দূর করা আর সম্ভব মতো পুর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের মনে নিরাপত্তার ভাব ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা।

আমরা তখন লক্ষ্য করেছি, ডাঃ রায় অভিনন্দন সভা-টভা একেবারেই পছন্দ করতেন না। মন্ত্রিসভা গঠনের দুদিন পরেই ল-কলেজের ছাত্ররা এসে তাঁকে আমন্ত্রণ জানালো কলেজে গিয়ে ভাষণ দেবার জন্ত।

তিনি বললেন,—সময় হবে না হে, ভীষণ ব্যস্ত।

কিন্তু তারা কি অত সহজেই শুনবে? বিলক্ষণ পীড়াপীড়ি করতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়েই ডাঃ রায় বললেন,—দেখ আটচল্লিশ ঘণ্টা মাত্র হলো আমরা এখানে এসেছি। কী করেছি সাধারণ মানুষের জন্য, যে তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াবো? যেদিন কিছু করতে পারবো সেদিনই গিয়ে দাঁড়াবো, তার আগে নয়।

এবং তাঁর কথা তিনি রেখেছিলেন। বেশ কয়েকটা মাস তারপর কেটে গেল তিনি সভায়-টভায় যাননি বললেই হয়। তার বদলে সবার চোখের অন্তরালে সরে গিয়ে একমনে কাজ করে গেছেন, যাতে দেশের সমস্যাগুলির মোকাবিলা করতে পারেন। একনাগাড়ে বারো ঘণ্টা কাজ করতেন, মাঝে ঐ অফিসের লাউঞ্জেই লাঞ্চ সেরে নিতেন। খাওয়া আর একটু বিশ্রাম নিয়ে মোট সময় নিতেন ৪৫ মিনিট।

মনে আছে, বাড়িতে তাঁর এক বিরাট লাইব্রেরী ছিল। আমি তাঁর কাজ করতে প্রথম যেদিন সকালে তাঁর কাছে গেলাম, তিনি তখন একগাদা চিঠি সামনে রেখে এক-এক করে দেখছিলেন্। যখন শুনলেন তাঁর পি-এ বা ব্যক্তিগত সহায়ক হয়ে আমিই এসেছি কাজ করতে মুখ্যসচিবের নির্দেশে, তখন আর দেরি না করে সঙ্গে সঙ্গে চিঠির উত্তর মুখে মুখে লিখিয়ে দিতে শুরু করে দিলেন। খুব দ্রুত ডিক্‌টেশন দিতে পারতেন ডাঃ রায়। গলাটা একটু তুলে, যেন জনসভায় ভাষণ দিচ্ছেন, এমনি ভঙ্গিমায় প্রথম-প্রথম ডিক্‌টেশন দিতেন। তাঁর চিন্তার পরিচ্ছন্নতা ও যুক্তির তীক্ষ্ণতা ছিল লক্ষ্য করবার মতো। তাঁর সঙ্গে আমি কাজ করেছি এক নাগাড়ে সাড়ে ১৪ বছর। এই সাড়ে ১৪ বছর আমার কাজ ছিল তাঁর সঙ্গে সাধারণ মানুষ যাঁরা দেখা করতে আসতেন, প্রয়োজন মাফিক তাঁদের আগু-পিছু নির্দেশ করে দেওয়া, চিঠির ওপরে নোট লেখা, তাঁর ফাইল ও কাগজপত্র গুছিয়ে দেওয়া, আর তারপরে তাঁর পিছনে পিছনে রাইটার্সে আসা। রাইটার্সে তিনি আসতেন সবার আগে, যেতেন সবার শেষে।

কাজকর্মে নিয়মানুবর্তিতা ছিল তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। সাধারণত তিনি উঠতেন ভোর পাঁচটায়, আর সাড়ে ছটার মধ্যে চান-টান করে নিয়ে তিনি একেবারে রেডি। খুব কম লোকই জানেন, তাঁর বিছানার পাশে থাকতো গীতা আর ব্রহ্মস্তোত্রম্,—এই দুইখানি বই। নিয়ম করে রোজই পড়তেন তার

কিছু কিছু। এই প্রসঙ্গে তাঁর সকালবেলাকার জলখাবারের কথাটাও বলি। একটা ডিম, গোটা দুই টোষ্ট, একটা কলা বা পেঁপে, একটু বেল আর কফি। যাঁরা তাঁর অন্তরঙ্গ, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ওঁর সঙ্গে ব্রেক ফাষ্টের টেবিলে বসে যেতেন মাঝে মাঝে। এঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কর্ণেল ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

বলা বাহুল্য, ডাক্তার হিসাবে ডাক্তারী ছিল ডাঃ রায়ের জীবনের প্রধান আকর্ষণ। মন্ত্রিসভায় যোগ দেবার আগে তাঁর আয় কতো ছিল শুনবেন? তাঁর অ্যাকাউন্ট্যান্ট মিঃ সাইলাসের কাছ থেকে শুনেছি, যে মাসে তিনি মুখ্যমন্ত্রী হলেন, তার আগের মাসে তাঁর আয় হয়েছিল ৪২ হাজার টাকা। মন্ত্রী হবার পর তাঁর মাসিক বেতন হলো ১,৪০০ টাকা। এ অঙ্ক আবার মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তিনি নিজেই ঠিক করে দিয়েছিলেন। ডাক্তার হিসাবে তাঁর আয় যদি কম করে ধরি মাসিক তিরিশ হাজার টাকা, তাহলে সাড়ে চৌদ্দবছরে তাঁর আয় হঁতো ৫০ লাখ টাকা। সে ক্ষেত্রে তিনি মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে সাড়ে চৌদ্দবছরে আয় করেছেন কতো? না, বেতন আর ভাতা টাতা নিয়ে মাত্র আড়াই লাখ টাকা। এই অসাধারণ আর্থিক স্বার্থত্যাগ ভারতের কজন রাজনৈতিক নেতার আছে?

ডাক্তার হিসাবে আয় করেছেন তিনি প্রচুর সন্দেহ নেই, কিন্তু রাখতে পেরেছেন কই? আয়ের বেশিটা যেতো দান-খয়রাতে; যে সব হাসপাতাল তৈরি করেছিলেন নিজে, তার খরচ জোগাতে; এছাড়া কংগ্রেসের জন্য খরচ ত ছিলই। ১৯৩৬ সালের নির্বাচনের জন্য কংগ্রেসের টাকা যোগাতে গিয়ে তিনি তাঁর নিজের বসত বাড়িটা পর্যন্ত বাঁধা রাখতে দ্বিধা করেন নি। বহু গরীব উদ্বাস্তু আর অভাবী মানুষ তাঁর কাছে আসতো সাহায্য চাইতে, এবং প্রায় প্রত্যেক দিনই তিনি তাদের কিছু না কিছু দিতেন। দেবার সময় তাদের সামনে দাঁড়াতে তাঁর সংকোচ হতো, তিনি নিজে অন্তরালে গিয়ে আমাকে এগিয়ে দিতেন। তাঁর নীতি ছিল, ডান হাত দেবে, বাঁ হাত তা জানতে পারবে না।

কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারেন, এই অল্প আয়ে তিনি তাঁর গৃহস্থালীর খরচ সামলাতেন কী করে? লোকজন, এসো-জন বসো-জন নিয়ে তাঁর খরচের বহর তো নেহাৎ কম ছিল মনে হয় না।

ঠিক। কিন্তু এর উত্তরও আমি দিতে পারি। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দুটি বছর কাটাতে না কাটাতেই কলকাতার উপকণ্ঠে তাঁর যে জমি ছিল, সেটা তাঁকে বিক্রি

করে দিতে হয়েছিল। শুধু কি তাই? বিভিন্ন কোম্পানীতে তাঁর যে শেয়ার ছিল, তাও আস্তে আস্তে বিক্রি করতে হয়েছিল, কতগুলি কোম্পানীর তিনি নিজেই ছিলেন চেয়ারম্যান। কিন্তু এতেও হয় নি। তাঁর শিলং-এর অতো সাধের যে রায়-ভিলা, তা-ও শেষপর্যন্ত বিক্রি করে দিতে হয়েছিল। শেষ বয়সে এমন করে রিক্ত হতে তাঁর কোনো কুণ্ঠা ছিল না, দুর্ভাবনা ছিল না, হাসিমুখেই অসচ্ছল জীবন বরণ করে নিয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলি। তাঁর বাড়িতে রোগী বা অভ্যাগত আসার দিক থেকে কোনো বাধানিষেধ ছিল না। টাকা উপায়ের দিক থেকে দেখতে গেলে তিনি চিকিৎসা বৃত্তি ছেড়ে দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু চর্চা ছাড়েন নি। বিনা পয়সায় রোগী দেখতেন তাঁর বাড়িতে। সকাল সাতটা থেকে রোগী দেখা শুরু করতেন। দুজন সহকারী ডাক্তার থাকতেন, তাঁরা রোগীর রোগের বিবরণ আগাগোড়া লিখে রাখতেন। গড়ে ৬ জন স্ত্রী আর ১০ জন পুরুষ রোগী দেখতেন তিনি রোজ।

রোগী ছাড়া আরও কতোরকম লোকই না আসতো! ছোট বড়ো, বড়লোক গরীব লোক, কেউই বাদ যেতো না, নানান কাজে তাদের আনাগোনা। তিনি মনোযোগ দিয়েই সবার কথা শুনতেন। আর যতদূর সম্ভব তাদের সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করতেন। কথা দিতেন না কাউকেই, শুধু বলতেন,—চেষ্টা করে দেখবো কী করতে পারি।

মধ্যবয়সী একটি বিধবা মহিলার কথা মনে পড়ছে। তাঁর সঙ্গে কোনো দরখাস্ত ছিল না। যখন বললাম,—আপনার কী দরকার সেটা লিখে দিন।

তিনি বললেন,—লেখা যাবে না, মুখে বলবো। ব্যাপারটা খুব গোপনীয় এবং ব্যক্তিগত।

—কী রকম?

গলা নামিয়ে তিনি ছলছল চোখে বললেন,—কী আর বলবো, আমি বিধবা, কিন্তু পেটে আমার বাচ্চা। আপনজন কাউকে একথা মুখ ফুটে বলতে পারিনি, তাই দিশা না পেয়ে ওঁর কাছে ছুটে এসেছি।

বলা বাহুল্য, ডাঃ রায়ের নির্দেশে ওঁকে কোন এক আশ্রম বা হোম-এ পাঠানোর ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছিল।

এরকম অনেক ঘটনা। একবার এক তরুণী ওঁকে চিঠি লিখলো:

আমার জীবন সংশয়। আমি বি-এ ক্লাশে পড়তাম, কিন্তু যাকে ভালো-বেসেছি ও বিয়ে করতে চাই, সে মাত্র ম্যাট্রিক পাস, আর তাছাড়া,—বেকার। বাপ-মা এতে রাজী নয়। কিন্তু ওকে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করতে হলে আমাকে আত্মঘাতী হতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী কি দয়া করে এই ছেলেটিকে চাকরি দিয়ে আমাকে বাঁচাতে পারেন না?

বলা বাহুল্য, শেষ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী ছেলেটিকে একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়ে মেয়েটাকে রক্ষা করেছিলেন অপমৃত্যুর হাত থেকে।

কিন্তু কথা হচ্ছে, হাজার হাজার বেকার ছেলেকে কেমন করে চাকরি দেওয়া যায়? দলে দলে এ-রকম যারা আসতো, তাদের তিনি উপদেশ দিতেন ছোটখাটো ব্যবসা করবার জন্য। কিন্তু ব্যবসা যে তারা করবে, তাদের পুঁজি কোথায়? অধিকাংশই তারা উদ্বাস্তু, তাদের দিন চলাই দুষ্কর। ডাঃ রায় বললেন,—তাহলে তোমরা এক কাজ করো। পাইকারী বাজারে ঘুরে বেড়াও দেখি? ঘুরে বেড়িয়ে ছাখো কোন্ কোন্ জিনিস তোমরা বিক্রি করতে পারবে। তার একটা লিষ্ট করে নিয়ে এসো, সঙ্গে সঙ্গে দামটাও টুকে নিয়ে আসতে ভুলোনা।

এদের জন্য তিনি হয় নিজের পুঁজি থেকে, আর নয়ত সরকারের বাণিজ্য দপ্তর অথবা উদ্বাস্তু ত্রাণদপ্তর থেকে কিছু কিছু অর্থ-সাহায্যের ব্যবস্থা করে দিতেন। আমি বহু ঘটনা জানি, ছেলেরা একশ টাকা কি দুশ টাকা পুঁজি এইভাবে নিয়ে ফিরিওয়ালার ব্যবসা করে অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছে।

এই সময় পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনেক ন্যায্যমূল্যের দোকান খুলেছিলেন। ডাঃ রায় বাঙালী ছেলেদের এইসব দোকান করার সুযোগ নিতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। এছাড়া, তাদের তিনি বলতেন পরিবহণের ব্যবসা করতে। ট্যাক্সি ও বাস-এর পারমিট তিনি রেখেছিলেন স্বাধীনতা-সংগ্রামে যাঁরা অংশ নিয়েছিলেন তাঁদের সহায়তার জন্য। সিভিল সাপ্লাই বিভাগ থেকে প্রায়ই অনেক পারমিট বেরুতো ডাল, সরষের তেল, চাল,—এসব আমদানী করার জন্য। কিন্তু এসব ব্যবসা করতে হলে বেশ কিছু পুঁজির দরকার। নির্যাতিত রাজবন্দী যাঁরা ছিলেন, তাঁরা পুঁজি পাবেন কোথায়? কতগুলি চতুর ব্যবসায়ী কিছু কিছু নির্যাতিত দেশসেবক খুঁজে খুঁজে তাঁদের ধরে তাঁদের মাধ্যমে পারমিট বার করতে লাগলো। এইভাবে বেনামী সব ব্যবসা গজিয়ে উঠতে

লাগলো, সরকারের আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে কি করে? আমার মনে আছে, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সঙ্গে জড়িত এক নেতা কোনো এক বাংলা কাগজের নাম-করা সম্পাদককে সঙ্গে করে ডাঃ রায়ের সঙ্গে প্রায়ই দেখা করতে আসতেন। তাঁদের ব্যবসায়ী-বন্ধুদের পারমিটের জন্য তদ্বির করাই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য।

ডাঃ রায় যখন তাঁর মন্ত্রিসভা গঠন করলেন, তখন মহাকরণে আসর জাঁকিয়ে রয়েছেন সব বাঘা বাঘা আই-সি-এস। এঁরা ব্রিটিশ আমল থেকেই প্রশাসনে পাকাপোক্ত। এঁদের কেউ কেউ নতুন অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিলেও, কেউ কেউ আবার পারেন নি। ডাঃ রায়ের আগে তাঁরাই সব দরকারী চিঠি, যেগুলি কেন্দ্রীয় সরকার বা প্রধানমন্ত্রীকে লেখা হবে, সেগুলির মুসাবিদা করে দিতেন, মন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী তাতে সই করে দিতেন মাত্র। এ সব ব্যাপারে তাঁদের আত্ম-প্রসাদ ছিল দারুণ। এমন খসড়া করে দেবো যে, তাতে আর দাঁত ফুটোতে হবে না,—এই ছিল তাঁদের মনোভাব।

কিন্তু ডাঃ রায় অন্য ধরনের মানুষ। তিনি একসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার আর কলকাতা করপোরেশনের মেয়র,—এই দুই পদে থেকে চিঠির মুসাবিদার ব্যাপারে রীতিমত অভিজ্ঞতা অর্জন করে এসেছেন। তিনি মহাকরণে এসে দিলেন সব উল্‌টে। বিভাগীয় প্রধানেরা খসড়া পাঠালে, তিনি তা কাটাকুটি করতেন, অদল বদল করতেন, নিজের অভিমতও দিতেন, তারপরে নতুন করে চিঠি সাজিয়ে পাঠিয়ে দিতেন দিল্লীতে। আসলে বিভাগীয় তথ্যের ভিত্তিতে তিনি নিজেই ডিক্‌টেশন দিয়ে নতুন করে চিঠি লিখিয়ে তারপরে পাঠাতে শুরু করলেন। তাঁর বেশির ভাগ চিঠিই হয়ে দাঁড়াতো আধা-সরকারী। কারণ, যাঁদের লিখছেন, তাঁদের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সংস্পর্শ অনেক দিনের। নেহেরুজীকে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সম্বোধন করেছেন 'প্রিয় জওহরলাল' বলে, সর্দার প্যাটেলকে 'প্রিয় বল্লভভাই' বলে। তাঁরাও আবার ওঁকে লিখতেন 'প্রিয় বিধান' বলে, ইন্দিরা গান্ধী লিখতেন 'প্রিয় বিধানকাকা' বলে, আবার উনি তাঁকে লিখতেন 'প্রিয় ইন্দু' বলে।

নেহেরু পরিবারের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ ছিল ঘনিষ্ঠ। তিনি ছিলেন তাঁদের পরিবারেরই একজন। মতিলাল নেহেরু ডাঃ রায় আর ডাঃ আনসারীকে বলতেন,—আমার জীবনের জোড়া অছি বা ট্রাষ্টি।

ডাঃ রায় আবার স্বরাজ ভবন এবং কমলা নেহেরু মেমোরিয়াল হাসপাতালের একজন অছি-ও ছিলেন বটে। শুধু নেহেরু পরিবার নয়, সর্দার প্যাটেলের সঙ্গেও তাঁর অন্তরঙ্গতা ছিল যথেষ্ট। আমি দেখেছি, দেশ যখন বড়ো কোনো সংকটে পড়েছে, তখন কী প্রধানমন্ত্রী, কী উপ-প্রধানমন্ত্রী,—দুজনেই ডাঃ রায়ের সুচিন্তিত মতামত নিয়েছেন, পরামর্শ করেছেন তাঁর সঙ্গে।

এইরকম একটা ব্যাপারে,—সেটা হবে ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাস,—ডাঃ রায়ের সঙ্গে আমাকেও দিল্লী যেতে হয়েছিল। সাধারণত তিনি প্রধান-মন্ত্রীর বাড়ী গিয়ে উঠতেন না। প্রথম দিকে উঠতেন মৌলানা আজাদের ওখানে, পরে উঠতেন ডাঃ জে. পি. গাঙ্গুলীর বাসায়। কিন্তু সেবার দেখলাম, তিনি ওসব না করে সোজা গিয়ে উঠলেন নেহেরুজীর বাড়ীতে। পুরো তিনটি দিন তিনি ওখানে রইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আমারও সৌভাগ্য হলো প্রধানমন্ত্রী-ভবনের আতিথেয়তা লাভ করবার। রাত্রের খাবার সময়কার কথাবার্তা দুই নেতার মধ্যে চলতো মধ্যরাত্রি পর্যন্ত, প্যাটেলজীও এসে তাতে যোগ দিতে লাগলেন। আমার মনে হচ্ছিল, পশ্চিমবঙ্গেরই কোন জরুরী সমস্যা নিয়ে তাঁরা বোধহয় আলোচনা করছেন; আর সেজন্য দরকারী কাগজপত্রও আমরা সঙ্গে এনেছি।

এক রাত্রে আমি তখনো টাইপ রাইটারে কাজ করছি বসে বসে, হঠাৎ তাকিয়ে দেখি সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছেন ডাঃ রায় ও নেহেরুজী। নিজেদের কথাবার্তায় তাঁরা এত মগ্ন যে, আর কোনো দিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। মধ্যরাত্রি তখন পেরিয়ে গেছে।

এইরকম অবস্থায় তিন দিন তিন রাত্রি কাটিয়ে আমরা ফিরে এলাম। কিন্তু যা ঘটতে যাচ্ছে, তা আমি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারি নি। জানলাম পরে, কলকাতায় এসে। ১৯৪৮-এর ১৪ই সেপ্টেম্বর ভোর চারটের সময় হায়দরাবাদ রাজ্যের ২৫০০ মাইল জুড়ে প্রসারিত যে সীমান্ত-রেখা তা ভেদ করে ভারতীয় সেনাবাহিনী এগিয়ে গিয়ে ১২ ঘণ্টার মধ্যে কেন্দ্রীভূত হলো সেকেন্দ্রাবাদে, মেজর জেনারেল জে. এন. চৌধুরী আর মেজর জেনারেল এ. রুদ্রের নেতৃত্বে। মাত্র চারদিনে কাজ শেষ। ১৮ই সেপ্টেম্বর নিজাম নিজের সৈন্যদের থামিয়ে দিলেন। কুখ্যাত লায়েক আলি-মন্ত্রিসভা ভেঙে দিলেন, রাজাকার আন্দোলন নিষিদ্ধ করলেন, আর আবেদন জানালেন শান্তির।

হায়দরাবাদ রাজ্য চলে এলো ভারতের মধ্যে। এই ঘটনার বেশ কয়েক মাস পরে আমি জানতে পেরেছিলাম, নেহেরুজীর জরুরী তলব পেয়ে কেন ডাঃ রায় এবার দিল্লী গিয়েছিলেন এবং ছিলেন খোদ প্রধানমন্ত্রীর অতিথি হয়ে। হায়দরাবাদ সংক্রান্ত পুলিশী ব্যবস্থা নিয়েই নেহেরু ও প্যাটেল আলাপ আলোচনা করছিলেন ও পরামর্শ নিচ্ছিলেন ডাঃ রায়ের।

হায়দরাবাদের ব্যাপারে সাম্প্রদায়িক ঐক্যে যাতে ফাটল না ধরে, সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে প্রধানমন্ত্রী আগেভাগে নির্দেশ দিয়েছিলেন সব প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীদের। ডাঃ রায় সেইমত সুরাওয়ার্দি সাহেবের সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি তখন ছিলেন কলকাতায়। এই দেখা সাক্ষাতের ফল কী পেলেন তিনি, সেটা ১৩ই সেপ্টেম্বর চিঠির আকারে লিখে পাঠালেন নেহেরুকে। লিখলেন—

প্রিয় জওহর,

শহীদ সুরাওয়ার্দির সঙ্গে দেখা করলাম আজ সন্ধ্যাবেলা। সে বললো হায়দরাবাদের ব্যাপারে মুসলমানরা, তা সে ভারতেই হোক আর পাকিস্তানেই হোক, কোনো মারদাঙ্গা করবে না। তা সত্ত্বেও আমরা সজাগ রইলাম। যাতে কোথাও কোনো দাঙ্গাহাঙ্গামা না হয়, সেজন্য যা ব্যবস্থা নেবার সব নিয়েছি এইজন্য যে মুসলমানেরা কোনো ঘটনা না ঘটালেও কমুনিস্ট পার্টি তাদের হয়ে কিছু করে বসতে পারে। কোনো একটা বড়ো গোলমাল হলে তাদের খুব সুবিধে, সেই সুযোগে অমনি মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে।

তোমার বিশ্বস্ত

বিধান

হায়দরাবাদে পুলিশী ব্যবস্থা নেবার পর ২১ সেপ্টেম্বর (১৯৪৮) প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীকে লিখলেন:

প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী,

খুব জরুরী একটা ব্যাপারে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। দেখা যাচ্ছে, হায়দরাবাদে যখন আমরা কাজ আরম্ভ করি, তখন কিছু মুসলিমকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এর কারণ বোধহয়, তাদের কারুর কারুর হায়দরাবাদের ব্যাপারে দরদ থেকে থাকবে, কিংবা ও-সংক্রান্ত কোনো কাজ-কর্মের যোগসূত্র তাদের থাকা সম্ভব, অথবা এ-ও হতে পারে, সন্দেহের বশেই

কাউকে ধরা হয়েছিল। কিন্তু সে যাই হোক, এখন যখন হায়দরাবাদের মিলিটারী বিষয় সংক্রান্ত ব্যাপারটা শেষ হয়ে গেছে, তখন আর তাদের জেলে কিম্বা অন্যভাবে আটকে রাখার কোনো দরকার নেই। আশা করি আপনি তাদের মুক্তির নির্দেশ দেবেন, যদি না তাদের আটকের পিছনে অন্য কোনো গুরুতর কারণ থেকে থাকে।

হায়দরাবাদের নাটকীয় ঘটনাবলীর পর আমাদের এই নীতি হওয়া খুবই দরকার যে শুধু হায়দরাবাদ নয়, সারা ভারতেরই মুসলমান জনগণের সম্পর্কে যথাসম্ভব উদার হতে হবে আমাদের, আরও সহৃদয় বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেওয়া উচিত তাদের দিকে। সংকটের সময় ভারতের মুসলমানেরা সমগ্রভাবে ভারতীয় ইউনিয়নের দিকে ঝুঁকে যে আমাদের নীতিকেই জয়যুক্ত হতে সাহায্য করেছিল, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আমাদের আন্তরিকতা ও সহৃদয়তা দিয়ে মুসলমান জনগণের মন জয় করার এই উপযুক্ত সময়। নয় কী? ফেলে আসা দিনগুলোর কথা মনে করুন। তারা কম আঘাত পায় নি। তাদের মধ্যে সংশয় ও হতাশার একটা ভাব যে না রয়েছে এমনও নয়। হায়দরাবাদের ঘটনার ফলে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তা থেকে ভারত জুড়ে একটা সাম্প্রদায়িক সাম্য গড়ে তোলার সুযোগ উপস্থিত। আমরা যদি ঠিকমতো কাজ করি, তাহলে সাম্প্রদায়িকতার বিষ একেবারে ঝেড়ে ফেলে দেওয়া সম্ভব। ঘটনাপ্রবাহের গতি ঘুরিয়ে দেওয়াই যথেষ্ট নয়, যাতে এর পুরোপুরি অবসান হয়, সে ব্যাপারে সক্রিয় ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

হায়দরাবাদের কথাই যদি ধরেন, আমি আপনাকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে, সারা পৃথিবীর চোখ এখন আমাদের দিকে। আর সেজন্যই আমাদের খুব ভেবেচিন্তে কাজ করতে হবে। খুব চিন্তাভাবনা না করে কোনো বিবৃতি বা মন্তব্য হঠাৎই করা উচিত হবে না। প্রত্যেকটি কথারই তখন মূল্য হবে অপরিসীম এবং আমাদের বিরোধীরা তাই নিয়ে হৈ চৈ শুরু করে দিতে পারে। দেশের বাইরের সংবাদপত্রগুলিও আমাদের পক্ষে তেমন নেই। তারা আমাদের কাজের যথেষ্ট সমালোচনা করেছে, যদিও তাদের সমালোচনা বাস্তব অবস্থার ওপর ভিত্তি করে হয় নি। আর সেজন্য সেগুলো যথার্থও নয়। কিন্তু এসব সত্ত্বেও বলবো, দেশের বাইরেকার এইসব মতামত আমরা উপেক্ষাও করতে পারি না। বিশেষ করে, এতে যখন আমাদের যারা বন্ধু

তাদেরও অনেকে খানিকটা যোগ দিয়েছেন। সেজন্ত আমার মনে হয়, অন্তরা যাতে তাঁদের কথাবার্তায় কিছুটা সংযত হন, সে বিষয়ে তাঁদের বুঝিয়ে বলা দরকার হয়ে পড়েছে।

আপনার বিশ্বস্ত

জে. নেহেরু

এইখানে একটা কথা বলে রাখি। ডাঃ রায় যখন মুখ্যমন্ত্রীত্ব নিলেন তখন তাঁর বয়স ৬৫ পেরিয়েছে। কথাটা বন্ধুদের আক্ষেপ করে বলতেনও। বলতেন, এখন আমি ৬৫, যদি বয়সটা দশবছর আরও কম হতো! কতো কাজই না করবার আছে! দেশের অর্থনীতিকে গড়ে তুলতে হলে কয়েকটা বছর ধরে একনাগাড়ে খেটে যেতে হবে।

আমাদের এটুকু সৌভাগ্য যে, তিনি অন্তত সাড়ে চৌদ্দ বছরের সময়টা পেঁয়েছিলেন। তিনি বলতেন, আমার নীতি হচ্ছে, সামনে যে কাজ পাবো, তা-ই প্রাণপণে করবো। মনে আছে, অ্যাসেমব্লীতে বিরোধীপক্ষের এক ব্যক্তিগত আক্রমণের বিরুদ্ধে তিনি বলে উঠেছিলেন,—আমার মন সাচ্চা; আর আমার মধ্যে আছে একজনের নয়, দশজনের শক্তি।

আমি তাঁর সঙ্গে দিল্লীতে অনেকবার গেছি। দেখেছি দিল্লীর প্রচণ্ড গরমেও তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়ের উত্তর ব্লক থেকে দক্ষিণ ব্লক পর্যন্ত ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছেন, প্ল্যানিং কমিশনের অফিস থেকে মন্ত্রীদের বাড়ি বাড়ি ঘুরছেন তাঁর পশ্চিমবঙ্গের জরুরী সমস্যাগুলি মেটাতে।

এইরকম ক্রমাগত ঘোরাঘুরি করতে করতে এক-একদিন তিনি খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। এটা লক্ষ্য করে তাঁর এক বন্ধু একবার বলেছিলেন,—ডাঃ রায়, মন্ত্রীরা অধিকাংশই বয়সে আপনার ছোট, আর তাঁরা আপনাকে ভক্তি-শ্রদ্ধাও করেন। নিজে তাঁদের অফিসে অফিসে না গিয়ে, নিজের আস্তানায় তাঁদের ডেকে পাঠালেই ত পারেন?

অল্প একটু হেসে ডাঃ রায় জবাব দিতেন,—আমার পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থের জন্ত কাজ আদায় করতে আমি দিল্লীর বড়সাহেবদের সেলাম জানাতে এসেছি। আমি ডেকে না পাঠিয়ে নিজে তাদের কাছে গেলে তারা একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করবে না? কী বলো?

এতো বলা সত্ত্বেও আমি দেখেছি, বহু মন্ত্রী ও সেক্রেটারী নিজে থেকেই

তাঁর আস্তানায় এসেছেন সৌজন্যের খাতিরে। ডাঃ জে. পি. গাঙ্গুলির ৪২নং র‍্যাটেনডন রোডের প্রশস্ত বারান্দাটি বহু মিটিং আর কন্‌ফারেন্সের সাক্ষ্য বহন করছে। গুলজারীলাল নন্দা, হুমায়ুন কবীর, এস. কে. দে, অজিতপ্রসাদ জৈন, জগজীবন রাম, অশোক সেন, অতুল্য ঘোষ, অ্যাটর্নি জেনারেল হেমচন্দ্র সান্যাল,—এঁরা তো প্রায়ই আসতেন তিনি দিল্লী গেলে। শরীর-টরির খারাপ হয়েছে শুনে দু-একবার পণ্ডিত নেহেরুও এসেছেন, দেখেছি।

ডাঃ রায়ের চরিত্রের আরেকটি দিক ছিল, তিনি একটু অসহিষ্ণু প্রকৃতির ছিলেন, কোনো কিছু ব্যাপারে দেরি সইতে পারতেন না। আমাদের হয়ত ডিক্‌টেশন দেবার জন্য ডেকে পাঠিয়েছেন, কিন্তু ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই তিনি ডিক্‌টেশন দেওয়া শুরু করে দিতেন, চেয়ারে গিয়ে বসবার সময়টুকুও দিতে চাইতেন না।

আর একটা জিনিস তাঁর মধ্যে দেখেছি, তিনি চাইতেন, তাঁর ব্যক্তিগত কর্মচারীরা কাজের ব্যাপারে সবসময় সচেতন থাকবে, বুদ্ধি খাটিয়ে বুঝে নেবে, তিনি কখন ঠিক কোন্ জিনিসটা চান। যখন তিনি কারুর কাছ থেকে কোনো বিশেষ কাগজপত্র বা ফাইল চাইতেন, তখন তা কখনই খুলে বলতেন না।

শুধু বলতেন, ওহে সেই ফাইলটা নিয়ে এসো তো!

কিম্বা বলতেন, সেই কাগজটা নিয়ে এসো দেখি!

কোনো প্রশ্ন করা চলবে না, বুঝে নিতে হবে, তিনি কোন্ ফাইল বা কোন্ কাগজটা চাইছেন। যদি তিনি ঠিক জিনিষটি না পান, তো সঙ্গে সঙ্গে চটে যাবেন। তাঁর চটাচটির ব্যাপারেও একটা জিনিস লক্ষ্য করার মতো, খুব রেগে গেলেও তাঁর মুখ থেকে এমন সব কথা বেরুতো না, যা কোনো ভদ্রলোকের পক্ষে শোভন নয়। তার ওপরে, বকাবকি করার পর নিজের মনটা যখন নরম হতো, তখন আবার অনুশোচনা জাগতো, যাকে বকেছিলেন তাকে কাছে ডেকে সব কিছু মিটিয়ে নিতেন।

এরকম একটা ঘটনা আমার নিজের ব্যাপারেই ঘটেছিল। ১৯৫১ সালের কোনো একটা সময় মন্ত্রিসভা ঠিক করলেন যে, কর্মচারীদের বেতন-কাঠামোর কিছু উন্নতি করবেন। বিশেষ করে মাঝারি আর নিচু স্তরেই তাঁদের চোখ পড়েছিল বেশি। সকাল দশটায় মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে মন্ত্রিসভার বৈঠক বসবে। মন্ত্রি-সভার কাগজপত্র আমার কাছে রেখে অন্য জরুরী ফাইল তাঁর হাতে দিয়েছিলাম,

গাড়িতে যেতে যেতে তিনি তা দেখবেন। তাঁর বাড়ি থেকে অফিসে যখন যেতেন আমি তার সঙ্গে না গিয়ে পিছনের গাড়িতেই সচরাচর যেতাম। এখন হয়েছে কী, তিনি ঐ ফাইলগুলো ছেড়ে খুঁজতে লাগলেন মন্ত্রিসভার কাগজপত্র। তাঁর গাড়িতে যে সিকিউরিটি অফিসারটি ছিল, তাঁকেই জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন,—কাগজগুলো কোথায়? অ্যাঁ?

সে বেচারী কী করে উত্তর দেয়? জানলে তো উত্তর দেবে? তারপর আর যাবে কোথায়? তার কিছু পরে আমি যখন গিয়ে পৌছলাম অফিসে, তখন দেখি তিনি রাগে কাঁপছেন, আমাকে দেখে প্রচণ্ড ধমক: কেন এমন ভুল হয় শুনি?

কিন্তু যে কথা বলছিলাম। ঐ যে বেতন-কাঠামোর উল্লেখ করেছি, আমরা যারা মন্ত্রীদের ব্যক্তিগত কর্মচারী, সংখ্যায় পনেরো জন,—আমরা বেমালুম বাদ পড়ে গেছি সংশ্লিষ্ট তালিকা থেকে। কিন্তু তবু তাঁর কাছে নিজেদের দুঃখের কথা জানাতে আমাদের কারুর সাহস হলো না। মন্ত্রিসভা ঐ বেতন-কাঠামোগুলি মঞ্জুর করে দেবেন, আর আমাদের বিষয়টা একেবারে বাদই থেকে যাবে। শেষ পর্যন্ত ঠিক করলাম, আমাদের বিষয়টা খুব ছোট করে লিখে তাঁর সামনে দেবো, আর বলবো,—অর্থবিভাগের অনবধানতায় আমরা বাদ পড়ে গেছি।

আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, তাঁর কাছে কোনো আর্জি জানাতে হলে, মুখে না বলে লিখে বললেই তিনি খুশি হতেন। কী আর করি, তাই আধখানা কাগজে যা লিখবার, লিখে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে তাঁর ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। চোখ তুলে দেখলেন, কিন্তু সে-চোখে রাগের চিহ্নটুকুও ছিল না। আমার হাত থেকে কাগজখানা নিলেন, একটি বার চোখ বুলোলেন, তারপরে বললেন,—আচ্ছা যাও।

তারপরে দেখলাম, দশটা বাজার কয়েক মিনিট আগেই অর্থমন্ত্রী নলিনীরঞ্জন সরকার তাঁর সেক্রেটারী বিনয় দাশগুপ্ত ও আরও কয়েকজন অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে ডাঃ রায়ের ঘরে ঢুকে পড়লেন। অন্য মন্ত্রীরাও তারপরে আসতে লাগলেন একে একে। বৈঠক শুরু হয়-হয়, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী জানালেন,—বৈঠক আজ হবে না, কারণ কর্মচারীদের একটা অংশের বিষয় একেবারে বাদ পড়ে গেছে।

এ-কথা বলে তিনি ফাইলটা টেবিলের উপর ছুঁড়ে ফেললেন। সেই আধখানা কাগজটা দিলেন অর্থমন্ত্রীর হাতে, বললেন,—তোমার দপ্তরকে ব'লো যেন ভুলটা শুধরে নেয়।

আমাদের বেতন সিনিয়র স্কেলে তুলে দেবার কথা বললেন। আর সেই মর্মে নোটটা অদল বদল করে তাঁকে যেন সেদিনই বিকেলের মধ্যে দেখানো হয়,—এ নির্দেশ দিতেও দ্বিধা করলেন না। মন্ত্রীরা বললেন,—বেশ তো, ওটা পরে হবে'খন। অন্যগুলো হয়ে যাক।

তিনি বললেন,—উঁহু, ওতে আমার সায় নেই। যাদের কথা বলা হচ্ছে, তাদের একজন সেই সকাল থেকে বেশি রাত্তির পর্যন্ত আমার সঙ্গে সমানে কাজ করে যায়, তা সে রবিবারই হোক, আর ছুটির দিনই হোক। এদের কিছু না করে অন্যদের জন্য করি কী করে?

বলা বাহুল্য, মন্ত্রিসভার বৈঠক মুলতুবী রয়ে গেল। বিকেলের দিকে অর্থদপ্তরের অফিসাররা নতুন নোট লিখে তাঁর কাছে এলেন, আর আগামীকাল যাতে বৈঠক বসে, তার জন্য তাঁর হুকুম নিয়ে চলে গেলেন।

হ্যাঁ, এই ভাবেই তিনি কাজ করতেন। ভুল হলেও তা শুধরে নিতে কখনই গড়িমসি করতেন না।

ডাঃ রায়ের মন্ত্রিসভা গঠনের সাতদিনের দিন দিল্লীতে হঠাৎ যা ঘটলো, তাতে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে হাহাকার পড়ে গেল বলা যেতে পারে। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই, ১৯৪৮-এর ৩০শে জানুয়ারি হচ্ছে সারা ভারতের সব থেকে তমসাচ্ছন্ন দিন। ঐদিন বেলা সাড়ে পাঁচটার সময় মহাত্মা গান্ধী মারা গেলেন।

বিড়লা ভবনের প্রাঙ্গণে তিনি যখন প্রার্থনা-সভায় যাচ্ছিলেন, তখন এক ধর্মোন্মাদ হিন্দু যুবক তাঁকে লক্ষ্য করে রিভলবার দিয়ে পরপর চারটি গুলি করে, তার একটি এসে লাগে তাঁর বুকে। ঘটনাটা ঘটে পাঁচটার সময়, আর তার ঠিক আধঘণ্টা পরেই তাঁর জীবনদীপ নিভে যায়। এবং এই ঘটনায় শুধু ভারত কেন, সারা পৃথিবী শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ে।

ডাঃ রায় তখন ছিলেন মহাকরণে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এলেন তাঁর বাড়িতে। শোবার ঘরে না ঢুকে নিচের তলায়ই একটি ঘরে গিয়ে ধপ করে বসে পড়লেন চেয়ারে। বাড়িতে তখন কেউ ছিল না বললেই চলে, কারণ

অতো সকাল সকাল যে তিনি ফিরে আসবেন এটা কে ভাবতে পেরেছিল? আমি সুইং-দরজার আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে দেখলাম, তিনি মাথা নিচু করে চুপচাপ বসে আছেন পাথরের মূর্তির মতো। তাঁর মনে যে তখন কী হচ্ছিল, তার কতটুকু আমরা বুঝবো বাইরে থেকে?

মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে ডাঃ রায়ের প্রথম দেখা হয়েছিল ১৯১৫ সালে, কাশিমবাজারের মহারাজার বাড়িতে। তারপরে দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর, দেশবন্ধুরই বাড়িতে, ১৯২৫ সালে। সেই থেকে দুজনের মধ্যে নিবিড় সংযোগ। মহাত্মাজীর প্রত্যেকটি ঐতিহাসিক অনশনের সময় ডাক্তার হিসাবে কাজ করেছেন ডাঃ রায়। তাঁর নেতৃত্বে কাজ করেছেন হরিজন অন্দোলনে, কাজ করেছেন নিষিদ্ধ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হিসাবে। অনেক দিনের সেই নিবিড় বাঁধন আজ ছিঁড়ে গেল।

ডাঃ রায় ঘরেই বসে আছেন একা, এমন সময় কোনো এক কাগজের একজন রিপোর্টার এলেন। আমি ওঁর কাছে গিয়ে কথাটা জানালাম।

উনি মুখ তুলে তাকালেন, বললেন,—আসতে বলো।

নিয়ে গেলাম ভদ্রলোককে।

ডাঃ রায় বললেন,—অহিংসার যিনি প্রবর্তক, তিনি মারা গেলেন কিনা হিংসার নোংরা হাতে? তাঁকে হারিয়ে আমাদের যে শূন্যতা, তার পরিমাপ করবে কে? কে বুঝবে আমাদের ক্ষতি হলো কতখানি!

এখানে না বলে পারছি না, ঠিক এই সময় আমারও জীবনে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। ডাঃ রায়ের বাড়িতে বসেই খবর পেলাম, আমার শিশু কন্যাটি মারা গেছে। এ কথা শুনে কোনো সন্তানের পিতা কি স্থির থাকতে পারে? আমি সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি রওনা হলাম। তখন সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে। ৩৬ নম্বর ওয়েলিংটন স্ট্রীটের ঐতিহাসিক বাড়ি থেকে যখন পথে নামলাম, তখন রাস্তাঘাট অন্ধকার, কোনো গাড়ি চলছে না, ট্রাম বাস ট্যাক্সি সব বন্ধ। কী আর করি, অতো দূরের রাস্তা পায়ে হেঁটেই চলে এলাম বাড়ি। যখন এসে পৌছলাম, তখন দেহে আর মনে দুদিক থেকে ভেঙে পড়েছি।

অন্য সব বর্ণনা ছেড়ে দেই,—এর পরে যা আমার মনে চিরদিনের মতো দাগ কেটে রয়েছে, সে হচ্ছে গান্ধীজীর চিতাভস্ম যেদিন ব্যারাকপুরের ঘাটে বিসর্জন দেওয়া হয় সেদিনকার ঘটনা। যে-দিকে তাকাই লোক আর লোক,

লোকের আর শেষ নেই। প্রায় লাখ দশেক লোক ব্যারাকপুরের গঙ্গার ঘাটে জড়ো হয়েছিল সেদিন। ডাঃ রায় জওহরলালকে চিঠিতে জানালেন :

"আজ বাংলায় আমরা চিতাভস্ম-বিসর্জনের অনুষ্ঠান পালন করলাম। আমার নিজের কাছে এ দিনটা খুবই দুঃখের। ভাবছিলাম, এই বিপুল ভীড় যদি অন্য কোনো কারণে হতো! কিন্তু থাক এ দুঃখের কথা, আমার ধারণা, এই চিতাভস্ম থেকেই এমন এক শক্তির সৃষ্টি হবে, যা গান্ধীজীর চিন্তাধারা দিকে দিকে ছড়িয়ে দেবে! এই যে দশ লক্ষের বেশি লোক অনুষ্ঠান পালন করলো ব্যারাকপুরের গঙ্গার ঘাটে, যে-ঘাট ভবিষ্যতে 'গান্ধীঘাট' নামে পরিচিত হবে,—সেই অনুষ্ঠান আর কিছুই নয়, আমাদের সকলেরই এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সূত্রপাত। এলাহাবাদে যা হয়েছিল তা আমি রেডিও-র মারফৎ শুনেছি। যে-যেখানে ছিলাম সবাই আমরা যে অন্তরে এক হয়ে, যিনি চলে গেছেন, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছি, সে বিষয়ে ভুল নেই। না ভুল হলো। ভুল হলো 'যিনি চলে গেছেন' এই কথা বলা। গান্ধীজী চলে যান নি, আমাদের মধ্যেই তিনি রইলেন! যতদিন আমরা জনগণের সেবা করতে পারবো, ততদিন আমাদেরই মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর কাজ করে চলবেন।

"তুমি ৫ই ফেব্রুয়ারিতে যা লিখেছিলে, তার সঙ্গে আমি একমত যে, কিছু লোক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এদেশে রাজনৈতিক হত্যার নীতি গ্রহণ করেছে। এমন কী, আজকের এই জাতীয় শোক-পালনের দিনটিকেও দল বা গোষ্ঠীর কাজে লাগানোর জন্য যে একটা প্রতিযোগিতা চলেছে, আমি তা-ও লক্ষ্য করেছি। এমন লোকও আছে, যারা একদিকে জনগণের জন্য স্বাধীনতা দাবি করছে, অন্যদিকে অপরের স্বাধীনতাকে দাবিয়ে রাখবার জন্য খুন ও হিংসার মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করতে চাইছে। এজন্য, তুমি যে মনে করেছ ষড়যন্ত্রকারীদের হটিয়ে প্রশাসন ও চাকরির ক্ষেত্রকে পরিচ্ছন্ন করে তুলবে, সে-কাজে পশ্চিমবঙ্গ সরকারও তোমাকে মদত দিতে প্রস্তুত। এ-বিপদের মোকাবিলা করবার জন্য ছোটখাটো বাদ-বিসম্বাদ ভুলে এক হয়ে একযোগে কাজ করে যাবার যে আকাংক্ষা তুমি প্রকাশ করেছো, আমারও তাতে সায় আছে, এবং তাতে আমি সম্পূর্ণ মদত দেবো।"

এর পর দেখি, পূর্ব পাকিস্তানের কংগ্রেস অ্যাসেম্বলী পার্টির নেতা কিরণশঙ্কর রায়কে মুখ্যমন্ত্রী কলকাতায় ডেকে পাঠিয়েছেন। একদিন বিকেলে কিরণশঙ্কর-

বাবু ডাঃ রায়ের বাড়িতে এসে উপস্থিত, আর তারপরে তাঁদের দুজনের মধ্যে কথাবার্তা চলতে লাগলো এক ঘণ্টা ধরে। কম্যুনিষ্ট পার্টি তখন খুব দ্রুত শক্তি সঞ্চয় করছিল। তাদের সহিংস কাজকর্মের জন্য রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ে আর কী! সেজন্য ডাঃ রায় চাইছিলেন এমন এক লোক, যিনি দক্ষ রাজনীতিবিদ্ এবং শক্ত হাতে হাল ধরতে পারবেন। ডাঃ রায়ের চোখ সহজেই গিয়ে পড়লো তাঁর আজীবনের বন্ধু কিরণশঙ্কর রায়ের ওপর। তাঁকে এনে, হাতে দিলেন স্বরাষ্ট্র (পুলিশ) ও পরিবহণ বিভাগের ভার। কিরণবাবু পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভায় যোগ দিতে রাজী হয়েছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু ডাঃ রায় যাতে তাঁকে শেষ পর্যন্ত না নেন, তার জন্য পর্দার অন্তরালে যথেষ্ট তৎপরতা চল্‌ছিল। পরদিন কিরণবাবু স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন; মন্ত্রিসভার সদস্য সংখ্যা দাঁড়ালো,—তেরো।

কিরণবাবু দক্ষ মানুষ, মন্ত্রিসভার তিনি একটি স্তম্ভ বিশেষ ছিলেন। আর ছিলেন তাঁর নেতার প্রতি বিশ্বস্ত, ডাঃ রায়ের সঙ্গে তাঁর কখনো মতান্তর হয় নি। এই কিরণবাবুই কম্যুনিষ্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন। অবশ্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হিসাবে তাঁর কার্যকাল বেশিদিনের নয়, ক্রমাগত অসুস্থ হয়ে পড়তে পড়তে শেষ পর্যন্ত মারাই গেলেন বছর খানেকের মধ্যে।

যাই হোক, প্রাদেশিক বিধানসভার প্রথম বাজেট-অধিবেশন বসলো ১৯৪৮ সালের দশই ফেব্রুয়ারি। ট্রেজারি বেঞ্চের প্রথম সারিতে বসলেন মুখ্যমন্ত্রী, তাঁর দুই পাশে নলিনীরঞ্জন সরকার এবং কিরণশঙ্কর রায়। বিরোধীপক্ষে আসন নিলেন জ্যোতি বসু, খুদাবক্স্ এবং আরও কয়েকজন মুসলমান সদস্য। বিরোধীপক্ষ আকারে ছোট হলেও, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন বক্তা ছিলেন খুব ভালো। কিন্তু সরকারপক্ষের বিপুল সংখ্যাধিক্যের কাছে তাঁরা কী করবেন? ডাঃ রায়ের চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ, তাই তাঁর জন্য একটা জোরালো টেবিল-ল্যাম্পের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছিল। কী মহাকরণে, কী বিধানসভায়,—ডাঃ রায় প্রায়ই একটা আতসী কাঁচ বা ম্যাগ্‌নিফাইং গ্লাস ব্যবহার করতেন। আমরা দেখেছি, ১৯৫১-৫২ পর্যন্ত মুখে বানিয়ে বলার থেকে লিখিত ভাষণই দিতে পছন্দ করতেন ডাঃ রায়। চীফ হুইপের অফিস থেকে যা দিতো, তার ওপর ততটা নির্ভর না করে নিজেই সব কিছু দেখেটেখে নিয়ে ডিক্‌টেশন দিয়ে বিধানসভায় ভাষণ তৈরি করে নিতেন।

সেদিন বিধানসভা বসেছিল গান্ধীজীর মৃত্যুর পরেই। সেজন্য তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ছাড়া আর কোনো কাজ ছিলো না। সভার সব পক্ষ থেকেই শ্রদ্ধা জানানো হলো। এবং বিরোধীপক্ষ থেকে সবার আগে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছিলেন জ্যোতি বসু।

বিধানসভায় ১৭ ফেব্রুয়ারি তাঁর প্রথম ঘাটতি বাজেট পেশ করলেন নলিনী রঞ্জন সরকার। (এক বছর আগে যুক্ত বাংলার নবম ঘাটতি বাজেট পেশ করেছিলেন মহম্মদ আলী।) ১৯৪৮-৪৯ সালের এই বাজেটে ৩১ কোটি টাকার বরাদ্দ ছিল, তার মধ্যে সাড়ে ছয় কোটি ছিল উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির জন্য। এ-টাকাটা কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদান থেকে নেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। আর রাখা হয়েছিলো এক কোটি টাকা, অল্প বেতনভোগী সরকারী কর্মচারীদের টাকা বাড়িয়ে দেবার জন্য।

কিন্তু সে যাই হোক, তখনকার পশ্চিমবঙ্গের চেহারাটাও একবার ভেবে নেওয়া দরকার। ভৌগোলিক সীমা আর লোকসংখ্যার দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গ হয়ে দাঁড়ালো যুক্ত বাংলার এক তৃতীয়াংশ মাত্র। পশ্চিম বাংলার অংশে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য ভালোই গড়ে উঠেছিলো। সেজন্য দেখা গেল, এর অর্ধেক লোকই অ-কৃষি-বৃত্তিতে যুক্ত রয়েছে। শতকরা ১৬ জন রয়েছে শিল্পে, আর শতকরা ২২ জন বাস করছে শহরে। তাছাড়া, খাদ্যশস্যের ব্যাপারে ঘাটতি রয়েছে, পাটে ত বটেই, চালেও সম্ভবত।

আমরা আগে কম্যুনিষ্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করে দেওয়ার কথা বলেছি। কেন এটা করা হলো, বিধানসভায় সে কথা বলতে গিয়ে কিরণশঙ্কর রায় বললেন,—ওরা সব বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চাইছে; উদ্দেশ্য হচ্ছে হিংসাত্মক কাজকর্মের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা দখল করা। গ্রামের লোকদের বলছে আইন শৃঙ্খলা ভাঙো, শ্রমিকদের বলছে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক আক্রমণ চালাও আর উৎপাদন ব্যাহত করে দাও। আর তারপরে তারা বে-আইনী অস্ত্রশস্ত্র জোগাড় ক'রে তাদের কাজের জন্য পশ্চিমবঙ্গকেই প্রথম তাদের কার্যকলাপের কেন্দ্র করে তুলবে।

কম্যুনিষ্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করার ব্যাপার নিয়ে প্রধানমন্ত্রী ডাঃ রায়কে কী লিখেছিলেন, সেটাও এই সুযোগে উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেছিলেন ঐ পার্টি সাবোটাজ ও সন্ত্রাসবাদের যে কর্মসূচী

নিয়েছিল তার কথা। এ-বিষয়টি নিয়ে অবশ্য আলোচনা হয়েছিল দিল্লীতে, ১৯৪৯ সালের এপ্রিলে, মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলেন। পার্টিটিকে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হবে কিনা, এ বিষয়ে তাঁর মতামত দেশের সব মুখ্যমন্ত্রীদেরই তিনি লিখে জানিয়েছিলেন।

"বিষয়টি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা বিবেচনা করে দেখেছে এবং তাঁদের সামনে মুখ্যমন্ত্রীদের মতামত পেশ করেছেন আমাদের উপ-প্রধানমন্ত্রী। মন্ত্রিসভা এই মত প্রকাশ করেছেন যে, ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করে দেওয়ার মতো কোনো পদক্ষেপ ঠিক এই মুহূর্তে পরিহার করাই উচিত। সন্দেহ নেই যে, কম্যুনিষ্ট পার্টি খুব ক্ষতিকর কাজকর্ম করে বেড়াচ্ছে। আমি আইনসভায় যা বলেছি, তা এখানেও আবার বলি। এইসব কাজকর্ম খোলাখুলি বিদ্রোহের দিকে যাচ্ছে, সাবোট্যাজ আর সন্ত্রাসবাদ ক্রমশই বাড়ছে। সেইজন্যই কী কেন্দ্রীয় সরকার, কী প্রাদেশিক সরকার,—উভয় সরকারই ঐ পার্টির সদস্যদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়েছে। পরিস্থিতি মোতাবেক এই ব্যবস্থা চলতেও থাকবে।

"সাধারণভাবে বলা যায়, নিষিদ্ধকরণ দিয়ে সেই সংগঠনকে কাবু করা যায় না, যে সংগঠন অন্তরাল থেকে কাজ করে। নিষিদ্ধকরণের ফলে সাবোট্যাজকারী আর সন্ত্রাসবাদীদের আদর্শবাদী দেশপ্রেমিকের মতো দেখাতে পারে।"

ভারতের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন একজন আমেরিকান মিশনারী চীনদেশ ভালো করে ঘুরে দেখে এসে নেহেরুজীকে একটি উপভোগ্য চিঠি লেখেন ১৫ই মে তারিখে। সেটি হলো এই :

"বহু বুদ্ধিজীবীর মনে প্রশ্ন জাগছিল, যে-সব কারণে কুওমিন্টাংদের বর্তমান অবস্থা হয়েছে, তার মতো অনেকগুলো কারণে কংগ্রেসেরও কি সেই অবস্থা হবে? আর সঙ্গে সঙ্গে কম্যুনিষ্টরা এসে পড়ে ভারতে বিপ্লব পুরোপুরি শেষ করার চেষ্টা করবে? ক্ষমতার লিপ্সা যখন আছে, তখন বিপ্লব-আন্দোলন কি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলবে? জনগণকে জমি ফিরিয়ে দেবার ব্যাপারে এই আন্দোলন কি গড়িমসি করবে, সর্ত নিয়ে টানাপোড়েনে খুব বেশি সময় কাটিয়ে দিয়ে? প্রত্যেক মুহূর্তেরই এখন দাম আছে। নিচুতলার কর্মচারীদের মধ্যে যে ঘুষ আর দুর্নীতি চলছে, কংগ্রেস কি তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে সব-কিছু সহ্য করে যাবে? নাকি চীনের কম্যুনিষ্টদের মতো নির্মমভাবে দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ

করবে? এ ছাড়া আরও কথা আছে। শিল্পক্ষেত্রে মুনাফা ভাগ করে দেওয়ার নীতির ওপর কংগ্রেস কি জোর দেবে? এই সব প্রশ্নের উত্তর কংগ্রেস যদি দৃঢ়তার সঙ্গে দিতে পারে ঠিক পথে গিয়ে, তাহলেই দেশ বাঁচতে পারবে কম্যুনিষ্টদের হাত থেকে।"

প্রধানমন্ত্রী দেশের সব মুখ্যমন্ত্রীদের কাছেই এই চিঠির কপি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

৭ই জুন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী লিখলেন :

প্রিয় প্রধানমন্ত্রী,

জুন মাসে লেখা আপনার একখানা চিঠি এইমাত্র পেলাম, সঙ্গে ১৫ই মে তারিখে লেখা ডঃ স্ট্যানলি জোন্সের চিঠিখানার একখানা কপি। দুখানি চিঠি পড়েই খুব কৌতূহল হয়, বিশেষ করে ডঃ জোন্সের চিঠিখানা। খুব ধারালোভাবেই তিনি তাঁর কথাগুলি আমাদের সবার সামনে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন।

সন্দেহ নেই, কংগ্রেসের মধ্যে বেশ কিছু দুর্নীতি আর দলাদলি ঢুকে পড়েছে। কিন্তু সব থেকে খারাপ জিনিস হচ্ছে, কংগ্রেস-নেতাদের বেশির ভাগই যেন ফুরিয়ে গেছেন। আপনি যেমন বলেছেন, তেমনি নতুন চেষ্টা না চালালে, আর নতুন নতুন লোক না আনলে, কংগ্রেস অনড় হয়ে দাঁড়াতে বাধ্য। আমি আপনার সঙ্গে পুরোপুরি একমত যে, দেশে ঐরকম একটা উদ্যমের জোয়ার আনতে আর একটুও দেরি করা উচিত নয়।

দৃষ্টিভঙ্গি ও রীতিনীতির দিক থেকে কংগ্রেসকে প্রতিষ্ঠান হিসাবে আরও প্রাণবন্ত করে তুলতে হলে ঐরকম নতুন উদ্যম যে একান্ত দরকার, সেটা আমরা অনেকেই বুঝতে পারছি, কিন্তু এটা সবাই ধারণা করতে পারছি না যে, আমাদের কাজের ধারা হবে কী রকম। সেজন্য আমার মতে, আপনার এবং ডঃ স্ট্যান্লি জোন্সের চিঠি দুখানার মূল বিষয়গুলিকে একটা ফরমূলার আকারে পরিণত করা হোক। বর্তমান কংগ্রেসের হিন্দু-মুসলমান ঐক্য, অস্পৃশ্যতা বর্জন ও খদ্দর তৈরি করার যে নীতি, তা আমাদের এগিয়ে চলার পথে খুবই মূল্যবান হয়েছে, কিন্তু আমাদের রীতিনীতিতে আরও জোরদার ও নির্দিষ্ট কিছু চাই।

আপনার স্নেহভাজন

বিধান

এই সময় আবার আরেকটা ঘটনা ঘটেছিল। দুই বাংলার পাওনা আর দেনার ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে যে মতান্তর দেখা দিয়েছিল, তা মেটাবার জন্য শালিসী ট্রাইবুনাল তাঁদের রায় ঘোষণা করলেন। দেনাপাওনাজনিত তথ্যের কচকচির মধ্যে না গিয়ে আমরা দেখাবো, দুই বাংলার সংখ্যালঘু, বিশেষ করে পূর্ব থেকে যারা দলে দলে পশ্চিমে চলে আসছিল, তাদের স্রোত রোধ করার জন্য ডাঃ রায়ের চেষ্টায় ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যে কনফারেন্স বসেছিল কলকাতায় ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে, তার কী হলো। ভারতীয় দলের মাথায় ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের পুনর্বাসন মন্ত্রী ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী আর পাকিস্তানী দলের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন ওঁদের অর্থমন্ত্রী গুলাম মহম্মদ। দুই বাংলার দুই মুখ্যমন্ত্রীও উপস্থিত ছিলেন। ভারত ও পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের মনের আশঙ্কা দূর করার জন্য ব্যাপক কর্মসূচী নিয়ে চুক্তি হলো ৯ই এপ্রিল তারিখে। প্রাদেশিক ও স্থানীয় সংখ্যালঘুদের বোর্ড বসাবার কথা ছিল চুক্তিতে। কথা ছিল, যে-সব কর্মচারী সংখ্যালঘুদের বিষয়ে যথাযথ কাজকর্মের ব্যাপারে গাফিলতি করবে, যে-সব লোক দুই দেশের সম্পর্কের মধ্যে চিড় ধরাবার চেষ্টা করবে বা সংখ্যালঘুদের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করবে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপারে চুক্তিমতো ডাঃ রায় সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ব্যবস্থাই গ্রহণ করলেন, কিন্তু পরবর্তী সব ঘটনায় দেখা গেল, এতে কোনো ফল হলো না, দলে দলে উদ্বাস্তুরা যেমন আসছিল, তেমনি আসতেই লাগলো, বরং দিন দিন বাড়তে লাগলো তাদের সংখ্যা। আসলে নিচুস্তরের পুলিসের কিছু লোক আর পাকিস্তানী কিছু অফিসার পূর্ব পাকিস্তান থেকে সংখ্যালঘুদের উৎখাত করার ব্যাপারে ইন্ধন জুগিয়েছিলেন।

আবার ওদিকে হয়েছে কী, কংগ্রেসদলের চীফ হুইপ অমরকৃষ্ণ ঘোষ, যিনি প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে দলের নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে ডাঃ রায়কে আনবার ব্যাপারে কলকাঠি নেড়েছিলেন, তিনি এই সময় ডাঃ রায়কে হটিয়ে পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি সুরেন্দ্রমোহন ঘোষকে আনবার চেষ্টায় রত হয়েছিলেন। কারণ আর কিছুই নয়, তাঁর ইচ্ছামতো সব কিছু হচ্ছিল না। তাঁর অযৌক্তিক কতগুলি অনুরোধ ডাঃ রায় ত রাখেনই নি, উল্টে নেতা হিসাবে ধমক দিয়েছিলেন। আর যায় কোথায়? তিনমাসের মধ্যেই

দ্বিতীয়বারের জন্য মন্ত্রিসভাকে উল্‌টে দেবার জন্য তিনি উঠে পড়ে লাগলেন। ২২শে এপ্রিল তিনি কংগ্রেস অ্যাসেমব্লী পার্টির কয়েক জনের সই পর্যন্ত জোগাড় করলেন, তার মধ্যে ছিলেন দুজন মন্ত্রী এবং তিনজন পার্লামেণ্টারি সেক্রেটারী, যাঁরা চাইলেন বর্তমান মন্ত্রিসভা বদ্‌লে খাঁটি কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হোক। তাঁদের মতে, এ-মন্ত্রিসভায় কংগ্রেসের বাইরের লোকও রয়েছে। এই মন্ত্রিসভা যদি চলতে থাকে, তাহলে পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস-প্রার্থীদের অসুবিধা হতে পারে। এর উত্তরে ২৬শে এপ্রিল ডাঃ রায় যে বিবৃতি দিলেন, তাতে তিনি বললেন যে, চিঠিগুলি তাঁর কাছে পৌছবার আগেই, সই যাঁরা দিয়েছেন, তাঁদের কেউ কেউ তাঁদের দস্তখৎ প্রত্যাহার করে নিচ্ছেন বলে তাঁকে জানিয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও, এর সঙ্গে কয়েকজন মন্ত্রী ও পার্লামেণ্টারি সেক্রেটারীরা যখন জড়িত, তখন এটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, সাংবিধানিক দিক থেকে এটি গুরুতর বিষয়, এ সম্পর্কে বিশেষ বিচার-বিবেচনা করা উচিত।

এ সময় বাংলার সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির এক প্রতিনিধিদল গিয়ে নেহেরুর সঙ্গে দেখা করেন। তিনি তখন বোম্বেতে। নেহেরু সব শুনে বললেন,—ঠিক আছে। এ নিয়ে ডাঃ রায় এবং আপনারা, আপনাদের দুপক্ষের সঙ্গেই আলোচনা করবো।

ইতিমধ্যে দুপক্ষই শক্তি-সঞ্চয়ে হুড়োহুড়ি লাগিয়ে দিয়েছিলেন। বর্ধমানের মহারাজা উদয়চাঁদ মহতাব ছিলেন বিধানসভায় নির্দল সদস্য, তিনি কংগ্রেসে চলে এলেন। প্রভুদয়াল হিম্মৎসিংকা-ও তাই করলেন। ৫ই মে তারিখে বেলা ৪টায় ডাঃ রায়ের বাড়ির দোতলার হলঘরে বিশেষ অধিবেশন বসলো কংগ্রেস অ্যাসেম্বলী পার্টির। সাধারণত এ সব সভা নিচের তলাতেই হতো, কিন্তু সংবাদপত্রকে ঠেকানো আর গোপনীয়তা রক্ষা করার জন্য সেবার হয়েছিল এই ব্যবস্থা। আমার ওপর ভার পড়েছিল নাম-করা এক মিষ্টির দোকান থেকে মিষ্টি নিয়ে আসবার।

যাই হোক, প্রাথমিক কথাবার্তার পর সভার আসল কাজ আরম্ভ হলো। বাড়ির বাইরে বিশাল এক জনতা উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছে কী হয় না-হয়, জানবার জন্য। সভায় উপস্থিত ছিলেন সবশুদ্ধ ৫৩ জন সদস্য, তার মধ্যে চারজন মন্ত্রী ছিলেন যাঁরা এম.এল.এ বা বিধানসভার সদস্য নন। তিনজন

মন্ত্রী আবার হাজির ছিলেন না, তার মধ্যে একজন হচ্ছেন সেচ-মন্ত্রী ভূপতি মজুমদার। কংগ্রেস অ্যাসেমব্লী পার্টির সেক্রেটারী দেবেন সেন, যিনি চীফ হুইপ অমর ঘোষের সঙ্গে মিশে মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাচ্ছিলেন, তিনি যখন বুঝলেন যে জেতার কোন আশা নেই, তখন অন্য সুর ধরলেন। একটি লিখিত ভাষণ পাঠ করে জানালেন, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষের নেতৃত্বে যে মন্ত্রিসভা গঠনের প্রস্তাব ছিল, তা তাঁরা প্রত্যাহার করে নিচ্ছেন। এ বিবৃতিতে সই করেছিলেন ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, অমর ঘোষ, জে. সি. গুপ্ত প্রভৃতিকে নিয়ে ২২ জন। অন্য ৩১ জন (তার মধ্যে বর্ধমানের মহারাজাও ছিলেন) ডাঃ রায়ের নেতৃত্বের প্রতি পুর্ণ আস্থা স্থাপন করতে দ্বিধা করেন নি।

ডাঃ রায় কিন্তু অবাধ্যদের শায়েস্তা করতে দেরি করলেন না, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই মন্ত্রিসভাকে নতুন করে ঢেলে সাজালেন। রইলেন পুরাণো মন্ত্রিসভার ৯ জন, বাদ গেলেন হেম নস্কর আর মোহিনীমোহন বর্মন। এছাড়া ভূপতি মজুমদার। তিনি অবশ্য আগেই তাঁর পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এইভাবে, ন-মাসের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে তৃতীয় বারের জন্য মন্ত্রিসভা পুনর্গঠিত হলো।

কিন্তু যা বলছিলাম। ঐ ৫ই মে তারিখেরই ঘটনা। পার্টি-মিটিং শেষ হয়ে গেছে, সন্ধ্যা হয়ে গেছে, তফসিলী সম্প্রদায়ভুক্ত একজন মন্ত্রী এলেন, সঙ্গে তাঁর ভাইপো, তিনিও একজন তরুণ এম.এল.এ.। চুপি চুপি তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর লাইব্রেরী ঘরে ঢুকলেন। কিন্তু কোথায় ডাঃ রায়? তিনি তখন তাঁর শোবার ঘরে ঢুকে পড়েছেন। ওঁরা আমাকে কাছে পেয়ে আমাকেই পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন একবার দেখা করিয়ে দেবার জন্য। ওঁদের দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম। খুবই দমে গেছেন এমন চেহারা। বললেন,—ওঁকে বুঝিয়ে বলবো। ভুল করেছি। মন্ত্রিসভা ভেঙে নতুন করে গড়ার প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়ে সাংঘাতিক ভুল করেছি।

আমি আর কী করি, ইণ্টার কম-এর মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বললাম। তিনি কিন্তু তখুনি নেমে এসে ওঁদের সঙ্গে দেখা করলেন। কথাবার্তা শেষ করে ওঁরা যখন চলে যাচ্ছেন, তখন একটু খুশি হয়েই আমাকে চুপিচুপি বলে গেলেন,—মশাই, বরফ গলাতে পেরেছি।

না, শুধু এই মন্ত্রীই নন, অন্য দুজন যাঁরা বাদ পড়েছিলেন, তাঁদেরও আবার

নেওয়া হয়েছিল কয়েকমাস পরে। আর তারপর থেকে তাঁদের নেতার প্রতি তাঁদের যে আনুগত্য ছিল তা থেকে তাঁরা একবিন্দুও সরে যান নি।

সেদিনটা আবার আমার পক্ষেও পরীক্ষার দিন ছিল। তাঁর প্রতি আস্থা জানিয়ে ৩১ জন সদস্য সই করে যে প্রস্তাব নিয়েছিলেন, সেই কাগজ, আর ২২ জন অন্য সদস্যের বিবৃতির কাগজ,—এই দুটো কাগজ ডাঃ রায় আমার হাতে দিয়েছিলেন। তাঁর শোবার ঘরে তিনি যখন একা, তখন ঘরে ঢুকে তাঁর হাতে কাগজ দুখানা আমি ফেরৎ দিয়েছিলাম। তিনিও সেগুলি রেখেছিলেন হাত বাড়িয়ে টেবিলের ওপর। কিন্তু রাত নটার সময় আমাকে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—ওহে, কাগজ দুটো কোথায়? আমি দিল্লীতে এখুনি কথা বলবো প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে।

কিন্তু আমার তখন স-সে-মি-রা অবস্থা। কাগজদুটো কোথায় পাই? কিছুতেই বোঝাতে পারছি না যে, কাগজগুলো আমি তাঁর হাতে দিয়ে গিয়েছিলাম। তিনি ক্রমে ক্রমে ভীষণ রেগে উঠলেন। আমি ত প্রমাদ গুনলাম! তারপরে হঠাৎ ভাগ্যক্রমে নিচু হয়ে খাটের তলায় খুঁজতে গিয়ে দেখি কাগজগুলো পড়ে আছে! আসলে কাগজগুলো টেবিলে রেখে তার ওপরে পেপারওয়েট্ চাপা দিতে ভুলে গিয়েছিলেন। বাতাসে সেগুলি উড়ে গিয়ে যথারীতি খাটের তলায় সেঁধিয়েছিল।

সেগুলি তাঁর হাতে ফিরিয়ে দিতেই একটু যেন লজ্জা পেলেন। আমার দিকে তাকালেন একটু সলজ্জ দৃষ্টিতে, যেমন করে এই ধরনের ঘটনা ঘটলে তাকাতেন, তেমনি অভ্যস্ত ভঙ্গিতে। তারপরে শান্ত গলায় বললেন,—নিচে যাও প্রধানমন্ত্রীকে ফোনে ধরবার চেষ্টা করো।

কিন্তু সে যাক, এবার অন্য কথায় ফিরে আসি। ১৯৪৮ সালে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে পুর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর দেখা হলো দুবার, এই কলকাতাতেই। বিভিন্ন অসুবিধা ও বিষয় নিয়ে কথা বলতে এই সময় চীফ সেক্রেটারীও ঢাকা গিয়েছিলেন। পুর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের সব থেকে বড়ো নালিশ ছিল, ওখানকার কর্তাব্যক্তিরা তাদের তলে তলে ভয় দেখাবার পথ নিয়েছেন, যার ফলে লোকগুলো চলে আসতে আরম্ভ করেছে। এসময় আবার পুর্ব পাকিস্তানের একজন মন্ত্রী হামিদুল হক্ চৌধুরী মিথ্যা প্রচার চালালেন যে, পুর্বপাকিস্তান থেকে চলে এসেছে মাত্র বিশ হাজার লোক, আর সে যায়গায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে

পূর্বপাকিস্তানে মুসলমান এসেছে ত্রিশ হাজার। এ-বিষয়ে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীকে জানালেন,—যদিও একেবারে সঠিক সংখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়, তবু প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়, পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে এসেছে প্রায় দশ লক্ষ লোক, আর এরা অধিকাংশই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হিন্দু। এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা আসার পর পূর্ব পাকিস্তানে এমন একটা প্রচেষ্টা চলেছে, যাতে গ্রামে যারা চাষবাস করে খায়, তারাও চলে আসছে। এই জিনিসটা আমাদের বুঝতে হবে, যাতে পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে না যায়।

এ গেল উদ্বাস্তু-সমস্যার কথা। আরও সমস্যা ছিল। ১৯৪৮-এর ২৩শে ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী দেশের সমস্ত মুখ্যমন্ত্রীদের একটি বিশেষ সমস্যার বিষয় লিখে জানালেন। সেটি হচ্ছে নেতাজী-পরিচালিত 'আজাদ হিন্দ ফৌজ'-এর প্রাক্তন সৈনিকদের কথা। স্বাধীনতার পর তারা অনেকে চাকরি-বাকরি পেলেও বহুসংখ্যক লোক তখনো বেকার; এবং সেজন্য তাদের কষ্টেরও শেষ নেই। চিঠিতে নেহেরুজী লিখেছিলেন—"চাকরি-বাকরির সব রাস্তাই তাদের জন্য খোলা। শুধু সাধারণ চাকরিতে নয়, তাদের পুলিশ, হোমগার্ড প্রভৃতিতেও নেওয়া যেতে পারে; বরং এতেই তারা খাপ খেয়ে যাবে বেশি। আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসাররা জাতীয় রক্ষী বাহিনী বা হোম গার্ডদের শিখিয়ে নেবার ব্যাপারে কাজে আসবেন। মোট কথা এদের কাজে লাগানোর ব্যাপারে আপনার সরকার খুবই তৎপর হবেন, এটাই আমার পরামর্শ। ব্রিটিশ সরকার এদের ব্ল্যাক লিস্টে রেখেছিল বলে এদের ওপর কোনোরকম বাধা-নিষেধ আরোপ করা আমাদের উচিত নয়।"

প্রসঙ্গত লর্ড ম্যাউণ্টব্যাটেনের কথা বলি—আমাদের শেষ ইংরেজ গভর্নর-জেনারেল বা বড়লাট। ইনি পদত্যাগ করতে চাওয়ায় ভারতীয় কাউকে ঐ পদে বসানোর প্রশ্নটি কেন্দ্রীয় সরকারের সামনে এসে দেখা দিলো। ১৯৪৮ সালের ১০ই জুন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী গভর্নর-জেনারেল হলেন এবং তার ফলে আমাদের রাজ্যপালের পদ শূন্য হয়ে গেল। এসব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করার নজির সৃষ্টি করলেন প্রধানমন্ত্রী নেহেরু। ১৮ই এপ্রিলে লেখা তাঁর নিচের চিঠিখানাই এর বড়ো প্রমাণ:—

প্রিয় বিধান,

তুমি নিশ্চয়ই মনে করতে পারবে, আমি তোমাকে বলেছিলাম যে, রাজাজীকে যদি চলে আসতে হয়, তাহলে বাংলার রাজ্যপাল পদের জন্য কারুর নাম তুমি প্রস্তাব করে পাঠাও। তুমি বিষয়টা ভেবে দেখে কয়েকজনের নাম আমাকে জানাবে? এ নিয়ে রাজাজীর সঙ্গেও আলাপ করে দেখতে পারো। আগেই বলেছি, আমাদের নীতি হচ্ছে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের লোককে রাজ্যপাল পদে নিযুক্ত করা হবে না।

তোমার বিশ্বস্ত
জওহরলাল

এর উত্তরে ডাঃ রায় চিঠি লিখলেন ২২শে এপ্রিল। তিনি লিখলেন:—

প্রিয় জওহর,

তোমার ১৮ তারিখের চিঠি এইমাত্র পেলাম।

এ বিষয়ে ইতিমধ্যেই আমি তোমাকে লিখেছি, সেটা অবশ্য টাইপ করা ছিল না, কারণ ও-বিষয় কেউ জানুক এটা আমি চাইছিলাম না। ঐ চিঠিতে আমি লিখেছিলাম ডঃ কাট্‌জুর নাম, তিনি আসতে পারেন। কিন্তু ও চিঠি কি তুমি পাও নি?

তোমার বিশ্বস্ত
বিধান

ডাঃ রায় আরও একটি দরকারী কাজ এইসময় করেছিলেন। দামোদর উপত্যকা প্রকল্প ছাড়া, বহুমুখী যে নদী-উপত্যকা প্রকল্প ডাঃ রায়ের চেষ্টায় গৃহীত হয়েছিল, সেটা হচ্ছে ময়ূরাক্ষী প্রকল্প, তখন বলা হতো, মোর প্রকল্প। এতে ছিল একটা বাঁধ তৈরির কথা (এখন যাকে বলা হয় ক্যানাডা বাঁধ); দুহাজার কিলো ওয়াট বিদ্যুৎ তৈরির একটি কেন্দ্র তৈরির কথা। আর ছিল সেচের উপযোগী কয়েকটি খাল-খননের কথা, যার ফলে ছয় লক্ষ একর জমিতে সেচ দেওয়া যাবে। এ জমির বেশির ভাগই পড়বে বীরভূম জেলায়, কিছু বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদে। কিন্তু বাঁধের ব্যাপারে আপত্তি করে বসলেন বিহার সরকার। এর জন্য নাকি তাঁদের সাঁওতাল পরগণার কুড়ি হাজার মানুষ উৎখাত হয়ে যাবে। দুই সরকারের মধ্যে এ নিয়ে কিছুতেই যখন নিষ্পত্তি হলো না, তখন ডাঃ রায় নেহেরুকে অনুরোধ জানালেন হস্তক্ষেপ করতে। ফলে, একটি

কনফারেন্স বসলো দিল্লীতে। ঐ কুড়ি হাজার মানুষের বসবাসের ব্যবস্থা যাতে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেই হয়ে যায়, তার একটি পরিকল্প পেশ করলেন ডাঃ রায়। কাজেই আর কোনো মতান্তর রইল না, ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হয়ে গেল পশ্চিমবঙ্গের অনুকূলেই।

এইরকম আরেকটা ব্যাপার হয়েছিল জাতীয় সঙ্গীত নিয়ে। জাতীয় সঙ্গীত 'জনগণমন' হবে কি 'বন্দে মাতরম্' হবে, এই নিয়ে একটা বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। এই বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে একটি নোটও পাওয়া গিয়েছিল ১৯৪৮-এর জুন মাসে। এ-নিয়ে ডাঃ রায় ও নেহেরুর মধ্যে যে চিঠির আদানপ্রদান হয়, তা এখানে তুলে দেওয়া হলো :

কলকাতা
১৪ই জুন ১৯৪৮

প্রিয় প্রধানমন্ত্রী,

ভারত সরকারের ডেপুটি সেক্রেটারী ঈ. গেনর সাহেবের একখানা চিঠি এবং আপনার দপ্তরের একটি নোট পেলাম আমরা, জাতীয় সঙ্গীতের ব্যাপার নিয়ে।

এ-বিষয়ে আমাদের মন্ত্রিসভায় আমরা আলোচনা করেছি। অবশ্য আইন সভাই এর চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করবে। তবে, যে পর্যন্ত সেটা না হচ্ছে, সে পর্যন্ত কাজ চালানোর যে সিদ্ধান্ত হয়েছে, তাতে এটা বুঝতে পারছি না, জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে 'জনগণমন' ব্যবহার করা কি আপনার নির্দেশ, না কি, এ বিষয়ে আপনি আমাদের মতামত চেয়ে পাঠিয়েছেন। যদি এটা নির্দেশ হয় ত, আমাদের বলার কিছু নেই। কিন্তু যদি মতামতের প্রশ্ন হয়, তাহলে বলতে পারি, পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভার মতে, জাতীয় সঙ্গীত হবার ব্যাপারে 'বন্দে মাতরম্'-এর দাবি যে অনেক বেশি, সেটা বিবেচনা করে দেখা উচিত। নির্ধারিত মান অনুযায়ী এর সুর করা যেতে পারবে, আর তা বাজাতে সময় লাগবে ৪৫ সেকেণ্ড বা এক মিনিট। কিন্তু এ সব ছাড়াও দেখা উচিত, জাতীয় সঙ্গীতের পিছনে কোনো ঐতিহ্য আছে কিনা। বন্দে মাতরমের তা আছে। ১৯০৫ সাল থেকে আত্মদান ও নিপীড়নের এক মহান ঐতিহাসিক ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে এর পিছনে। ব্রিটিশ আমলে সরকারী আদেশ ভাঙবার জন্য মানুষ এই গান গেয়ে উঠতো, আর তার জন্য অবলীলায় শাস্তি ভোগ করতো।

মানুষ জেলে গেছে, বন্দুকের গুলির সামনে বুক পেতে দিয়েছে, ফাঁসীর মঞ্চে উঠে গেছে এই গান কণ্ঠে নিয়ে। আমরা নিশ্চয় বলতে পারি, 'জনগণমন'-এর পিছনে তেমন কোন ঐতিহ্য নেই। এ কথা বলার দরকার করে না, কোনো দেশের জাতীয় সঙ্গীত যে কোনো বড়ো কবির দ্বারা লিখিত হবে, এমন কোনো কথা নেই। অনেক দেশ আছে যাদের জাতীয় সঙ্গীত লিখেছেন এমন লোক, যাঁর কবি হিসাবে খুব কমই সুখ্যাতি আছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত লেখার দরকার করে না। রবীন্দ্রনাথের উপর আমাদের বিপুল শ্রদ্ধা ও ভালবাসা থাকা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভা একযোগে বলছেন, 'বন্দে মাতরম্'-ই জাতীয় সঙ্গীত হওয়া উচিত। আমাদের এ-ও সন্দেহ নেই যে, আমরা এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের জনগণের মতামতই ব্যক্ত করছি।

আপনার বিশ্বস্ত
বি. সি. রায়

নয়াদিল্লী
১৫ জুন ১৯৪৮

প্রিয় বিধান,

তোমার ১৪ই জুনের চিঠির জন্য ধন্যবাদ।

'জনগণমন'-এর ব্যাপারে তোমাকে বলি, জাতীয় সঙ্গীত কী হবে সেটা যে আইনসভাই স্থির করবেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। 'বন্দে মাতরম্'-এর ব্যাপারে কয়েকজন মুসলমান যে আপত্তি করছেন, সেটাও কোনো কাজের কথা নয়। এ চিন্তাটা এখানকার অনেককেই প্রভাবিত করতে পারে নি। কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকেই, এবং তার সঙ্গে আমিও বিশেষ করে অনুভব করি, এখনকার পরিস্থিতিতে জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে 'বন্দে মাতরম্' একেবারেই খাপ খাচ্ছে না। 'বন্দে মাতরম্' আমাদের জাতীয় ভাবোদ্দীপক গান হিসাবে এখন কেন, চিরকালই মর্যাদা পাবে, কারণ এর সঙ্গে আমাদের জাতীয় সংগ্রাম ওতপ্রোত-রূপে জড়িত ছিল। কিন্তু যে গান জাতীয় সংগ্রাম ও আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধিত্ব করে, যেমন 'বন্দে মাতরম্' করেছে,—তার সঙ্গে জাতীয় সঙ্গীতের কিছুটা তফাৎ আছে। জাতীয় সঙ্গীত এমনই হবে, যাতে জয়ের কথা থাকবে, আশাপূরণের কথা থাকবে,—অতীতে কী সংগ্রাম করা হয়েছে, তার কথা নয়।

জাতীয় সঙ্গীত হচ্ছে প্রধানত সঙ্গীত, কথার সমষ্টি নয়। এর এমন একটি সুর থাকা দরকার, যার লালিত্য থাকবে, যা তালে তালে গাওয়া যায়, আর পৃথিবীর একোণ থেকে ওকোণ পর্যন্ত বাজিয়ে ফল পাওয়া যায়। সত্যি কথা বলতে কী নিজের দেশেও এটা বাজাতে হবে, দেশের বাইরে বাজাতে হবে আরও হয়ত বেশি। আমাদের প্রত্যেকটি দূতাবাসেও এটি বাজাতে হবে। বিদেশী দূতাবাস ও অফিসগুলিও এটা বাজাবে। 'জনগণমন' এইভাবেই সামনে এসে গেছে, আমাদের দিক থেকে এটা তুলে ধরার চেষ্টা আদৌ করতে হয় নি। গত অক্টোবরে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ওয়ালড্রফ-অ্যাস্টোরিয়া হোটেলে এটা বাজানো হয়েছিল। ইউনাইটেড নেশন্‌স-এর সভা যখন বসেছিল, তখনকার কথা। এ সঙ্গীতে একটা সাড়া পড়ে গিয়েছিল। বিদেশী প্রতিনিধি যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা বলেছিলেন, এমন সুন্দর জাতীয় সঙ্গীতের সুর তাঁরা আর কখনো শোনেন নি! উপস্থিত আমেরিকান ও আরও অনেকের কাছে এর বিরাট চাহিদা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সে-কথাটা শুনে আমরা এর রেকর্ড চাইলাম। আর তা পাবার পর আমরা প্রস্তাব দিলাম, সৈন্যদের ব্যাণ্ড-পার্টি এটা বাজাতে শিখুক। দেখতে দেখতে সৈন্যদের মধ্যে এটি জনপ্রিয় হয়ে উঠলো। জাতীয় সঙ্গীত বাজাবার সময় হলে এটি এখন স্থল-বাহিনী, নৌ-বাহিনী ও বিমান-বাহিনী সবাই নিয়মিত বাজিয়ে যাচ্ছে।

আমরা বহু নাম-করা সঙ্গীত-বিশারদদের পরামর্শ নিয়েছি, তার মধ্যে বিদেশের সব থেকে বড়ো অর্কেস্ট্রা-পরিচালকও কেউ কেউ আছেন। আসলে ভালো অর্কেস্ট্রা বা মিলিটারীতে বাজানোর পক্ষে 'বন্দে মাতরম্‌' তেমন জুৎসই হচ্ছে না। 'জনগণমন'-এর এমন একটা লালিত্য ও তাল আছে, যা ঐ কাজের পক্ষে খুবই উপযুক্ত বলে সবাই অনুমোদন করেছেন।

এইভাবে 'জনগণমন' যখন মিলিটারী বা অন্যান্য বাজনার ব্যাপারে আপনা থেকেই জনপ্রিয় হয়ে দাঁড়তে লাগলো, তখন আমি সব প্রদেশের রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীদের মতামত চেয়ে চিঠি লিখলাম। দু-একটি ক্ষেত্র ছাড়া সবাই একযোগে 'জনগণ'-এর পক্ষে মত দিলেন। আর শুধু তা-ই নয়, অধিকাংশই এ কথা জানালেন, তাঁদের প্রদেশে এই গানটি খুবই জনপ্রিয় হয়েছে।

এই রকম অবস্থা যখন হয়ে দাঁড়ালো, তখন আমরা এখানকার মন্ত্রিসভায় বসে ঠিক করলাম, যতদিন না পাকাপাকি কোনো সিদ্ধান্ত হচ্ছে, ততদিন

জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে 'জনগণমন'ই চলতে থাকুক। এ-ব্যবস্থার খুবই দরকার হয়ে পড়েছিল। কী ভারতে, কী বিদেশে, এমন সব উপলক্ষ্য হতে লাগলো, যখন জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে একটা-কিছু বাজাতেই হবে। বারবার চাহিদা আসতে লাগলো, আর আমাদের তাতে সাড়া দিতেই হলো।

আমি এখানে কথাটা আবার বলতে চাই, জাতীয় সঙ্গীতের কথা ততটা নয়, যতটা দরকার উপযোগী সুরের। যদিও কেউ কেউ বলেন 'বন্দে মাতরম্'-এর তা আছে, কিন্তু আমি যতদূর বুঝতে পেরেছি তা নেই। বিশেষ করে বিদেশের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে ও সুর একেবারে অচল। জানিনা 'জনগণমন'-কে গ্রহণ করা হবে কিনা, তবে 'বন্দে মাতরম্'-কে নেওয়া হবে কিনা সে বিষয়ে আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে।

তাছাড়া, কথার দিক থেকে দেখতে গেলেও 'বন্দে মাতরম্'-এর ভাষা বেশির ভাগ লোকই বুঝতে পারবে না, আমি ত নয়ই।

তোমার বিশ্বস্ত,

জওহর

এ চিঠির উত্তরে ডাঃ রায় লিখলেন ২৪শে জুন :

প্রিয় জওহর,

জাতীয় সঙ্গীত নিয়ে ১৫ তারিখে তুমি যে চিঠিখানা লিখেছো, তা আমি খুব মনোযোগ দিয়েই পড়েছি। আমি এ নিয়ে দক্ষ মতামত দিতে পারি না, যদিও সুদূর অতীতে আমি একসময় যন্ত্রসঙ্গীত নিয়ে কিছু নাড়াচাড়া করেছিলাম। কিন্তু সে যাই হোক, তোমার চিঠির তৃতীয় প্যারাগ্রাফে যে যুক্তি তুমি দেখিয়েছো, তা আমি বুঝতে পারলাম না। 'বন্দে মাতরম্' আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল, এবং এ গান জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে অযোগ্য বলে আমি মনে করি না। বরং এ গান ভবিষ্যৎ ভারতের প্রতিনিধিত্ব করছে, ভারতবর্ষ যা হবে, শক্তিশালী এক দেশ, সমৃদ্ধিশালী এক দেশ, সুজলা এবং সুফলা,—বিজয়ের প্রতীক, প্রত্যাশা পূরণের প্রতীক। আসলে, পুরাণো দিনের সংগ্রামের কোনো কথাই এতে নেই।

তোমার চিঠির পরের প্যারাগ্রাফে গানের সুষম ছন্দ ও কথার প্রশ্ন তুলেছো। আমি তোমার সঙ্গে একমত যে জাতীয় সঙ্গীতের সুরে একটা সুষম ছন্দ থাকা দরকার, যা সহজেই দেশ ও বিদেশে বাজানো যাবে। গত অক্টোবরে

ওয়ালড্রফ অ্যাস্টোরিয়া হোটেলে আমিও উপস্থিত ছিলাম, যখন 'জনগণমন' বাজানো হয়েছিল। আমি এও জানি যে, এই সুর বিদেশের প্রতিনিধিদের খুবই ভালো লেগেছিল। কিন্তু এর থেকে এই দাঁড়ায় না যে 'বন্দে মাতরম্'-কেও তেমনি সুরে গাওয়া যাবে না, সে সুর অন্য দেশের লোকদের অতোটা ভাল লাগবে না, বা আরও বেশি ভালো লাগবে না। যে ভাবেই হোক, যদি তেমন সুর করা যায়, তাহলে 'জন-গণ-মন'-এর তুলনায় 'বন্দে মাতরম্' বেশি প্রাধান্য পাবে বলে আমার ধারণা। 'জন-গণ-মন' সেভাবে সুরারোপিত হয়েছে বলেই সেনাবিভাগ ভালোভাবে বাজাতে পেরেছে। আমার দৃঢ় ধারণা, 'বন্দে মাতরম'-এর সুর যদি তেমন ভালো করে করা যায়, তাহলে তারাও তা সুন্দর করে বাজাতে পারবে। চিঠিতে তুমি বলেছো বিদেশের নাম-করা সঙ্গীত-বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে 'জন-গণ-মন' নিয়ে তুমি আলোচনা করেছো। আমি তোমাকে অনুরোধ করবো, তুমি তাদের 'বন্দে মাতরম'-এর নূতন সুরটা শুনিয়ে দিয়ে তাদের মতামত জেনে নাও।

কিছু দিন আগে জাতীয় সঙ্গীত সম্পর্কিত তোমার চিঠিখানা যখন পেয়েছিলাম, তখন তোমাকে তথ্খুনি লিখেছিলাম আমার মতে, 'জন-গণ-মন' -এর বদলে 'বন্দে মাতরম'-কেই পছন্দ করা উচিত। তুমি মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত জানিয়েছিলে যে, আপাতত 'জন-গণ-মন'-কেই জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে ধরা হোক। আমি তোমার কাছে প্রস্তাব দেবো, 'বন্দে মাতরম'-কেও ঐ রকম সুযোগ দেওয়া উচিত। নতুন সুরের 'বন্দে মাতরম'। এই সুর বিদেশে শুনিয়ে দেখা হোক, তারা 'জন-গণ-মন'-এর থেকে এটা বেশি পছন্দ করে কিনা।

এবার 'বন্দে মাতরম'-এর ভাষা সম্বন্ধে বলি। তুমি বলেছো, এ-ভাষা অনেকেই হয়ত বুঝবে না। তুমি নিজেই বলেছো, যে, অন্যের কথা ছেড়ে দেই, তুমি নিজেই ঐ গানের ভাষা বুঝতে পারো না। এ সম্পর্কে আমার বক্তব্য হলো এই যে, সে অসুবিধা 'জন-গণ-মন'-এর বেলাতেও খেটে যায়।

জাতীয় পতাকার ব্যবহার সম্বন্ধে ভারত সরকারের নির্দেশ আমি পেলাম, কিন্তু তোমার চিঠিতে এ বিষয়ে কিছু স্পষ্ট করে বলা নেই।

তোমার বিশ্বস্ত
বিধান

যাই হোক, আমাদের ঘরের কথায় আবার আমরা ফিরে আসি। বিধান-সভার শরৎকালীন অধিবেশনে ভারতের সংবিধানের খসড়া পেশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় এবং পর পর কয়েকটা দিনের অধিবেশনের পর তা গৃহীত হলো। বিধানসভায় তখন ছিলেন দুজন কম্যুনিস্ট সভ্য। একজন জ্যোতি বসু অন্য জন দার্জিলিঙের পাহাড়ী জেলার একজন ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী,—রতনলাল ব্রাহ্মণ। জ্যোতি বসু ঐ খসড়ার বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন —এই খসড়া অগণতান্ত্রিক, ব্যক্তিস্বাধীনতা-খর্বকারী এবং এতে কায়েমী স্বার্থকে মদত দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া, খসড়ায় অর্থসংক্রান্ত বিষয়ে কিছু অদল-বদলের সুপারিশ করার প্রস্তাব এনেছিলেন অর্থমন্ত্রী; সভা সেইমতো সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব পাস করেছিল। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে রাজস্ব বণ্টন ও বরাদ্দ নিয়ে সংবিধানে যে ব্যবস্থার প্রস্তাব করা হয়েছে, তাতে হয়েছে গোড়ায় গলদ। আর সেজন্য গৃহীত প্রস্তাবে বলা হলো যে, আয়কর ও পৌরকর বাবদ মোট যা আয় হবে, তার অন্তত শতকরা ষাট ভাগ দিতে হবে রাজ্যকে। রাজ্যকে আরও দিতে হবে, তামাকের ওপর ধার্য আবগারী শুল্কের মোট আয়ের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ। দিতে হবে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানীর লভ্যাংশের ভাগ, দিতে হবে সেই সব করের পুরো অথবা অংশভাগ, যা কেন্দ্রীয় সরকার সংবিধান-অনুযায়ী 'অবশিষ্ট সম্বন্ধীয় ক্ষমতা' বলে জারী করতে পারেন। এই ঘটনা থেকে দেখা যাচ্ছে, স্বাধীনতার পর কেন্দ্রের অর্থ-ঘটিত নীতি নিয়ে তাঁদের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের গোড়া থেকেই খটাখটি বেঁধে গিয়েছিল, আর এ ব্যাপারে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীরই ভূমিকা ছিল অগ্রণী।

ওদিকে উদ্বাস্তু-সমাগমের গুরুতর সমস্যা নিয়ে সারা ১৯৪৮ সালটাই ডাঃ রায়কে ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়েছিল বলা যায়। এ নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর চিঠির আদান-প্রদান হয়েছিল প্রচুর। এ সম্পর্কে ১৯৪৮-এর ২২শে মার্চ নেহেরুজী যে চিঠি তাঁকে লিখেছিলেন, তাতে তাঁর অদ্ভুত দূরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া গেছে। সেদিন তিনি যা বলেছিলেন, তার পঁচিশ বছর পরে 'বাংলা দেশ'-এর উত্থান সেই সত্যই প্রমাণ করে। তিনি লিখেছিলেন:

নয়াদিল্লী

প্রিয় বিধান, ২২শে মার্চ ১৯৪৮

পূর্ববঙ্গ থেকে ক্রমাগত যে খবর পাওয়া যাচ্ছে, তা উদ্বেগজনক এবং

আমাদের এখানকার অনেক বন্ধুই এতে খুব মুষড়ে পড়েছেন। এটা আমি বুঝতে পারি। কিন্তু তবুও আমার মনে হয়, এ সম্পর্কে আমাদের নীতি থাকা উচিত পরিষ্কার, আর তা থেকে, ছোটখাটো ঘটনা সত্ত্বেও, আমরা সরে দাঁড়াবো না।

পূর্ববঙ্গ ক্রমাগতই অবহেলিত ও কোণঠাসা হতে থাকবে, যতদিন ও-দেশের আসল টানের কেন্দ্র থাকবে পশ্চিম পাকিস্তানে। এই আসল টানের কেন্দ্র পশ্চিমে থেকে যেতে বাধ্য, আর তার ফলে পূর্ববঙ্গ ক্রমশই দূর থেকে দূরে সরে যাবে। পশ্চিম পাকিস্তান, আমার মনে হয়, থেকে যাবে, যদিও আমার আশা, ভবিষ্যতে আমাদের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হবে, আর আমাদের মধ্যে কতগুলি জিনিস এক হয়ে যাবে, যেমন,—প্রতিরক্ষা।

অন্যান্য কারণের মধ্যে এটিও একটি কারণ, যার জন্য পূর্ব থেকে পশ্চিমবঙ্গে বিপুল জনতা আসার স্রোতকে উৎসাহ দেওয়াটা ভুল হবে। এই রকম জনতার স্রোত যদি আসতেই থাকে, তাহলে পশ্চিমবঙ্গ, আর শুধু পশ্চিমবঙ্গ কেন, ভারতীয় ইউনিয়নও কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

সেজন্য আমাদের সমস্যা হচ্ছে পূর্ববঙ্গে কী করে হিন্দুদের মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখা যায় এবং আমাদের সাধ্যমতো কতদূর তাদের সাহায্য করা যায়। যদি তারা পশ্চিমবঙ্গে এসেই পড়ে, তাহলে তাদের দেখাশোনা করতে হবে বই কি! কিন্তু তাবলে উদ্বাস্তুদের বিপুল জনস্রোতের মধ্যে আরও ভীড় বাড়াতে তাদের উৎসাহ দিলে কোনো কাজ হবে না।

তোমার স্নেহভাজন

জওহরলাল নেহেরু

বিপুল উদ্বাস্তু আসার বিষয় নিয়ে প্রধানমন্ত্রী আরও একখানা চিঠি লেখেন ১৬ই আগস্ট :

প্রিয় বিধান,

পূর্ববঙ্গ থেকে জনস্রোত আসার বিষয় নিয়ে লেখা তোমার ১৪ই আগস্টের চিঠি পেলাম। তোমার বিপদ আমি বুঝতে পারছি এবং তোমাকে যতটা পারি সাহায্য আমাদের করা উচিত। কিন্তু আমি তোমাকে আগেই বলেছি, এইরকম বিপুল জনস্রোত যদি পূর্ববঙ্গ থেকে আসতে থাকে তো, সে-সমস্যার কোনো সঠিক সমাধান হবে না। এ জন্যই আমি আগাগোড়া এ জিনিস আট্‌কাবার পক্ষে ছিলাম, তাতে যা-ই ঘটুক না কেন। আমি এখনো মনে

করি, এটা আটকাবার জন্য সবরকম চেষ্টাই করা উচিত। কোনো কোনো হিন্দু নেতা যে পশ্চিমবঙ্গে চলে এসেছেন, সেটা খুবই ভুল হয়েছে বলে আমার মনে হয়।

আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন, বেশির ভাগ প্রদেশকে আরও উদ্বাস্তু নেবার জন্য রাজী করানো মুস্কিল। অনেক দিন ধরেই আমরা তাদের ওপর এ জন্য চাপ দিয়ে চলেছি। আমার মতে, যতো কষ্টই হোক না কেন, পূর্ববঙ্গের লোকদের পক্ষে চলে না এসে ওখানে থেকে যাওয়াই ভালো ছিল।

তোমার বিশ্বস্ত

জওহরলাল নেহেরু

ক্রমাগত এই উদ্বাস্তু-আসার চাপে পেরে না উঠে মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীকে লিখলেন ২২শে আগস্ট তারিখে :

প্রিয় জওহর লাল,

তোমার ১৬ তারিখের চিঠি পেয়েছি।

তোমার প্রস্তাব, পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের ঠেকাতে আমরা যেন সবরকম চেষ্টাই করি। হিন্দু নেতারাও চলে এসেছেন পশ্চিমবঙ্গে। সুতরাং সে দিকে চিন্তা করে লাভ নেই। সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত আজ এসেছিলেন। তিনি বলেছেন, গত দু-তিন মাসের মধ্যে পূর্ববঙ্গের অবস্থা খুব খারাপ হয়েছে; পূর্ববঙ্গ সরকার তাঁকে শান্তির জন্য কাজ করতে দেবে কিনা সন্দেহ। তবু, যারা ওদেশ ছেড়ে চলে আসতে চায়, তাদের জন্য পূর্ববঙ্গে বিভিন্ন কেন্দ্র খোলবার একটা পরিকল্পনা তৈরি করতে তিনি প্রস্তুত আছেন। ওখানে থাকতে যারা ভয় পাচ্ছে, ওখানেই তাদের থাকবার ব্যবস্থার করার জন্য রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সংঘ ও তিনি নিজে মিলে যাতে পরিকল্পনা তৈরি করেন, আমি সেইমতো প্রস্তাব দিয়েছি। পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে এও একটা উপায় হতে পারবে।

অন্য প্রদেশগুলি আমাদের উদ্বাস্তুদের নেবে না বলে চিঠিতে তুমি লিখেছো বটে, কিন্তু তবু আমি বলতে পারি, ওড়িষ্যা ও তার করদ রাজ্যগুলি যা ঐ প্রদেশের মধ্যে এসেছে, তারা স্বচ্ছন্দেই ওদের নিতে রাজী হবে। আমি ওখানকার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমহতাবের সঙ্গে কথা বলেছি, তিনি রাজী আছেন বলেই মনে হলো। এই ধরনের কোনো সুপরিকল্পিত ব্যবস্থাই দরকার হয়ে

পড়েছে পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য। যে-সব ঝুপড়ি আর মিলিটারী আস্তানাগুলো খালি পড়ে ছিল, সেগুলি সব ভরে গেছে। তার ওপর আরও লোক আসছে।

তোমার বিশ্বস্ত
বিধান

এর উত্তরে প্রধানমন্ত্রী লিখলেন ১৯৪৮ এর ২৫শে আগষ্ট তারিখে :

প্রিয় বিধান,

তোমার ২২শে আগষ্টের চিঠি পেলাম।

যদি কোনো বিপর্যয়ের মোকাবিলা আমাদের করতেই হয়, তাহলে সেটা করতে হবে কোনো ক্ষতির পরোয়া না রেখে ; এতে আমাদের অনেকেই যদি ধুয়ে মুছে নিঃশেষ হয়ে যাই তো, যাবো। এ বিষয়ে পরিস্কার থাকতে হবে, নইলে আমাদের কথা বা কাজ জনগণকে বিভ্রান্ত করতে পারে। প্রথম থেকেই আমি বলে আসছি, পুর্ববঙ্গ থেকে হিন্দুদের পশ্চিমবঙ্গে চলে আসাটাকে যে কোনো প্রকারেই হোক রুখতে হবে। এটা যদি খুব বড়ো আকারে দেখা দেয়, তাহলে সর্বনাশের আর সীমা পরিসীমা থাকবে না। আমার মতে, পুর্ববঙ্গের হিন্দু নেতা যাঁরা চলে এসেছেন, তাঁরা তাঁদের জনতার জন্য কোনো কর্তব্যই পালন করেন নি। যা তুমি বলেছো, তাই যদি হয়, অর্থাৎ অবস্থা যদি ইতিমধ্যেই অনেকদূর এগিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে যতদূর করবার আমরা তো করবোই, কিন্তু ব্যাপারটা ভাবতেই বিচলিত বোধ করছি, মানুষ না জানি কতো কষ্টের মধ্যেই না পড়বে! এই উদ্বাস্তু-আগমন আমি শেষ পর্যন্ত রোধ করবার চেস্টা করবোই, আর সেজন্য যদি যুদ্ধ করতে হয তো, তা-ও স্বীকার।

(ইতিমধ্যে একটা আন্দোলন হচ্ছিল, যতো উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে আসবে, ঠিক তত মুসলমান পুর্ববঙ্গে পাঠিয়ে দিতে হবে। এ বিষয়টির উল্লেখ করে জওহরলাল এই চিঠিতেই লিখলেন :)

মানুষ মুসলমান হলেই যে জাতীয়তাবাদী হবে না, এমন কোনো কথা নেই। হয়ত কারুর মনে খারাপ মতলব থাকতে পারে. কিন্তু সে ক্ষেত্রে তার বিচার-বিবেচনা হবে ব্যক্তি হিসাবে। আর যদি বলা হয়, যেহেতু অন্য কোথাও কতগুলো লোক তাদের যা করা উচিত তা করছে না, সেজন্য ভারতীয় নাগরিকদের একটি দলকে ঠেলে বার করে দিতে হবে, এ যুক্তি মানবতার

দিক থেকেই বলো আর আইনের দিক থেকেই বলো, আমি মানতে পারি না।

আমি শুনে সুখী হলাম যে ওড়িষ্যা ও ওড়িষ্যার ভিতরে-আসা দেশীয় রাজ্যগুলি পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তুদের নিতে রাজী আছে। এ জন্য অবশ্যই তারা তৈরি হতে পারে এবং পারা উচিতও, যেমন কিনা তোমার সরকার করছে। কিন্তু তোমরা যে এ কাজটা করছো, সেটা টের পেয়ে আরও উদ্বাস্তু না উৎসাহিত হয়ে এসে পড়তে থাকে! সেটা অবশ্যই পরিহার করতে হবে।

তোমার বিশ্বস্ত

জওহরলাল

স্বাধীনতার ১৪ মাস পরে উদ্বাস্তু জীবনের যে ছবি ফুটে ওঠে তাতে দেখা যায়, কলকাতা ও তার কাছাকাছি জেলাগুলিতে যে ৫০ টি উদ্বাস্তু ত্রাণশিবির খোলা হয়েছিল, তাতে লোক একেবারে উপ্‌ছে পড়ছে! শিবিরবাসী এই সব উদ্বাস্তুদের সংখ্যা ছিল ৪০ হাজার, আর রাজ্যের বিভিন্ন কেন্দ্রে যারা যায়গা নিয়েছিল, এমন ২ লক্ষ উদ্বাস্তুকে নগদ খয়রাতি দেওয়া হচ্ছিল। ৬ই নভেম্বর ডাঃ রায় জানালেন,—আরোও একমাস এই খয়রাতি চলবে, কিন্তু তা' বলে চিরকাল তো চলতে পারে না! এতে সরকারের খরচ মাসে ২৪ লক্ষ টাকা। ডাঃ রায় উদ্বাস্তুদের কাছেই আবেদন জানালেন,—আপনারা আপনাদের পুনর্বাসনের জন্য পরিকল্পনা তৈরি করে সরকারের কাছে দিন। আপনারা সমবায় সমিতি গড়ে সরকারের কাছ থেকে ঋণ নিন। ঠিকমতো পরিকল্পনা হলে, সরকার সেইমতো জমি দিতে পারে, ছোট ব্যবসায়ী, কাঠের মিস্ত্রী বা সাধারণ মিস্ত্রীদের দরকারী জিনিসপত্র বা যন্ত্রপাতিও দিতে পারে।

পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের অভিযোগ ওখানকার সরকারের কাছে পেশ করার জন্য এবং তাদের পশ্চিম বাংলায় চলে আসাটাকে রোধ করার জন্য যাতে পূর্ব পাকিস্তানে একজন ডেপুটি হাইকমিশনার বসানো হয়, তার জন্য ডাঃ রায় নেহেরুকে তাগিদ দিচ্ছিলেন। এ পদের জন্য তিনি প্রথমে ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের নাম করেছিলেন। ডঃ ঘোষ পূর্ববঙ্গেরই লোক এবং বহুদিন তিনি ওখানে জনগণের সেবা করেছেন। ডঃ ঘোষের ওখানে যাওয়ার মানে হলো তাঁর পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি থেকে বিদায় নেওয়া। আর তাছাড়া কংগ্রেস পার্টির মধ্যে থেকেই যে তিনি ডাঃ রায়ের বিরোধিতা করছিলেন,—এটাও ব্যাহত হবে।

কিন্তু তা হলো না। এর পরে ডাঃ রায়ের চোখ পড়লো সুরেন্দ্রমোহন ঘোষের ওপর। কিন্তু তাঁকেও পাঠানো গেল না। তখন পুরানো কংগ্রেসী এবং কলকাতার ভূতপুর্ব মেয়র শ্রীসন্তোসকুমার বসুকে পাঠানো হলো। উনি আইন-ব্যবসার বিপুল আয় ছেড়ে দিয়ে ঐ কাজ গ্রহণ করলেন। এটা তাঁর স্বার্থত্যাগ বই কী!

যাই হোক, উদ্বাস্তুদের ব্যাপারে ডাঃ রায়ের মাথায় হঠাৎ খেলে গেল আন্দামানের কথা। কর্মচারী ও অ-কর্মচারী মিলিয়ে ১১ জনের একটি দলকে পাঠালেন আন্দামানে, উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন ওখানে কেমন হতে পারে সেটা দেখতে। আর দেখতে চাষবাস, শিল্প, মৎস্যচাষ প্রভৃতির উন্নয়ন ওখানে করা যাবে কিনা। এই দলের মাথায় ছিলেন ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী নিকুঞ্জ মাইতি। এটা ঘটেছিল ১৯৪৮-এর ১৬ই নভেম্বর। এ-সম্পর্কিত সরকারী রিপোর্ট প্রধানমন্ত্রী, উপ-প্রধানমন্ত্রী ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সামনে পেশ করা হলো ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে, ডাঃ রায় যখন দিল্লী গেলেন ইণ্টার ডোমিনিয়ন কন্ফারেন্সে যোগ দিতে।

এই সময় পাকিস্তানের স্রষ্টা কায়েদে আজম জিন্না মারা গেলেন। পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল হলেন এবার পুর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন। আর তাঁর যায়গায় মুখ্যমন্ত্রী হলেন নুরুল আমিন। ইনি ছিলেন একসময় যুক্ত বাংলার বিধানসভার অধ্যক্ষ বা স্পীকার।

ডাঃ রায়ের মন্ত্রীত্বের প্রথম তিনবছর খুব চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে কেটেছিল। বিপুল ঐ উদ্বাস্তু সমস্যা, এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে আইন শৃঙ্খলার অবনতি, সাম্প্রদায়িকতা ও কম্যুনিষ্ট তৎপরতা, তার ওপরে ছিল বেকারত্বের সমস্যা আর খাদ্যের অভাব,—এই সবের বিরুদ্ধে তাঁকে ক্রমাগত লড়াই করে যেতে হয়েছিল। তিনি অ্যাসেম্ব্লীতে ফিরে এসেছিলেন সাধারণ নির্বাচন কেন্দ্র থেকে নয়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট-কেন্দ্র থেকে। এই পদটি শূন্য হয়েছিল শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পদত্যাগ করার পর। ডাঃ রায় সম্পর্কে তাঁর বন্ধু ও শত্রু দু-পক্ষই ভাবতেন,—ইনি কি মন্ত্রীপদে বেশিদিন থাকবেন, না ওঁর ডাক্তারীতে ফিরে যাবেন? ডাক্তারীতে যেমন ছিল ওঁর প্র্যাকটিশ, তেমন ছিল রাজার মতো আয়। ওঁর ঘনিষ্ঠ মহলও ভাবতেন, উনি কংগ্রেস ও বিধানসভায় দলবাজির বহর দেখে বিরক্ত হয়ে আজ না হয় কাল ঠিক ফিরে

আসবেন ডাক্তারীতে। এরকম ঘটনা অবশ্য একবার যে ঘটেনি তা নয়, কিন্তু সেটা আমি যথাস্থানে বলবো।

॥ ৪ ॥ ॥ ১৯৪৯ ॥

বড়ো রকমের ছাত্র-বিক্ষোভ, গত ২৩ বছর ধরে যা কলকাতার জীবনে রোজকার ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তার প্রথম প্রকাশ দেখা দিয়েছিল কলকাতার বুকে ১৯৪৯ এর জানুয়ারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে। দিন কয়েক আগে শেয়ালদা স্টেশন এলাকায় উদ্বাস্তুদের একটা অংশের ওপর পুলিশ টিয়ার গ্যাস চালিয়েছিল বলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ১৮ জানুয়ারি তারিখে প্রচণ্ড বিক্ষোভ প্রকাশ করে। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে তারা যখন মহাকরণের দিকে মিছিল নিয়ে যেতে শুরু করলো, গোলমালটা দেখা দিলো তখুনি। বেলা আড়াইটায় শুরু হয়ে গোলমাল চললো সাড়ে ছটা পর্যন্ত, বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছাকাছি এলাকা জুড়েই অবশ্য। একটা আধটা নয়, ন-টা ট্রাম পুড়লো, চারজন মারা গেল ও ১৫ জন আহত হলো। ডাঃ রায় তখন অফিসেই ছিলেন। অফিসেই তাঁর কাছে খবর আসতে লাগলে টেলিফোনে। পরদিন ছাত্র আর উদ্বাস্তু মিলে প্রায় দু হাজার লোক, পুলিশ মর্গে এসে হানা দিলো। গতকাল পুলিশের গুলিতে যারা মারা গেছে তাদের দেহগুলি চাই।

বাড়লো গোলমাল। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছাকাছি যে পুলিশ পাহারা ছিল তাদের ওপর বোমা-টোমা পড়তে লাগলো একের পর এক। ফলে যা হয়। পুলিশের গুলিতে মারা গেল ৫জন আর গ্রেপ্তার হলো ২০০ জন। অবস্থা হলো আরও ঘোরালো, পরিস্থিতি পুলিশের আয়ত্বের বাইরে গেল। শেষ পর্যন্ত কিছু মিলিটারী এনে অবস্থা শান্ত করতে হয়। গোলমালের মধ্যে দেখা গিয়েছিল ট্রাম আর বাসই ছিল ওদের লক্ষ্যবস্তু (প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, রাজ্যসরকারের প্রথম বাস কলকাতার রাস্তায় বেরিয়েছিল ১৯৪৮ এর ৩১ জুলাই)। পাঁচখানা স্টেট বাস বা ১০টি ট্রাম পুড়েছিল ঐ দু দিনে, ট্রামের ক্ষতির পরিমাণ কলকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানীর এজেন্ট মিঃ গড্লের মতে, তিন লক্ষ টাকা।

যাই-হোক, পুলিশী ব্যবস্থা নিয়ে অ্যাসেম্বলীতে প্রশ্ন উঠেছিল। ডাঃ রায় বললেন, পুলিশ যা করেছে তা যে সবটাই যুক্তিপূর্ণ সে কথা আমি ঘূণাক্ষরেও বলছি না। আর এইটাই আমি তদন্ত করে দেখতে চাই। আসলে হিংসা কোনো মীমাংসা নয়। হিংসা হিংসারই জন্ম দেয় এবং তার শেষ পরিণতি হয় ধ্বংসে। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই পেট্রোল আর কেরোসিন দিয়ে শ্রমমন্ত্রী

কালীপদ মুখার্জীর বাড়ীতে আগুন দিতে ছোট ছোট ছেলেগুলোকে উস্‌কানি দিয়েছে কে? তার ওপর বাচ্চা ছেলেগুলোকে বলা হয়েছে, মোটরগাড়িতে বোমা ফেলতে পারলে প্রতিটি বোমা পিছু পাঁচ টাকা দেওয়া হবে। আপনারা শুনে রাখুন, যে ছেলেরা ধরা পড়েছে তারা এ কথা স্বীকার করেছে।

এই ঘটনার দু দিন পরে খবর এলো ছাত্রদের কয়েকজন প্রতিনিধি ডাঃ রায়ের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করবে। কথাটা শুনে ডাঃ রায়ের বন্ধুরা ওঁকে নিষেধ করলেন, খবরদার এ সব ঝুঁকি নেবেন না, ওদের কথা শুনতে যাবেন না। কিন্তু ডাঃ রায় কি সেই পাত্র? সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ একদল যুবক ঢুকে পড়লো তাঁর নিচের তলার হলঘরে। আমি তাড়াতাড়ি সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম, বললাম,—কী চাই?

তারা বললো, দেখা করবো মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে, অনেক কথা বলবার আছে।

দাঁড়ান, বলে আমি ওঁ-র ঘরে চলে গেলাম।

ডাঃ রায় তখনো রোগী দেখতে ব্যস্ত ছিলেন। আমাকে অমন হন্তদন্ত হয়ে ঢুকতে দেখে মুখ ফেরালেন, বললেন,—কী ব্যাপার হে, অ্যাঁ?

বললাম, স্যার ছাত্র আর যুবকদের একটি দল এসে পড়েছে। তারা এক্ষুনি দেখা করার দাবি জানাচ্ছে।

ডাঃ রায় এক মুহূর্ত থেমে থেকে তারপরে বললেন, নিয়ে এসো, তবে এখন নয়, রোগীদের দেখা হয়ে যাক, তারপর।

এই প্রসঙ্গে বলা দরকার, সেই সময় তাঁর বাড়িতে নিরাপত্তা রাখার জন্য যে ব্যবস্থা থাকা দরকার, তা এক রকম ছিল না বললেই হয়। গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে একজন ট্রাফিক কনস্টেবল, ব্যস ঐ পর্যন্তই! আর কোনো পাহারাদার নেই। তবে বাড়ির পিছন দিকে একটা ছোট ঘরে কয়েকজন বন্দুকধারী পুলিশ ছিল বটে, কিন্তু তারা ছিল একটু দূরে দূরে; বাইরের লোকের চোখে পড়তো না।

এই অবস্থায় যুবকদলকে যখন তাঁর ঘরে ঢোকানো হলো, তখন বেশ উত্তেজিত কথাবার্তা হতে লাগলো দু-পক্ষে। তারা চাইছিল কয়েকজন অফি-সারের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হোক আর ১৪৪ ধারা উঠিয়ে নেওয়া হোক। ডাঃ রায় বললেন, আর যাতে মারদাঙ্গা না হয় সেটা তোমরা দেখবে আগে কথা দাও। কয়েকদিন ধরে যদি দেখি যে, হ্যাঁ তোমরা কথা

রেখেছো তখন ১৪৪ ধারাও তুলে নেবো, পুলিশী বাড়াবাড়িরও তদন্ত করবো।

এইভাবে ব্যক্তিগত ঝুঁকি নিয়ে তিনি ছাত্রদের ঠাণ্ডা করলেন বলতে হবে। এবং তাঁর কথাও তিনি রেখেছিলেন। অ্যাসেম্বলীতে ঐ দুটি ব্যাপারই ঘোষণা করে তিনি তাঁর কথার মর্যাদা রাখতে পেরেছিলেন।

ওদিকে স্বরাষ্ট্র (পুলিশ) মন্ত্রী কিরণশঙ্কর রায় বেশ কিছু দিন ধরে অসুখে ভুগছিলেন। তিনি মারা গেলেন ১৯৪৯ এর ২০শে ফেব্রুয়ারি। এর আগে আরেকজন মন্ত্রী দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিলেন। হঠাৎ পিস্তলের গুলি ছিটকে লাগে। ইনি হচ্ছেন মোহিনীমোহন বর্মণ।

আর-সি-পি-আই হানা

এর পরে ২৬শে ফেব্রুয়ারির একটি ঘটনা। মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে আমার অফিস রুমে আমি বসে আছি, এমন সময় লম্বা চেহারার এক যুবক এসে ঘরে ঢুকলেন। চোখে মুখে তার আতঙ্কের ছাপ, হাত-পাও যেন কাঁপছে থরথর করে। একটা চেয়ার সজোরে টেনে নিয়ে তাতে ধপ করে বসে পড়ে হাঁপাতে লাগলেন, খানিকক্ষণ কোনো কথাই বলতে পারলেন না।

—কী ব্যাপার ? আপনি কে ?

উত্তর এলো,—বলছি। আগে আমাকে একটু জল খাওয়ান দয়া করে !

—নিশ্চয়ই।

জল টল খাওয়ার পর একটু সুস্থ হয়ে তিনি বললেন,—আমি রঘু ব্যানার্জী, ব্যারাকপুরের এস-ডি-ও। আমি ওখান থেকে গাড়ি করে সোজা চলে এসেছি। ও এলাকায় সাংঘাতিক কাণ্ড হয়েছে।

ততক্ষণে আমরা জানি, মহাকরণ থেকে ফেরার সময় হয়ে গেছে ডাঃ রায়ের। তাঁর গাড়ি দরজায় এসে লাগা মাত্রই আমরা ছুটে কাছে গেলাম। রঘু ব্যানার্জী কাঁপা গলায় বললেন,—স্যার, সাংঘাতিক খবর জানাতে এসেছি আপনাকে। আজ সকালেই ঘটেছে।

—বটে !—ডাঃ রায় বললেন,—এসো আমার সঙ্গে।

ওঁরা গেলেন দুজনে লাইব্রেরী ঘরে। এইখানে রঘুবাবু তাঁর কাহিনী বলতে লাগলেন,—স্যার, আজ সকালে দমদম বিমান বন্দরের মাইল খানেকের

মধ্যে এক দল লোক মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তিনভাগে ভাগ হয়ে একসঙ্গে হানা দিয়েছে। হানা দিয়েছে বিমান বন্দরে জেশপ কোম্পানীর কারখানায়, আর যশোর রোডের ওপর সরকারী অস্ত্র তৈরির কারখানায়।

—তারপর ?

একটু ঢোঁক গিলে রঘু ব্যানার্জী বলতে লাগলেন,—তারপরে যা হলো স্যার, তা সাংঘাতিক কাণ্ড। জেশপ কারখানায় ওরা তিনজন বিদেশীকে ধরে জলন্ত ফারনেসের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। বিমান বন্দরে তিনজন লোককে খুন করেছে। একটা এয়ারোপ্লেনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। সাতটা রিভলবার চুরি করেছে। পালিয়ে যাবার সময় যশোর রোডের ওপর গৌরীপুরের ফাঁড়িতে গুলি চালিয়েছে, বসিরহাট থানাও বাদ যায় নি। বসিরহাটে তাদের সঙ্গে পুলিশদের একটা খণ্ডযুদ্ধ হয়ে গেছে বলা যেতে পারে। ওরা থানা লুট ক'রে বা থানার ওপর গুলি চালিয়েও ক্ষান্ত হয় নি, ট্রেজারি আর জেলখানার ওপরও আক্রমণ চালিয়েছে। ওরা সীমান্ত পার হয়ে পূর্ব পাকিস্তানে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু ওখানকার লোকজনের সাহায্যে তাড়া করে দুজনকে ধরে ফেলা হয়েছে। বিকেলবেলা বসিরহাট পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ হয় চল্লিশজন সশস্ত্র লোকের সঙ্গে, এর মধ্যে কয়েকজন আবার ঐ দমদম হানার সঙ্গে জড়িত ছিল। হানাদারদের সঙ্গে ছিল একটা স্টেনগান, রিভলবার আর রাইফেল ত ছিলই। পুলিশের চেষ্টায় ২৫ জন হানাদারকে গ্রেপ্তার করা হয়। ঐ স্টেনগান এবং রাইফেল-রিভলবার মিলিয়ে ১৫টি অস্ত্রশস্ত্র ওদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়।

রঘু ব্যানার্জীর বিবরণ শুনে ডাঃ রায় তৎক্ষণাৎ পুলিশ আর স্বরাষ্ট্র বিভাগের অফিসারদের একটি জরুরী বৈঠক ডাকলেন। এবং বৈঠকের নির্দেশ অনুসারে কলকাতা ও কলকাতার উপকণ্ঠে ১৪৪ ধারা জারী করা হলো। পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা ঘটলে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে, সে বিষয়ে একটি কর্মসূচী তৈরি হয়ে যাবার পর মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি থেকেই পুলিশ কমিশনার এস. এন. চ্যাটার্জী ও ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ (আই জি) সুকুমার গুপ্ত তাঁর অফিসারদের কাছে নির্দেশ পাঠাতে লাগলেন। সময়টা তখন প্রায় মধ্য রাত্রি।

এই ঘটনা সমস্ত দেশটাকে একেবারে নাড়িয়ে দিলো। ফেব্রুয়ারিতে প্রধানমন্ত্রী নেহেরু পার্লামেণ্টে পশ্চিমবঙ্গে কম্যুনিস্টদের কার্যকলাপ সম্পর্কে

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি দিলেন। তিনি বললেন, গত বছরে (১৯৪৮) দেখা যায় সি-পি-আই গভর্নমেণ্টের ওপর শুধু খড়্গহস্তই ছিল না, তারা যা করছিল তাকে প্রায় বিদ্রোহই বলা যেতে পারে। এই সূত্রে প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় বিপ্লবী কম্যুনিস্ট পার্টি (আর-সি-পি-আই)র বিশেষ উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তারা বিপ্লবী কম্যুনিস্ট পার্টির লোক। সি-পি-আই থেকে এরা পৃথক হয়ে গেছে, কিন্তু মাঝে মাঝে আবার সহযোগিতা করেও থাকে।

বাজেট পেশ

ওদিকে রাজ্যের বাজেট পেশ করলেন অর্থমন্ত্রী (স্বাধীনতার পর দ্বিতীয় বাজেট) ১৯৪৯-এর ২৪শে ফেব্রুয়ারি। এতে ঘাটতি ছিল ১.১ কোটি টাকা। খরচের খাতে সবচেয়ে বেশি যা পড়েছিল, সে হচ্ছে উন্নয়ন পরিকল্পগুলির জন্য। ৪.২৬ কোটি টাকা বাজেটে ধরা হয়েছিল উদ্বাস্তুদের জন্য। এ টাকা কেন্দ্র দিতে রাজী হয়েছিল।

উদ্বাস্তুদের কথায় দেশ বিভাগের প্রসঙ্গ অনিবার্যভাবে এসে যায়। পূর্ব ও পশ্চিম উভয় বঙ্গের দুই মুখ্যসচিব আজিজ আহ্‌মেদ আর সুকুমার সেন আন্তর্ডোমিনিয়ন কনফারেন্সে যে সব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, সেগুলি কার্যে পরিণত করার জন্য মাঝে মাঝেই মিলিত হচ্ছিলেন। এই রকম একটি কনফারেন্সের শেষের দিনে (এগুলিকে মুখ্যসচিবদের সম্মেলন বলা হতো) দুই বঙ্গের সম্পর্কের ব্যাপারে সেই প্রথম আশার বাণী শোনা গেল। জানা গেল, সীমান্তের ঘটনা ও শুল্ক ইত্যাদি বিষয়ে পরিস্থিতি যা ছিল তা থেকে যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছে, যাতায়াতকারীদের ওপর হয়রানি প্রভৃতি নিয়ে কোনো নালিশই শোনা যায় নি।

এদিকে আশার বাণী শোনা গেলেও অন্যদিকে উদ্বাস্তু সমস্যা ছিল গভীর। এদের পুনর্বাসন শুধু পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে হওয়া সম্ভব ছিল না, তাই পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে কেন্দ্রের কাছে বারবার অনুরোধ যাচ্ছিল। বিভিন্ন প্রদেশে এদের যায়গা করে দেবার জন্য এদের সংখ্যার একটা নির্দিষ্ট সীমা বা এক কথায় কোটা ঠিক করে দেওয়া হোক ; অর্থাৎ এতো সংখ্যক লোক যেন এক এক প্রদেশে যায়গা পেয়ে যেতে পারে। কেন্দ্র উদ্বাস্তুসমস্যাকে জাতীয় সমস্যা হিসাবেই গণ্য করে নিয়েছিল। কিন্তু কতগুলি প্রদেশ এ বিষয়ে পূর্ণ সহযোগিতা করছিল না। ১৯৪৯-এর এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে সর্দার প্যাটেল

মুখ্যমন্ত্রীদের একটি সম্মেলন ডেকে দেশের ভিতরকার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে চাইলেন। প্রধানমন্ত্রী বললেন, আপনারা মুখ বুজে আপনাদের কোটা মতো উদ্বাস্তুদের নিয়ে নিন আপনাদের নিজের নিজের রাজ্যে।

আমাদের মুখ্যমন্ত্রী তাঁর মন্ত্রিসভার কয়েকজন সদস্যকে নিয়ে কয়েকটি প্রদেশে ঘুরে এলেন। কোথায় কেমন করে ওদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে এটাই ছিল তাদের দেখে নেওয়ার বস্তু। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা গেল, ওদের থাকবার জন্য যে জমি দেওয়া হয়েছে তা বাসযোগ্য নয়, চাষ করবার জন্য যে জমি দেওয়া হয়েছে তাও চাষের যোগ্য নয়। ফলে হলো কী, তারা ঐ সব যায়গা থেকে হতাশ হয়ে আবার ফিরে আসতে লাগলো পশ্চিমবঙ্গে। প্রায়ই দেখা যেতো এরা ডাঃ রায়ের বাড়ি ঘিরে ফেলেছে। তারা তাদের দুঃখের কাহিনী নিজের মুখে তাঁর কাছে বলতে চায়। বেচারীরা দু-দুবার করে বাস্তুচ্যুত হয়েছে, এক, পূর্ববঙ্গ থেকে, দুই, যেখানে গিয়েছিল, আবার সেখান থেকে। এভাবে কি মানুষ বাঁচে ?

পুনর্বাসনের দিক থেকে উত্তর প্রদেশ যা করেছিল তা প্রশংসার যোগ্য। সেজন্য ডাঃ রায় গোবিন্দবল্লভ পন্থকে ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন, সাক্ষাৎমতো মুখেও সুখ্যাতি করেছিলেন। কিন্তু উত্তর প্রদেশ (তখন যুক্তপ্রদেশ) যাই করুক, অন্য রাজ্যগুলি তা করছিল না—বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের লাগোয়া প্রদেশ বিহার ও ওড়িষ্যার চিত্র ছিল শোচনীয়। এই দুই রাজ্যের উদ্বাস্তরা ত্রাণ শিবির বা ঐ রকম যায়গায় পচে মরছিল বলা চলে।

এতো গেল উদ্বাস্তুদের কথা। সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় অরক্ষিত বিস্তৃত সীমান্ত-রেখার প্রসঙ্গ এসে পড়ে। বিশেষ করে পাকিস্তানীদের উৎপাত আর চোরা কারবার বন্ধ করার জন্য পাহারার বন্দোবস্ত করা দরকার। নদীয়া ও অন্যান্য সীমান্তবর্তী জেলা থেকে এ ধরনের খবর যত আসে ততই চিন্তিত হয়ে পড়েন মুখ্যমন্ত্রী। ভাবলেন—গ্রামের ছেলেদের নিয়ে একটা আধা মিলিটারী বাহিনী এ উদ্দেশে গড়ে তুললে কেমন হয়।

মুখ্যমন্ত্রী এবং মুখ্যসচিব মিঃ সেন উভয়েই ১৯৪৮ সালে আসাম গিয়েছিলেন আন্তঃ রাজ্য কনফারেন্সে যোগ দিতে। মুখ্যমন্ত্রী শিলংয়ে তাঁর নিজের “রায়

ভিলা" নামক অতি মনোরম বাংলোতে গিয়ে উঠেছিলেন। প্রসঙ্গত বলি, এই "রায় ভিলা" (বা রে-ভিলা) ১৯৫৩-৫৪ সালে তিনি বিক্রি করে দিয়েছিলেন আসাম সরকারকে। কিন্তু ঐ আধা-মিলিটারী বাহিনী সম্পর্কে যা বলছিলাম। মুখ্যসচিবের সঙ্গে পরামর্শ করে একদিন তিনি আমাকে ও বিষয়ে ডিক্‌টেশন দিলেন। একটি স্বেচ্ছাবাহিনী গড়ে তোলার প্রস্তাব সম্বলিত প্রকল্পের রূপ রেখাই তিনি ডিক্‌টেশন দিয়ে প্রস্তুত করে নিলেন। এই স্বেচ্ছাবাহিনীর নাম হলো "বঙ্গীয় জাতীয় রক্ষীদল" বা ওয়েস্ট বেঙ্গল ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার ফোর্স।

এই প্রকল্পের এবং তার সঙ্গে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কিরণশংকর রায়কে লেখা সংশ্লিষ্ট বিষয়ক চিঠি, এই দুটি একটি বড়ো খামে পুরে শিলং সেন্ট্রাল পোস্ট অফিসে পোস্ট করতে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। কিন্তু পাঠিয়ে দেবার কিছুক্ষণ পরে আমার মনে হলো, ঐ যাঃ। খামের ওপর "বাই এয়ার মেল" লেবেলটা তো সেঁটে দিতে ভুলে গেছি! কী হবে?

সে সময় আসামের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সরাসরি কোনো রেল সংযোগ ছিল না। আসাম থেকে পশ্চিমবঙ্গে যেতে হলে খানিকটা পথ পার্বতীপুর হয়ে পাকিস্তানের মধ্যে দিয়ে গেছে। আমার ভয় হলো, খামখানা পাকিস্তানী সেন্সর কর্তাদের চোখে নিশ্চয়ই পড়বে, আর ওতে গোপন যে ব্যাপারটা রয়েছে, তা জানাজানি হয়ে যাবে। কী সর্বনাশ!

আমাদের পিওনকে সঙ্গে নিয়ে তাড়াতাড়ি দৌড়ালাম পোস্ট অফিসের দিকে। ওখানকার পোস্টমাস্টারের সাহায্যে অনেক খুঁজে শেষ পর্যন্ত খামখানা পাওয়া গিয়েছিল। আর সেটা পেয়ে আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। আর কি ভুল হয়? সঙ্গে সঙ্গে "বাই এয়ার মেল" লেবেল এঁটে চিঠিখানা পাঠিয়ে দিয়ে তবেই নিশ্চিন্ত বোধ করতে লাগলাম।

যাই হোক, পরের সপ্তাহে পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভা চাঁদমারি ট্রেনিং সেন্টারের পরিকল্পটি অনুমোদন করলেন। কলকাতা থেকে ৩৯ মাইল দূরে হলো এই চাঁদমারি, এখানে গ্রামীণ যুবকদের প্রতিরক্ষার কার্যকলাপ শেখানোর ব্যবস্থা হলো। এক বছরের মধ্যে চারটি ব্যাচ শিক্ষণপ্রাপ্ত হয়েছিল; তাদের সংখ্যা হবে প্রায় আড়াই হাজার। ডাঃ রায় সেনাবাহিনীর তদানীন্তন অধিনায়ক জেনারেল কারিয়াপ্পাকে নিমন্ত্রণ জানালেন এই শিক্ষণ-শিবির পরিদর্শন করবার

জন্য। জেনারেল কারিয়াপ্পা দেখেশুনে এতো খুশি হয়েছিলেন যে, তথ্‌খুনি ঘোষণা করলেন, ভারতীয় সেনাবাহিনীর নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রাদেশিকতা কোনো প্রতিবন্ধক হবে না।

ভবিষ্যতের বাঙালী বাহিনীর শিক্ষণকার্যে নিয়োজিত হতে পারবে মনে করে ২০০ বাঙালী যুবককে সেনাবাহিনীতে নেবার আদেশও তিনি দিয়ে দেন ঐ সঙ্গে। এ সবই খুব উৎসাহব্যঞ্জক ঘটনা। এর পরে এই বাহিনী আকারে আরও অনেক বড়ো হয়েছিল। এবং সীমান্ত পাহারা দেওয়া ছাড়াও ধর্মঘট বা আপৎকালীন অবস্থায় জরুরী কাজ-কর্মগুলি অব্যাহত রাখার জন্য এদের নিযুক্ত করা হতো। আমার মনে আছে, একবার যখন কলকাতা করপোরেশনের লোকেরা ধর্মঘট করলো আর সারা শহর জুড়ে জঞ্জালের স্তূপ জড়ো হতে লাগলো, তখন তদানীন্তন পুলিশের কর্তা পি কে সেনের নির্দেশে এই বাহিনী কাজ করেছিল; এবং যেভাবে কাজ করেছিল তা সত্যিই শ্লাঘার বিষয়।

॥ ৫ ॥

দক্ষিণ কলকাতায় উপনির্বাচন

এই সময়কার আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে, দক্ষিণ কলকাতার উপনির্বাচন। এই নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এর ফলাফলের জন্য, ১৯৪৯ সালে ডাঃ রায়ের মন্ত্রিসভা প্রায় ভেঙে যাচ্ছিল আর কি! সেই কথাটাই এবার বলবো। শরৎচন্দ্র বসুর দাদা সতীশচন্দ্র বসুর মৃত্যুতে একটি সদস্যপদ খালি হয়েছিল। শরৎবাবু তখন কংগ্রেসের বাইরে এসে রিপাবলিকান সোস্যালিষ্ট পার্টি গঠন করেছিলেন. যে পার্টির অস্তিত্ব এখন আর নেই। তিনি ঐ পার্টির হয়ে ঐ সদস্যপদের জন্য প্রতিযোগিতায় নামলেন। কংগ্রেস তাঁর প্রতিপক্ষ হিসাবে দাঁড় করালেন দক্ষিণ কলকাতা জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি স্থরেশ দাসকে। শরৎবাবু তাঁর স্বপক্ষে শুধু নিজের দলই নয়, সমস্ত সরকার-বিরোধী ও কংগ্রেস-বিরোধী দলেরই সমর্থন সংগ্রহ করলেন। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর প্রথম যে নির্বাচনী সভা করলেন কংগ্রেস, সেটা হয়েছিল দক্ষিণ কলকাতার দেশপ্রিয় পার্কে। কিন্তু সভাটি মারামারিতে বন্ধ হয়ে যায়। কংগ্রেস-পতাকা পুড়ে যায়। বিজয়সিংহ নাহার এবং ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র গুহরায় সহ কয়েকজন কংগ্রেসকর্মী আহত হন; এই প্রথম অনুরূপ জনসভায় অ্যাসিড বাল্ব আর ইঁট-

পাটকেল ছোড়া হয়। এক কথায়, একটা অরাজক অবস্থার মধ্যে সভা পণ্ড হয়ে গিয়েছিল। দাঙ্গাকারীরা এর পর কাছেই সুরেশ দাসের নির্বাচনী অফিসে হানা দিয়ে অফিস তচ্‌নচ্‌ করে। অবস্থা ঘোরালো হয়ে দাঁড়ালে পুলিশ ডাকা হয়। পুলিশ শেষ পর্যন্ত গুলি চালায়। একটি লোক মারাও যায়। বোমা মারামারির ঘটনাও হয়; সারা অঞ্চল জুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে; রাস্তায় ট্রাম বাস বন্ধ হয়ে যায়।

যাই হোক, ১২ই জুন (১৯৪৯) তারিখে যথারীতি ভোটগ্রহণ করা হয়েছিল। আশঙ্কা মতো বড়ো রকম কিছু ঘটেনি এই রক্ষে। নিরাপত্তার জন্য এই প্রথম সরকার থেকে মিলিটারির প্রহরা চেয়ে পাঠানো হয়েছিল। আমার বাড়ি দক্ষিণ কলকাতায়। আমি পুরুষদের ভোটগ্রহণকেন্দ্রে ভোট দিয়ে এলাম। তখনকার দিনে পুরুষ আর মেয়েদের জন্য আলাদা আলাদা কেন্দ্র করা হতো। আমার ভোট দেওয়া হয়ে গেলে আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে গেলাম আঁশুতোষ কলেজে, সেখানে হয়েছে তার ভোটগ্রহণ-কেন্দ্র। তখন বেলা প্রায় তিনটে হবে। আমরা কাছাকাছি গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম। দেখলাম, ভোটগ্রহণ-কেন্দ্রের গেটে শরৎ বসুর অনুগামীরা ভিড় করে আছেন, আর উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করছেন, ভোটগ্রহণ কেন্দ্র থেকে সুচেতা কৃপালনী বেরিয়ে এসো। বেরিয়ে যাও নেহেরুর এজেণ্ট !

আসল কথা, নেহেরুজী সুচেতা কৃপালনীকে পাঠিয়েছিলেন কংগ্রেসের পক্ষ থেকে নির্বাচনী সংগঠনকে সাহায্য করবার জন্য। আমার স্ত্রী অবশ্য ভিতরে গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎও হয় সুচেতা কৃপালনীর।

আমার স্ত্রী ভোট দিয়ে বেরিয়ে আসার পর আমরা কিছুক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে ঘটনাটা লক্ষ্য করছিলাম। ঐ লোকগুলো তখন যে রকম মারমুখি ছিলো, তাদের হাত থেকে সুচেতা দেবীকে রক্ষা করতে পুলিশকে সে দিন কম বেগ পেতে হয় নি। তিনি বেরিয়ে আসা মাত্রই লোকগুলো তাঁর দিকে তেড়ে গেল, মুখে যা-তা বলতে লাগলো, ইত্যাদি। কিন্তু আশ্চর্য মানুষটির ধৈর্য ও সাহস ! অবিচলিত ভাবে গাড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন, পুলিশরা তাঁর চারদিকে একটা বেষ্টনী তৈরি করে তাঁকে ঘিরে রাখলো। এইভাবে তিনি গাড়িতে উঠে বেরিয়ে গেলেন। লোকগুলোর উচ্ছৃঙ্খলতা আর তাঁর শান্তভাব, এই-ই ছিল লক্ষণীয় বিষয়।

ঐ দিনই সন্ধ্যাবেলা মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে যখন তাঁর সঙ্গে দেখা হলো, তখন সব বললাম। এও বললাম, কংগ্রেস প্রার্থীর ভাগ্য যে সুপ্রসন্ন হবে এমন অনুমান করা যাচ্ছে না।

ভোটের ফলাফল ঘোষিত হলো ১৪ই জুন রাত সাড়ে সাতটায়। সুরেশ দাসের ৫,৭৫০ ভোটের উত্তরে শরৎচন্দ্র বসু পেয়েছেন ১৯,৩০০ ভোট। তখনও পর্যন্ত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কোনো সংগঠিত ফ্রণ্ট ছিল না। শরৎবাবু ভোটে জিতেই সেটা করলেন। একে যুক্তফ্রণ্ট গঠনের ভিৎ বলা যেতে পারে। আর শুধু তাই নয়, কংগ্রেসের এই পরাজয় মন্ত্রিসভার ভিৎ-ও যে টলিয়ে দিয়েছিলো, এ-কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। প্রাদেশিক কংগ্রেস সংগঠন-ও বেশ চোট খেয়েছিলো। এ সব কারণে কয়েকজন প্রথম সারির মন্ত্রী ভোটগ্রহণের খুঁৎ টুৎ খুঁজে যাতে নির্বাচনী ফলাফল উল্‌টে দেওয়া যায়, তার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু এ সব পরামর্শে ডাঃ রায় কান দেন নি। গণতন্ত্রের প্রকৃত উপাসকের মতোই তিনি তাঁর এককালের বন্ধু ও সহযোগী শরৎবাবুকে সংসদীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে স্বাগত জানাতে কুণ্ঠিত হন নি। শরৎবাবু কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা ছিলেন ; কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব থেকে তাঁকে হঠাৎই অপসারিত করা হয়েছিল। এবং তাঁর ও নেহেরুজীর মধ্যে বিরোধ এক সময় খুবই চরমে উঠেছিল।

কিন্তু সে যাই হোক, কংগ্রেসের দক্ষিণ কলকাতার পরাজয় কিন্তু ঐ ১৯৪৯ সালের দ্বিতীয়ার্ধে ডাঃ রায়কে দুরূহ পরিস্থিতির মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল। তাঁর সাড়ে চৌদ্দ বছরের মন্ত্রিত্বের কালে বহুবার তাঁকে সংকটের সম্মুখীন হতে হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু এই সংকট হয়ে দাঁড়িয়েছিল চরম। স্বাধীনতা আর গণতন্ত্রের সেই ছিল বহিঃপ্রকাশের প্রথম স্তর। সেজন্য ভোটের মাধ্যমে জনগণের মতামতের অভিব্যক্তির ফল যে সুদূর প্রসারী হয়েছিল, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ২০শে জুন সকালে প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর একটি ভাষণ কাগজে কাগজে বেরিয়ে গেল যাতে তিনি মন্তব্য করেছিলেন বলে প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভার পদত্যাগ করা উচিত। এ মন্তব্য বলা বাহুল্য ডাঃ রায়ের চোখ এড়িয়ে গেল না। সকাল সাড়ে আটটায় আমার ঘরে ইলেকট্রিক বেল বেজে উঠলো ক্রিং ক্রিং। বুঝলাম ডাক পড়েছে। কাছে গেলাম। গম্ভীর মুখ। ডিক্‌টেশন দিয়ে তথ্‌খুনি যে চিঠি লেখালেন, তাতেই

তাঁর তখনকার মনের অবস্থা ধরা পড়লো। এবং যে সিদ্ধান্তের কথা তিনি চিঠির মাধ্যমে প্রকাশ করলেন, তার জন্য তিনি তাঁর কোনো সহযোগীর সঙ্গেই পরামর্শ করলেন না। তাঁরা অবশ্য তখনো এসে পৌঁছন নি। এই চিঠিতে তিনি পদত্যাগের ইচ্ছা পর্যন্ত প্রকাশ করলেন। বললেন, নির্বাচনের ফলাফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তার জন্য প্রয়োজন হলে তিনি পদত্যাগ করতেও পশ্চাৎপদ নন। চিঠিটি হলো এই :

কলকাতা

২০শে জুন ১৯৪৯

প্রিয় জওহর,

নয়া দিল্লীতে প্রাদেশিক রাজনৈতিক পরিষদের খোলা বৈঠকে তুমি যে বক্তৃতা দিয়েছিলে, তা আজকের সকালের কাগজে ছাপা হয়েছে। তুমি দুটি জিনিস বলেছো বলে কাগজগুলো বলছে। এক, দেখা যাচ্ছে যে, ঐ নির্বাচনী এলাকার জনগণ হয় পশ্চিমবঙ্গের প্রাদেশিক কংগ্রেসের ওপর, আর নয় ত প্রাদেশিক সরকারের ওপর, চটে গেছে। দুই, সরকারে মন্ত্রীরা রয়েছেন জন-প্রতিনিধি হিসাবে, কিন্তু এই জনপ্রতিনিধিত্বের ভাব মূর্তি যখন তাঁরা খুইয়েছেন, তখন তাঁদের পদত্যাগ করা উচিত।

তোমার মতামতের এই দুটো দিক আমাকে ভীষণভাবে ভাবিয়ে তুলেছে। প্রথমতঃ আমি স্বীকার করি না যে দক্ষিণ কলকাতার পুনর্নির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ওপর প্রকাশ পেয়েছে সর্বতোভাবে জনগণের রাগ আর ঘৃণা। সত্যি কথা বলতে কী, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষের লোকেরা কালা ভেংকটারাওকে যা বলেছিল তার সঙ্গে এই মন্তব্য প্রায় মিলে যাচ্ছে বলা চলে। কালা ভেংকটারাও নির্বাচনী প্রচারকার্যের সময় আগাগোড়া উপস্থিত ছিলেন। তিনি দেখে শুনে বলেছিলেন, নির্বাচনে পরাজয়ের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনপ্রিয়তা হারানোই দায়ী, এ কথা বলা মূর্খতারই পরিচায়ক। আসলে নির্বাচনের সময় ধ্বংসাশ্রয়ী ও ঈর্ষাকাতর কিছু লোক পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে ততটা নয়, যতটা কেন্দ্রীয় সরকারের ও তাঁদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে যথেচ্ছ প্রচার চালিয়ে যাচ্ছিল। তা সে যা-ই হোক না কেন, আমার মনে হলো, তোমার ভাষণের প্রতিক্রিয়া আমার অন্তরে যা হয়েছে তা তোমাকে জানানো দরকার।

রাজ্যের স্বার্থে আমি যখন আমার জীবিকাক্ষেত্র থেকে সরে দাঁড়াই, তখন আমার মনে হয়েছিল, ব্যক্তিগতভাবে রোগীর সেবা করার থেকে সমগ্রভাবে রাজ্যের সেবা করলে সেটা বেশি কাজে লাগবে। এ কর্তব্য করায় আমার অবসর বা স্বাস্থ্য কোনোটার দিকেই ভ্রুক্ষেপ করি নি। একজন নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক হিসাবে যদি মনে করো দক্ষিণ কলকাতার পুনর্নির্বাচনের পরাজয়ের মাধ্যমে আমার সরকারের বিরুদ্ধে জনমত প্রকাশ পেয়েছে, তাহলে আমি যা করবো তা আমার কাছে খুবই স্পষ্ট। তোমার দ্বিতীয় মন্তব্য অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার আর জনমতের প্রতিনিধিত্ব নেই, এবং সেক্ষেত্রে একমাত্র সঙ্গত কাজ হচ্ছে আমার পদত্যাগ করা। এ বিষয়ে আমার সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করি নি। মাত্র ঘণ্টাখানেক আগে তোমার ভাষণ পড়েছি। আর তখ্খ্নি মনে হয়েছে তোমাকে আমার মতামত জানাতে একটুও দেরি করা উচিত নয়, যাতে আমি আগামী বৃহস্পতিবার সকালে সুইজারল্যাণ্ড যাবার আগেই তোমার উত্তরটা পেয়ে যেতে পারি। বিশ্বাস করো, যে দায়িত্ব স্বেচ্ছায় তুলে নিয়েছিলাম, তা যদি আমাকে ত্যাগ করতে বলা হয় তাতে আমি আদৌ দুঃখিত হবো না। শুধু আমার সহকর্মীদের কথাটা জানাতে হবে, আর তা আমি জানাবো তোমার উত্তর পাওয়া মাত্র। যার ফলে, আমার ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাপারটা কার্যে পরিণত করা যেতে পারবে।

দ্রুত উত্তর আশা করছি।

তোমার বিশ্বস্ত

বিধান

এই চিঠিখানা শেষ হওয়া মাত্র দ্বিতীয় একখানা চিঠির ডিক্টেশন তিনি দিতে লাগলেন। এটি হচ্ছে তাঁর বন্ধু সর্দার প্যাটেলের উদ্দেশে লেখা।

কলকাতা

২০শে জুন ১৯৪৯

প্রিয় বল্লভভাই,

পণ্ডিত নেহেরুকে আজ যে চিঠিখানা লিখলাম, তার একখানা কপি তোমাকে এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি। এতে আমি যা অনুভব করেছি, তা-ই বলেছি, তার প্রত্যেকটি অক্ষর আমার আত্মপ্রত্যয়ের অভিব্যক্তি। আমার একমাত্র দুঃখ পণ্ডিত নেহেরু এই কথা উড়িয়ে দিতে চান যে, কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে তাঁর

নিজের কোনো প্রতিরোধ প্রবৃত্তি নেই, যদিও ভারতের কম্যুনিষ্টদের তিনি অবাঞ্ছিত ব্যক্তি বলে মনে করেন। তাঁর মতামতের এই অভিব্যক্তি, তুমি হয়ত স্বীকার করবে, এই রাজ্যে আমাদের অবস্থা অত্যন্ত অসুবিধাজনক করে তোলে। পরিস্থিতি যে কী রকম, তা তিনি উপলব্ধি করুন এই আমার ইচ্ছা। আমার আরও ইচ্ছা এই যে, তিনি নিজে এসে এই প্রদেশে কিছুদিনের জন্য সরকার চালিয়ে দেখুন, তাহলে সঠিক বুঝতে পারবেন সমস্যাটা কোথায়। মতামতের এই ধরনের অভিব্যক্তি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমিকাকে আরও কঠিনতর করে তোলে। কবে যে তিনি এটা বুঝবেন কে জানে, অপর পক্ষে দেখ, আমাদের জনসাধারণের কষ্ট লাঘবের জন্য খাদ্যের কোটা বাড়াবার যত চেষ্টা করেছি, ততবার সে প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় খাদ্যদপ্তর। সমস্যাগুলো যদি পুরোপুরি উপলব্ধি না করেন বা সহযোগিতা না করেন কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তর, তাহলে প্রাদেশিক সরকারের পক্ষে কাজ চালানো সম্ভব নয়।

তোমার বিশ্বস্ত

বিধান

বাইশে জুন প্রধানমন্ত্রী উত্তর দিলেন অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ ভাষায়, যাতে ডাঃ রায় তাঁর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজটা না করে বসেন। চিঠিটা হলো এই :

প্রিয় বিধান,

এই মাত্র তোমার ২০শে জুনের চিঠি পেলাম। আর পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে এই উত্তর লিখছি।

সবার আগে, আমার ব্যক্তিগত যে শ্রদ্ধা আছে তোমার প্রতি, তার আর পুনরুল্লেখ করতে চাই না। আমি স্থির জানি, জনসেবার প্রেরণা থেকেই তুমি মুখ্যমন্ত্রীত্বের বোঝা কাঁধে তুলে নিয়েছিলে। তা না হলে সরকারী বেসরকারী যে বহুবিধ কাজে তুমি যথেষ্ট ব্যাপৃত ছিলে, তার ওপরে এই বাড়তি ঝঞ্ঝাট পোয়াবার কোনোই দরকার ছিল না তোমার।

বর্তমান অবস্থায় তোমার পদত্যাগের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তুমি সুইজারল্যাণ্ড থেকে ফিরে এসো, তখন হয়ত পরিস্থিতি আর একটু স্বচ্ছ হয়ে আসবে। আর তখন আমরা কথাটা বিবেচনা করে দেখবো। বাংলায় নতুন

করে আবার সাধারণ নির্বাচনের সম্ভাবনাটাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, আরও অন্য উপায়ও আমাদের বিবেচনা করবার আছে।

আমি আবার বলছি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে সম্পূর্ণভাবে জনগণের প্রতিনিধিত্ব করছে না, এমন ধারণার কথা আমি একটুও বলি নি। যা আমি বলেছি তা হচ্ছে, দক্ষিণ কলকাতা এই রকম ধারণা করেছিল এবং কংগ্রেস ও মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেছিল, কিন্তু প্রদেশের বাকি অংশ কী ধারণা করেছিল, সে হচ্ছে অন্য কথা।

সে জন্য আমি তোমাকে এখন তাড়াহুড়ো করে কিছু করতে পরামর্শ দিচ্ছি না। তোমার চিকিৎসার জন্য তুমি সুইজারল্যাণ্ড ও অস্ট্রিয়ায় চলে যাও, সেখানে পুরোপুরি বিশ্রাম নাও, দুশ্চিন্তাও দূরে সরিয়ে রাখো, যতদূর সম্ভব কলকাতা ও তার সমস্যাবলীর কথা ভুলে থেকো।

তোমার প্রীতিমুগ্ধ
জওহরলাল নেহেরু

এইখানে বলা দরকার, প্রায় ১৭ মাস হয়ে গেল ডাঃ রায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। এই সতেরো মাস তিনি কী করেছিলেন?

এ কথা মানতেই হবে, চরম হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতিতেও তিনি পশ্চিম বঙ্গের উন্নতির জন্য বিবিধ পরিকল্পনা নিয়ে নীরবেই অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। জুন মাসে কলকাতার সাংবাদিকদের ডাকা হলো। ডাঃ রায় ঘোষণা করলেন, চোখের অপারেশন করতে দুমাসের জন্য ইয়োরোপ যাচ্ছি এ কথা ঠিক কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কতগুলি কাজ করে আসবো। জার্মানীর সহযোগিতায় এখানে একটা নুনের কারখানা খোলা যায় কি না দেখবো। প্যারিসে পাতাল রেল যারা তৈরি করেছে, সেইসব বিশেষজ্ঞদের একটা দলকে কলকাতায় আনার চেষ্টা করব। তারা দেখুক কলকাতার মাটিতে পাতাল রেল তৈরি করা সম্ভব কি না।

এখানে বলে রাখা ভালো, পরে কিন্তু সত্যিই তাঁর চেষ্টায় এসেছিল ফরাসী বিশেষজ্ঞদের একটি দল। কয়েক মাস ধরে তারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে তাদের রিপোর্ট পেশ করেছিল। এই ঘটনার প্রায় ২৩ বছর পরে কেন্দ্রীয় সরকার অনুরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন বুঝে রাশিয়া থেকে বিশেষজ্ঞ আনিয়েছিলেন। আজ আপনারা দেখছেন, সে কাজ শুরুও হয়ে গেছে।

ঐ সভায় তিনি আরও বললেন, কলকাতা রাজ্য পরিবহণের জন্য ডবল ডেকার বাস যারা তৈরি করে, তাদেরও সঙ্গে দেখা করবো বার্মিংহ্যামে। উদ্বাস্তুদের জন্য সস্তায় কাঠের বাড়ি বানানো যায় কী করে, সে বিষয়ে একটি সুইডিশ ফার্মের সঙ্গেও যোগাযোগ করবো।

আসল কথা, দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ডাঃ রায়ের—দেশকে যদি দ্রুত পরিবর্তনশীল পৃথিবীর সঙ্গে তাল রেখে চলতে হয়, তাহলে সরেজমিনে গিয়ে পশ্চিম দেশের ঐ সব উন্নয়নমূলক কাজকর্ম ভালো করে দেখে-শুনে আসা দরকার।

ও দিকে দিল্লীতে কিন্তু কলকাতার উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীর পরাজয় নিয়ে কংগ্রেস মহলে ঝড় বয়ে যাচ্ছিল। পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এক জরুরী বৈঠকে মিলিত হয়ে আড়াই ঘণ্টা ধরে আলোচনা করলেন ১৬ই জুলাই তারিখে। ২২শে জুন তারিখে ডাঃ রায়ের লেখা একটি গোপন নোট ছিল তাঁদের আলোচনার অন্যতম বিষয়বস্তু। এই নোটে ডাঃ রায় কংগ্রেসের পরাজয়ের কারণ খুব খোলাখুলি লিখে দিয়েছিলেন। তাতে ছিল, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর মতো মানুষও বলেছেন, এই ব্যর্থতার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার বহুলাংশে দায়ী। এই সরকারের প্রতিটি কার্যকলাপ ও ভুল-ত্রুটির দায়িত্ব যখন আমার, তখন আমাকে পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই বলতে হচ্ছে যে, না, সরকারের কোনো দোষ নেই। এই নোটে তিনি আরও বলেছিলেন, ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট পশ্চিমবঙ্গের যে পরিস্থিতি, এক সম্প্রদায়ের ওপর অপর সম্প্রদায়ের মারদাঙ্গা, বঙ্গবিভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গের বিক্ষুব্ধতা, শোচনীয় অবস্থার মধ্য দিয়ে পুর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে সুবৃহৎ সংখ্যায় উদ্বাস্তু-আগমন, ক্রমাগত খাদ্যাভাব, বাংলার বাইরে থেকে কাপড়চোপড় সংগ্রহ করার অসুবিধা, দেশবিভাগের জন্য পরিবহণ ব্যবস্থা ভেঙে পড়া, এই সমস্ত কারণ মিলে যে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছিল তা-ই সময়ে সময়ে গণ বিক্ষোভ ও হিংসার মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে। এর পরে তিনি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির গঠন সম্পর্কে বলেছিলেন, দেশ বিভাগের পরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভ্যদের বেশ বড়ো একটা অংশ পুর্ববঙ্গের যায়গায় পশ্চিমবঙ্গকে তাঁদের কর্মক্ষেত্র হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। মনে রাখতে হবে, কী জেলাস্তরে কী প্রদেশস্তরে কংগ্রেস কমিটির নির্বাচন হয় নি বেশ কয়েক বছর। তখনকার সভাপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের নির্দেশে পুর্ববঙ্গের প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির ১৪৭ জন সভ্য

যারা পশ্চিমবঙ্গে আসতে চেয়েছিলেন তাঁরা এখানকার কমিটিতে সঙ্গে সঙ্গে আসন পেয়ে গেলেন—যদিও পশ্চিমবঙ্গে তাদের কোনো নির্বাচনকেন্দ্র ছিল না যে জন্য কেন্দ্রের তাঁরা প্রতিনিধি বলে গণ্য হতে পারেন। বি-পি-সি-সির প্রেসিডেন্টই বলুন আর ডি-সি-সির প্রেসিডেন্টই বলুন, তাঁদের কোনোই সংযোগ ছিল না পশ্চিমবঙ্গের জনগণের সঙ্গে। প্রদেশে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে পার্লিয়ামেণ্টারি বোর্ড যদি আমার কাছে একটি টেলিগ্রাম করেও জিজ্ঞাসা করতেন, তাহলে শ্রীযুক্ত দাসকে প্রার্থী হিসাবে দাঁড় করানোর যে কী অসুবিধা তা আমি বুঝিয়ে বলতাম।

মুখ্যমন্ত্রীর একটি চিঠির উত্তরে প্রধানমন্ত্রী চিঠি লিখে জানালেন, তিনি নিজে কলকাতা এসে পরিস্থিতি বুঝে নিয়ে যথার্থ সিদ্ধান্তে পৌছতে চান। এই চিঠি লিখলেন ডাঃ রায় ইয়োরোপে রওনা হয়ে যাবার পাঁচ দিন পরে। চিঠিখানা যখন তিনি পেলেন তখন তিনি সুইজারল্যাণ্ডে। চিঠিখানা হচ্ছে এই :—

নতুন দিল্লী ২৮শে জুন ১৯৪৯

প্রিয় বিধান,

তোমার রওনা হয়ে যাবার আগের মুহূর্তে যে চিঠি লিখেছিলে, তা আমি পেয়েছি। পেয়েছি কলকাতা ঘটনাবলীর পূর্ণ বিবরণ, সত্যি কথা বলতে কি তখনকার পরিস্থিতি নিয়ে অনেক রকম বিবরণ ও বিশ্লেষণই আমি পেয়েছি এবং তাতে করে মনে মনে একটা পরিষ্কার ছবি এঁকে নিতেও পেরেছি।

জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে—১৩ তারিখ নাগাদ আমি নিজে কলকাতা গিয়ে জনগণের মন বুঝতে চাই। কলকাতায় কংগ্রেস-মিটিং না হবার যে ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে, তা ভেঙে আমি জনসভায় ভাষণ দিতে চাই। ইতিমধ্যে আমরা কয়েকজন লোক পাঠাচ্ছি, যারা পরিস্থিতির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আমাদের অবহিত করবে।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং বসছে ১৬ই জুলাই। আলোচ্য বিষয়গুলির মধ্যে কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতিই সব থেকে প্রাধান্য পাবে বেশি। কলকাতার অবস্থা যাই হোক না কেন, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তার প্রতিক্রিয়া হয়েছে সাংঘাতিক। পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসে যে বিশৃঙ্খলা চলছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, এবং আমাদের অধিকাংশ দুর্ঘটনার জন্য দায়ীই এই বিশৃঙ্খলা। এই সবই আমাদের ভেবে দেখতে হবে। প্রকৃতপক্ষে কলকাতার পরিস্থিতির

মোকাবিলা করতে হবে যতো তাড়াতাড়ি পারা যায়। কী ভাবে এটা করা হবে তা আমি বলতে পারি না। কিন্তু তা বলে যে ভাবে চলছে সে ভাবে চলতে দেওয়াও যায় না।

আমি তোমাকে মদনের কথা লিখেছি। ভিয়েনার তরুণ ভারতীয় ডাক্তার মদন। আমি তাকে বলেছি, তোমার সঙ্গে বার্নে গিয়ে দেখা করতে। সে লিখেছে, যাতায়াতের জন্য প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা সে জোগাড় করতে পারছে না। আমাদের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী সম্ভবত এ ব্যাপারে তাকে সাহায্য করতে পারবেন।

তোমার

জওহরলাল নেহেরু

ডাঃ রায় ২৩শে জুন রওনা হয়ে যাবার পরে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির জরুরী বৈঠক বসেছিল। তাঁর এই ইয়োরোপে যাত্রা নিয়ে একটা মজার কাহিনী আমার মনে পড়ছে। ডাঃ রায় জ্যোতিষে বিশ্বাস করতেন। একটা কোষ্ঠীও তিনি তৈরি করিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর রওনা হবার দুদিন আগে সন্ধ্যাবেলা তাঁর এক বন্ধু বুক কোম্পানির গিরীন মিত্র একজন ময়লা কাপড়জামা পরা কালো মতন বামুনকে সঙ্গে করে এসে হাজির। ডাঃ রায় তখন মহাকরণ থেকে তাঁর নিচের তলাকার শীততাপনিয়ন্ত্রিত কক্ষেই বসে বিশ্রাম করছিলেন। শ্রীমিত্র লোকটিকে আমার কাছে নিয়ে এসে বললেন, এ কে জানেন? ওড়িষ্যা-বাসী একজন হস্তরেখাবিদ অর্থাৎ জ্যোতিষী। দারুণ ভবিষ্যৎ বলতে পারে। ডাঃ রায় যাচ্ছেন অসুখ সারাতে বিদেশে, তাই আমি বলেছি, মশাই যাবার আগে একবার হাতখানা দেখিয়ে যান। রাজী হয়েছেন তিনি। তাই আমি একে নিয়ে এসেছি একেবারে সঙ্গে করে।

তাহলে যান ভিতরে।

ভিতরে বেশ কিছুক্ষণ ধরে কথাবার্তা হবার পর ওঁরা দুজন বাইরে এলেন। মিত্র আমাকে বললেন, লোকটি কী বলেছে ডাঃ রায়কে জানেন? যেদিন উনি রওনা হতে চান সেদিন রওনা হতে পারবেন না—যাওয়া দুদিন পিছিয়ে যাবে। আরও কী বলছে জানেন? চোখের অপারেশন এখন হবে না।

বলছেন কী!—আমি সবিস্ময়ে বলে উঠলাম,—প্যাসেজ বুক করা হয়ে গেছে, বি-ও-এ-সির প্লেন ছাড়ার সময় ও তারিখ ঠিক হয়ে গেছে, এখন কি সব বানচাল হয়ে যেতে পারে? ও সব বুজরুকি।

কিন্তু আশ্চর্য ঘটনা, কোম্পানীর এজেন্ট আমাদের ফোন করে জানালো ভারতের বাইরেই প্লেনের কোনো যান্ত্রিক গোলযোগ ঘটায় প্লেন ঠিক সময়ে আসতে পারছে না, এবং সেজন্য ছাড়তেও পারছে না।

জ্যোতিষীর ছুটি ভবিষ্যৎ-বাণীই খেটে গিয়েছিল। চোখ অপারেশনের উপযোগী হয় নি বলে অপারেশন না করিয়েই ডাঃ রায় ফিরেছিলেন ইয়োরোপ থেকে, আর তাঁর প্লেনও এখান থেকে ছেড়েছিল ঠিক ছুটি দিন পরে। এই ঘটনার পর থেকে ঐ ছেঁড়া জামাকাপড় পরা জ্যোতিষীটিকে প্রায়ই আসতে দেখতাম ডাঃ রায়ের কাছে। আর তিনি তাকে খুব সমাদরেই ডেকে-ডুকে কাছে বসাতেন। সব থেকে অবাক্ হবার মতো, যে ভবিষ্যৎ-বাণী জ্যোতিষীটি করেছিল, সেটি তাঁর আয়ু সম্পর্কে। তাঁর মৃত্যুর পর আমরা মিলিয়ে দেখেছিলাম কাঁটায় কাঁটায় তা সত্যি। তাঁর কোষ্ঠীতে ১৯৬২-র ১লা জুলাই-এর পর আর কোনো ঘর কাটা ছিল না।

যাই হোক, ডাঃ রায় রওনা হতে পেরেছিলেন ২৩শে জুন তারিখে এ কথা আগেই বলেছি। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে পাশ্চাত্ত্যে তিনি আরও কয়েকবার গেছেন, কিন্তু এটিই ছিল সেদিক থেকে তাঁর প্রথম যাত্রা। তাঁর যায়গায় নলিনীরঞ্জন সরকারকে তিনি অস্থায়ী মুখ্যমন্ত্রী করে গিয়েছিলেন। নলিনীবাবু কংগ্রেসী হলেও স্বতন্ত্র। অর্থাৎ প্রফুল্ল সেনের পিছনে যেমন কংগ্রেস সংগঠনের পৃষ্ঠ-পোষকতা ছিল, সেই রকম কিছু তাঁর ছিল না। প্রফুল্লবাবু হুগলি, বর্ধমান ও মেদিনীপুর কংগ্রেস গ্রুপের তখন নেতা ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি সমগ্রভাবে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের প্রবক্তা হিসাবে নিজেকে তেমন জাহিরও করেন নি, মন্ত্রী হিসাবেও ছিলেন নতুন। সে জন্য তাঁকে মন্ত্রিসভার পক্ষ থেকে কংগ্রেসের ঐ ১৩ই জুলাই-এর জরুরী বৈঠকে যোগ দেবার জন্য দিল্লী থেকে ডেকে পাঠানো হলো। প্রধানমন্ত্রী এবং কংগ্রেস সভাপতি দুজনেই ডাঃ রায়কে ঐ মিটিং-এ যোগ দেবার জন্য তার পাঠালেন। পণ্ডিত নেহেরু তখন কলকাতায়। তাঁর তারবার্তা হলো এই: দুদিন ধরে এখানে আছি। শুক্রবার সকালে দিল্লী ফিরবে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং বসছে ১৬ই তারিখ থেকে। মুখ্যমন্ত্রীদের বৈঠক ২০ তারিখ থেকে। অনেক জরুরী সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আলোচনার জন্য তোমার উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। জানলাম, তোমার অপারেশন হচ্ছে না, সে জন্য তোমাকে ভারতে

(দিল্লীতে) আসতে অনুরোধ জানাচ্ছি। দরকার হলে পরে ইয়োরোপে ফিরে যেও।

এর উত্তরে ডাঃ রায় ১৬ই জুলাই একটি দীর্ঘ তারবার্তা পাঠালেন পণ্ডিতজীকে। তাতে ছিল ওয়ার্কিং কমিটি ও মুখ্যমন্ত্রীদের মিটিং যা কাল থেকে শুরু হবে, তাতে যোগ দেবার বিষয়ে তুমি যে তারবার্তা পাঠিয়েছো, তা আজ পেলাম। জুরিখের ডাক্তার অপারেশনের বিরুদ্ধে মত দিয়েছেন, চশমার কাঁচ বদলাতে বলেছেন, কিন্তু তাতে এখনো পর্যন্ত কোনো ফল ফলে নি। আরেকজন বলেছেন, চিকিৎসা চালিয়ে যেতে এবং পাঁচ সপ্তাহ পরে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। এখানে একজন বিশেষজ্ঞকে দেখাচ্ছি প্যারিসে এবং ভিয়েনাতে। আমার বাঁ চোখটা ইতিমধ্যেই অকেজো হয়ে গেছে, ডান চোখটা ভালো আছে, কিন্তু তার আরও ক্ষতি হোক এটা আমি চাই না। নলিনী সরকারকে আমার পুরোপুরি নির্দেশ দেওয়া আছে। তিনি মুখ্যমন্ত্রীদের বৈঠকে থাকবেন। আর যদি চাও, তিনি ওয়াকিং কমিটির বৈঠকেও উপস্থিত থাকতে পারবেন। সেইভাবে আমি তাঁকে নির্দেশও পাঠাচ্ছি। ডাক্তাররা যতদিন না তাদের শেষ সিদ্ধান্ত জানাচ্ছে, ততদিন ভারতে ফিরে যাওয়া অসম্ভব বলে দুঃখিত।

মুখ্যমন্ত্রী নলিনীরঞ্জন সরকারকে প্যারিস থেকে তার করলেন ১৬ই জুলাই তারিখে—নেহেরুকে তার করেছি। এখন ফিরে যাওয়া অসম্ভব। যদি ওরা চায়, ওয়াকিং কমিটির মিটিংয়ে যোগ দিও। মুখ্যমন্ত্রী-সম্মেলনে আলোচনা করবে। কেন্দ্রের খাদ্য বণ্টনের উন্নতির জন্য এবং কলকাতার বাইরে ভারত সরকার যাতে ভরতুকি দিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার ব্যবস্থা করে, তার জন্য চাপ দেবে। বাংলার খাদ্য রেশনিং-এর বিষয়ে তোমাকে নোট পাঠাচ্ছি। দয়া করে পরিসংখ্যান সংগ্রহ করে রাখবে, কাটজু ও অন্যান্যদের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা। রবিবার ১৭ তারিখ কিংবা সোমবার ১৮ তারিখে রোমের গ্র্যাণ্ড হোটেলে ফোন করবে।

ঐ দিন ডাঃ রায় তাঁর তারবার্তাকে আরও একটু বিশদ করে চিঠি লিখলেন প্রধানমন্ত্রীকে। কলকাতায় না ফিরে ইয়োরোপে চিকিৎসা চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্তে যে তিনি অটল রইলেন, এই-ই ছিল ঐ চিঠির মূল কথা। বাহুল্য বোধে সেটি আর এখানে উদ্ধৃত করা হলো না।

২৮শে জুলাই দিল্লীতে ওয়ার্কিং কমিটি প্রস্তাব পাশ করলেন এই মর্মে যে, পশ্চিমবঙ্গে ছমাসের মধ্যে সাধারণ নির্বাচন করতে হবে, নতুন অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিসভা গঠন করতে হবে এবং প্রাদেশিক কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতিকে পুনর্গঠিত করতে হবে। মন্ত্রিসভাকে ঢেলে সাজানোর ব্যাপারটা কংগ্রেস সংসদীয় পার্টির নেতা যতদিন না দেশে ফিরে আসছেন, ততদিন স্থগিত রাখতে হবে।

ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব পাশ হয়ে যাবার পর প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীকে সুইজারল্যাণ্ডে নিম্নলিখিত চিঠিখানা পাঠিয়েছিলেন :—

নতুন দিল্লী, ২রা আগষ্ট ১৯৪৯

প্রিয় বিধান,

প্যারিস থেকে পাঠানো তোমার ২৪শে জুলাই-এর চিঠির জন্য ধন্যবাদ। পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে ওয়ার্কিং কমিটি যে প্রস্তাব পাশ করেছেন, আমি আন্দাজ করছি তুমি তা দেখে থাকবে। প্রস্তাবগুলো কেন নেওয়া হলো, সে প্রসঙ্গের মধ্যে আমি যাবো না, তবে এইটুকু বলবো, ও বিষয়ে আমরা যে আমাদের সব থেকে আগ্রহান্বিত চিন্তাকে যোগ করতে পেরেছিলাম এতে কোনো ভুল নেই।

নলিনীবাবু আমাকে বলেছিলেন, তুমি তিন সপ্তাহের মধ্যে, অর্থাৎ আগষ্টের তৃতীয় সপ্তাহে সম্ভবতঃ ফিরে আসবে। আশা করি ফেরার পথে কলকাতা যাবার মুখে তুমি দিল্লীতে আসবে। তাহলে তুমি কলকাতা পৌছবার আগেই আমরা পরস্পরের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎটা করে নিতে পারবো। আর এর ফলে তোমার পক্ষে কলকাতায় পৌছে আবার এখানে চলে আসার ঝঞ্ঝাট সম্ভবত পোয়াতে হবে না।

বল্লভভাই প্যাটেলের শরীর ভালো যাচ্ছে না। দেরাদুনে দুই কিংবা তিন মাস থাকবার পর কয়েক দিন আগে তিনি এখানে ফিরে এসেছেন বটে, কিন্তু তাঁর স্বাস্থ্য ভালো যাচ্ছে না।

তোমার স্নেহের

জওহরলাল নেহেরু

কংগ্রেসের মধ্যে দুটি প্রধান উপ-দল ছিল। একটি দল ডাঃ রায়ের বদলে ডঃ পি-সি ঘোষকে সংসদীয় পার্টির নেতা করার জন্য চাপ দিচ্ছিল। আর মন্ত্রি-মণ্ডলীর যাঁরা সমর্থক তাঁরা চাইছিলেন, ইয়োরোপ থেকে ডাঃ রায় ফিরে

আসা পর্যন্ত মন্ত্রিসভা যাতে পুনর্গঠিত না হয়। বলা বাহুল্য, শেষোক্ত দলই জিতে গিয়েছিল। আমি নিজে একটা তারবার্তা পেলাম মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে। তিনি ২রা সেপ্টেম্বর বোম্বে এসে পৌছোচ্ছেন। আমাকে বলছেন সেখানে গিয়ে তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে। সেইমতো আমি বোম্বে চলে গেলাম। তাঁর প্লেনটা এলো বিকাল বেলা। যে কোনো জায়গায় জনতার মধ্য থেকে ডাঃ রায়কে দূর থেকে চিনে নিতে কষ্ট হয় না। সাধারণ ভারতীয়দের তুলনায় তাঁর দীর্ঘ দেহই তাঁকে এই বিশিষ্টতা দান করেছে। সাত সপ্তাহের ঝটিকা সফর সত্ত্বেও তাঁর স্বাস্থ্য ভালো হয়েছিল। মুখে তাঁর উজ্জ্বল হাসি। আমার হাতে তাঁর ছোট্ট এ্যাটাচি কেস্‌টা ফেলে দিয়ে আমাকে নিয়ে অপেক্ষমান গাড়ির দিকে এগুতে লাগলেন। গাড়িতে উঠে ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলেন সোজা বিড়লা ভবনে যেতে। এখানে তখন ছিলেন বল্লভভাই প্যাটেল। অসুস্থ। হৃদ্‌যন্ত্রের আক্রমণ। গাড়িতে যেতে যেতে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, নেহেরু যে কলকাতায় তিন দিন ছিলেন জুলাইয়ের দ্বিতীয় সপ্তাহে, কারা তাঁর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেছিল বলতে পারো?

যা জানি তা বললাম। তাঁর অনুপস্থিতিতে যা-যা ঘটেছিল তার যতটুকু জানতাম সব বললাম। গাড়ি বিড়লা ভবনে পৌছলে মাধোপ্রসাদ বিড়লা এগিয়ে এসে তাঁকে স্বাগত জানালেন, নিয়ে গেলেন অসুস্থ বল্লভভাইয়ের কাছে। বিমানবন্দর থেকে সোজা তাঁর বন্ধু বল্লভভাই প্যাটেলের বিছানার পাশে চলে আসার মধ্যে কারণ ছিল দুটি। একটা হচ্ছে, ডাক্তার হিসাবে তাঁকে দেখা, দ্বিতীয়টি হচ্ছে, মন্ত্রিসভার টানাপোড়েন সম্পর্কে তাঁর মনোভাব বুঝে নেওয়া এবং তাঁর সমর্থন পাওয়া। এই সমর্থন অবশ্য তিনি পেয়েছিলেন পুরোমাত্রায়। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীত্বের জন্য কোনো এক প্রতিপক্ষের দাবি সম্পর্কে প্যাটেলজী এক সময় বলেছিলেন,—ডাঃ রায় হচ্ছেন সিংহ, আর যারা তার পিছনে লাগছে তারা তুলনায় ইঁদুর ছাড়া আর কিছু নয়।

কথাটা আমি আমার দিল্লীর সাংবাদিক বন্ধু চারু সরকারের কাছ থেকে শুনেছিলাম।

পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভা তাঁদের প্রতিনিধি হিসাবে প্রফুল্লচন্দ্র সেনকে বোম্বে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, যাতে তিনি ডাঃ রায়ের অনুপস্থিতি-কালের গোটা পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁকে মোটামুটি ওয়াকিবহাল করতে পারেন, কিন্তু

তাঁর বোম্বে আসার আরও একটা কারণ ছিল। মন্ত্রিসভা আশঙ্কা করেছিলেন, প্রদেশের ব্যাপার নিয়ে কংগ্রেস হাই কম্যাণ্ড যেভাবে জল ঘোলা করেছিলেন, তাতে বিরক্ত হয়ে ডাঃ রায় তাঁর পদত্যাগের কথা ঘোষণা করে ফেলতে পারেন। এই ধরনের কোনো সিদ্ধান্ত ডাঃ রায় নিলে তিনি যাতে বাধা দিতে পারেন, প্রফুল্লসেনের বোম্বে আসার সেটাও একটা মস্ত কারণ।

সত্যি কথা বলতে কি, বাইরে কম্যুনিষ্ট এবং দলের ভিতরে কংগ্রেসের একটি শক্তিশালী শাখা,—এই দুই প্রতিপক্ষ যখন তাঁকে দুদিক থেকে চেপে ধরেছে; তার ওপরে যখন কেন্দ্রীয় নেতারাও বাংলার শোচনীয় পরিস্থিতির বিষয় তেমন করে বুঝতে চাইছেন না, তখন ঐ বোম্বেতেই তিনি একটি পদত্যাগপত্র লিখে তৈরি করে তাঁর পকেটে রেখে দিয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ লক্ষ লোকের ভাগ্যই বলতে হবে, এ নিয়ে তিনি আর পীড়াপীড়ি করেন নি। পাঠকদের অবগতির জন্য পদত্যাগ পত্রটির বয়ান এখানে তুলে দিচ্ছি :

১৯৪৮ সালের ২০শে জানুয়ারি গান্ধীজি তাঁর অনশনের অব্যবহিত পরেই আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বাংলার মন্ত্রিসভার নেতৃত্ব গ্রহণ করতে বললেন, কারণ জনগণ আমাকেই চাইছিল। আমি তাঁর আদেশ শিরোধার্য করলাম, কারণ আমার কাছে তিনিই সমগ্র কংগ্রেসের মতাদর্শের প্রতিভূ। আজকে যাঁরা এই বিরাট সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব করছেন, তাঁরা মনে করছেন, বাংলায় একটি পুনর্গঠিত অন্তবর্তী মন্ত্রিসভার দরকার; দরকার শীগ্‌গিরই বাংলায় একটি নির্বাচনপর্ব অনুষ্ঠিত করা। আমার কর্তব্য হচ্ছে নির্দ্বিধায় তাঁদের সে নির্দেশ মেনে নেওয়া। গত যে ১৮ মাস আমি বাংলার সেবা করবার সুযোগ পেয়েছি তাতে আমার যতদূর সাধ্য তা আমি করেছি, হয়ত বাংলার জনগণকে তাঁদের সঙ্গত দাবি অনুযায়ী কাপড়, খাদ্য বা অন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যোগাবার ব্যবস্থা করতে পারি নি, কিন্তু এটুকু দাবি করবো যে, আমি চেষ্টা করেছি প্রাণপণ এবং বহু অসুবিধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছি। এই সব কর্মব্যস্ত দিনে আমার বিবেক এবং আমার কর্তব্যজ্ঞানই আমাকে চালিত করেছে। আর এখন আমি আমার পুর্বতন জীবিকা অর্থাৎ ডাক্তারীতেই ফিরে যাচ্ছি এই চেতনা নিয়ে যে, কোনো কিছু করবার চেষ্টা না করা থেকে চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়াও ভালো। আমার বিশ্বাস, আমার পশ্চিমবঙ্গের জন্য আমি উন্নয়ন

পরিকল্পনার ভিত্তি স্থাপনা করে যেতে পেরেছি। এখন যিনি আমার যায়গায় আসবেন, তাঁর পথ শুভ হোক এই কামনাই করি। সরকারের সকল কর্মচারী, আমার মন্ত্রিসভার ও বিধানসভার সহকর্মিগণ যেন পুর্ণোদ্যমে কাজ করে যেতে পারেন এই প্রার্থনা।

আমার নিজের ধারণা, এই সংকটে নতুন কোনো অন্তবর্তী মন্ত্রিসভা বাংলার খুব কাজে আসবে না। কিন্তু তবু কেন্দ্রীয় কর্তাব্যক্তিরা যখন চাইছেন তখন আমি আর তার অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবো না। আমার কাজ হচ্ছে সরাসরি পদত্যাগ করা, যাতে আমার থেকে যোগ্যতর ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া যায়।

নেহেরু ১১ই জুলাই কলকাতায় এসে যে তিনটি দিন ছিলেন সে সময় বহু ধরনের লোকের সঙ্গে তাঁর দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছিল। তার মধ্যে ছিলেন কংগ্রেসী, ছিলেন প্রশাসনের মাথারা, ছিলেন বুদ্ধিজীবীরা। প্রাদেশিক দুই উপ-দলের মধ্যে সমঝোতা আনা ছিল তাঁর কলকাতায় আসার উদ্দেশ্য। আর উদ্দেশ্য ছিল বর্তমান মন্ত্রিসভা জনপ্রিয়তা হারিয়েছে কেন তার কারণগুলো খুঁজে বার করা, যার জন্য দক্ষিণ কলকাতার উপনির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয় ঘটেছিল। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির অস্থায়ী সভাপতি অরুণচন্দ্র গুহ, অমরকৃষ্ণ ঘোষ ও আরও অনেককে নিয়ে তখন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। এই গ্রুপ্‌টাই ছিল তখন পার্টি সংগঠনে সব থেকে প্রভাবশীল। এঁদের মত ছিল, খাঁটি কংগ্রেসীদের নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠিত হোক। ডাঃ রায়ের মন্ত্রিসভায় সেটি ছিল না বলে তাঁদের অভিমত। একটি স্মারকলিপির আকারে তাঁরা যা পেশ করেছিলেন তার প্রধান অভিযোগ ছিল এই যে, মন্ত্রিসভা দক্ষ নয় এবং প্রশাসনিক পৃষ্ঠপোষকতায় সংগঠনের স্তরের নৈতিক মান তাঁরা অনেক নিচে নামিয়ে দিয়েছেন।

অভিযোগের এখানেই শেষ নয়, প্রধানমন্ত্রীর দিল্লী যাবার আগে কংগ্রেসের অনৈক বিক্ষুব্ধ সভ্য জে.সি. গুপ্ত তাঁর হাতে একটা লিখিত অভিযোগ-নামা তুলে দিয়েছিলেন। এতে ছিল মোট ১৭টি উদাহরণের উল্লেখ যার ফলে নাকি বর্তমান মন্ত্রিসভা অখ্যাতি অর্জন করেছে। অফিসের ফাইলপত্র প্রভৃতির ভিত্তিতে যাতে তদন্ত করা হয় সেই মর্মে প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী এই অভিযোগ-নামার একটি কপি অস্থায়ী মুখ্যমন্ত্রী

নলিনীরঞ্জন সরকারের কাছে দিয়ে অনুরূপ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর বলেছিলেন, কোনো উত্তর দেবার বা মন্তব্য করার থাকলে তা যেন তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ডাঃ রায়ের অনুপস্থিতিতে শ্রীসরকারই তদন্ত করালেন। তদন্ত করিয়ে সংশ্লিষ্ট অফিসারদের নোট্‌সহ অভিযোগের উত্তর ও মন্তব্য প্রভৃতি যথারীতি প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এরই উল্লেখ দেখা যায় ডাঃ রায়কে লেখা তার ১২ই সেপ্টেম্বরের চিঠিতে।

নয়াদিল্লী

১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯

প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী,

ঐ সব অভিযোগ রটনার উত্তরে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ একটি নোট্ আমাকে পাঠিয়েছিলেন অস্থায়ী মুখ্যমন্ত্রী। সে সম্পর্কে আমিও তাঁকে একটি নোট পাঠিয়েছিলাম। তাতে আমি বলেছিলাম, ১২টি অভিযোগের মধ্যে বিশেষ কিছু নেই কিন্তু বাকি ৫টি সম্পর্কে ঘটনা যা দেখছি তাতে মনে হয়েছে, হয় ভুল পন্থা অবলম্বন করা হয়েছিল আর নয়ত আরও তদন্ত করা প্রয়োজন।

এখন আপনি যখন ফিরে এসেছেন, তখন এই পাঁচটি অভিযোগ সম্পর্কে যদি বাড়তি কোনো তথ্য আপনার কাছে থেকে থাকে তাহলে তা আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। এ বিষয়ে আপনার নোট্-এর একটি কপি করুন। (এটি করা হয়েছিল—লেখক।) ঠিক এই উদ্দেশ্যে দলের পুর্ণ বৈঠক করা হোক বা না হোক আপনার উত্তরটা সব সভ্যদের জানিয়ে দিন, এই হচ্ছে আমার পরামর্শ, কারণ অভিযোগগুলি ও সে সম্পর্কে আমার মন্তব্য ইতিমধ্যেই প্রচারিত হয়ে গেছে।

আপনার বিশ্বস্ত

জওহরলাল নেহেরু

এই চিঠির যথাযথ উত্তর মুখ্যমন্ত্রী পাঠিয়েছিলেন ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে। তাতে ঐ পাঁচটি অভিযোগ সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য ছিল। তার উত্তরও দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। বাহুল্যবোধে সেটি আর এখানে উদ্ধৃত করা হলো না। তাতে লিখেছিলেন, আপনি যা তথ্য দিয়েছেন তাতে ব্যাপারটা আরও ভালো করে বুঝতে সুবিধা হলো এবং গত প্রতিবেদনে যে ফাঁক ছিল, তা-ও ব্যাখ্যাত হলো।

কিন্তু তার সামান্য আগের ঘটনা একটু বলা দরকার। পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ এবং তার উত্তর প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য সহ আমাদের অস্থায়ী মুখ্যমন্ত্রী কাগজে দিয়েছিলেন প্রকাশ করতে। সারা দেশের খবরের কাগজগুলিতে তা ছাপাও হয়েছিল ফলাও করে। বোম্বের কাগজগুলি যে ভাবে তাদের পৃষ্ঠা ভরিয়েছিল এই বিষয় নিয়ে, তাতে মন্ত্রিসভা বিরক্ত বোধ করেছিলেন বলা যায়। ডাঃ রায় তাঁর বোম্বের মেরিন ড্রাইভের বাসায় সাংবাদিকদের সঙ্গে এক বৈঠকে এই সব অভিযোগ সম্পর্কে বক্রোক্তি করেই বলেছিলেন, যিনি এই সব অভিযোগ বা রটনার হোতা তিনি যে মাত্র ১৭টি অভিযোগেই ক্ষান্ত হয়েছিলেন এ জন্য আমি কৃতজ্ঞ। পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভার বিভিন্ন-মুখী কর্মোদ্যোগের জন্য আরও বেশী রটনা বা অভিযোগ আসা উচিত ছিল, কারণ কাজ যারা করে তাদেরই বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় ওঠে, যারা মৃত, মরণোন্মুখ বা নিদ্রিত তাদেরই কাজকর্ম নেই এবং সে জন্য সমালোচনাও নেই এবং এই সব পরিকল্পের প্রত্যেকটি পরিকল্প উন্নয়ন ঘটাবে পশ্চিমবঙ্গের তথা সমগ্র দেশের।

বোম্বে থেকে তিনি কলকাতায় এসে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নিলেন যথারীতি। ১০ই সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস অ্যাসেম্বলী পার্টি এক বৈঠকে ডাঃ রায়ের নেতৃত্বের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করলেন ৩৪-১৪ ভোটে এবং সঙ্গে সঙ্গে দলের কার্যকরী সমিতিকে অনুরোধ জানালেন, যাতে তারা তাঁদের অন্তবর্তী মন্ত্রিপরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করেন। কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতিও অক্টোবরের চার ও পাঁচ তারিখে দিল্লীতে সভা করে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভা সম্পর্কে তাঁদের পূর্বগৃহীত প্রস্তাব থেকে সরে দাঁড়ালেন। ২১ জন সভ্যসম্বলিত কমিটির সেই সভায় ডাঃ রায় এক ঘণ্টা ধরে অতি বিশদভাবে সবাইকে পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি এবং এই পরিস্থিতিতে মন্ত্রিসভার পরিবর্তন ঘটানোর বিপদ যে কতটা গভীর, বিশেষ করে সাধারণ নির্বাচনে সিদ্ধান্ত নেবার পরে, তা বুঝিয়ে বলেছিলেন এবং শ্রোতাদের প্রত্যয় উৎপাদনেও সফল হয়েছিলেন।

যা-ই হোক, শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হলো ডাঃ রায়ের মন্ত্রিসভা কাজ চালিয়ে যেতে থাকবে—যত দিন না তিনি নিজে তাঁর মন্ত্রিসভার কিছু রদবদল করতে চান। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিও যা ছিল তা-ই থাকবে—যতক্ষণ পর্যন্ত না নির্বাচন

হচ্ছে। এইভাবে মন্ত্রিপক্ষ লাভ করলেন তাঁদের স্বপক্ষে—অন্যদিকে সুরেন্দ্রমোহন ঘোষের নেতৃত্বে দলের সংগঠনের মধ্যেকার বিরোধী গ্রুপও তখনকার মতো তাঁদের স্থিতাবস্থা বজায় রাখলেন। পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ নির্বাচনের সিদ্ধান্ত অবশ্য বহাল রইলো।

এবার মুখ্যমন্ত্রীর কথা বলি। ইয়োরোপে তিনি হল্যাণ্ডের এক সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। তাঁরা বিশেষজ্ঞের একটি দল পাঠাবেন বঙ্গোপ-সাগরের গভীর জলে মাছ ধরার ব্যবস্থা কী করা যায় তার সমীক্ষা করবার জন্য। সেই অনুসারে তাঁরা কিন্তু এসেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কয়েকটা ট্রলার বা মাছ ধরার উপযোগী সমুদ্রগামী লঞ্চও জোগাড় করেছিলেন। কিছুদিন পরে এই ধরনের মাছ ধরার ব্যবস্থাও চালু হয়েছিল। পাতাল রেল তৈরি করবার জন্য একটি ফরাসী সংস্থার কাছ থেকে একটি পুরো পরিকল্প বা স্কীমও তিনি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। সেইমতো বিশেষজ্ঞরা এসে মাটি পরীক্ষা করে কলকাতার পাতাল রেলের জন্য দশ খণ্ডের একটি ব্লু-প্রিণ্ট বা খসড়াও পেশ করে গিয়েছিলেন। কলকাতার পরিবহণ সমস্যার সমাধানে তেইশ বৎসর আগে তাঁর এই আগ্রহান্বিত প্রয়াস অনেকের কাছে বাড়াবাড়ি মনে হয়েছিল, বিশেষ করে তাঁর রাজনৈতিক বিরুদ্ধবাদীরা একে অবাস্তব বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর তেইশ বছর আগেকার প্রয়াস আজ বাস্তবায়িত হতে চলেছে। রাশিয়া থেকে বিশেষজ্ঞরা এসে কাজ করে গেছেন। এবং সেইমতো পাতাল রেলের কাজও আজ মোটামুটি সুরু হয়ে গেছে। শুধু এই-ই নয়, আরও আছে। কোপেনহেগেনে তিনি খোঁজ নিয়েছিলেন, সিমেণ্ট কনক্রী-টের বাড়ির কাঠামো কিভাবে করা যায় যা উদ্বাস্তু এবং সাধারণ নগরবাসীদের জন্য যথাসম্ভব সস্তায় গড়ে তোলা যেতে পারে।

১৬ লক্ষ উদ্বাস্তুদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের বিপুল ব্যয় নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যখন হিমসিম খাচ্ছিলেন, যখন মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে এই বাবদ টাকা চেয়ে চেয়ে হদ্দ হচ্ছিলেন, ধর্ণা দিচ্ছিলেন প্রধানমন্ত্রী থেকে ত্রাণ ও পুনর্বাসন সংশ্লিষ্ট সমস্ত মন্ত্রিদপ্তর পর্যন্ত, তখন তিনি লক্ষ্য করলেন, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের জন্য যা করা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে তা করা হচ্ছে না এবং পশ্চিমবঙ্গের ত্রাণ ব্যবস্থা সেজন্য ভেঙে পড়বার মুখে। ডাঃ রায় আর সামলাতে পারলেন না। নিদারুণ ক্ষোভ আর উত্তেজনায় তিনি

প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখলেন। তাতে তিনি রাজ্যের শোচনীয় আর্থিক অবস্থার কথাও জানাতে ভুললেন না, আর এই চিঠির একখানা কপি তিনি পাঠিয়ে দিলেন উপ-প্রধানমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে। ১লা ডিসেম্বরের এই চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন :

প্রিয় জওহর,

তোমার চিঠি। এতে যে উপসংহার টানা হয়েছে বা তার জন্য যে যুক্তি দেখানো হয়েছে তা আমার মনে একেবারেই দাগ কাটলো না বলে আমি দুঃখিত। তোমার ধারণা, তোমার সরকার ত্রাণ ও পুনর্বাসন বাবদে আমাদের বেশ মোটা টাকা দিয়েছে। কিন্তু তুমি কি জানো এই বাবদ মোট অনুদান যা তোমার সরকারের কাছ থেকে পাওয়া গেছে দুই বছরে ১৯৪৮-৪৯ এবং ১৯৪৯-৫০ সালে, তা হচ্ছে তিন কোটির সামান্য কিছু বেশি, আর বাকি প্রায় পাঁচ কোটি দেওয়া হয়েছে ঋণ হিসাবে? পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তদের জন্য যা খরচ করা হয়েছে তার তুলনায় এই টাকটা যে নগণ্য তা কি তুমি জানো? আমি তুলনা করতে চাই না, কারণ তুলনা করার ব্যাপারটা সব সময়ই বিদ্বেষ সৃষ্টিতে সহায়ক হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এ কথা আমি বলতে চাই যে, ষোলো লক্ষ উদ্বাস্তর পক্ষে এই অনুদান অতি সামান্য। এই অঙ্ক দুই বছরে জড়িয়ে হিসাব করলে দাঁড়ায় মাথা পিছু প্রায় কুড়ি টাকা। একে কি তুমি মোটা টাকা বলবে?

আমার পরবর্তী বক্তব্য হচ্ছে ত্রাণ পুনর্বাসন বাবদ অনুদানের ব্যাপারে কোনো রকমের টাকা চাই নি। যা আমি বলেছি তা হচ্ছে, ১৯৪৯-৫০ সালের জন্য আমাদের ঘোষিত প্রতিশ্রুতি ও ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হয়েছে চার কোটি পঁচাত্তর লক্ষ টাকা। এর একটা অংশ-প্রায় এক পূর্ণ তিনের চার কোটি অনুদান হিসাবে ব্যয় করা হবে আর তিন কোটি দেওয়া হবে ঋণ হিসাবে। তিন কোটি টাকার ঋণদানের সময়সীমা আমি বাড়িয়ে দিতে রাজি হয়েছিলাম, যার ফলে এক পূর্ণ একের দুই কোটি টাকা অনুদান ও দুই পূর্ণ দুই কোটি টাকা ঋণ হিসাবে এই বছর অর্থাৎ ১৯৪৯-৫০ সালে দিতে পারব বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে পারি। আমি তোমাদের সবাইকে অনুরোধ করেছিলাম এক কোটি টাকা অনুদান অথবা দু বছরের মধ্যে পরিশোধিতব্য ঋণ হিসাবে দিলে কলকাতা থেকে ছাত্রদের ভীড় অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া যাবে। এতে করে ভবিষ্যতের অনেক গোলমাল থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। ছাত্রদের অত্যধিক ভীড় কলকাতার

পক্ষে মারাত্মক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই প্রচণ্ড ভীড়ের ফলস্বরূপ উদ্ভূত কোনো বৃহৎ ঘটনার অর্থ হচ্ছে খাদ্যাভাব প্রভৃতির জন্য জীবন-হানি এবং পুলিশ ও মিলিটারি ব্যবস্থা করার জন্য অতিরিক্ত খরচ। যে সব ছাত্রদের জন্য ঋণটা আমরা চেয়েছিলাম তার বেশির ভাগই হচ্ছে উদ্বাস্তু ছাত্র এবং সমস্ত ব্যাপারটাই প্রদেশের পুনর্বাসন ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছু নয়।

যা আমি একাধিকবার বলেছি তা আমি আর একবার বলি। বাংলা যখন ভাগ হয়ে গেছে তখন পশ্চিমবঙ্গ শুরু হয়েছিল দুই পূর্ণ একের দুই কোটি টাকার ঘাটতি নিয়ে এবং এখনো তা পুরিয়ে দেওয়া হয় নি। এই দিক দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের দিক থেকে আমরা ভাল ব্যবহার পাই নি। আয়কর ও পাটের মাশুলের দরুন আমাদের প্রাপ্য অংশ আমরা পাই নি। আয়করের দরুন আমাদের প্রাপ্য অংশ তাঁরা অন্য প্রদেশগুলিকে ভাগ করে দিয়েছেন, আর পাটের মাশুলের অংশ তাঁরা নিজেরাই হস্তগত করে বসে আছেন। আগে-ভাগে আমাদের না জানিয়ে ১৯৪৮-এর মার্চে তাঁরা আমাদের কাছে এক ফতোয়া পাঠালেন যে আয়করের দরুন আমাদের প্রাপ্য অংশকে শতকরা কুড়ি থেকে কমিয়ে বারো করা হলো। ভাষান্তরে এই খাতে আমাদের প্রাপ্য বাৎসরিক ছয় কোটি টাকাকে কমিয়ে সাড়ে তিন কোটি করা হলো। বাকি দুই পূর্ণ একের দুই কোটি অন্য প্রদেশের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হলো। নতুন ব্যবস্থা যে কি রকম বৈষম্যমূলক হয়েছে তা তোমাকে দেখাচ্ছি। ২১ মিলিয়ন (দু কোটি দশ লক্ষ) লোকসংখ্যা নিয়ে বম্বে পেয়েছে শতকরা কুড়ি থেকে বেড়ে একুশ শতাংশ' আর সেখানে ঐ লোকসংখ্যা কিংবা বোধহয় আরও একটু বেশি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের অংশ কমে গেল শতকরা কুড়ি থেকে শতকরা বারোতে। আয়কর আদায়ে পশ্চিমবঙ্গ ও বম্বের দান কিন্তু প্রায় সমান সমান ছিল। এর কারণ দেখানো হয়েছে, বাংলাদেশের আয়কর আদায়ভুক্ত সীমানা গেছে ছোট হয়ে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা তা নয়। বাংলার যে অংশ নিয়ে পূর্ববঙ্গ গঠিত হয়েছে সে অংশ অবিভক্ত বাংলার মোট আয়করের মাত্র পাঁচ শতাংশ আদায় দিতো। কলকাতা ও শিল্পাঞ্চলই আয়করের সব থেকে বেশি অংশ দিতো এবং দেশবিভাগের পর ঐ অংশ পশ্চিমবঙ্গেরই থেকে গেছে আর সে জন্য দেশবিভাগের পরে প্রকৃতপক্ষে যা ছিল তাই রয়ে গেছে। সে জন্য আয়কর বণ্টনের ঐ নতুন ব্যবস্থা যে কোন্ যুক্তি বা নীতিতে করা হলো তা আমি বুঝতে

পারলাম না। এর ফলে আমাদের অর্থসঙ্গতি ভীষণভাবে ঘা খেয়েছে। সংকীর্ণ মনোভাব নিয়ে কথাটা বলছি না, অবস্থা গতিকেই কথাটা বলতে হচ্ছে।

এইভাবে ভাঙাচোরা অর্থসঙ্গতি নিয়ে আমরা যখন হিমসিম খাচ্ছি, তখন আবার সীমান্ত পাহারা দেবার জন্য নতুন সীমান্ত পুলিশের আমদানী করতে হলো, আমাদের প্রদেশের পক্ষে এ এক বিরাট বাড়তি বোঝা। সীমান্ত এলাকায় যাতায়াতের জন্য রাস্তাঘাট করে দিতে হয়েছে যার জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম না এবং এগুলো সাধারণ প্রশাসনের দিক থেকে প্রয়োজনীয় ছিল না। সীমান্ত এবং সীমান্তের যে সব এলাকা দিয়ে নিষিদ্ধ ও বে-আইনী জিনিসপত্রের আদান-প্রদান সম্ভব সেগুলি রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা আমাদেরই করতে হয়েছে। এই দুটি বিষয় নিশ্চয়ই পুরোপুরি সমগ্র ভারতবর্ষের স্বার্থের মধ্যে পড়ে, কিন্তু বার বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও এই বিষয়ে কেন্দ্র থেকে আমরা কোনো আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা পাই নি।

তারপরে এলো পনেরো লক্ষ মানুষ। এরা উচ্চ ও মধ্যবিত্ত হিন্দু পরিবারের লোক। বুভুক্ষু একদল সর্বহারা মানুষ, নতুন জায়গায় কিছু খুঁটে খাবার আশাটুকু পর্যন্ত তাদের বিলুপ্ত। মাসের পর মাস ধরে ভারত পুর্ব পাকিস্তানের উদ্বাস্তু সমস্যার অস্তিত্ব পর্যন্ত স্বীকার করতে চায় নি, আর সে জন্য নিজের ঘাড়ে কোনো দায় দায়িত্ব নিতে চায় নি। প্রাদেশিক সরকার তাদের সাধ্যমতো যতদূর করবার করেছে। এই সব উদ্বাস্তুদের জন্য দুই বছরে কেন্দ্র যা ব্যয় করেছে সে হচ্ছে মাথা পিছু কুড়ি টাকার মতো সুবৃহৎ অনুদান।

আমি নিজে শিল্প ও অন্যান্য সংগঠনমূলক পরিকল্প রচনার জন্য দায়ী বলে কেন্দ্রকে যে সাংঘাতিক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে সেটা আমি ভালোভাবেই বুঝি, কিন্তু এ-ও জানি এবং বিশ্বাস করি যে, এই সব অসুবিধার জন্য কেন্দ্রের দোমনা নীতিই দায়ী। কেন্দ্রের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগগুলি একযোগে টিম বা গোষ্ঠী হিসাবে কাজ করে না। তুমি যে বলে থাকো, প্রদেশগুলির অসুবিধা থেকে কেন্দ্রের অসুবিধাগুলি আরও বেশি, সে বিষয়ে আমরা একমত হতে পারলাম না। আমি অবশ্য তীব্র সমালোচনায় নামতে চাই না, কারণ অপরের সমালোচনা করবো অথচ তাদের কাজের দায়িত্ব নেবো না—এটা কোনো বাস্তবসম্মত কথা নয়।

এই প্রসঙ্গে আমি আবারও চাপ দিচ্ছি। ছাত্রদের ভীড় কমানোর ব্যাপারে এই পরিকল্প আমি পেশ করেছি প্রদেশের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে। যদি তোমরা এই ঋণটা দিতে রাজী না হও, তাহলে আমাদের এই ঋণটা জোগাড় করবার অনুমতি দাও, আমরা তাতেই খুশি হবো। সময় থাকতেই তোমাকে বিপদ সংকেত জানিয়ে রাখলাম।

তোমার বিশ্বস্ত
বিধান

প্রধানমন্ত্রী এর উত্তরে লিখলেন (২রা ডিসেম্বর ১৯৪৯) :

প্রিয় বিধান,

তোমার ১লা ডিসেম্বরের চিঠির জন্য ধন্যবাদ। তুমি ঠিক মতোই ধরিয়ে দিয়েছো যে অনুদান না বলে ঋণ কথাটাই আমার ব্যবহার করা উচিত ছিল।

পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যারা এসেছে, তাদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্য কতো খরচ হয়েছে আমি জানি না। সম্ভবত তুমি ঠিকই বলেছো, পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের তুলনায় ওদের জন্য হয়ত অনেক বেশিই খরচ করা হয়েছে। খরচের এই ব্যবধানটা ইচ্ছে করে নিশ্চয়ই করা হয় নি, হয়েছে কতকগুলি জরুরী বিষয়ের জন্য। প্রায় পাঁচ লক্ষ লোক পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ভারতে এসে পড়েছিল দেশ ভাগ হবার আগেই। আমরা তাদের জন্য সাহায্যই দেই নি। তারপরে এলো বন্যার মতো পঞ্চাশ থেকে ষাট লক্ষ মানুষ মোটামুটি দুই মাসের মধ্যে। এ ব্যাপারে কিছু প্ররোচনা ছিল এবং আমাদের সে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয়েছিল। পুর্ব পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু একসঙ্গে অতো আসে নি, এবং এসেও ছিল ধাপে ধাপে পর্যায়ক্রমে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্রকৃতপক্ষে সমস্ত হিন্দু আর শিখই বিতাড়িত হয়েছিল। পুর্ব পাকিস্তানে বেশ বড়ো একটা জনসংখ্যা রয়ে গিয়েছিল এবং তোমাদের ও আমাদের নীতিই ছিল এমন কিছু না করা, যাতে ওখান থেকে সমস্ত সংখ্যালঘুই চলে আসে। এ ব্যাপারটা ঠেলে দিতো অপরিসীম কষ্ট ও সমস্যার মধ্যে, যার মোকাবিলা করা যে কোনো সরকারের পক্ষেই প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াতো।

আরও একটি প্রশ্ন জাগে, সে প্রশ্নটি হলো, এই সব উদ্বাস্তুদের ত্রাণ-পুনর্বাসনের জন্য পশ্চিমবঙ্গে যে ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা হয়েছে সে সম্পর্কে

অনুদান অথবা ঋণ হিসাবে প্রকৃত যে পরিমাণ টাকা তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছিল তা পুনর্বাসনের জন্য এখনো পুরোপুরি ব্যয় করা হয় নি।

আয়কর এবং পাটশুল্কবাবদ অর্থবণ্টন সম্পর্কে আমি এখানে কোনো বিতর্কের মধ্যে যেতে চাই না, এই বিষয়টা, তুমি জানো, বহুবার বিবেচনা করে দেখা হয়েছে। তাছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের অপারগতা নিয়ে তর্ক করে কোনো ফল হবে বলে মনে হয় না। কেন্দ্রীয় অথবা প্রাদেশিক সরকার দুই ক্ষেত্রেই আমাদের সফলতা ও ব্যর্থতা কতখানি তা নিয়ে আমাদের সকলেরই নিজস্ব মতামত আছে। সেজন্য পরস্পরকে দোষারোপ করে কোনো লাভ নেই। ওয়ার্কিং কমিটির দৃঢ় ধারণা এই যে পশ্চিমবঙ্গের সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে বিশেষ মনস্তাত্বিক পন্থায় এবং সেভাবে কতগুলি সুপারিশও তাঁরা করেছিলেন। সে সব প্রস্তাবের অনেকগুলিই এখন পর্যন্ত কার্যকরী করা হয় নি।

আমি তোমার চিঠির কপি আমার এখানকার সহকর্মীদের কাছে পাঠাচ্ছি তাঁদের মতামত জানবার জন্য।

তোমার প্রীতিমুগ্ধ

জওহরলাল নেহেরু

এই বিষয়ে সর্দার প্যাটেল একটি কড়া চিঠি লিখেছিলেন। চিঠির তারিখ ৬ই ডিসেম্বর ১৯৪৯:

প্রিয় বিধান,

তোমার ১লা ডিসেম্বর (১৯৪৯)-এর চিঠিখানা আমি দেখলাম। তুমি যেভাবে প্রধানমন্ত্রীকে লিখেছো তাতে আমি দুঃখ পেয়েছি। এটা যদি ব্যক্তিগত কোনো চিঠি হতো কিংবা তুমি তাকে কথা প্রসঙ্গে কিছু বলছো এমন কোনো ঘটনা হতো, তাহলে বলার কিছু ছিল না, বয়োজ্যেষ্ঠ হিসাবে তুমি তা করতে পারো। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর কাছে যেখানে তুমি সরকারী চিঠি লিখছো সেখানে তাঁর পদমর্যাদা ও তোমার নিজের পদমর্যাদার কথা তুমি মনে রাখবে এটাই আমার আশা ছিল। যদি তুমি তোমার বক্তব্য জোরালো করেই পেশ করতে চাও তো সেক্ষেত্রেও আমার বক্তব্য, বিশ্বাসে অটল থেকেও শোভনতা বজায় রাখা সম্ভব।

তুমি যে প্রস্তাব দিয়েছো তার গুণাগুণ নিয়ে আমি কোনো মন্তব্য করবো না। আমি শুধু এই কথাই বলবো, তুমি যেভাবে জিনিসটাকে দেখেছো, সেটা

হচ্ছে শুধু এক দিক থেকে দেখা এবং এক দিক থেকে দেখাই বিচার করে দেখার একমাত্র পথ নয়—কেন্দ্র যেভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে তুমি কিছু কড়া কথা বলেছো। তুমি নিজে যে নীতির কথা বলে থাকো 'অর্থাৎ কঠোর সমালোচক আমি হতে চাই না, কারণ তাদের কাজের দায়িত্ব নেবো না, অথচ সমালোচনা করবো এটা কোনো বাস্তবসম্মত কথা নয়,'—এই নীতিতেই তুমি অবিচল থাকলে ভালো হতো। পরস্পরকে দোষারোপ করার খেলায় আমরা যে সব সময় হেরে যাবার দলে থেকে যাবো এমন কথা নিশ্চয় করে বলতে পারি না, যদিও এই খেলা আমার কাছে অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণ, আর আমি অন্যদের উদাহরণ তুলে ধরতে চাইও না।

তোমার বিশ্বস্ত

ভি, প্যাটেল

দিল্লীতে তাঁর চিঠি যে সমাদর পায় নি, এ খবর পেয়ে ডাঃ রায় প্রধানমন্ত্রী ও উপ-প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছিলেন। এই চিঠি দুটি পড়বার মতো মনে হওয়ায় এই সঙ্গে প্রকাশ করা গেল। দুটি চিঠিরই তারিখ ৮ই ডিসেম্বর ১৯৪৯ সাল।

প্রিয় জওহর,

কয়েক ব্যক্তি আমায় জানিয়েছেন সেদিন ঐ চিঠিলেখাটা আমার পক্ষে অনুচিত হয়েছে। যদি কোনো ভুল বলে থাকি তাহলে আমি আন্তরিক দুঃখিত, কিন্তু এ কথাও ঠিক, আমি ভেবেছিলাম দুটি বিষয় আমি জোর দিয়ে বলবো—এক, কেন্দ্রেই হোক আর প্রদেশেই হোক সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে খুব বেশি মিলমিশ নেই। দ্বিতীয়ত, কেন্দ্র ও প্রদেশগুলির মধ্যে সমস্বার্থের ব্যাপারে বেশি সহযোগিতা এবং সমন্বয় নেই। ১লা ডিসেম্বর লিখিত তোমার পাক্ষিক চিঠির ২৫ সংখ্যক প্যারাগ্রাফে প্রশ্নটির এই দিকের কথাই তুমি তুলেছো। আর আমিও চিঠির মাধ্যমে যে ভাষা প্রকাশ করেছি তার উন্নতিসাধন করতে পারছি না, কারণ, যত দিন পর্যন্ত আমার দায়িত্ব আছে বলে মনে করবো ততদিন আমার প্রদেশের জন্য লড়াই করে যাবো। কিন্তু তা বলে সে লড়াই এমন হবে না যে তাতে আমার সৌজন্যের অভাব প্রকাশ পায় বা যাদের সঙ্গে লড়াই করছি তাদের সঙ্গে আমার সদ্ভাবের অভাব আছে বলে মনে হয়। আমি জানি আমি যাই লিখি না কেন, তাতে তুমি আমাকে ভুল বুঝবে না। আমি

রাজনীতিক নই, আমি কূটনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে লিখিও না, আমি লিখি যা আমি অনুভব করি।

আমি এই সঙ্গে তোমাকে এবং মন্ত্রিসভার সদস্যদের ধন্যবাদ জানাই, তোমরা শেষ পর্যন্ত ১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে কোচবিহারকে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করতে রাজী হয়েছো বলে। যার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি সেটা শুধু এই প্রদেশের পরিবৃদ্ধিই নয়, এটা একটা মনস্তাত্ত্বিক সংঘটনও বটে। এই প্রদেশের মানুষদের প্রতি খুবই যে সমবেদনামূলক দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ পেয়েছে এটা আমি বুঝতে পারছি। এই বিষয়ে বাংলার মানুষ যথেষ্ট অধীরও হয়ে পড়েছিল।

এই বাস্তবসম্মত কাজ করার জন্য আমি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে খুবই কৃতজ্ঞ। আমি জানি, আমি নিশ্চিত যে বঙ্গপ্রদেশের মানুষ এই সিদ্ধান্তকে অবশ্যই স্বাগত জানাবে।

তোমার প্রীতিভাজন
বি. সি. রায়

প্রিয় বল্লভভাই,

ত্রাণ ও পুনর্বাসন নিয়ে আমি পণ্ডিত জওহরলালকে যে চিঠি লিখেছি সে চিঠি লেখা আমার উচিত হয় নি বলে তুমি মনে করেছো—এই খবরটা আমার কানে এসেছে। হয়ত আমার লেখাটা একটু কড়া হয়ে গেছে, কিন্তু যতখানি কড়া ঠিক ততখানি আন্তরিক ও অকপট। আমি এটা দেখেও সন্তোষ লাভ করেছি যে পণ্ডিত জওহরলাল তাঁর লিখিত ও প্রচারিত পাক্ষিক পত্রে স্বীকার করেছেন যে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা নেই এবং সব মিলিয়ে ছক বেঁধে কাজ করার পদ্ধতির অভাব আছে। আসলে, এই দুটি ব্যাপারই আমি দিয়েছিলাম আমার চিঠিতে। কিন্তু সে যাই হোক, আমি তাঁকে আজ যে চিঠি লিখলাম, তার একটি কপি পাঠালাম তোমার কাছে। আমার চিঠি-খানার সমাদর সম্পর্কে আমি দিল্লী থেকে যে খবর পেয়েছিলাম সে সম্পর্কে আমার প্রতিক্রিয়া কী, তা তুমি এই থেকে জানতে পারবে।

কোচবিহারকে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করার যে পদক্ষেপ তোমরা নিয়েছিলে, সেজন্য তোমাদের ধন্যবাদ জানাতে চাই বলেই এই চিঠি আজ লিখছি। আমি বিষয়টা আমার মন্ত্রিসভার সামনে উপস্থাপিত করেছিলাম। আর তাঁদের অনুমতি নিয়েই তোমাকে জানাচ্ছি যে মিঃ মেননের চিঠিতে যে সব বিলি-

ব্যবস্থার কথা লেখা আছে তা সবই মেনে নিতে তাঁরা রাজী। আমি মিঃ মেননকেও চিঠি লিখছি। তোমাদের এই কাজের জন্য আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই এই জন্য যে, অন্য সব কথা ছেড়ে দিলেও এর যে একটা মনস্তাত্ত্বিক ফলশ্রুতি আছে, তা আমি অস্বীকার করতে পারি না। এই প্রদেশের জন্য যা তোমরা করলে, তা বাংলার মানুষ অনুভব করবে বলেই আমার আশা ও বিশ্বাস, কিম্বা যা আমি বলতে পারছি না, তার থেকেও বেশি তারা অনুভব করবে।

তোমার বিশ্বস্ত
বিধান

এবার আমরা অন্য প্রসঙ্গে আসি। নিজের রাজ্যে অর্থনৈতিক ভিত্তি স্থাপন করার জন্য ইয়োরোপের বড়ো বড়ো শহরে গিয়ে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করার যে নজির সৃষ্টি করেছিলেন সেদিন ডাঃ রায়, তা কোনো মুখ্যমন্ত্রী করেছিলেন বলে আমার জানা নেই। এদিক থেকে ডাঃ রায় ও নেহেরুর মধ্যে মিল ছিল। দুজনকেই তড়িঘড়ি আর অধৈর্যের প্রতিমূর্তি বলে মনে হতো, কারণ দুজনেই বিগত দুই শতাব্দীর গ্লানি তাঁদের জীবিতকালে এক বা দুই দশকের মধ্যে কাটিয়ে উঠতে চাইতেন। নেহেরুর অবশ্য তাঁর পার্টি ও সরকারী যন্ত্রের ওপর পুরোপুরি একাধিপত্য ছিল। কিন্তু ডাঃ রায়কে তার জন্য কঠোর সংগ্রাম করতে হয়েছিল। ১৯৫২-র নির্বাচনে কংগ্রেস যখন একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে তাঁর নেতৃত্বে বেরিয়ে আসতে পেরেছিল, তখন থেকে নিজের প্রদেশে তাঁর একাধিপত্য আমৃত্যু বজায় ছিল। নেহেরু এক সময় তাঁকে ঠাট্টা করে বলেছিলেন, বিধান, তোমার সম্পর্কে যা আমি সব থেকে হিংসা করি সে হচ্ছে তোমার হাইট বা উচ্চতা।

যাই হোক পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ নির্বাচন করার জন্য দিল্লী আর কলকাতা, দু তরফেরই খুবই মাথাব্যথা দেখা দিয়েছিল। ডাঃ রায় ও তাঁর সহকর্মীরা মনে করতেন তার উপযুক্ত সময় তখনো আসে নি। নেহেরু তাঁর তিন দিনের কলকাতা সফরে যে ধারণা করে গিয়েছিলেন, তার ফলে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছিল যতটা মনস্তাত্ত্বিক, ততটা রাজনৈতিক নয়। আর পরিস্থিতি সম্পর্কে ডাঃ রায় যে ধারণা করেছিলেন, তার ফলশ্রুতি ছিল যতটা অর্থনৈতিক

ততটা রাজনৈতিক নয়। ডাঃ রায় ইয়োরোপ থেকে ঘুরে আসার পর দুই নেতার মধ্যে প্রচুর চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হয়েছিল। এর মধ্যে সব থেকে চিত্তাকর্ষক চিঠি দুখানির কপি এখানে প্রকাশ করলাম, এর থেকে তাঁদের মনোভঙ্গী এই সব প্রশ্নে কী ছিল সেদিন, সে সম্পর্কে একটা আন্দাজ পাওয়া যাবে।

নয়া দিল্লী

২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৪৯

প্রিয় বিধান,

কয়েকদিন আগে তোমার ১৭ই ডিসেম্বরের চিঠিখানা পেয়েছি। এতে যে সব প্রসঙ্গ তুমি তুলেছো, তা যথেষ্ট গুরুত্বপুর্ণ। আমি সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করেছি এবং ভেবেও দেখেছি বিস্তর। কলকাতায় যখন গিয়েছিলাম তখন আমার এই ধারণা হয়েছিল যে, কলকাতা ও বাংলার পরিস্থিতির মোকাবিলা করার আসল রাস্তা ততটা রাজনৈতিক নয় যতটা মনস্তাত্ত্বিক। অবশ্য আমাদের আইন শৃংখলামূলক পরিস্থিতিরও মোকাবিলা করতে হয়েছিল, আর তার সঙ্গে রাজনৈতিক পরিস্থিতিরও। কিন্তু আসল কথা হলো, জনগণের মনে প্রচণ্ড বিক্ষোভ ছিল, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক দুই সরকারের বিরুদ্ধেই অসন্তোষ ছিল প্রচুর, আর ছিল নিদারুণ সংশয়ের ভাব। কলকাতায় আমি সব কিছু তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করেছি। আর ফিরে এসেছি এই বিশ্বাস নিয়ে যে, এই সংশয় ও অসন্তোষের নিদারুণ অবস্থাকে কাটিয়ে উঠতে হলে কিছু একটা নিশ্চয়ই করা দরকার। আমি কলকাতার জনগণের সঙ্গে সম্পূর্ণ খোলাখুলি কথা বলেছি, আমার প্রতিক্রিয়ার কথাও তাদের বুঝিয়ে বলেছি। ফিরে এসে ওয়ার্কিং কমিটির কাছে আমি নিম্নলিখিত দুটি কাজের কথা সুপারিশ করেছিলাম :

(১) ছয় মাসের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভায় নির্বাচন। এবং

(২) মন্ত্রিসভা ও বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেসে কতগুলি রাজনৈতিক পরিবর্তন।

আমরা জানি গত আড়াই বছর কি তারও কিছু বেশি কাল বঙ্গদেশকে গভীর সংকটের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে, বিশেষ করে বঙ্গবিভাগ ও তার ফলাফলের জন্যই তার দুর্ভোগ হয়েছে বেশি। একদিক থেকে দেখতে গেলে

বঙ্গদেশ অন্য কয়েকটি বিষয়ের মতো এ বিষয়েও সমগ্রভাবে ভারতবর্ষের ব্যাধির লক্ষণযুক্ত, বাংলার এই লক্ষণ আমাদের সাবধান করে সঠিক পথে চলতে নির্দেশ দিচ্ছে, আর সমস্যার গভীর কারণগুলিকে আমাদের বুঝে নিতে বলছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে একেবারে মূল থেকে, বাইরের কয়েকটি অভিব্যক্তি মাত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করে নয়। এর মূল বিবিধ, আর তা হাতড়ে পাওয়া সহজও নয়। এর একটা দিক আমি মাত্র ছুঁতে পেরেছিলাম, যখন বলেছিলাম নির্বাচন করার কথা।

যত দিন যাচ্ছে ততই আমার এই ধারণা হচ্ছে যে, এই দেশের জন্য যদি সুষ্ঠুভাবে কিছু করতে হয় তো সেটা শুধু সরকারী ব্যবস্থাপনায় হবে না, যদি না তার সঙ্গে জনসাধারণের পূর্ণ সহযোগিতা থাকে। জনসাধারণের জন্য কাজ করাই যথেষ্ট নয়। একমাত্র উপায় হচ্ছে জনসাধারণের সঙ্গে কাজ করা, এগিয়ে যাওয়া এবং কাজটা যে তাদের নিজেদের এই বোধ তাদের মধ্যে সঞ্চার করা। সারা ভারত জুড়ে আমাদর মধ্যে প্রবণতা দেখা দিয়েছে যত পারা যায় তত বেশি করে সরকারীভাবে কাজ করবো, আর, সেই অনুপাতে যত কম পারা যায় জনসাধারণের সঙ্গে মিশে কাজ করবো। এমন কি কংগ্রেসও জনসাধারণের সঙ্গে কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে। তাদের সব থেকে বেশি ঝোঁক হচ্ছে কী করে দলবাজী করে কিছু ক্ষমতা বাগাবো, নির্বাচনে জিতবো আর আসন বজায় রাখবো। পুরোনো আদর্শ এবং জনসাধারণের সঙ্গে তাদের নিবিড় সংযোগ, এটা বহুলাংশেই চলে গেছে। সেজন্য জনগণ যদি অন্য পথ খোঁজে, আর তা না পায়,—তাহলে তারা যে হতাশ হয়ে সরকারের ওপর দোষ চাপাবে, এতে আর অবাক হবার কী আছে? যদি আমরা জাতীয় কাজকর্মে জনগণকে কাজে লাগাবার পন্থা খুঁজে না পাই এবং সেই ধারায় সরকারী কাজকর্ম না চালনা করতে পারি, তাহলে পরিস্থিতি ক্রমাগত খারাপ হতে থাকবে। জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা ও সমর্থন না পেলে কোনো পরিমাণ সরকারী উদ্যোগই আমাদের এগিয়ে দেবে না, তা সে উদ্যোগের মধ্যে জনগণের উপকারার্থে পরিকল্পনা, পরিকল্প যতই থাক না কেন।

তোমার বিশ্বস্ত

জওহরলাল নেহেরু

কলকাতা

৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৪৯

প্রিয় জওহরলাল,

খুবই মনোযোগ দিয়ে তোমার চিঠি পড়লাম। সত্যি কথা বলতে কী তুমি গত জুলাইতে কলকাতা আসবার আগেও, আমার ২০শে জুনের চিঠির উত্তরে তোমার ২৩শে জুন ১৯৪৯-এর চিঠি, যা আমি ইয়োরোপ থেকে ফিরে আসার পর পেয়েছিলাম, তাতেও তুমি বাংলায় নির্বাচন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলে। প্রকাশ করেছিলে এই কারণে যে বাংলার যা পরিস্থিতি তাতে নির্বাচন না করে পারা যায় না বলে তোমার মনে হয়েছিল। তুমি অনুভব করেছিলে বলে আমি ধরে নিচ্ছি, দক্ষিণ কলকাতার পুনর্নির্বাচনে শরৎ বসুর সাফল্য এই নির্দেশই করছে যে, জনগণ কংগ্রেসের ওপর আস্থা হারিয়েছে, নির্বাচনের ফলাফল সেই দৃষ্টান্তই সামনে তুলে ধরছে। অপরপক্ষে, এ-ও নিশ্চয়ই তোমার ধারণা হয়েছে যে, কংগ্রেস-বিরোধী প্রচার যখন সজোরে চলছে, তখন তাকে ঠেকাবার জন্য কংগ্রেস পক্ষ থেকে কিছুই করা হয় নি। সম্ভবত তোমার মনে হয়েছে যে, অনুরূপ পরিস্থিতিতে নির্বাচনী প্রচার চালালে সেটা কংগ্রেসীদের একত্র সমাবেশের একটি সুযোগ সৃষ্টি করতো, আর সেইসঙ্গে ভারতের যুগপৎ প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির সম্যক চিত্রও তুলে ধরা যেতো জনসাধারণের কাছে। এটা একটা পরীক্ষা, যা দিয়ে তুমি জানতে চেয়েছিলে কংগ্রেসের ওপর জনগণের আস্থা এখনো আছে কিনা। তোমার মনে থাকতে পারে, রোম থেকে আমি তোমাকে একটি চিঠি দিয়েছিলাম। তাতে বলেছিলাম, বাস্তবে নয়, কল্পনায় এটা ধারণা করা যায় যে, নির্বাচন করাই যুক্তিযুক্ত, যেহেতু বিধানসভার বর্তমান সদস্যরা ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্টের আগে নির্বাচিত হয়েছেন, সেই হেতু ১৯৪৯-এর জুলাইয়ে জনসাধারণের মানসিক অভিব্যক্তি তাঁদের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে না বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

আমি এও শুনেছি যে কিছু লোক যারা কলকাতায় তোমার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন, তাঁরা, কী প্রাদেশিক, কী কেন্দ্রীয় উভয় সরকারের উপরই প্রচণ্ড অখুশি, যা থেকে বোঝা যায় তাদের মধ্যে নিদারুণ হতাশার ভাব বিরাজ করেছে। সম্ভবত তুমি তখন বুঝতে পারো নি, আসল গণ্ডগোলটা মোটেই রাজনৈতিক নয়, এমন কি তাদের হতাশার কারণ বিধানসভার সদস্য

বা মন্ত্রিসভায় তাঁদের আস্থা নেই বলে নয়, আসল কারণটা হচ্ছে পুরোপুরি অর্থনৈতিক। বহুবার আগে তোমাকে লিখেছি, আসল সংকট যা বাংলার মানুষকে পীড়িত করছে তা হলো :

(ক) খাদ্যের অভাব

(খ) চাকরির অভাব

(গ) জমির অভাব, যে জমিতে তারা, বিশেষ করে উদ্বাস্তুরা পুনর্বাসন-লাভ করতে পারে। এইসব সমস্যা, সাধারণ নির্বাচন এবং নতুন এক দল বিধানসভার সদস্য বা মন্ত্রী নিযুক্ত করে দূর করা সম্ভবত যায় না।

তোমার বিশ্বস্ত

বিধান

॥ ৬ ॥

॥ ১৯৫০ সাল ॥

পশ্চিমবঙ্গের তমসাচ্ছন্ন দিগন্তে একটু আলোর রেখা দেখা দিলো। সেটা হচ্ছে কোচবিহার সামন্তরাজ্যের পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে সংযুক্তি। নতুন বছরের প্রারম্ভেই এটা হলো। ছিন্নবিছিন্ন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ, লোকসংখ্যার ঘনবসতি দেশের মধ্যে সব থেকে যেখানে বেশি, সেখানে এই ঘটনা যে জনগণের মনে আশা ও উদ্দীপনার সঞ্চার করবে, এ কথা বলাই বাহুল্য। ক্রমাগত উদ্বাস্তু সমাগম পরিস্থিতিকে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট ঘোরালো করে তুলেছিল।

একটা ভাড়া-করা উড়োজাহাজে আমরা সপ্তাহখানেক আগে দার্জিলিং গিয়ে হাজির হয়েছিলাম। দার্জিলিং-এ বড়দিন কাটানোর জন্য মুখ্যমন্ত্রী গভর্নমেণ্ট হাউসে অবস্থান করছিলেন। ডাঃ রায় ঠাণ্ডা পছন্দ করতেন, তাঁর অফিস ও বাড়ি, দুজায়গাতেই শীততাপনিয়ন্ত্রক যন্ত্র বা এয়ার কণ্ডিশনার থাকতো, সারা বছর এক বিশেষ আবহাওয়ার মধ্যে তিনি থাকতে ভালোবাসতেন। তাঁর এই প্রায়-শীতে-জমে যাওয়া ঠাণ্ডা ঘরে অবস্থান করার কথা তাঁর বন্ধু বা সহকর্মীরা মাঝে মাঝে একটু আধটু উল্লেখ করতেন। নলিনী সরকার ও কিরণশঙ্কর রায় ভালো করে চাদর মুড়ে বা কোটের বোতাম ভালো করে এঁটে তারপরে তাঁর ঘরে ঢুকতেন। তাঁদের অবস্থা দেখে কখনো কখনো ডাঃ রায় আমাদের বলতেন, ওহে, যন্ত্রটার চাবি টিপে ঘরটা একটু গরম করে দাও দেখি।

তাঁর শক্তি ও কর্মক্ষমতার উৎসই ছিল এই নিয়ন্ত্রিত উত্তাপে শোবার ঘর বা অফিস-ঘরে থাকা। এক-একদিন রাত্রে যখন আমরা যুবকরা হিমালয়ের দুরন্ত ঠাণ্ডার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য দরবার-হলের 'ফায়ার প্লেস'-এর আগুনের চারিদিকে জড়ো হয়েছি, তখন আটষট্টি বছরের ডাঃ রায়কে দেখেছি খোলা বারান্দায় সিল্কের সার্ট আর একটা পুল-ওভার গায় দিয়ে পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন। তাঁর অমন অটুট স্বাস্থ্যের আর একটা গূঢ় কারণ হচ্ছে, তিনি সকালে ও রাত্রে নিয়মিত স্নান করতেন, এমন কি গরম কালে সময় পেলে আরও একবার স্নান করতেন মধ্যাহ্নভোজনের আগে। তাঁর ঠাণ্ডা সহ্য করার ক্ষমতা অনেকের কাছেই অদ্ভুত মনে হতো।

১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারি ডাঃ রায় তাঁর চীফ সেক্রেটারি ও ডিভিশনাল কমিশনারকে নিয়ে কোচবিহারে চলে গেলেন প্লেনে করে, সর্দার প্যাটেলের দূত নানজাপ্পার কাছ থেকে সংযুক্তির দলিলনামা গ্রহণ ও সংযুক্তি-উপলক্ষে আয়োজিত জনসভায় সভাপতিত্ব করবার জন্য। এই সভাতেই তিনি ঘোষণা করলেন, কোচবিহার একটি স্বতন্ত্র জেলা হিসাবে পরিগণিত হবে, এর সদর থাকবে কোচবিহার সহরেই। জনসংখ্যার অনুপাতে বিধান সভায় জনপ্রতিনিধিত্ব থাকবে, স্টেটের সমস্ত কর্মচারীদেরই পশ্চিমবঙ্গের সরকারী চাকরীর অন্তর্গত করে নেওয়া হবে। কোচবিহারের এই স্বেচ্ছামূলক সংযুক্তির অর্থ হচ্ছে পশ্চিম বঙ্গের আরও ১৯১৮ বর্গমাইল ভূমি ও আট লক্ষ জনসংখ্যা লাভ।

জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে ডাঃ রায় কলকাতায় ফিরে গেলে পরে মন্ত্রিসভা ও তাদের সমর্থকরা বছরের শ্রেষ্ঠ খবরটি পেয়ে উল্লসিত হয়ে উঠলেন। ৮ই জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করলেন, ১৯৩৫-এর ভারত সরকার-আইন মোতাবেক সংরক্ষিত ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অন্তর্বর্তী নির্বাচন পশ্চিমবঙ্গে হবে না, হবে সাধারণ নির্বাচন—বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে। প্রধানমন্ত্রী এও বললেন, বাংলার রাজ্যপাল কৈলাসনাথ কাটজু যে রিপোর্ট দিয়েছেন, সেই অনুসারেই পূর্বতন সিদ্ধান্ত এইভাবে উলটে দেওয়া হলো। শ্রীকাটজু জনসাধারণের সর্বশ্রেণীর মতামত নিয়েই অন্তর্বর্তী নির্বাচন স্থগিত রাখার অনুকূলে মত প্রকাশ করেছেন এবং ৮/৯ মাস পরে অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে সাধারণ নির্বাচনের সুপারিশ করেছেন। ডাঃ রায় ও তাঁর মন্ত্রিসভার পক্ষে এ একটা বিজয় ত বটেই!

যে দিন এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করা হয়, সে দিন রবিবার থাকায় ডাঃ রায় তাঁর বাড়িতেই ছিলেন। সকালে নিয়মমাফিক রোগী-টোগী দেখে তিনি নটা নাগাৎ যাদবপুর যক্ষা হাসপাতালে যাবার জন্য রওনা হয়ে গেলেন। অন্য কয়েকটি যায়গাতেও তাঁর যাবার কথা ছিল। তিনি বাড়ি ফিরে এলেন ঠিক দুপুর বারোটায়। খাওয়ার জন্য উপরে না উঠে তিনি নিচের তলায় অফিস ঘরে ঢুকে গেলেন। তার পরক্ষণেই একে একে এলেন পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল ও পুলিশ কমিশনার। তাঁরাও সে ঘরে ঢুকে গেলেন। আমার ডাক পড়লো। ডাঃ রায় আমাকে নোট দিতে লাগলেন, যা থেকে আমি বুঝলাম তাঁর ওপর সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত আক্রমণের ঘটনা ঘটে গেছে। যাদবপুর যক্ষা হাসপাতাল, যার তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা এবং যার প্রাণস্বরূপ ছিলেন কিরণশঙ্কর রায়ের ছোট ভাই ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায়, সেই হাসপাতালের একটা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে ডাঃ রায় যখন ফিরছিলেন, তখন তাঁর গাড়ির ওপর একদল লোক পাথর ছুঁড়ে গাড়ির পাশের আর সামনের জানালার কাঁচ চুরমার করে দিয়েছে। গাড়িতে তাঁর রক্ষী যিনি ছিলেন, তিনি রিভলবার বার করেছিলেন গুলি ছোঁড়বার জন্য। কিন্তু বিপদের সামনে ডাঃ রায়কে অসাধারণ বিচারবুদ্ধির পরিচয় দিতে দেখেছি, যার উদাহরণ আমি পরে আরও দেবো। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে গুলি ছুঁড়তে বারণ করলেন। সৌভাগ্যক্রমে ঐ রিভলবার বার করাতেই কাজ হয়েছিল। রিভলবার দেখেই গুণ্ডার দল পালিয়ে যায়। অবাক হয়ে ডাঃ রায় মন্তব্য করেছিলেন, কোথায় তলিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ! এই কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত ঘটনা দিয়ে সরকারের নীতি কোনমতেই বদ্‌লানো যাবে না।

যতদূর জানি, তাঁর প্রাণহানি ঘটানোর চেষ্টা এই-ই প্রথম আর এই-ই শেষ, ষড়যন্ত্র আর মিছিল-সমাবেশ ছিল বহু।

নিষিদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সারির নেতাদের কেউ কেউ, তাঁদের মধ্যে জ্যোতি বসু, মুখ্যমন্ত্রীর ভাইঝি রেণু চক্রবর্তী ও তাঁর স্বামী নিখিল চক্রবর্তী অন্যতম, গা ঢাকা দিয়ে আণ্ডারগ্রাউণ্ড-এ চলে গিয়েছিলেন। গোপন পুলিশী সূত্রে ঐ পার্টির কাজকর্ম আর ভবিষ্যৎ কার্যকলাপের খবর মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে পৌছতো। সেই অনুসারে পার্টির বিবিধ কর্মসূচীর খবর পাওয়া যায়,—ছাত্র, যুবক, শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে জোট বেঁধে তাদের দুটি পর্যায়ে ভাগ করে

ফেলা। তার মধ্যে একটি হচ্ছে ১৪৪ ধারা অমান্য করে মিছিল ও সভা করা, আর এইভাবে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে নেমে পড়া। 'সেল' তৈরি করার গোপন প্রয়াসকে পুলিশী ভাষায় তখন 'ইউ জি ডেন' বলা হতো। এই ডেনগুলির কার্যকলাপ ছিল সাংঘাতিক, বন্দুক আর গুলি-গোলা জোগাড় করা, পুলিশদলের ওপর হামলা করা, আর নানা রকম অন্তর্ঘাতমুলক কাজকর্ম করা। পুলিশ ওদের মধ্যে এজেণ্ট ঢুকিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল, আর এই সূত্রেই ওদের কার্যকলাপের খবর তারা নিয়মিত পেতো।

যাইহোক, মুখ্যমন্ত্রীর আমন্ত্রণে সর্দার প্যাটেল দিল্লী থেকে কলকাতা এলেন ১২ই জানুয়ারি তারিখে। রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা ধারণা করা, আর কংগ্রেসীদের মধ্যে ঐক্যের ভাব এনে দেওয়াই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। কলকাতার আইনবিগর্হিত কাজকর্মের ক্রমাগত রিপোর্ট তাঁর কাছে আসায় তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের কাছে প্রদত্ত তাঁর ভাষণে তিনি এই বলে সবাইকে সতর্ক করে দেন যে, জনগণ যদি এই আইন শৃঙ্খলা-হীনতা সম্পর্কে তাঁদের নিস্পৃহ ভাব ত্যাগ না করেন, তাহলে ব্যবসা-বাণিজ্য এই প্রদেশ ছেড়ে অন্যত্র সরে যাবে। পর দিন ময়দানের পঞ্চাশ হাজার মানুষের বিপুল সমাবেশে বক্তৃতা দিতে উঠে তিনি জনগণকে স্বেচ্ছাচারিতা ও হিংসার এই চ্যালেঞ্জের বিরুদ্ধে নির্ভীকভাবে দাঁড়াতে বলেন।

ভারতের সংবিধান-সভা তিন বছর আগে প্রথম বসেছিল নতুন সংবিধান তৈরি করার জন্য। সেই সংবিধান-সভা ২৪শে জানুয়ারি থেকে আর কার্যকরী রইল না। ২৬শে জানুয়ারি সভা ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের অস্থায়ী পার্লামেণ্টে পরিণত হলো এবং সর্বসম্মতিক্রমে ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলেন ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ। প্রথম সাধারণতন্ত্র-দিবস পশ্চিমবঙ্গেও উদ্‌যাপিত হলো মহাসমারোহে। বেলা সাড়ে দশটায় এক মহতী সমাবেশের মধ্যে নতুন সংবিধান অনুসারে শপথ গ্রহণ করলেন রাজ্যপাল, মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ ও বিধানসভার অধ্যক্ষ। ঐ দিন শহরে কোন হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে নি।

কিন্তু ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহ থেকে পূর্ববঙ্গ থেকে যে উদ্বাস্তু-জনস্রোত আসতে লাগলো, সংখ্যায় তা হলো বৃহত্তম। এই সংখ্যা পূর্বের সমস্ত রেকর্ড ভঙ্গ করলো। খুলনা জেলার নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের ওপর ব্যাপক অত্যাচার হয়েছিল, এবং তার ফলে নরনারী ও শিশুদের এক বিশাল জনতা বনগাঁ সীমান্ত

পার হয়ে ভারতে এসে পড়লো। পাকিস্তান সরকার হিংসাত্মক ঘটনার খবর প্রথম দিকে একেবারে চেপে দিয়েছিল। ডাঃ রায় সাবধান-বাণী উচ্চারণ করলেন, সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী তার প্রত্যুত্তর করলেন। এ সব বাদবিসম্বাদ সত্ত্বেও হিন্দু সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচারের ভয়াবহ কাহিনী চারদিকে আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়লো, ১৩,০০০ উদ্বাস্তু সীমান্তবর্তী নগর বনগাঁয় এসে হাজির হলো। রাজশাহী ও ঢাকাতে দাঙ্গা শুরু হয়ে গেল, কিন্তু সব থেকে ভয়াবহ ঘটনা ঘটলো বরিশালে। রেল স্টেশনে, ষ্টীমার-ঘাটে, আর ঢাকা বিমানবন্দরে অসহায় উদ্বাস্তুর দল আটক পড়ে রইলো। ডাঃ রায় এদের ভারতের আনবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করতে লাগলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশের অপেক্ষায় না থেকে তিনি নিজের দায়িত্বে ১৬ খানি ভাড়া-করা প্লেন ঢাকায় পাঠালেন ঐ আটক মানুষদের নিয়ে আসতে। এয়ার ওয়েজ ইণ্ডিয়া লিমিটেডের তিনি নিজে ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি। সেই হিসাবে ঐ কোম্পানীর কে কে রায়কে টেলিফোন করে বললেন,—যতগুলি সম্ভব প্লেন ঢাকায় পাঠাও, আর যাদের আনবে, তাদের কাছ থেকে ভাড়া চাইবে না।

ও দিকে ট্রেন বা ষ্টীমারে যে সব হিন্দুরা আসছিল, তাদের কোতল করার কাহিনী ছড়িয়ে পড়ছিল, স্থলপথে অথবা জলপথে, উভয় পথেই পূর্ববঙ্গ থেকে বন্দুকধারী রক্ষীর সাহায্য ছাড়া চলে আসা খুবই বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। একদিন সন্ধ্যাবেলা তিনি অফিস থেকে বাড়ি এসে শুনলেন, সীমান্ত থেকে কয়েকটি রেলের বগী এসেছে সম্পূর্ণ খালি, তাতে শুধু শাঁখা-ভাঙা, ছেঁড়া শাড়ী-ধুতি আর জামার অংশ, আর রক্তের দাগ। সঙ্গে সঙ্গে তিনি টেলিফোনে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। আমরা যারা নিচের তলায় ছিলাম, শুনতে পাচ্ছিলাম তাঁর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর। উত্তেজিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রীকে বলছেন,—সংখ্যালঘুদের রক্ষা করা আর আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। মানুষের এই চরম দুর্ভোগের শেষ করতে হলে চাই এখন যুদ্ধ।

বাস্তবিকই তাঁর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গিয়েছিল। আর, এর পরেই কলকাতায় জ্বলেছিল আগুন। হাওড়ার অবস্থাও তথৈবচ। সেখানকার অবস্থা বরং আরও খারাপ। কলকাতা, হাওড়া এবং পশ্চিমবঙ্গের আরও কয়েকটি যায়গায় কারফিউ

জারি করা হলো। হাওড়ার দাঙ্গা থামাতে একজন জবরদস্ত মিলিটারি অফিসার ব্রিগেডিয়ার রন্‌ধাওয়াকে কাজে লাগানো হলো। এক কথায়, পুলিশকে সাহায্য করবার জন্য মিলিটারি নামানো হয়েছিল।

কলকাতায় যখন জোর দাঙ্গা চল্‌ছে, তখন একদিন সন্ধ্যাবেলা অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এ-কে ফজলুল হক্‌ তাঁর বালক-পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে ডাঃ রায়ের বাড়িতে এসে হাজির। আমি তাঁকে ফটক থেকে ভিতরে অফিস-ঘরে নিয়ে এসে বসালাম। ডাঃ রায় তখন অফিস থেকে ফিরে আসেন নি। হক্‌ সাহেব অত্যন্ত ফুর্তিবাজ লোক, কিন্তু তাঁকে তখন অত্যন্ত গম্ভীর আর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখাচ্ছিল। তিনি বললেন, পথে আসতে আসতে দাঙ্গার চেহারা দেখলাম ঘরে আগুন ধরিয়ে দেবার দৃশ্যও চোখে পড়লো। মুসলমান সংখ্যালঘুদের বাঁচানোর জন্য মুখ্যমন্ত্রীর সাহায্য চাইতে এসেছি। আমার ঝাউতল্লার নিজের বাড়িও খুব নিরাপদ নয়।

আমি হক্‌সাহেবকে জানতাম সেই দিন থেকে, যে দিন তিনি অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। বিধানসভায় প্রদত্ত তাঁর বহু বক্তৃতাই আমাকে মাতিয়ে তুলেছিল একদিন।

আমি বিনীতভাবে তাঁকে প্রশ্ন করলাম,—স্যার, দেশ ভাগ করে আপনারা যখন পাকিস্তান করলেন, তখন কি ভাবতে পেরেছিলেন, দুই বাংলার মানুষের জীবনেই এমন দুর্দশার করাল ছায়া নেমে আসবে ?

হক্‌সাহেব উত্তরে নিচুগলায় বললেন,—না এমন যে হবে তা আমি কোন মতেই ভাবতে পারি নি।

যাইহোক, একটু পরেই ফিরে এলেন ডাঃ রায়। দুইজনে রুদ্ধদ্বার-কক্ষে কথাবার্তা বলতে লাগলেন। শেষ হলে ডাঃ রায় আমাকে বললেন,—ওহে, তুমি হক্‌সাহেবের সঙ্গে যাও, বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এসো।

ওঁর গাড়ির পিছন পিছন বন্দুকধারী পাহারাদার সান্ত্রীপরিবৃত গাড়িখানাকেও চলতে বলা হলো। কিন্তু হক্‌সাহেব বিদায় নেবার আগে ডাঃ রায় তাঁকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন,—আপনি এখুনি বরিশাল চলে যান, সেখানে ঘোর দাঙ্গা বেঁধেছে এই কারণে যে, গুজব রটেছে কলকাতার হাঙ্গামায় ফজলুল হক্‌ মারা গেছেন। আমি এখানকার পাগলামি বন্ধ করার সব রকম চেষ্টা করছি, কিন্তু আপনিও আমাকে সাহায্য করুন। আপনি আপনার নিজের দেশ

বরিশালে গেলে লোকে আপনাকে সশরীরে দেখে বুঝতে পারবে যে, আপনি নিরাপদে আছেন এবং বেঁচে আছেন।

বলা বাহুল্য, হক্‌সাহেব রাজী হয়ে খুব শীগ্‌গিরই চলে গিয়েছিলেন বরিশালে। পূর্ববঙ্গ থেকে ১৯৫০-এর এই দ্বিতীয়বারের বিপুল উদ্বাস্তু-জনস্রোত, যার ফলে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ছিল, তা রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক যন্ত্রকে প্রায় ভেঙে ফেলবার উপক্রম করছিল। এত অল্প সময়ের মধ্যে এতো লোক পশ্চিমবঙ্গ নেবার জন্য প্রস্তুত ছিল না। ডাঃ রায়ের পক্ষেও এই চাপ সহ্য করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। কেন্দ্রকে তিনি লিখছিলেন ও টেলিফোনে বলছিলেন,—ও দেশ ছেড়ে যারা চলে আসছে, তাদের জন্য বন্দুকধারী রক্ষীর ব্যবস্থা করার জন্য পাকিস্তানকে বলা হোক, উপদ্রুত অঞ্চলেও উপযুক্ত রক্ষীর ব্যবস্থা করা হোক, হিংসাত্মক কার্যকলাপে যারা লিপ্ত, তাদের গ্রেপ্তার করা হোক, পাকিস্তান সরকারের নেতারা উপদ্রুত এলাকায় ব্যাপকভাবে ঘুরে বেড়িয়ে শান্তি স্থাপনা করুক।

তাঁর কথাতেই হোক আর যে জন্যই হোক, লিয়াকৎ আলি খান পূর্ব-পাকিস্তানে চার দিনের এক ভ্রমণসূচী পালন করেছিলেন। জনসভা করেছিলেন, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখাও করেছিলেন। তিনি বরিশালেও গিয়েছিলেন। লাখুটিয়া ছিল সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা, তিনি সেখানেও গিয়েছিলেন। লাখুটিয়ার জমিদার-পরিবার উপদ্রবের লক্ষ্যস্থল ছিল। মেয়েদের হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে এসে তাদের অপহরণ করা হয়েছিল। (এটা অবশ্য লিয়াকৎ আলি তাঁর একটি ভাষণে অস্বীকার করেছিলেন)। অভিজাত এক হিন্দু জমিদারের স্ত্রী কলকাতায় থাকতেন, কিন্তু ঐ সময় তিনি ওখানে ছিলেন। তিনি একদিন মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে এসে তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলেন। বর্ণনা করলেন তাঁর গ্রাম লাখুটিয়ার হিন্দুদের দুর্দশার কথা।

পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু ছাড়া, এই পশ্চিমবঙ্গেও এ জেলা থেকে ও জেলায় সংখ্যা-লঘু সম্প্রদায়ের লোক চলাচল শুরু হয়ে গিয়েছিল। যার ফলে এই প্রদেশে ভিতরে-বাইরে দুদিক থেকেই উদ্বাস্তুর চাপ সামলাতে হচ্ছিল। একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করেছিলাম, যখনই বড়োরকমের কোনো সাম্প্রদায়িক আগুন জ্বলে উঠতো, তখন কোনো চরমপন্থী আন্দোলন দেখা দিত না বললেই হয়, আর সে সময় সবাই সরকারকেই রক্ষাকর্তা বলে গণ্য করতো।

পরিস্থিতির মোকাবিলায় সাম্প্রদায়িক অথবা অন্যধরনের আন্দোলন দমনে সঠিক পন্থা অবলম্বন করায় ডাঃ রায় ও তাঁর সরকারের জনপ্রিয়তা ধীরে ধীরে স্থিতিশীলতা লাভ করছিল। যে সব রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপের ফলে সন্ত্রাসের সৃষ্টি হতে পারে তাদের নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন ডাঃ রায়। খবরের কাগজের সম্পাদকদের ডেকে বললেন—এমন খবর আপনারা ছাপবেন না, যাতে উত্তেজনা বাড়তে পারে। এমন ঘটনার কথাও প্রকাশ করবেন না, যা থেকে সাম্প্রদায়িক সঙ্কট দেখা দিতে পারে।

তখনকার মতো খবরের সেন্সার করার ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছিলেন তিনি। কাগজগুলোকে ছাপাবার আগে খবর-টবরগুলো সরকারের কাছে পাঠিয়ে সেন্সার করিয়ে নিতে হতো। উদ্বাস্তুদের আকস্মিক আগমনের ফলে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল, এবং পুর্ববঙ্গের কয়েকটি জেলায় সংখ্যালঘুদের যে কী শোচনীয় অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়েছিল, সে সম্পর্কে তিনি প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন ১৫ই ফেব্রুয়ারিতে লিখিত একটি চিঠিতে। লোক বিনিময়ের প্রস্তাব সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে খুবই গুরুত্বপুর্ণ উত্তর এসে পড়লো, যাতে ঐ সমস্যার বিষয়ে তাঁর তখনকার চিন্তাধারার একটা পরিচয় পাওয়া যায়।

নয়াদিল্লী, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৫০

প্রিয় বিধান,

তোমার ১৫ই ফেব্রুয়ারির চিঠির জন্য ধন্যবাদ। পুর্ববঙ্গের হিন্দুদের এই সমস্যার বিষয়টি আমরা যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে বিচার বিবেচনা করছি। তোমার সঙ্গে আমি একমত যে আর গড়িমসি না করে কী নীতি নেওয়া হবে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে আমাদের আসা উচিত। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি লক্ষ লক্ষ লোককে এক স্থান থেকে আর এক স্থানে সরিয়ে দেওয়া আমাদের ক্ষমতার সম্পূর্ণ বাইরে। এই কাজে হাত দিতে গেলেই বিরাট অসুবিধা ও সংকটের সৃষ্টি হবে। এটা স্থিরনিশ্চয় যে পাকিস্তান আমাদের এক ইঞ্চিও জমি ছেড়ে দেবে না, সম্ভবত একমাত্র যুদ্ধ ছাড়া। আমরা এখন সত্যিই চরম পন্থার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি।

আমার মনে হয় এই বিষয়টা আমাদের বিবেচনা করে দেখা উচিত অল্প কিছু দিন পরে, অবশ্য খুব বেশি দিনও নয়। আর দুই কি তিন সপ্তাহ পরে পরিস্থিতি স্বচ্ছ হয়ে আসবে।

সমগ্র জাতিগত এই পরিস্থিতি সম্পর্কে আমার নিজের ধারনার কথা আমি তোমাকে বলতে পারি। আমার মনে হয় বর্ষার আগের মাসগুলি বেশ সংকট-পূর্ণ। এই সময়টা যদি আমরা উত্তীর্ণ হয়ে যেতে পারি, তাহলে মানসিক চাপ আর বড়ো কোনো সংঘাতের সম্ভাবনা ধীরে ধীরে কমে যাবে। আরও সাত আট মাস কাটাতে পারলে ওটা বরং আরও কমবে। সেজন্য পরিস্থিতিকে আমাদের দেখতে হবে স্বল্পব্যাপী দৃষ্টিকোণ থেকে।

আমার পরামর্শ হচ্ছে, তিন সপ্তাহ বা ঐরকম কাছাকাছি কোনো সময় পরে তুমি এখানে চলে এসো, আমরা এ সব বিষয় নিয়ে তোমার সঙ্গে পুরোপুরি আলোচনা করতে পারবো। ইতিমধ্যে, তুমি জানো, পুর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের ঘটনাবলী সম্পর্কে অনুসন্ধান করবার জন্য আমরা জয়েণ্ট কমিশন বসানোর প্রস্তাব দিয়েছি। এই কমিশন যদি বসে, তাহলে আমাদের সাক্ষাৎকারের আগে এদের রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করাই সমীচীন হবে।

তোমাদের

জওহরলাল

পরিস্থিতির গুরুত্ব সম্পর্কে কেন্দ্রকে অবশ্য ইতিমধ্যে পুর্ণ সচেতন করে দেওয়া হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী রাজ্যসভায় ২৩শে ফেব্রুয়ারি চার হাজার শব্দযুক্ত তাঁর ভাষণে খুলনার বিয়োগান্ত ঘটনাবলীর উল্লেখ করেছেন, করেছেন রাজসাহী আর বরিশালের দাঙ্গার উল্লেখ, তারপর বলেছেন মুর্শিদাবাদ, কলকাতা ও ঢাকার ঘটনার কথা। লোক বিনিময়ের প্রস্তাব তিনি সম্পূর্ণ অবাস্তব বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। তবে রাজ্যসভাকে এই আশ্বাসও তিনি দিলেন যে এবার থেকে বাংলার বিষয় পাবে সর্বাধিক প্রাধান্য, এবং বাংলা ও কাশ্মীর যার সমস্যা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত, সে সম্পর্কে তিনি নিজে আত্মনিয়োগ করবেন সব থেকে বেশি। এই সংকল্প অনুসারে মার্চ মাসে তিনি কলকাতায় এলেন দু-দুবার। তাঁর প্রথম কার্যসূচি ৬ই মার্চ শুরু হয়ে ৯ই মার্চ শেষ হলো। ডেকে পাঠালেন তিনি তাঁর পুনর্বাসন মন্ত্রী মোহন লাল সাকসেনাকে, ডেকে পাঠালেন পাকিস্তানের ভারতীয় হাই কমিশনার ডঃ সীতারাম ও ঢাকা থেকে তাঁর ডেপুটি সন্তোষ বসুকে। প্রতিবেশী রাজ্য আসাম, বিহার ও ওড়িষ্যা থেকেও প্রতিনিধিরা এলেন কলকাতায়। রাজভবনে উচ্চপর্যায়ে একটি বৈঠকে বসলো। প্রতিবেশী রাজ্যগুলি কে কতো পরিমাণ উদ্বাস্তু গ্রহণ করবে, তার সংখ্যাও

স্থির হয়ে গেল। এ কাজে তাদের অবিলম্বে এগিয়ে যেতেও বলা হলো। প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বনগাঁ শিবিরে গেলেন কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা নিজের চোখে দেখতে। ১৪ই মার্চ আবার তিনি এলেন কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গের নেতাদের সঙ্গে উদ্বাস্তু সমস্যা সম্পর্কে আরও আলোচনা করতে। বিহারের কয়েকটি শিবিরও তিনি গেলেন দেখতে। জাতীয় সংকটে ভারতের জনগণ বিশেষ করে এই সীমান্ত রাজ্যের জনগণ যে প্রশংসনীয় ঐক্য ও সাহস দেখিয়েছিলেন দেশের অখণ্ডতা যখন এক সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে, তখন কেমন করেই বা তারা সেইরকম রাজনৈতিক কার্যকলাপ শুরু করতে পারেন, যা দেশকে দুর্বল করে দিতে পারে! প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী যেখানে গেছেন সেখানে কোনরকম সরকার বিরোধী মিছিল বার হয়নি বা শ্লোগান ওঠে নি। বামপন্থী শক্তিরাও সেই সংকট মুহূর্তে সরকারকে হয়রান করা থেকে বিরত ছিল।

এই সময়ের কিছু পরের কথা বলছি। মুখ্যমন্ত্রী সেদিন একটু সকাল সকাল মহাকরণ থেকে বাড়ি ফিরে তাঁর শীততাপনিয়ন্ত্রিত অফিসঘরে সরাসরি ঢুকে গেলেন। ঢুকেই আমাকে ডাকলেন, বললেন, এখ্‌খুনি অবিভক্ত বাংলার একটা ম্যাপ এনে দেওয়ালে টানিয়ে দাও। আর শোন? এখ্‌খুনি কয়েকজন ভি-আই-পি আসছেন। বড়ো হলঘরটায় যদি কোনো লোকজন সেই সময় এসে পড়ে তো, সরিয়ে দিও।

কিন্তু এই ভি-আই-পিরা যে কারা, তা তিনি আমার কাছে ভাঙেন নি। এর দশ মিনিটের মধ্যে দক্ষিণের ফটক দিয়ে একটি গাড়ি এসে ঢুকলো উঠোনের মধ্যে। খুব লম্বা এবং সুন্দর দেখতে এক ভদ্রলোক নামলেন, সঙ্গে আরও একজন, তিনিও সমান সুন্দর, তবে একটু ভারী চেহারা। দ্রুত পায়ে তাঁরা এসে হলে ঢোকামাত্র আমি এগিয়ে গেলাম তাঁদের অভ্যর্থনা জানাতে। কাছে গিয়ে চিনতে পারলাম। লম্বা ভদ্রলোকটি হলেন প্রধান সেনাপতি জেনারেল কারিয়াপ্পা, আর অন্য জন হলেন মেজর জেনারেল এস-বি-এস-রায়। দুজনেই ছিলেন সাধারণ বেশে, তাঁদের গাড়িতে কোনো রক্ষী বা পাইলটও ছিল না। অর্থাৎ এটা ছিল তাঁদের খুব গোপন সাক্ষাৎকার। যে ঘরে তাঁদের জন্য মুখ্যমন্ত্রী অপেক্ষা করছিলেন, তার দরজা খুলে গেল। এঁদেরকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে ভিতরে ডেকে নিয়ে দরজা বন্ধ করার আগে আমার দিকে ফিরে ডাঃ রায়

বললেন, টেলিফোনই আসুক অথবা যে-ই আসুক, আমাকে যেন বিরক্ত করো না।

আচ্ছা স্যর।

রুদ্ধকক্ষে এই বৈঠক শুরু হয়েছিল সন্ধ্যা ৬টায়, চললো সাড়ে সাত বা আটটা পর্যন্ত। মাঝে একবার ওর বিশ্বস্ত বেয়ারা কার্তিক ঢুকেছিল কফি আর জলখাবার নিয়ে। তাঁরা চলে যাবার পর আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম কীসের জন্য এই বৈঠক? কিন্তু কোনো উত্তর খুঁজে পেলাম না।

পরের দিন বিকেলে ভি-আই-পিরা আবার এলেন। আবারও ঐরকম গোপন বৈঠক চললো। আমি কোনো অজুহাতেই ভিতরে ঢুকতে পারলাম না। এবার তাঁদের গাড়ি পর্যন্ত ডাঃ রায় এগিয়ে দিলেন কথা বলতে বলতে। আর সে কথায় ডাঃ রায় এতো মগ্ন ছিলেন যে অন্যদিকে একটু তাকানও নি। প্রধান সেনাপতিকে শুধু দেখলাম কী একটা বিষয়ে জোর দিয়ে বলবার জন্য তাঁর ডানহাতের ছড়িটা বাঁ হাতের চেটোর ওপর বার কয়েক আঘাত করলেন। তৃতীয় দিনও মুখ্যমন্ত্রী শীগগির শীগগির ফিরলেন, হলঘর অতিথিমুক্ত করা হলো, ভি-আই-পিরাও যথারীতি বৈঠকে বসবার জন্য আবার এলেন। এইদিন আমার ভাগ্য প্রসন্ন হলো। আমার ঘরের বেলটা বেজে উঠতেই আমি তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুকলাম। দেখলাম, ম্যাপের সামনে ওঁরা তিনজন দাঁড়িয়ে আছেন, জেনারেল কারিয়াপ্পা ছড়ি দিয়ে ম্যাপের মধ্যে খুলনা জেলার কয়েকটা জায়গা দেখাচ্ছেন। আমাকে ওঁরা দেখতে পান নি। আমি কিন্তু শুনতে পাচ্ছিলাম ওঁদের নিচু স্বরের কথাবার্তা। সীমান্তের এপারে আমাদের ও সীমান্তের ওপারে যশোর ও খুলনার মোক্ষম যায়গাগুলিই ছিল ওঁদের আলোচ্য বিষয়। আমার অবস্থা তখন শোচনীয়, বেরিয়েও যেতে পারছিনা, আবার থাকতেও পারছিনা, তাহলে মনে হতে পারে যে চুরি করে আমি ওঁদের গোপন কথা শুনছি।

যাই হোক তাঁদের তিনদিনের বৈঠকের ওটাই ছিল শেষ দিন। ডাঃ রায় তাঁদের গাড়ি পর্যন্ত পৌছে দিলেন। বিদায় সম্ভাষণের পর জেনারেল কারিয়াপ্পা তাঁর স্থানীয় সেনাধ্যক্ষের দিকে আঙুল নির্দেশ করে বললেন, ডাঃ রায়, উনি আপনার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলবেন।

মেজর জেনারেল রায় কেন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলবেন, এই কথায় আমার মনে হলো ভারত পাকিস্তানের মধ্যে পূর্বাঞ্চল নিয়ে একটা

কিছু বোধহয় ঘটতে যাচ্ছে, বিশেষ করে তখনকার ঐ পরিস্থিতিতে, যখন সংখ্যালঘুদের সমগ্র জনসংখ্যাই সীমান্ত পার হয়ে এপারে চলে আসবে বলে মনে হচ্ছিল। এই প্রশ্নের চরম সমাধানের জন্য অচিরে অথবা অদূর ভবিষ্যতে কোনো সম্ভাব্য সংঘাতের ভুমিকাস্বরূপই কি এই বৈঠক হয়েছিল? আজ মনে হয় ২১ বছর আগে ডাঃ রায় এই উদ্বাস্তু সমস্যার বিষয়ে যা ভেবেছিলেন, তা পুর্ববঙ্গে শেষ পর্যন্ত সত্যিই ঘটেছিল যদিও একেবারে বিপরীত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে।

কিন্তু যাক সে কথা। পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষে একটি বিয়োগান্ত ঘটনা ঘটল ২০শে ফেব্রুয়ারি তারিখে। মারা গেলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্রের দাদা শরৎচন্দ্র বসু। শরৎবাবুর শরীর ভাল যাচ্ছিল না, ইতিমধ্যেই থ্রম্বসিসের আক্রমণ হয়েছিল। ঐ দিন রাত্রে ১১টা ১০ মিঃ পর্যন্ত উভয় বঙ্গের হিন্দু-মুসলমান ঐক্য সম্পর্কে তাঁর ন্যাশনালিস্ট কাগজের জন্য একটি প্রবন্ধের ডিক্‌টেশন দিয়েছিলেন তিনি। দিয়ে শুতে গেছেন। ৩০ মিনিট পরেই মৃত্যু। পরদিন সকালে প্রাত্যহিক রোগী দেখা ও অভ্যাগতের ভীড় সামলে ডাঃ রায় আমাকে আর তাঁর ডাক্তার বন্ধু ক্যাপ্টেন এস রায়কে গাড়িতে ডেকে নিয়ে রওনা হলেন তাঁর একসময়কার বন্ধু অথচ রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ শরৎ বসুর বাড়ির দিকে। দেশের স্বার্থে স্বাধীনতার যুদ্ধে তাঁরা একসঙ্গে কাজ করেছেন দীর্ঘ দিন। তাঁরা দুজন এবং সঙ্গে তাঁদের আরও তিন বন্ধু, নলিনী সরকার, তুলসী গোস্বামী ও নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, এদের মিলিত গোষ্ঠীকে লোকে বলতো, বৃহৎ পঞ্চজন বা বিগ ফাইভ। বাংলার কংগ্রেসে জে. এম. সেনগুপ্তের বিপক্ষে সুভাষচন্দ্র বসুর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করবার জন্য রাজনৈতিক মঞ্চে একত্রে সংগ্রাম করেছিলেন এঁরা। বাস্তবিক রাজনীতিতে কী অদ্ভুত সব ঘটনাই ঘটে! দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর পুরাণো বেঙ্গল কাউন্সিলে যে ডাঃ রায় জে. এম. সেনগুপ্তের ডেপুটি হয়ে কাজ করেছিলেন, সেই তিনি তাঁকে ছেড়ে চলে এসেছিলেন। আবার পরে শরৎ বসু ও তিনি যে যার ভাবনামতো ভিন্নতর পথে সরে এসে পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন।

যাই হোক, শরৎ বসুর ১নং উডবার্ণ পার্কের বাড়িতে প্রথম যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ডাঃ রায় অন্যতম। শোকগ্রস্ত লোকজন ইতিমধ্যে করে ফেলেছিলো। সেই ভীড় সরিয়ে ডাঃ রায় গিয়ে পৌছোলেন

সেই ঘরের মধ্যে, যে ঘরের একটি খাটে শরৎবাবুকে সুসজ্জিত অবস্থায় রাখা হয়েছে। পুষ্পার্ঘ্য স্থাপিত করে মৃতদেহের সামনে ডাঃ রায় মিনিট দুই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপরে চলে এলেন কারুর সঙ্গে কোনো কথা না বলে, একেবারে সোজা মহাকরণে।

এইরকম সময়ে আমার আর একটি চিত্তাকর্ষক অভিজ্ঞতা হয়েছিল। কোন এক রবিবারের সকালবেলায় মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির হলঘরখানা লোকের ভীড়ে উপচে পড়েছে। হঠাৎ খাটো চেহারার রোগা দাড়িওয়ালা এক মুসলমান ভদ্রলোক আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। পোষাক দেখে মনে হচ্ছিল তিনি উত্তর প্রদেশ অথবা পুর্ব পাঞ্জাবের লোক। আমার কাছে এসে বললেন, অন্যদের সঙ্গে আপনার কথাবার্তা শেষ হলে আমি আপনার ঘরে গিয়ে আপনার সঙ্গে একটু কথা বলবো।

ঠিক আছে।

আধঘণ্টা পরে ঘোরাঘুরির কাজ শেষ করে আমি ওঁকে আমার ঘরে ডেকে পাঠালাম। তিনি বললেন, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে একা তাঁর ঘরে দেখা করতে চাই। সে সময় অন্য কেউ তাঁর কাছে থাকলে চলবে না।

সেটা কি করে হবে?

তিনি বললেন, হবে। তাঁর ও আমার এক বন্ধুর মাধ্যমে সে ব্যবস্থা করা আছে। আপনি গিয়ে বলুন এক মুসলমান ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান, তাহলেই হবে। দেখবেন ঠিক একা তিনি আমার সঙ্গে কথা বলবেন।

আমি তাঁর কাছ থেকে আরও কিছু কথা বার করতে চাইলাম, কিন্তু তিনি আর কিছু বলতে একদম নারাজ। ভিতরে ভিতরে একটু বিরক্ত হয়ে এবং কিছুটা দ্বিধার পর আমি শেষ পর্যন্ত ঢুকলাম গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে। বললাম, বিচিত্র এক মুসলমান ভদ্রলোক এসে হাজির হয়েছেন।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি আগ্রহের সঙ্গে বলে উঠলেন, এসেছেন তিনি! শীগ্‌গির নিয়ে এসো।

আমি ত অবাক। কিন্তু মুখে তা প্রকাশ করা চলে না। আমি ভদ্রলোককে নিয়ে তাঁর ঘরে পৌছে দিলাম। প্রায় মিনিট কুড়ি তাঁরা দুজনে ঘরের মধ্যে রইলেন। তারপরে বেরিয়ে এলেন সেই মুসলমান ভদ্রলোক,

আমাকে চোস্ত উর্দুতে বললেন যে পরদিন সন্ধ্যাবেলাও তিনি আসবেন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে। আমার কৌতূহল বাড়লো, কিন্তু ভদ্রলোক একটি কথাও আমার কাছে ভাঙলেন না।

পরদিন যথা সময়ে ঠিক এসে পড়লেন ভদ্রলোক। আবার ঘটল নিভৃত সাক্ষাৎকার। যারা আসতেন দেখা করতে, সাধারণভাবে আমরা তাঁদের ভালোরকম জিজ্ঞাসাবাদ করে তারপরে বাছাই করে নিতাম। সত্যি কথা বলতে কী, গরীব ও অসহায় মানুষ যারা, যারা উদ্বাস্তু, তাদের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হতো না। কিন্তু কলকাতার উত্তর উপকণ্ঠে আর সি-পি-আই এর হামলার জন্য এবং তখন সাধারণভাবে যে রকম উচ্ছৃংখলা চলছিল সেজন্য এই বাছাই করার ব্যবস্থা আমাদের নিতে হয়েছিল। সিকিউরিটির লোকেরা সাদাপোষাকে ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতো। দরকার মতো আমার সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর ঘরেও হাজির থাকতো যখন সন্দেহজনক কোনো লোকজন তাঁর সঙ্গে দেখা করতো। কিন্তু কোনো কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে এই নিয়মটা শিথিল করা হতো। যেমন করা হলো এই মুসলমান ব্যক্তিটির বেলায়।

ভদ্রলোকের সাক্ষাৎকার শেষ হলো। কিন্তু চলে যাবার আগে তিনি আমার ঘরে এলেন। একটু হেসে বললেন, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কাজ শেষ হলো এখনকার মতো, কিন্তু আবার আমি আসবো, হয়ত সাতদিন কিংবা পনেরো দিন পরে। সত্যিই তাই। সপ্তাহখানেক কাটতে না কাটতেই তিনি আবার এসে হাজির। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ ছিল, সকাল বিকাল যখনই তিনি আসুন না কেন, তখনই যেন তাঁকে খবর দেওয়া হয়। যাই হোক, দুজনে রুদ্ধকক্ষে এবার কাটালেন প্রায় ঘণ্টাখানেক। কয়েকখানা ফুলস্ক্যাপ কাগজ চেয়ে পাঠানো হলো। আমি দেখলাম, তিনি মুখ্যমন্ত্রীর লেখবার টেবিলে ঝুঁকে সেই কাগজে ইংরেজীতে কী সব লিখতে লাগলেন। এই রকম তিন মাস ধরে প্রায়ই তাঁকে আসতে দেখেছিলাম। প্রতিবারই তাঁকে সমাদর করে কাছে বসাতেন ডাঃ রায়। এই সূত্রে আমার সঙ্গেও তাঁর তখন বেশ মাখামাখি হলো। এবং হলো বলেই পরে এক দিন তিনি গোপনে আমার কাছে তাঁর আপন পরিচয় ব্যক্ত করলেন। বাইরে উর্দুভাষী কেতাদুরস্ত মুসলিম হলেও এটা তাঁর ছদ্মবেশ। আসলে তিনি হিন্দু আর্যসমাজভুক্ত। কোনো এক মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন। আমার ঘরে নামাজ পড়ে দেখিয়েছিলেন যে তাঁর ছদ্মবেশ কতো নিখুঁত। তিনি

আমাকে বলেছিলেন, দেশেরই স্বার্থে একটি বিশেষ কাজে তিনি নিযুক্ত আছেন।

নেহেরু লিয়াকৎ আলি চুক্তি

বরিশালের দাঙ্গার ফলাফল এবং পূর্ববাংলার দাঙ্গাবিধ্বস্ত এলাকায় লিয়াকৎ আলি খানের ভ্রমণ ঐ দেশের নেতাদের বুঝিয়ে দিয়েছিল যে পরিস্থিতি কতো গুরুতর। এবং এর যদি সুরাহা এখখুনি না করা হয় তাহলে কী ফল ফলতে পারে—এক হচ্ছে লোকসংখ্যা বিনিময় যা কী এ দিককার কী ও দিককার কোনো সরকারের পক্ষেই সামলানো সম্ভব নয়, আর দ্বিতীয় ফলটি হচ্ছে, যুদ্ধ। ভারত ও পাকিস্তান দুই দেশের নেতারাই বুঝলেন, সর্বোচ্চ রাজনৈতিক ভিত্তিতে এই সমস্যার মোকাবিলা করা দরকার। ভারত সরকার পাকিস্তানী প্রাধনমন্ত্রীকে দিল্লীতে আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। লিয়াকৎ আলি সাহেব তাঁর সাঙ্গ-পাঙ্গ নিয়ে দিল্লী এসে পৌছলেন ১৯৫০-এর ২রা এপ্রিল। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে তার আগেই পরামর্শের জন্য জানানো হয়েছিল। যদিও দুই দেশের মত বিনিময়ের ক্ষেত্রে সরাসরি তিনি যোগ দেবেন না। সংখ্যা-লঘুদের বিষয়ে দুই দেশের দুই প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে প্রথমদিনের আলোচনা চললো ১৪০ মিনিট ধরে, পরের দিন সেটা বেড়ে দাঁড়ালো আড়াই ঘণ্টা। চারদিন এমনি আলোচনা চলার পর সংখ্যালঘু সমস্যা, বিশেষ করে দুই বাংলা—ত্রিপুরা ও আসামের পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো ৮ই এপ্রিল। এই চুক্তিই নেহেরু-লিয়াকৎ আলি চুক্তি নামে পরিচিত। চুক্তি অনুসারে দুই সরকারকেই দিতে হবে ধর্মনিরপেক্ষে সবাইকে নাগরিকত্বের সমান মর্যাদা, দেশের সরকারী অথবা মিলিটারী প্রভৃতি চাকরিতে সবাইকে সমান সুযোগ, উভয় বঙ্গ, ত্রিপুরা ও আসাম থেকে আগত শরণার্থীদের সুযোগ-সুবিধা এবং করতে হবে সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষা—এ ছাড়া সংখ্যালঘু কমিশন বসানোর কথাও চুক্তিতে রইলো। একটি বসবে পূর্ববঙ্গের জন্য আর একটি পশ্চিমবঙ্গের জন্য। আর একটি হবে আসামের জন্য। প্রত্যেকটি কমিশনেরই চেয়ারম্যান থাকবেন একজন মন্ত্রী। দুই সরকারই তাঁদের মন্ত্রিসভায় একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিয়োগ করবেন। তাঁদের পদ হবে সংখ্যালঘু বিষয়সমূহের মন্ত্রী। তাঁরা দাঙ্গা বিধ্বস্ত এলাকায় ভ্রমণ করে দুর্গতদের মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে আনবেন।

পারস্পরিক এই সব চুক্তি যখন হচ্ছিল তখন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী কলকাতায় ফিরে এলেন। তার আগের দিন নুরুল আমিন তাঁর বেতার ভাষণে তাঁর প্রদেশের মুসলমান শরণার্থীদের ব্যাপারে এবং যে সব হিন্দু ফিরে গেছেন বা ফিরবেন বলে আশা করা যায় তাদের সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার বিষয়ে অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য কতকগুলি বিবৃতি দিয়েছিলেন। পূব থেকে পশ্চিম বাংলায় অথবা পশ্চিম বাংলা থেকে পূর্ববাংলায় যে সব শরণার্থী গমনাগমন করেছেন তাদের সংখ্যা সম্পর্কে নুরুল আমিনের দাবি যে সম্পূর্ণ অবাস্তব ও মিথ্যা, ডাঃ রায় তা প্রমাণ করে দিলেন প্রকৃত সংখ্যাতত্ত্ব উল্লেখ করে। তিনি তাঁর বিবৃতিতে বললেন, এটা খুবই স্বাভাবিক যে চার লক্ষের মতো বিপুল শরণার্থীর চাপ সামলানো জনাব নুরুল আমিনের পক্ষে খুব কষ্টকর। তিনি বলেছেন, 'এ হচ্ছে আমাদের আস্থা, আমাদের কর্মক্ষমতা এবং আমাদের সামর্থ্যের পক্ষে কঠিন পরীক্ষা।' এবার তাহলে কি তিনি বুঝতে পারছেন, শরণার্থী পুনর্বাসনের মতো কাজটা কী বিরাট? আমাদের এখানের সংখ্যা চার লক্ষ নয় বিশ লক্ষ। মুসলমান নয় এমন শান্তিপ্রিয় নিরীহ মানুষ, যারা ওদের সরকারের উদ্দেশ্যমূলক নীতির ফলশ্রুতিতে পূর্ব বাংলায় থাকতে না পেরে এপারে আসতে বাধ্য হয়েছেন তাঁদের সংখ্যা বিশ লক্ষ। তিনি বলছেন, পূর্ববঙ্গ থেকে যদি গেছে এক জন হিন্দু তাহলে পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম থেকে এসেছে অন্ততঃ দুইজন শরণার্থী। আমি জিজ্ঞাসা করি, এই সব শরণার্থীর কোনো হিসাবপত্র কি তিনি রেখেছেন? আমরা রেখেছি। এবং প্রতিবাদের ভয় না রেখেই বলছি পূর্ববঙ্গ থেকে আগত প্রতি দুইজন শরণার্থীর যায়গায় পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম থেকে গেছে একজন মাত্র। পশ্চিমবঙ্গ থেকে যে সব শরণার্থী চলে যাচ্ছে, তাদের বাড়ি আছে পাকিস্তানে, তারা পশ্চিমবঙ্গে এসেছিল জীবিকার জন্য।

ইতিমধ্যে দিল্লীতে দুই দেশের দুই প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে মতের আদান-প্রদান চলছিল, যার ফলশ্রুতিতে ঘটেছিল নেহেরু-লিয়াকৎ আলি চুক্তি। এই চুক্তিতে খুশি হয়েছিলেন অনেকেই, ভেবেছিলেন, এর ফলে দুই দেশেই মানুষের দুর্ভোগ কমে যাবে বা বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু অন্য দিকে আবার এমন লোকও ছিলেন যাঁরা হিন্দু মুসলমান সমস্যার সমাধানের সূত্র হিসাবে এই চুক্তি-টাকে মেনে নিতে পারেন নি। এঁদের মধ্যে ছিলেন দুজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং ক্ষিতীশ চন্দ্র নিয়োগী। তাঁরা দুজনেই সারা

দেশের লোককে চমকিত করে ঐ চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে পদত্যাগ পত্র পেশ করে বসলেন। প্রধানমন্ত্রী তৎক্ষণাৎ শ্যামাপ্রসাদের পদত্যাগ গ্রহণ করে নিলেন তবে শ্রীনিয়োগীর পদত্যাগ গৃহীত হয়েছিল দিন কয়েক পরে। উচ্চপর্যায় থেকে তাঁর ওপর চাপ আসছিল যাতে তিনি পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করে নেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি।

চুক্তির তাৎক্ষণিক সাফল্য ছিল এই যে, এর ফলে দুই বাংলাতেই কিছু দিনের জন্য উদ্বাস্তু গমনাগমন একটু কমে গিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেল, ওপার বাংলায় চুক্তিগুলির সর্ত পালন করার থেকে চুক্তিভঙ্গ করার ঘটনাই ঘটতে লাগলো বেশি।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় সংখ্যালঘুবিষয়ক মন্ত্রিপদের জন্য চারুচন্দ্র বিশ্বাসের নাম সুপারিশ করেছিলেন। শ্রীবিশ্বাস কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন একসময়। কলকাতা বারের একজন প্রথম সারির ব্যবহারজীবী শ্রীবিশ্বাস রাজনীতি করতেন না বা করবার জন্য কংগ্রেসে বা কংগ্রেসীদের সারিতে গিয়ে ভীড় বাড়ান নি, কিন্তু মানুষ হিসাবে সত্য ও ন্যায়পরায়ণতার দিক থেকে তিনি ইতিমধ্যেই শ্রদ্ধাভাজন হয়েছিলেন।

কতো উদ্বাস্তু গেছে আর এসেছে তার সাম্প্রতিকতম হিসাব মুখ্যমন্ত্রী আমাকে দিয়েছিলেন শ্রীবিশ্বাসকে দেবার জন্য। শ্রীবিশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তার নির্দিষ্ট সাক্ষাৎকার এবং সংখ্যালঘুবিষয়ক ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসাবে তাঁর পরবর্তী কাজকর্ম শুরু করবার জন্য দিল্লী যাবার আগেই তাঁর দক্ষিণ কলকাতার বাড়িতে গিয়ে তাঁর হাতে আমি ঐ সব কাগজপত্র দিয়ে এসেছিলাম। শ্রী সি. সি. বিশ্বাস এবং ডঃ এ. এম. মালেক (রাজ্যপাল মালেক ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক কারারুদ্ধ হয়েছিলেন) যথাক্রমে ভারত ও পাকিস্তানের মন্ত্রী হয়ে শান্তি ও শুভেচ্ছার বাণী এবং দাঙ্গাহাঙ্গামা রোধ করবার জন্য দুই বাংলায় ব্যাপক ভ্রমণ-সূচী পালন করেছিলেন।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও কে. সি. নিয়োগী পদত্যাগ করে কলকাতায় ফিরে এলে হাওড়া স্টেশনে তাঁরা যে গণসম্বর্ধনা লাভ করেন, তারই পরবর্তী ঘটনা হিসাবে রটে যায় যে, ঐ চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভা এক-যোগে রাজ্যপালের কাছে তাঁদের পদত্যাগপত্র পেশ করেছেন। কিন্তু এই চুক্তির ব্যাপারে ডাঃ রায় তাঁর পদত্যাগ প্রদানকারী বন্ধুদের সঙ্গে একমত

ছিলেন না। কাগজে ঐ সব গুজব বার হওয়া মাত্রই তিনি সঙ্গে সঙ্গে ১৬ই এপ্রিল ওর প্রতিবাদে একটি বিবৃতি দিয়ে বললেন, আমি এবং আমার সহযোগীরা নেহেরু-লিয়াকৎ চুক্তিকে পুরো মদৎ দেবো এবং যে চেতনা থেকে এই চুক্তি করা হয়েছে তাকে পূর্ণ মর্যাদা দেবো।

তাঁর নিজের প্রদেশে তিনি তা সত্যিই করেছিলেন। তাঁর চিকিৎসক-জীবনের বন্ধু, যাঁর ওপর তাঁর আস্থা ছিল পুরোমাত্রায়, সেই ডাঃ আর. আমেদকে তিনি সংখ্যালঘু মন্ত্রী করে চুক্তিটি কার্যকর করতে প্রাথমিক সমস্ত ব্যবস্থাই গ্রহণ করেছিলেন।

১৫ই মে মুখ্যমন্ত্রী ঢাকা গেলেন আসামের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে। তার আগের রাত্রে নুরুল আমিনের সঙ্গে তিনি টেলিফোনে তাঁর খাওয়ার বিষয়ে যে কথা-বার্তা বলেছিলেন তা এখনো আমার কানে বাজে। চিকিৎসক হিসাবে নুরুল আমিনকে তিনি আগে থাকতেই চিনতেন এবং তাঁর সঙ্গে তাঁর ভালো সম্পর্ক ছিল। টেলিফোনে তিনি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছিলেন, দেখো নুরুল, ভালোবেসে যে যা দেয় তা-ই আমি খাই এ-কথা সত্যি, কিন্তু তোমাদের মুসলমানদের উদার অতিথিসৎকারের কথা ত জানি, তাই বলছি, মশলাদার পোলাও বা মাংস-টাংস আমার জন্য কোরো না, বুড়ো মানুষ একটু মাছ ভাত আর দই হলেই চলবে।

তার এই ঢাকা যাওয়া ছিল মাত্র একদিনের জন্য। ফিরে যাওয়া শরণার্থীদের তাদের আগেকার বাড়িতে পুনর্বাসন নিয়ে কিছু মতপার্থক্যের সূচনা হওয়ায় সেগুলির সমাধান করা ছিল তাঁর এই ভ্রমণের উদ্দেশ্য। আর উদ্দেশ্য ছিল চুক্তি কতখানি কার্যকারী হয়েছে তা নিজের চোখে দেখে আসা। চুক্তির সর্ত অনুযায়ী যে কমিশন বসানোর কথা ছিল, পশ্চিমবঙ্গে তা করা হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীপি. বি. মুখার্জীকে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করে।

উদ্বাস্তু সমাগমের শোচনীয় বছর ছিল ১৯৫০ সালটা। এই সময় প্রায় রোজই ডাঃ রায় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলতেন। প্রধানমন্ত্রীর কাছে এই সময় বাংলার সমস্যাই প্রাধান্য পেয়েছিল সব থেকে বেশি। সর্দার প্যাটেলের সঙ্গেও তিনি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চলতেন, কারণ প্রধান প্রধান নীতি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে দুজনের মধ্যে যেমন ছিল মতৈক্য, তেমনি আভ্যন্তরীণ বিশৃংখলা বা

পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে দুজনকেই শক্ত মানুষ বলে গণ্য করা হতো। সর্দার প্যাটেল একসময়ে পাকিস্তানকে হুমকি দিয়েছিলেন যে, যে সব হিন্দু উদ্বাস্তুদের ওদেশ থেকে বার করে দেওয়া হয়েছে তাদের পুনর্বাসনের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ ভূখণ্ড পাকিস্তানকে সমর্পণ করতে ভারত দাবি জানাতে বাধ্য হবে। এ দিক থেকে ডঃ শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে তিনি একমত ছিলেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার দ্বিতীয় ব্যক্তি বলে ভাষণে মন্তব্যে তাঁকে অবশ্যই সংযত থাকতে হতো। ডাঃ রায়ের বেলায়ও তাই। সর্দার প্যাটেলকে কলকাতা আসবার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হলো। আর তিনি এলেনও কলকাতায় ২০শে এপ্রিল তারিখে। পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতির মূল্যায়ন করা ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। আর উদ্দেশ্য ছিল ডাঃ রায়কে ব্যক্তিগতভাবে সমর্থন জানানো, যাতে করে তাঁর মন্ত্রিসভায় ঐক্য বজায় থাকে। মন্ত্রিসভার কেউ কেউ, অন্তত আমি দুজনের কথা জানতাম, যাঁরা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ ও শ্রীনিয়োগীর মতো পদত্যাগ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু প্যাটেলজীর কলকাতা-ভ্রমণে ফল হয়েছিল। মন্ত্রিসভার ঐক্য বজায় রইলো।

এবার দেখতে হবে দিল্লী-চুক্তির বারো সপ্তাহের পরে তার ফলশ্রুতি কী হয়েছিল। জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহ থেকে কাজের চাকা ঠিকই চলতে লাগল, কিন্তু তার বেশি কিছু হলো না। উদ্বাস্তুরা বিনা বাধায় যাতায়াত করতে লাগলো। যারা তাদের ভিটেমাটি আর জীবিকা ভালোবাসতো গভীরভাবে, তাদের কেউ কেউ অবশ্য ফিরে গেল। পূর্ববঙ্গের ত্রাণ-কমিশনার দাবি করলেন এক লক্ষ উদ্বাস্তু ফিরে এসেছে, আর পশ্চিমবঙ্গে ফিরে গেছে বেশ বড়সংখ্যক মুসলমানের দল। বড়ো কোনো দাঙ্গা-হাঙ্গামাও ঘটে নি। তা সত্ত্বেও দেখা গেল, পূর্ব বাংলা ত্যাগ করে দলে দলে আরও হিন্দু আসছে, পশ্চিমবঙ্গ থেকে চলে যাচ্ছে আরও মুসলমান। কী সরকারী কী বে-সরকারী কোনো দিক থেকেই তাদের আস্থা ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা হয় নি। কারুর সে ইচ্ছাও ছিল না, সামর্থ্যও ছিল না। পশ্চিমবঙ্গের সরকারী শিবিরগুলি সব ভর্তি হয়ে গেল এবং কোনো অজ্ঞাত কারণে আরও নতুন নতুন দল এসে হাজির হতে লাগলো। শিয়ালদহ স্টেশন হাজার হাজার উদ্বাস্তুতে একেবারে ছেয়ে গেল। সে এক মর্মান্তিক দৃশ্যই বটে! পশ্চিমবঙ্গ সরকার নতুন নতুন শিবির খোলবার চেষ্টা করতে লাগলেন। জনগণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক ভাষণে

প্রধানমন্ত্রী স্বীকার করলেন,—'যা আমরা করতে চেয়েছি তা এখনও করতে পারি নি।'

এইভাবে দুই দেশের নেতারা 'ক্ষমা ও ভুলে-যাওয়া'-র ভিত্তিতে যে উজ্জ্বল চিত্র প্রতিফলিত হবে ভেবেছিলেন, তা ক্রমশই সুদূরপরাহত হয়ে দাঁড়াতে লাগলো। দুর্ভাগ্যবশতঃ দুই দেশেরই প্রধানমন্ত্রিদ্বয় ইয়োরোপে চলে গিয়েছিলেন। এবং গিয়েছিলেন এমন একটা সময়ে, যখন তাঁদের উপস্থিতির প্রয়োজন ছিল সব থেকে বেশি। এমন কি ঐ সময়ে নুরুল আমিন পর্যন্ত বিদেশে চলে গিয়েছিলেন। অবশ্য সংখ্যালঘুবিষয়ক মন্ত্রিদ্বয়, বিশ্বাস ও মালেক, অবিশ্রান্ত ঘুরে বেড়িয়েছিলেন, দাঙ্গাবিধ্বস্ত এলাকার মধ্যে ঢুকে যেতেও ইতস্ততঃ করেন নি। বিশ্বাস গিয়েছিলেন বরিশাল জেলার সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায়, তেমনি মালেক এসে ঘুরে গেলেন হুগলি, বর্ধমান প্রভৃতি অঞ্চল। ১৯৫০-এর ৩রা সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সরকারী প্রেস-নোটে উদ্বাস্তুদের একটি পরিসংখ্যান বেরিয়েছিল। এতে দেখা যায়, এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে আগষ্টের শেষাশেষি পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু উদ্বাস্তু এসেছে ৪,৬০,৬১০ জন, আর পূর্ববঙ্গে গেছে ১,৩৯,৯৯০ জন মুসলমান। সংখ্যালঘু-সমস্যা সম্পর্কে তাঁর কী অভিমত, এ কথা এই সময় খোলাখুলিভাবে জওহরলাল নেহেরু এক চিঠিতে জানিয়েছিলেন ডঃ রায়কে, এবং সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার সংবাদ-পত্রগুলির ভূমিকা তাঁকে কতখানি পীড়া দিয়েছে, সে কথাও জানাতে তিনি ভোলেন নি।

নতুন দিল্লী
২৩শে মে ১৯৫০

প্রিয় বিধান,

তোমার ২২শে মে তারিখের চিঠির জন্য ধন্যবাদ, যে চিঠিতে তুমি জাফরুল্লা খানের চিঠির কথা উল্লেখ করেছো।

তোমার মন্তব্য অতি সত্য যে পূর্ব বাংলায় ঘটনা এখনও ঘটে যাচ্ছে এবং এর ফলে সাংবাদিকরা সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে। আমার মনে হয় পূর্ব বাংলার অনেক ঘটনা এবং সম্ভবতঃ পশ্চিমবঙ্গেরও কিছু ঘটনা—এ সব ঘটছে বহুলাংশে স্বাভাবিক সামাজিক অবস্থা ভেঙে পড়ার দরুন। এগুলি সরাসরি সাম্প্রদায়িক নয়, যদিও সাম্প্রদায়িকতা এতে আংশিক কাজ করছে। পূর্ব বাংলার অর্থনীতি

দুর্বল হয়ে যাওয়ার জন্য চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি সেখানে নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমি কলকাতার খবরের কাগজগুলি খুঁটিয়েই পড়ছি। এবং পড়ে আমার যা ধারণা হচ্ছে, তা অদ্ভুত মনে হতে পারে, কিন্তু এ কথা ঠিক, তারা ঘটনা-সম্পর্কিত সব কাহিনীই পছন্দ করে, কারণ, সমস্যার প্রতি তাদের যা দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাদের মনে যে উদ্দেশ্য ক্রিয়া করছে, তার সঙ্গে এগুলি খাপ খেয়ে যায়।

এই সমস্যার প্রতি আমাদের মূল দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে, সে সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ভাব আমাদের মনে থাকা দরকার। এখানে রয়েছে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি। এবং যদি রাজনৈতিক স্তরে পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের সংঘর্ষ হয়, তাহলে সে সংঘর্ষের মুখোমুখি আমাদের দাঁড়াতে হবে। কিন্তু আসল প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা হিন্দুমহাসভার মতো সাম্প্রদায়িক ধারায় এটা চিন্তা করবো, না পুরনো কংগ্রেস ধরনে চিন্তা করবো? পাকিস্তানের কোনো হিন্দুকে সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ভাবা কারুরই উচিত নয়, যদিও পারিপার্শ্বিক কারণে খানিকটা সে তা-ই। তেমনি ভারতের কোনো মুসলমানকেও অনুরূপ সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ভাবা উচিত নয়, যদিও পারিপার্শ্বিকতা তাকে সেই ভাবে চিন্তা করতে বাধ্য করছে। প্রশ্ন হচ্ছে, সংখ্যাগরিষ্ঠরা কীভাবে আচরণ করছে এবং তাদের নেতারা বা সাংবাদিকরা তাদের কীভাবে চালাচ্ছে? আমি দেখছি, কলকাতার খবরের কাগজগুলির সবগুলি না হলেও অধিকাংশরাই সাম্প্রদায়িক ধারায় কাজ করছে; তারা সব রকম ভারসাম্যের ভাব হারিয়ে ফেলেছে।

আমার দৃঢ় ধারণা, এই পথেই ভারতে ধ্বংস নেমে আসতে পারে। পাকিস্তানের দিক থেকে নয়, বরং আভ্যন্তরীণ ধ্বংস ও বিরোধ থেকেই, যে ঐক্যটুকু আমাদের দেশে আছে, তা ভেঙে যেতে পারে, আর তার ফলেই হবে দেশের সর্বনাশ।

যা আমি অনুভব করি, তা-ই তোমাকে খোলাখুলি লিখলাম। ভেবো না যে, এ সব আমাকে দমিয়ে দিচ্ছে বা হতাশ করে তুলছে। তা কিন্তু মোটেই নয়। আমার বিশ্বাস, এ সব বাধাবিপত্তি আমরা কাটিয়ে উঠবোই। তার কারণ, এ-ছাড়া আর কোনো পথ নেই। আমি ভাবতে পারি না যে, ভারত তলিয়ে যাচ্ছে।

তোমার বিশ্বস্ত

জওহরলাল নেহেরু

উদ্বাস্তু-সমস্যার ব্যাপারে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন নেহেরু ও তাঁর সরকারের কঠোরতম সমালোচকদের অন্যতম, তা সে রাজ্যসভার ভিতরেই হোক আর বাইরেই হোক। ৩০শে জুলাই দিল্লীতে তাঁর এক মর্মঘাতী উক্তির মাধ্যমে তিনি সরকারকে এই বলে সতর্ক করে দেন যে, সরকার যদি উদ্বাস্তু-সমস্যার মোকাবিলায় ব্যর্থ হন, তাহলে দেশে এক বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। তাঁর মতে এর একমাত্র সমাধান হচ্ছে,—এক, দুই দেশকে আবার জোড়া লাগানো; দুই, সুপরিকল্পিতভাবে জনসংখ্যা-বিনিময়; অথবা, তিন,—পূর্ববঙ্গের বাস্তুচ্যুত সংখ্যালঘুদের পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় ভূভাগ পাকিস্তানকে ছেড়ে দিতে বাধ্য করা। তিনি বলেন,—দিল্লী-চুক্তি সত্ত্বেও লক্ষ লক্ষ হিন্দু পশ্চিমবঙ্গে চলে এসেছে এবং এখনো আসছে।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদের এই তিনটি প্রস্তাবের উল্লেখ করে ৯ই আগষ্ট প্রধানমন্ত্রী রাজ্যসভায় বলেন,—ভারতের জোড়া-লাগা বা পাকিস্তানের ভূভাগের দাবির পিছনে বলপ্রয়োগ ও যুদ্ধের হুমকি প্রচ্ছন্ন আছে, যা আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে ক্ষুণ্ণ করে, সংখ্যালঘুদেরও দারুণ ক্ষতি করে। জনসংখ্যা-বিনিময়ের প্রস্তাবের পিছনেও রয়েছে বলপ্রয়োগের কথা, রয়েছে সংবিধান-লঙ্ঘনের কথা। এ ছাড়া কংগ্রেসের দীর্ঘকালীন উচ্চ আদর্শেরও এতে চ্যুতি ঘটে।

এইভাবে মন্ত্রিসভায় এক সময় যে দুইজনে সহযোগী ছিলেন, তাঁরা পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে লাগলেন এবং আর কখনো মিলতে পারলেন না।

ভারতীয়দের জন্য নাবিকবৃত্তি

ওপার বাংলার লোক এ-বাংলায় আসায়, এবং এ-পার বাংলার লোক ও-পারে চলে যাওয়ায় পশ্চিমবঙ্গে যে প্রভূত সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তার মধ্যে একটি হচ্ছে, দেশের ভিতরে জলপথে স্টীমার, লঞ্চ প্রভৃতি চালাবার জন্য সুদক্ষ নাবিকের একান্ত অভাব। কলকাতা বন্দর এবং অন্যত্র কাজ করতো বিপুলসংখ্যক পাকিস্তানী নাবিকরা। এই কাজটা তাদের প্রায় একচেটিয়া ছিল বললেও চলে। সেই তারা চাকরি ছেড়ে পূর্ব বাংলায় চলে যেতে এ দিকে একটা বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল। ডাঃ রায় এবং তাঁর সহযোগী ভূপতি মজুমদার, যিনি স্বরাষ্ট্র (প্রতিরক্ষা) বিভাগের দায়িত্বে

ছিলেন,—তাঁরা দুজন এই পরিস্থিতির সুযোগ নিতে দেরি করেন নি। পরিবহণের তদানীন্তন প্রধান অধিকর্তা এন. সি. ঘোষকে বলা হলো—কিশোর-বয়সী ছেলেদের নাবিকবৃত্তি শেখাবার জন্য একটি পরিকল্প তৈরি করতে। ভারত সরকারের কাছ থেকে ঋণস্বরূপ একটি স্টীমার চেয়ে এনে তার সাহায্যে কলকাতায় একটি শিক্ষণ-কেন্দ্র স্থাপিত হলো। কম্যাণ্ডার বসুর শিক্ষকতা ও সক্রিয় সহযোগিতায় ১৯৫০-এর মে মাসে ১০০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৬১ জন পাস করে বেরুলো এবং চাকরি পেলো। ১৫ই জুলাই নাবিকদের শিক্ষা-সমাপ্তির স্মারক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষার্থীদের বললেন,—অতীতকালে ভারতের জল-পথে যে বাণিজ্য চলতো, তারা যেন সেই ঐতিহ্যকে আবার ফিরিয়ে আনে। তিনি বললেন,—তোমরা মনে রেখো, ভারতের সওদাগর সেদিন ভারত মহাসাগর পাড়ি দিতো। তখন বালেশ্বর ছিল বাংলার মধ্যে। এই বালেশ্বরে তৈরি জাহাজগুলো তাদের নাবিকদের সুদূর টেমস নদীতে নিয়ে যেতো, সঙ্গে নিয়ে যেতো রেশমের পসরা।

এইভাবে দেশের ছেলেদের সামনে একটা নতুন পথ খুলে গেল। সেই থেকে এই কেন্দ্রে শিক্ষা শেষ করে বহু ছেলে চাকরি পেয়ে গেছে।

১৯৫০ ছিল সংকটজনক বছর। শুধু উদ্বাস্তুদের জন্য নয়, খাদ্যের দিক থেকেও বটে। সারা দেশের খাদ্য পরিস্থিতি ছিল সংকটজনক। বিহারে হয়েছিল প্রায়-দুর্ভিক্ষের অবস্থা। খবরের কাগজে প্রচুর লোক অনাহারে রয়েছে খবর বেরুতে লাগলো। পশ্চিমবঙ্গে এই বছরের জুলাইয়ের প্রথম দিকে প্রায় দু লক্ষ টন যে খাদ্য-ঘাটতি দাঁড়ালো, তার কারণ হচ্ছে এক দিকে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুর আগমন, অন্য দিকে আউস ধানের দু-লক্ষ একর জমিতে পাট-চাষের প্রবর্তন। তাছাড়া শস্য-ক্ষতিও একটা কারণ। বঙ্গবিভাগ কাঁচামাল-উৎপাদনের প্রধান যায়গাগুলি ছিনিয়ে নিয়েছিল। বড়ো বড়ো পাটকলগুলি ছিল পশ্চিমবঙ্গে, আর পাট-চাষ হতো পূর্ববঙ্গে। কেটে ছোট-করা এই যে পশ্চিমবঙ্গ, এখানকার ধান ও মাছ-চালানের প্রধান কেন্দ্র ছিল পূর্ববঙ্গ। সেটা চলে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক অবস্থা হয়েছে বিপর্যস্ত এবং বিপুল জন-সংখ্যার ভারে এ দেশ ধুঁকতে আরম্ভ করেছে। সে সময় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মজুদ খাদ্য ছিল ছসপ্তাহের মতো। উদ্বাস্তুদের জন্য চালের দরকার ছিল চল্লিশ হাজার টন। সরকারী খাদ্যভাণ্ডারের এই শোচনীয় অবস্থা মুখ্যমন্ত্রীকে

বিচলিত করলো। ডাঃ রায় জানতেন, রেশনিং-ব্যবস্থা যদি একবার ভেঙে পড়ে, তাহলে সরকারের আসন টলে যাবে, আর এই গোলযোগপূর্ণ শহরে খাদ্য নিয়ে দাঙ্গা বেঁধে যাবে। খাদ্যভাণ্ডারের এই শোচনীয় অভাব যাতে দূর হয়, তার জন্য তিনি এবং তাঁর খাদ্যমন্ত্রী কতবার যে দিল্লী গিয়েছিলেন তার ঠিক নেই। অমন যাঁর অটুট স্বাস্থ্য, সেই ডাঃ রায় রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক সংকটের চাপে বেশ শুকিয়ে গিয়েছিলেন সেই সময়। খাদ্য-সংকটের সময় তাঁর খাদ্য-তালিকা থেকে তিনি ভাত উঠিয়ে দিয়েছিলেন। ভাত খেতেন শুধু রবিবার অথবা বিশেষ কোনো উপলক্ষ ঘটলে। এ সব খবর প্রচারলাভ করে নি, নিতান্ত ঘনিষ্ঠ মহল ছাড়া এ কথা কেউ জানতেও পারে নি। লক্ষ লক্ষ গৃহকর্ত্রী সাক্ষ্য দেবেন যে, ডাঃ রায় যতদিন রাজ্যের রশ্মি ধরেছিলেন, ততদিন রেশন-ব্যবস্থা কখনো ভেঙে পড়ে নি। শুধু তাই নয়, প্রকৃতিদেবী যখনই কৃপা করেছেন বা কেন্দ্র থেকে যখনই খাদ্য পাওয়া গেছে, তখনই তিনি রেশনে চালের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে বিন্দুমাত্র ইতস্তত: করেন নি।

১৯৫০-এর আগস্ট-সেপ্টেম্বরে নাসিক-কংগ্রেসের জন্য প্রতিনিধি-নির্বাচন নিয়ে প্রদেশ কংগ্রেসের মন্ত্রিগোষ্ঠী ও ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের গোষ্ঠী (খাদি গোষ্ঠী) এবং সুরেন্দ্রমোহন ঘোষের (যুগান্তর গোষ্ঠীর) মধ্যে ক্ষমতা-দ্বন্দ্ব নতুন করে প্রকট হয়ে দেখা দিলো। মন্ত্রিগোষ্ঠীর নেতৃত্ব করছিলেন অতুল্য ঘোষ। তাঁকে মদত দিচ্ছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী, খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন, কালীপদ মুখোপাধ্যায় ও অন্য কয়েকজন মন্ত্রী। অতুল্য ঘোষ কলকাতার ছোট একটা ব্যাংকের কেরাণী ছিলেন এক সময়। কে-ই বা তখন চিনতো? সামান্য অবস্থা থেকে উঠেছিলেন তিনি। রাজনীতিতে প্রবেশ করেছিলেন হুগলির এক গ্রামাঞ্চল থেকে। তাঁর রাজনৈতিক গুরু প্রফুল্লচন্দ্র সেনের সঙ্গে তিনি অসহযোগ আন্দোলনের দিনে অনেকবার জেল খেটেছিলেন। সুভাষচন্দ্র বসুর ও যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের আমলে কলকাতার লোক তাঁর সম্পর্কে খুব কমই জানতো। ডাঃ রায়ের মন্ত্রি-সভার যখন পত্তন হলো, তখনই তিনি পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে দেখা দিলেন। নিদারুণ খাটতে পারতেন বলেই তিনি সংগঠনের পুরোভাগে চলে আসতে পেরেছিলেন। সর্বসম্মতিক্রমে তিনি প্রাদেশিক কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হয়েছিলেন এবং কংগ্রেস-সংগঠনকে তিনি ধীরে ধীরে তাঁর কব্জার মধ্যে নিয়ে আসেন। এতে তাঁর নেতা ডাঃ রায়ের ছিল পূর্ণ সমর্থন।

আমার মনে আছে, ১৯৬৭র সাধারণ নির্বাচনের আগে যখন কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী ডঃ ভি. কে. আর. ভি. রাও কলকাতা সফরে এসেছিলেন, তখন তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন আমাকে বলেছিলেন কীড ষ্ট্রীটে সরকারী অতিথি ভবনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। ডঃ রাও বিশ্রম্ভালাপের মুহূর্তে কংগ্রেসদলের নির্বাচন-সম্ভাবনা নিয়ে আমার সঙ্গে খানিকটা আলোচনা করেছিলেন। কথায় কথায় অতুল্য ঘোষ সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন, 'সংগ্রাম-কৌশলে তিনি একজন সুনিপুণ ব্যক্তি'।

যাইহোক, ১৯৫০-এর ১৭ই সেপ্টেম্বর বিপুল সংখ্যাধিক্যের সমর্থনে অতুল্য ঘোষ এবং বিজয়সিং নাহার পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেসের যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক মনোনীত হলেন। এবং এই সময় থেকে প্রাদেশিক কংগ্রেসে অতুল্যবাবুর আধিপত্য ছিল দেড় দশক ধরে অব্যাহত, যতদিন না কংগ্রেস ভাগ হয়ে কংগ্রেস (সংগঠন) ও কংগ্রেস (আর), এই দুটি দলে গিয়ে পরিণতি লাভ করেছিল।

ডাঃ রায়ের জীবিতকালে অতুল্য ঘোষ ও তাঁর গোষ্ঠীকে ক্ষমতাচ্যুত করার বড়ো রকম চেষ্টা হয়েছিল দুবার। প্রথম বার হয়েছিল তখন, যখন উত্তর কলকাতার পুনর্নির্বাচনে অশোক সেন হেরে গিয়েছিলেন। আর দ্বিতীয় বারের ঘটনা ঘটেছিল দক্ষিণ কলকাতার উপনির্বাচনের সময়, যখন সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করে বামপন্থীদের সমর্থনে নির্দলীয় প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। এই দুই নির্বাচনেই কংগ্রেস প্রার্থী বিপুল ভোটের ব্যবধানে হেরে গিয়েছিল। কিন্তু এই ধরনের প্রত্যেক সংকটেই অতুল্যবাবু তাঁর নেতা ডাঃ রায়ের দৃঢ় সমর্থন লাভ করেছিলেন। তাঁর পক্ষপুটাশ্রয়ে তিনি ছিলেন নিরাপদ। ডাঃ রায় এবং জওহরলাল নেহেরুর মৃত্যুর পরে সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটিতে অতুল্যবাবুর ক্ষমতায় আরোহণ পুরোপুরি পাকা হয়ে গিয়েছিল। পার্টি-সিণ্ডিকেটের সর্বোচ্চ কর্তাদের একজন হওয়ায় তাঁর আসন ছিল গুরুত্বপুর্ণ। কামরাজ নাদার, এস. কে. পাতিল ও মোরারজী দেশাইয়ের সঙ্গে তাঁর মিলনই নেহেরুর পর লাল বাহাদুর শাস্ত্রীকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রধানমন্ত্রীর পদে বসানো সম্ভবপর করেছিল। আবার শাস্ত্রীর মৃত্যুর পর প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর মনোনয়নের পথ পরিষ্কার করেছিল তাঁদের ঐ মিলিত শক্তিই।

অতুল্য ঘোষ তাঁর প্রধান কেন্দ্র কলকাতা থেকে দিল্লীতে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং কংগ্রেস সংগঠনকে চালিত করবার জন্য এখানেই তিনি কাটাতেন বছরের অধিকাংশ সময়। ১৯ নং ক্যানিং লেনের বাসা কংগ্রেস-মুখ্যমন্ত্রী ও নেতাদের ভীড়ে গিসগিস করতো। আমি বহু বার তাঁর দিল্লীর বাসায় গেছি ডাঃ রায়ের সঙ্গে, অথবা পরে প্রফুল্লচন্দ্র সেনের সঙ্গে। তাঁর আতিথেয়তার জন্য তিনি বিখ্যাত ছিলেন। ছোট-বড়ো সব রকম অতিথির জন্যই ছিল তাঁর উদার দাক্ষিণ্য। তাঁর রেফ্রিজারেটরে মজুদ থাকতো রাজধানীর সব থেকে ভালো মিষ্টি, আর সব থেকে ভালো মৌসুমী ফল। যখনই যেতাম তখনই আমি তার সদ্ব্যবহার করতাম। আমি অতুল্যবাবুকে ঘনিষ্ঠভাবে চিনতাম অনেক আগে থেকে, যখন তিনি সন্ধ্যাবেলা নিয়মিত আসতেন ডাঃ রায়ের বাড়িতে, আর তাঁর ফেরার জন্য অপেক্ষা করতেন। সে সময় খুব খোলাখুলিভাবে তিনি আমাদের সঙ্গে আলোচনা করতেন। তাঁর দরকার ছিল ডাঃ রায়ের সমর্থন, আবার ডাঃ রায়ের দরকার ছিল তাঁর সমর্থন। এবং তাঁদের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম বোঝাপড়া ছিল, কেউ কারুর ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতেন না। ফলে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস সংগঠন ও মন্ত্রিসভার মধ্যে ছিল পূর্ণ সহযোগিতা, যার শোচনীয় অভাব ছিল অন্য অনেক রাজ্যে। এ দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গ ছিল উদাহরণস্থল। দুজনের মধ্যে সংঘাত যে একেবারেই ঘটে নি তা নয়, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ ও সারা ভারত জুড়ে ডাঃ রায়ের আধিপত্য ও জনপ্রিয়তা থাকায় সে সংঘাত খুব কমই সবার দৃষ্টিগোচর হয়েছে।

দলের ভিতরকার বিরোধ এবং পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস-সংগঠনে ক্ষমতা-দখলের সমস্ত আশা ও রায়-মন্ত্রিসভাকে হটিয়ে নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের চেষ্টা—এই সবই নির্মূল হয়ে গেল ১৯৫০-এর শেষাশেষি। প্রাদেশিক কংগ্রেসের পুনর্গঠনের দু মাসের মধ্যেই ঘটলো প্রথম বড়ো রকমের দল-ছুটের ঘটনা স্বাধীন পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে। ডঃ ঘোষ ও ডঃ সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে খাদি-গোষ্ঠী ও অন্য একশ জন কংগ্রেসী মিলে এক নতুন স্থানীয় দল গঠন করলেন, তার নাম হলো 'কৃষক-প্রজা-মজদুর পার্টি।' এদের আদর্শ হলো একটি "শ্রেণীহীন শোষণমুক্ত গণতন্ত্র"-এর প্রতিষ্ঠা। দল-ছুটরা প্রশাসনকে দুর্নীতিগ্রস্ত এবং ব্যাপক কালোবাজারী আর জনগণের দুর্দশার উৎস বলে গাল দিতেন।

এর আগে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস পরিষদীয় দলের সম্পাদক হেমন্তকুমার বসু কংগ্রেস এম এল এ পদে ইস্তফা দিয়ে নিজেকে দল থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিলেন। পরে 'ফরোয়ার্ড ব্লক' নামে পরিচিত এক সর্বভারতীয় দল গঠন করেছিলেন তিনি। এবং ১৯৭১ সালে খুন হওয়া পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে এই দলের তিনিই ছিলেন অবিসম্বাদী নেতা।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এই সব দল-ছুটের কারণ কি? নৈরাশ্যই কি এর কারণ? না, এই আন্তরিক বিশ্বাস যে, পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস ও কংগ্রেস সরকার তাঁদের এতদিনকার আদর্শ থেকে সরে যাচ্ছেন? পরবর্তীকালে, বিশেষ করে ১৯৫২ আর ১৯৫৭-র দুই সাধারণ নির্বাচনের সময় এই রাজ্যে ব্যাঙের ছাতার মতো বহু রাজনৈতিক দল গজিয়ে উঠেছিল বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতির সুযোগ নেবার জন্য, কিন্তু জলের বুদ্বুদ জলে মিলিয়ে যাবার মতো তাদের অনেকগুলিই বিলীন হয়ে গেছে।

শ্রীঅরবিন্দের মহাপ্রয়াণ

১৯৫০ সালটি নানাদিক থেকেই ঘটনাবহুল। এই বছরেই মারা গেলেন ভারতের দুই মহান পুরুষ শ্রীঅরবিন্দ ও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। শ্রীঅরবিন্দের মৃত্যু-সংবাদ ডাঃ রায় পেলেন ৬ই ডিসেম্বর রাত দেড়টায়। সরকারী অফিস, স্কুল, কলেজ সব বন্ধ রাখতে নির্দেশ দিলেন তিনি। সওদাগরী অফিসগুলো বন্ধ ছিল, বন্ধ ছিল রাস্তার দোকানগুলিও। সন্ধ্যাবেলা রাজ্যপাল কাটজু একটি বেতারভাষণ দিলেন। কিন্তু সারা দেশকে যা সেদিন চমৎকৃত করেছিল, তা হচ্ছে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত, কারণ, "তাঁর দেহ অপার্থিব আলোর ছটায় এমন উদ্ভাসিত ছিল যে, কোথাও বিকৃতির কোনো চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল না।"

প্যাটেলের মৃত্যু

ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ। মুখ্যমন্ত্রী বসে আছেন তাঁর অফিস-ঘরে। এমন সময়, সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ দিল্লী থেকে আমি এক টেলিফোন পেলাম। টেলিফোন এসেছিল সর্দার প্যাটেলের দিল্লীর বাসা থেকে। আমি টেলিফোন লাইনটা ডাঃ রায়ের ঘরের টেলিফোনের সঙ্গে সংযোগ করিয়ে দিলাম। কথাবার্তা হচ্ছিল প্যাটেলের অসুখ নিয়ে। সর্দার ক্রমশই দুর্বল হয়ে পড়ছেন এবং রাত্রে

একেবারেই ঘুম হচ্ছে না। সেজন্য এখুনি ডাঃ রায় যেন দিল্লী চলে আসেন, এই অনুরোধ।

এর পরেই ডাঃ রায় আমাকে এক নাম-করা ঔষধের দোকানে পাঠিয়ে 'সোম্‌নিকেন' বলে একটি ঔষধ কিনিয়ে আনালেন। পরে শুনেছিলাম, এই ঔষধটি নাকি রোগীর পক্ষে মন্ত্রের মতো কাজ করেছিল। কিন্তু থাক সে কথা। আরেকটি টেলিফোন এলো তাঁর বন্ধু প্রখ্যাত শিল্পপতি জি. ডি. বিড়লার কাছ থেকে। তিনি জানালেন, তাঁর ব্যক্তিগত প্লেনখানা দমদম বিমান বন্দরে প্রস্তুত থাকবে বেলা এগারোটা নাগাদ। মুখ্যমন্ত্রী আমাকে বললেন,—আমার সঙ্গে দিল্লী যেতে হবে তোমাকে। এয়ার পোর্টে চলে যাবে ঠিক সময়মতো।

এই প্রথম আমি বিড়লার শীততাপনিয়ন্ত্রিত ডাকোটা বিমানে উঠলাম। বিমানের ভিতরে আবার শব্দ পৌঁছয় না এমন একটি প্রকোষ্ঠ ছিল। যাই হোক, বারোটা নাগাদ দমদম থেকে ছেড়ে আমরা সন্ধ্যার কাছাকাছি দিল্লী গিয়ে পৌঁছলাম। পরদিন ভোরবেলা কলকাতা থেকে আনা ওষুধ সঙ্গে নিয়ে ডাঃ রায় প্যাটেলের বাসায় গেলেন। কিছুক্ষণ ছিলেন তিনি রোগীর কাছে। ডাক্তার হিসাবে ওঁকে পুরোপুরি পরীক্ষা করে আর স্থানীয় ডাক্তার যাঁরা তাকে একেযোগে দেখছিলেন, তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি ওষুধের ব্যবস্থাপত্র দিলেন। বিকেলের দিকে বাসায় ফিরে এলেন কয়েকজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে তাঁদের অফিসে দেখা করে। রাত্রিবেলা গেলেন প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর সঙ্গে দেখা করতে। পরদিন সকালে কয়েকজন বন্ধু দেখা করতে এলে প্যাটেল-সম্পর্কে তিনি বললেন,—'দিল্লীর ঠাণ্ডা রোগীর পক্ষে ভালো নয়। সেজন্য আমি পরামর্শ দিয়েছি ওঁকে বোম্বাইয়ের অনুকূল আবহাওয়ায় নিয়ে যেতে। যা ওষুধ দিয়েছি, তাতে মনে হয় সর্দারের ভালো ঘুম হবে (এবং সত্যিই তা হয়েছিল), আর ফলে কোনো ঝুঁকি না নিয়েই তিনি বোম্বাই যাত্রা করতে সক্ষম হবেন।

তাঁর পরামর্শ অনুসারে সর্দার প্যাটেলকে বোম্বাই নিয়ে যাওয়া হলো কয়েক-দিন পরেই। কিন্তু দুরন্ত হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে প্যাটেল শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন ১৫ই ডিসেম্বর। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে ডাঃ রায় বললেন,—'তাঁর মৃত্যু অপ্রত্যাশিত ছিল না। দেশের কাছে তিনি ছিলেন দৃঢ়তার প্রতীক। তাঁর মৃত্যু আমার ব্যক্তিগত ক্ষতি, কারণ যে দিন থেকে এ রাজ্যের প্রশাসনের কাজ আমি তুলে নিয়েছি, সে দিন থেকে আমি তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ

ছিলাম। প্রশাসনের দিক থেকে তাঁর বাস্তবসম্মত পরামর্শ ও নির্দেশের ওপর আমি সব সময়ই নির্ভর করতে পেরেছি।'

এ সব ঘটনার আগে নাসিক কংগ্রেসের সভাপতিত্ব নিয়ে কংগ্রেসের উঁচু মহলে বিরোধ দেখা দিয়েছে বলে শোনা যাচ্ছিল। সর্দার প্যাটেল সমর্থন করছিলেন পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডনকে, কিন্তু নেহেরু সেটা চাইছিলেন না এই কারণে যে ট্যাণ্ডন ছিলেন দক্ষিণ পন্থী। কংগ্রেস হাই কম্যাণ্ড করতেন কী, সভাপতি-নির্বাচনের জন্য প্রার্থী তাঁরা আগেভাগে বাছাই করে নিতেন, পরে প্রদেশ কংগ্রেস প্রতিনিধিদের মাধ্যমে নির্বাচন কাকে করতে হবে, সে বিষয়ে বেসরকারী নির্দেশ পাঠাতেন। প্যাটেল ডাঃ রায়কে চিঠি লিখেছিলেন, ফোনেও কথা বলেছিলেন, তিনি যেন অতি অবশ্যই নাসিক কংগ্রেসে যোগদান করেন। আবার নেহেরুও ডাঃ রায়কে নাসিকে আসিতে বলেছিলেন। সেজন্য আমরা জানতাম মুখ্যমন্ত্রী নাসিকে যাবেনই। কিন্তু না, তিনি যান নি। দুজনকেই তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, ঐসময় রাজ্যের কতগুলি প্রয়োজনীয় বিষয়ের জন্য তাঁর এখানেই থাকা দরকার এবং সেজন্য তাঁর পক্ষে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এখন, আমাদের প্রশ্ন, কেন তিনি গেলেন না? আসল কথা, ভারতের সর্বোচ্চ দুই নেতার মধ্যেকার এই অন্তর্বিরোধে তিনি নিজেকে জড়াতে চাইছিলেন না। দুজনেই তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু, একজনকে চটিয়ে আরেকজনকে খুশি করা তাই তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

এই প্রথম কংগ্রেসের মধ্যে একটি নতুন গোষ্ঠী তৈরি হলো আচার্য কৃপালনীর নেতৃত্বে তাঁর সমর্থকদের নিয়ে। ডাঃ রায় প্রায়ই বলতেন,— 'ভারতে তিনজন কুলি আছে, প্যাটেল, পন্থ আর রায়। তাঁদের কাঁধ চওড়া, ঘাড়ও শক্ত, কংগ্রেসের অর্থসংক্রান্ত বোঝা বইবার পক্ষে উপযুক্ত।

সত্যিই তাই। সংগঠনের জন্য অর্থসংগ্রহের ব্যাপারে এই তিনজন লোকই ছিলেন অগ্রণী।

(৭)

১৯৫১

প্রাদেশিক কংগ্রেসের ওপর মন্ত্রিসভাগোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা, কৃপালনীর নেতৃত্বে বিদ্রোহী গোষ্ঠীর গঠন এবং সর্বোপরি প্যাটেলের মতো শক্ত মানুষের

মৃত্যু, এই সব কারণে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক চেহারাটা পাল্টে গেল। ৮ই ফেব্রুয়ারি যখন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বাজেট অধিবেশন শুরু হলো, তখন মন্ত্রিসভাকে এই সর্বপ্রথম শক্তিশালী বিরোধীপক্ষের সম্মুখীন হতে হলো। ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অন্য ছয়জন এম-এল-এ-কে নিয়ে বিরোধী পক্ষে গিয়ে বসলেন। বসলেন একটি আলাদা ব্লকে, যার নামকরণ হলো তাঁদেরই দলের নাম অনুসারে, কৃষক-প্রজা-মজদুর দল। এর ফলে মোট বিরোধী-সংখ্যা হয়ে দাঁড়ালো উনিশ। এ পর্যন্ত নয়জন মুসলিম লীগ সদস্য এবং দুজন কমিউনিস্ট সদস্য জ্যোতি বসু ও রতনলাল ব্রাহ্মণ এঁরাই বিরোধী পক্ষের ভূমিকা পালন করতেন, যদিও কিছুটা স্তিমিত আকারে। এখন আর সে অবস্থা রইলো না। বিরোধী পক্ষে এমন ব্যক্তিরা গিয়ে বসলেন, যাঁরা কংগ্রেসের স্তম্ভ ছিলেন, যাঁদের আত্মত্যাগের বহু দৃষ্টান্তের স্বাক্ষরও রয়েছে বিদ্যমান। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর মুখ্য সচেতককে বললেন দলের সব সভ্য যাতে নিয়মিত আসে সেটা দেখতে, এবং সেইমতো নির্দেশনামাও বেরিয়ে গেল।

রাজ্যপালের ভাষণ থেকে জানা গেল, পশ্চিমবঙ্গে যে ৩৫ লক্ষ উদ্বাস্তু এসেছিল, তার মধ্যে ১২ লক্ষ পূর্ব বাংলায় তাদের দেশে ফিরে গেছে। সেইরকম, যে ১১ লক্ষ মুসলমান পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে চলে গিয়েছিল, তাদের মধ্যে সাড়ে সাত লক্ষ আবার ফিরে এসেছে। ২৩ লক্ষ উদ্বাস্তুর মধ্যে ১২ লক্ষ সম্পূর্ণ পুনর্বাসন পেয়েছেন বলে সরকার দাবি করছেন। পুনর্বাসন যারা পায় নি, সেই বিরাটসংখ্যক মানুষগুলো, যাদের বেশ বড়ো একটা অংশ কলকাতার আশেপাশে ছড়িয়ে পড়েছিল,—তারা আইন শৃংখলার দিক থেকে গুরুতর সমস্যা সৃষ্টি করছিল। এদেরকে নিজের নিজের কব্জায় আনবার জন্য রাজনৈতিক দলগুলো পরস্পর প্রতিযোগিতা করে এদের দাবিগুলো তুলে ধরছিল, তা সে দাবি ন্যায়সঙ্গত হোক বা না হোক, আইনসম্মত হোক বা না হোক। কলকাতার দক্ষিণ আর উত্তর উপকণ্ঠে রাজনৈতিক দলগুলির দ্বারা চালিত হয়ে দলে দলে উদ্বাস্তুরা অননুমোদিত জমিতে বসবাস শুরু করে দিল আর এইভাবে বহু যায়গায় উদ্বাস্তু কলোনি গজিয়ে উঠলো, যেগুলিকে পরে বলা হতে লাগলো, 'জবরদখল কলোনি'। 'ভূমি-পরিকল্পনা ও উন্নয়ন আইন' অনুসারে অধিগৃহীত জমিতে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের সরকারী প্রয়াস সময়-সাপেক্ষও বটে, আর তাছাড়া বাধাগ্রস্তও হচ্ছিল বটে। আইনের বলে সরকার

উচিত মূল্যে যে জমি সংগ্রহ করবার চেষ্টা করছিলেন, সে-জমির মালিকরা আদালতে ইন্‌জাংশন এর পর ইন্‌জাংশন এর নালিশ করে সে প্রয়াস বানচাল করে দিচ্ছিল। জোর করে জমি দখল করার ব্যাপারে একটা আন্দোলন করার স্থযোগ এসেছে দেখে, পরস্পরের আদর্শ ভিন্ন হলেও কমিউনিস্ট দল আর ডঃ ঘোষ ও ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল পরস্পরের হাতে হাত মেলাতে দ্বিধা করলেন না।

আমরা দেখেছি, ডাঃ রায় তাঁর মুখ্যমন্ত্রীত্বের কালে উদ্বাস্তদের পশ্চিমবঙ্গের ভিতরে ও বাইরে স্থপরিকল্পিত উপায়ে পুনর্বাসিত করার জন্য অক্লান্ত প্রয়াস করে গেছেন। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁর কোনো পশ্চিমবঙ্গবাসী সহযোগীদের কাছ থেকে আশানুরূপ সমর্থন পান নি। তিনি প্রায়ই বলতেন,—'মানুষই হচ্ছে সত্যিকার সম্পদ, কারণ, সম্পদ তারাই সৃষ্টি করে। সম্পদ আকাশ থেকে পড়ে না। পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তদের মতো কর্মঠ মানুষগুলো যদি ঠিকমতো পুনর্বাসন পায়, তাহলে তারা এই প্রদেশের পক্ষে সম্পদ হয়ে দাঁড়াবে।'

১৯৫০-৫১ এর সালতামামীতে দেখা গেছে, আসল কলকাতার বাঙালীদের জনসংখ্যা অবাঙালীদের থেকে শতকরা পাঁচ মাত্র বেশি। আরও জানা গেছে যে, ব্যবসা-বাণিজ্য বাঙালীদের হাত থেকে ফস্কে যাচ্ছে। কিন্তু উদ্বাস্তদের এই বৃহৎ সংখ্যা বাংলা মায়ের সন্তানদের সপক্ষে ভারসাম্য বজায় রাখছে, তা সে জনসংখ্যার দিক থেকেই হোক, আর ছোট খাটো ব্যবসার দিক থেকেই হোক। শহরের মধ্যে শত শত উদ্বাস্তু যুবকেরা রাস্তায় ফুটপাথ দখল করে বসেছে আর ফেরীওয়ালাদের কাটরা গড়ে উঠেছে।

ওদিকে কৃষক-প্রজা-মজদুর পার্টি, ফরোয়ার্ড ব্লক, এবং আর-সি-পি-আই (সৌম্যেন ঠাকুর)-এর মতো বামপন্থী দলগুলির সঙ্গে সমঝোতা করে তাদের আন্দোলনকে নিয়ে এসেছে বিধানসভার বাইরে। ২৮শে মার্চ দেখা গেল সরকারের 'অননুমোদিত ব্যক্তিদের উচ্ছেদ বিল'-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে বিরোধী পক্ষের নেতা ডঃ স্থরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তদের বিরাট এক মিছিল চালিয়ে নিয়ে আসছেন বিধানসভার দিকে। ১৪৪ ধারার নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করার জন্য বিধানসভার কাছে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌম্যেন ঠাকুর, শ্রীমতী লীলা রায় প্রভৃতি আরও অনেককে গ্রেপ্তার করা হয়, কিন্তু কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁদের আবার ছেড়ে দেওয়া হয়।

ডাঃ রায় তাঁর সুদক্ষ সহকর্মীদের দুজনকে হারালেন। একজন হলেন কিরণ শঙ্কর রায়, তিনি মারা গেলেন। আর একজন নলিনী সরকার, দীর্ঘস্থায়ী অসুখের জন্য তিনি খুব কমই আসতে পারতেন মহাকরণের দপ্তরে বা বিধান সভায়। তাঁকে সাহায্য ও পরামর্শ দেবার মতো পরিণত রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি একমাত্র প্রফুল্ল চন্দ্র সেন ছাড়া আর কেউ ছিলেন না বললেই হয়। প্রশাসনিক যন্ত্রের বোঝা এবং বিধানসভায় দল পরিচালনার দায়িত্ব প্রায় পুরোপুরি তাঁর কাঁধেই চেপেছিল। বিধানসভায় তর্কবিতর্কের দক্ষতায় তিনি প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তি বলে পরিগণিত হতে লাগলেন। ভাষণগুলো লিখে নিয়ে এসে পড়ে দেওয়ার দিন শেষ হয়ে গেল। যখন চোখাচোখা বক্তৃতা দেবার দরকার হতো তখন দেখা যেতো তিনিই হাজির রয়েছেন সে কাজটা করবার জন্য। চার দিনের বাজেট আলোচনা সাঙ্গ করে তিনি বিরোধী পক্ষকে লক্ষ্য করে তীব্র প্রত্যুত্তরের কশাঘাত হানলেন। ডঃ ঘোষ এবং তাঁর দল যে ব্লকে বসেছিলেন, সেই দিকে আঙুল দেখিয়ে সেই প্রথম তিনি তাঁর চ্যালেঞ্জ জানালেন, বললেন যে যথেষ্ট প্রত্যয়ের সঙ্গেই তাঁর দল আগামী নির্বাচনের সম্মুখীন হতে প্রস্তুত আছে। তিনি বললেন,—'ওঁরা জনগণকে ধোঁকা দিতে পারেন কিছু সময়ের জন্য, কিন্তু জনগণ আমাদের প্রত্যেককে বেছে নেবে আমাদের বক্তৃতার জন্য নয়, আমাদের কাজের জন্য। পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনেই রহস্য ফাঁস হয়ে যাবে ভোটের মাধ্যমে। এই সব নিন্দুকরা যতদূর পারে চেঁচাক, আমরা তার উত্তরে যতদূর পারি কাজ করে যাবো।'

পশ্চিমবঙ্গে প্রথম সাধারণ নির্বাচন হলো ১৯৫২ সালে। দেখা গেল তাঁর চ্যালেঞ্জ ব্যর্থ হয়নি, বিধানসভায় কংগ্রেস একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে জয়যুক্ত হয়ে ফিরে এসেছে।

কথা হচ্ছে, তাঁর দলের জয় সম্পর্কে তাঁর এতো প্রত্যয় এসেছিল কী থেকে? আসল কথা, তাঁর সতর্ক প্রহরায় পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালোর দিকে যাচ্ছিল। মন্ত্রিসভা গঠন করেই তিনি সরকারী উন্নয়নমূলক কার্যকলাপের যে ভিত্তি স্থাপনা করেছিলেন, তা ত্বরান্বিত হচ্ছিল। এটা প্রকাশ পেলো অসুস্থ অর্থমন্ত্রী নলিনীরঞ্জন সরকার প্রদত্ত ১৯৫১-৫২ সালের বাজেটের ব্যয়বরাদ্দ থেকে। মনে আছে অসুস্থ অবস্থায় বিশেষ ধরনের এক হুইল-চেয়ারে বসে অর্থমন্ত্রী বাজেট পেশ করতে এসেছিলেন; চেয়ারটি চেয়ে আনা হয়েছিল তখন-

কার প্রধান বিচারপতি স্যর ট্রেভর হ্যারিসের কাছ থেকে। রাজস্বের খাতে ৩৪ কোটির কিছু বেশি টাকা পাওয়া যাবে বলে ধরা হয়েছিল, আর খরচ ধরা হয়েছিল ৩৮·৮১ কোটি টাকা। ঘাটতি দাঁড়াচ্ছিল ৪ কোটিরও বেশি। এই ঘাটতি নিয়ে শুরু করে পশ্চিমবঙ্গের মোট ব্যয় অবিভক্ত বাংলার ব্যয়বরাদ্দ থেকে কম ছিল না। আগে আগে যা করা হতো তার থেকে যথেষ্ট পরিমাণ বেশি ব্যয়বরাদ্দ এই বিভক্ত বাংলার জাতিগঠনমূলক বিভাগগুলির জন্য স্থির করা হয়েছিল। মন্ত্রিসভার গণ্ডির মধ্যে দেখা যেতো কেন্দ্রের প্রতি আচরণে তিনি বামপন্থী, আবার অর্থনৈতিক বিষয় অথবা সামাজিক বিধিবিধানে তিনি বামপন্থীও নন, দক্ষিণপন্থীও নন, বরং দুই পথের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতেন। এবং তার ঐ দুই সহকর্মীর অবর্তমানে দেখা গেল তিনি বিনা বাধায় গণতন্ত্র ও সামাজিক ন্যায়পরায়ণতার পথ ধরে চলতে পারছেন। সত্যি কথা বলতে কী, সমস্যাসঙ্কুল পশ্চিমবঙ্গে এই পন্থা অবলম্বন করার জন্যই তিনি ও তাঁর দল টিঁকে থাকতে পেরেছিলেন। এ বিষয়ে পরবর্তী কয়েক পৃষ্ঠায় আমি আরও অনেক উদাহরণ দেবো।

৯ই এপ্রিল কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি একটি প্রস্তাব পাশ করলেন—কংগ্রেসীদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান যে শৃঙ্খলার অভাব দেখা যাচ্ছে, সেই বিষয়ে। কংগ্রেস পরিষদীয় দলগুলোর মধ্যে বিশেষ করে এ জিনিসটা দেখা দিয়েছিল, যার জন্য ঘটছিল কংগ্রেসের মর্যাদাহানি। ১০ই এপ্রিল মুখ্যমন্ত্রীদের উদ্দেশে লিখিত এক পত্রে নেহেরু লিখেছিলেন :

প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী,

এই প্রস্তাবের ওপর আমি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছি। আমার আশঙ্কা হচ্ছে আমাদের মধ্যে ঢিলেমি দেখা দিয়েছে। শৃঙ্খলাহীনতার মনোভাব ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র, তা সে আমাদের পরিষদীয় দলগুলিতেই হোক, আর সাধারণভাবে কংগ্রেস সংগঠনেই হোক। সব থেকে দোষী বোধহয় আমাদের নিজেদের পরিষদ এবং এখানকার কংগ্রেস পরিষদীয় দল। আশা করি আমরা সবাই আমাদের এ দশা কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করবো।

ভারত সরকার এবং কখনো কখনো প্রাদেশিক সরকার সম্পর্কে "কলঙ্ক" রটনা করা একটা যেন ফ্যাশান হয়ে উঠেছে। ভাবতে অবাক লাগে, আমাদের নিজেদেরই কিছু লোক আর খবরের কাগজগুলি এসব বিষয়ে কেমন হালকা-

ভাবে কথাবার্তা বলে! আর তার ফলে আমাদের সরকার ও দেশের ওপর শুধু অখ্যাতিই আরোপিত হয়ে যাচ্ছে। সুবৃহৎ সরকারী সংগঠনে দুর্নীতি অথবা কর্তব্যে অবহেলার নিদর্শন কিছু কিছু থাকতে পারে। এ ধরনের কোনো ঘটনা ঘটলে বা সে সব আমাদের গোচরে আনলে আমরা সেগুলির গুরুত্ব অবশ্যই দেবো এবং অপরাধীদের শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করবো। এ বিষয়ে কোথাও কোনো শৈথিল্য থাকবে না। কিন্তু কোনো দায়িত্বশীল ব্যক্তির পক্ষে এটা অন্যায় ও অস্বাভাবিক যে যথোচিত তদন্ত না করে এবং প্রকৃত ব্যাপারটা সত্যি সত্যি কী, সেটা না জেনেই তিনি ভিত্তিহীন ও ধোঁয়াটে নালিশ নিয়ে আসবেন।

আপনাদের বিশ্বস্ত
জওহরলাল নেহেরু

সে সময় পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি কেমন দাঁড়িয়েছিল, তার একটি মূল্যায়ন করেছিলেন ডাঃ রায় পত্রটির উত্তর দিতে গিয়ে। তিনি লিখেছিলেন :

কলিকাতা
১৭ই এপ্রিল, ১৯৫১

প্রিয় জওহর,

তোমার চিঠি আমাকে গভীরভাবে ভাবিয়ে তুলেছে, শুধু এই প্রদেশে যে পরিস্থিতি বিরাজ করেছে সে বিষয়ে নয়, ভারতের বাকি অংশে যে অবস্থার উদ্ভব হয়েছে, সেজন্যও। মানুষের মনের যে প্রতিক্রিয়া, তা স্বভাবতই তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবান্বিত হয়ে থাকে। এই প্রদেশে তুমি জানো, আমাদের শুধু পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের প্রশ্নই বিদ্যমান নেই, রয়েছে উদ্বাস্তুদের প্রশ্ন। তারা আসছে এক ধরণের মানসিক উত্তেজনা নিয়ে, আর সেই সুযোগ নিয়ে আত্মোন্নতিকামী রাজনীতিকরা তাদের কাজে লাগাচ্ছে সরকার ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নানারকম প্রচার চালানোর উদ্দেশ্যে।

আমাদের শুধু বাঙালী ও অবাঙালীর সমস্যাই নেই। এই প্রদেশে আজ অবাঙালীর সংখ্যা শতকরা প্রায় পঁচিশ বা তার বেশি। আমাদের শুধু কমিউনিস্ট ও ফরোয়ার্ড ব্লকের সমস্যাই নেই, এরা উভয়েই এখন খুব সক্রিয়। আমাদের প্রদেশে রয়েছে বেশ বড়ো সংখ্যার এক দল পোক্ত ও পুরোনো কংগ্রেস কর্মীর সমস্যা যারা চূড়ান্তভাবে কংগ্রেস ছেড়ে দিয়ে কংগ্রেস ও কংগ্রেস সরকারকে

উচ্ছেদ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে, একবার সুযোগ পেলেই হয়। এ ছাড়া রয়েছে এমন সব এলাকা যেখানে তফসিলী সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা খুব বেশি। এদের অনেকেই এক ধরনের হীনমন্যতায় ভোগে আর নালিশ করে এই বলে যে যতখানি তাদের প্রাপ্য ততখানি তাদের জন্য কাজ করছে না কংগ্রেস। কিন্তু এ সব সমস্যাকে ছাপিয়ে যে সমস্যা বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে আজ দাঁড়িয়েছে তা হলো এই প্রদেশে বহাল তবিয়তে থাকা গুণ্ডার দল। এরা যে, সব সময় কোনো রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীর মধ্যে থাকে এমন নয়, এরা শুধু ঘোরালো পরিস্থিতির সুযোগ নেবার অপেক্ষায় থাকে এবং বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি করে বেড়ায়।

তোমার বিশ্বস্ত

বিধান

শরৎচন্দ্র বসুর মৃত্যু এবং কংগ্রেস দল থেকে হেমন্তকুমার বসুর বিচ্ছিন্ন হয়ে আসার ফলে দুটি পদ শূন্য হয়। এই পদ দুটি কিছু দিন পর্যন্ত পূরণ করা হয়নি। এ নিয়ে দুই নেতার মধ্যে চিঠি লেখালেখি চলে। নেহেরুর উত্তরের মধ্যে তাঁর তখনকার ভাবধারাই প্রকাশ পেয়েছে।

কলকাতা

১০।১১ই মে ১৯৫১

প্রিয় জওহর,

তুমি বোধহয় জ্ঞাত আছো যে, দক্ষিণ কলকাতায় শরৎচন্দ্র বসুর মৃত্যুর জন্য এবং উত্তর কলকাতায় একজন সদস্য পদত্যাগ করায় বিধানসভায় যে দুটি পদ শূন্য হয় তা পূরণ করতে হবে। দুটি আসনই কিছুদিন ধরে খালি পড়ে আছে। আমি ইতস্তত করছিলাম এই কারণে যে আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি, কলকাতার যে কোনো নির্বাচন এমনই মত্ততার সৃষ্টি করে যে সারা শহর আবর্তিত হতে থাকে আর সমস্ত জিনিসটাই আইন শৃংখলার সমস্যায় এসে দাঁড়িয়ে যায়। অপর পক্ষে পরবর্তী নির্বাচন নভেম্বরের কোনো এক সময় অর্থাৎ এখন থেকে ছ মাস পরে হবে বলে মাত্র ছমাসের জন্য প্রার্থী হতে চাইবেন এমন লোক আমাদের পক্ষে পাওয়া সম্ভবপর না-ও হতে পারে, কারণ পরবর্তী নির্বাচনকালে নির্বাচনকেন্দ্র এমন বদলে যেতে পারে যে এখন যিনি নির্বাচিত হবেন, তখন হয়ত ঐ এলাকার সঙ্গে তার কোনো সংযোগই

রইলো না। এমন অবস্থায় এ ব্যাপারটা কিছুদিনের মতো একেবারে মুলতুবি রাখবো কি না ভাবছিলাম। তোমার কি মত?

তোমার বিশ্বস্ত
বিধান

নয়াদিল্লী
১৩ই মে ১৯৫১

প্রিয় বিধান,

বিধানসভার শূন্যপদ সম্পর্কে তোমার ১১ই মের চিঠি। এ বিষয়ে খুব বেশি পরামর্শ আমি তোমাকে দিতে পারবো বলে মনে হয় না। তোমার যুক্তির আমি প্রশংসা করি। আবার এও ভাবছি, অন্যভাবে অন্য কোনো যুক্তি দেওয়া যেতে পারতো কি না। আমার মনে হচ্ছে এই ব্যাপারে সব থেকে ভালো হয় যদি তুমি পরিষদীয় বোর্ডকে জানাও। যদি তুমি রাজী হও আমিও জানাতে পারি অথবা তুমি নিজেই সরাসরি সেটা করতে পারো।

যা সব ঘটছে তাতে আমি আদৌ সুখী নই। আমার প্রকৃতি এমন নয় যে দলীয় গণ্ডীর মধ্যে কাজ করতে পারি, আবার ডিক্টেটর হবার মতো মনোভঙ্গিও আমার নেই। আমার চারদিকে বুদ্ধিমত্তা ও নৈতিকতার দিক থেকে এমন নিচু স্তর বিরাজমান যে দেখেশুনে আমার ঘেন্না ধরে গেছে। শেষ পর্যন্ত আমি যে কী করবো জানি না।

আমার পরামর্শ এই যে তুমি ঐ শূন্য পদ সম্পর্কে পরিষদীয় বোর্ডকে সরকারীভাবে চিঠি লিখে দাও।

তোমার স্নেহের
জওহর

জুনমাসে মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীকে দুটি নোট পাঠালেন। একটি প্রধানমন্ত্রীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে, অপরটি ঢাকার ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনার বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে। বৈদ্যনাথবাবু আসাম রাজনীতিতে যোগদান করতে চাইছিলেন। নেহেরু এর উত্তর দিলেন ২১শে জুন:

প্রিয় বিধান,

আমি সবে দিল্লী ফিরে এসেছি। আর এসেই পেলাম তোমার দুটি নোট, তার একটি হচ্ছে আমার স্বাস্থ্যসম্পর্কিত। তোমার উপদেশের যে আমি

কতখানি মূল্য দেই তা তুমি জানো। একথা সত্যি যে আমি ক্লান্ত এবং শ্রান্ত, আর এই ক্লান্তি আমার মধ্যে এখনো বর্তমান। তার প্রধান কারণ এই যে আমি পুরোপুরি কার্যক্ষম হয়ে ওঠবার অবসরই পাচ্ছি না। ২৬ তারিখে কাশ্মীর যাবো ভাবছি তা-ও ঠিক সাত দিনের জন্য। সময়টা আরও বাড়াতে পারলে হতো, কিন্তু কোনমতেই তা পারছি না।

তোমার অপর চিঠিখানি হচ্ছে ঢাকা থেকে বি মুখার্জী যে পদত্যাগ করতে চাইছেন সে সম্পর্কে। আমি জানি না কেন তিনি এটা চাইছেন। যাই হোক আসামের মুখ্যমন্ত্রী মেধির কাছ থেকে একখানা চিঠি আমি পেয়েছি। এতে তিনি বি মুখার্জীকে ছেড়ে দিতে বলছেন এই কারণে যে, সংগঠনের দিক থেকে কংগ্রেস করিমগঞ্জে তাঁর উপস্থিতি চাইছে। তাঁর মতে বি মুখার্জীই একমাত্র লোক যিনি এটা পারেন। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে নির্বাচনী প্রচারের দিকে লক্ষ্য রেখেই এটা তিনি চাইছেন। মুখার্জী যে পদত্যাগ করতে চাইছেন এটাই বোধহয় তার একটি কারণ।

আমি জানি না মুখার্জী চলে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করবেন কি না। যদি করেন তাহলে ওঁকে আমরা জোর করে ধরে রাখতে পারি না। সে ক্ষেত্রে ওঁর যায়গায় অন্য কোনো লোকের কথা আমাদের ভেবে দেখতে হবে। এ বিষয়ে তুমি একটু চিন্তা করে দেখবে কী?

তোমার স্নেহের

জওহর

ময়ূরাক্ষী প্রকল্প

বহুমুখী ময়ূরাক্ষী প্রকল্পের একটি প্রয়োজনীয় পর্যায় সমাপ্ত হওয়ায় সেটির সূচনা করার জন্য ২৯শে জুলাই একটি বিশেষ সেলুনে করে মুখ্যমন্ত্রী বীরভূম জেলার সিউড়ি রওনা হয়ে গেলেন। তাঁর সঙ্গে গেলেন সেচমন্ত্রী, সংশ্লিষ্ট অফিসার আর বিধানসভার কয়েকজন সদস্য। রাজনৈতিক বিরোধের আবর্তের মধ্যেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার প্রথম বড়ো কৃতিত্ব অর্জন করলেন নির্ধারিত সময়ের দু বছর আগেই সিউড়ি শহরের নিকটবর্তী তিলপাড়া ব্যারেজ ও সেচ খালগুলির আনুষ্ঠানিক সূচনা ঘটাতে পেরে। পরদিন বেলা ১০টা ২০ মিনিটে জলাধারের গেটগুলি খুলে দেওয়ার যন্ত্রের

হাতল ঘুরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সেই সূচনা করলেন, আর ১৫০ মাইল ব্যাপী খালগুলিতে জলের স্রোত প্রবাহিত হতে লাগলো। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল সেচ ব্যবস্থা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং জলবিদ্যুৎশক্তির উৎপাদন। তাঁর কার্যকালে এই ধরনের আরও বহু পরিকল্পের কাজ হয়েছিল। সিউড়ির জনগণ মুখ্যমন্ত্রীকে বিপুল অভিনন্দন জানালেন। তিনি কলকাতা ফিরে এলেন তার পরদিন।

কিদোয়াই সংক্রান্ত ঘটনা

আচার্য কৃপালনী কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে কিষান-মজদুর-প্রজা পার্টি গঠন করার পরই দিল্লীতে কংগ্রেস নেতৃত্বে আবার এক তীব্র বিভেদ দেখা দিলো। কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রী রফি আহমেদ কিদোয়াই চার বছর ধরে নেহেরুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ থাকার পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিলেন এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করার ইচ্ছা পর্যন্ত প্রকাশ করেছিলেন। ডাঃ রায় ও কিদোয়াই ছিলেন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাই ডাঃ রায় গেলেন দিল্লী এই বিরোধ মেটাতে আর কিদোয়াইকে কংগ্রেস সংগঠন ছাড়তে বারণ করতে। কিদোয়াই-এর অফিসে যখন তিনি গেলেন তখন আমি সঙ্গে ছিলাম। কিদোয়াই-এর ঘরের সামনে ডাঃ রায়কে সাংবাদিকরা ছেঁকে ধরলেন। তাঁকে দেখামাত্রই তাঁরা অভিনন্দন জানালেন, বললেন, মধ্যস্থতা করবার পক্ষে উপযুক্ত লোকই এবার এসেছেন।

ডাঃ রায় তাঁদের প্রশ্নাবলীর উত্তর-টুত্তর দিয়ে কিদোয়াইয়ের ঘরে ঢুকে গেলেন এবং দুজনে রুদ্ধদ্বারকক্ষে কাটালেন দীর্ঘ সময়। কিন্তু ডাঃ রায় দিল্লী থেকে চলে আসার দিন-কতক পরেই কিদোয়াই পদত্যাগ করলেন ২রা আগস্ট। তিনি যোগ দিলেন কৃপালনীর নতুন দলে। অন্তত এই সময় দেখা গেল তাঁর মধ্যস্থতা ফলপ্রসূ হলো না। নেহেরু-কিদোয়াই বিরোধের উৎস ছিল এই যে, কিদোয়াই চাইছিলেন কংগ্রেস বিরোধী রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশ নিতে, আর নেহেরু তাতে কিছুতেই মত দিচ্ছিলেন না।

প্যাটেলের মৃত্যুর পর কংগ্রেস বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল দুটি শিবিরে, একটি ছিল প্রধান মন্ত্রীর গোষ্ঠী, অপরটি কংগ্রেস সভাপতি পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডনের গোষ্ঠী। অনেক প্রদেশেই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে নিয়ন্ত্রণ করছিলেন সভাপতির সমর্থকরা—যদিও জনসাধারণের সমর্থন ছিল নেহেরুর দিকে। ডাঃ

রায় বুঝেছিলেন, ছ মাসের মধ্যে দেশের সামনে সাধারণ নির্বাচন; এ সময় প্রধান মন্ত্রীর হাত শক্ত করতেই হবে, যদি কেন্দ্রে ও প্রদেশগুলিতে কংগ্রেসকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনতে হয়। প্রধানমন্ত্রী ও কংগ্রেস সভাপতির মধ্যে সমঝোতা আনবার জন্য অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছিলেন ডাঃ রায়, পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ ও লালবাহাদুর শাস্ত্রী। পশ্চিমবঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষ ইতিপূর্বে সভাপতি নির্বাচনের সময় কৃপালনীর বিরুদ্ধে ট্যাণ্ডনকে সমর্থন করেছিলেন। এবার তাঁরা তাঁদের সমর্থন জানালেন, যাঁরা চেষ্টা করছিলেন যাতে স্বেচ্ছায় ট্যাণ্ডন পদত্যাগ করে মুখ্যমন্ত্রীকে জায়গা ছেড়ে দেন। প্রদেশ কংগ্রেসের এই কাজের মূলে বহুলাংশে ছিলেন ডাঃ রায়। দিল্লীতে তিনি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছিলেন কখনো দিনে দুবার করে এবং সেই সংকটকালে তাঁর নীরব ভূমিকাই ট্যাণ্ডনের পদত্যাগের পথ সুগম করে দিয়েছিল। নেহেরু হয়েছিলেন কংগ্রেস সভাপতি, আর সংকটও সেই সঙ্গে কেটে গিয়েছিল।

নেহেরু-ট্যাণ্ডনের এই বিরোধ সম্পর্কে দুখানি চিঠির কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। একখানা নেহেরুর ডাঃ রায়কে লেখা, অন্যখানা তার উত্তরে ডাঃ রায়ের লেখা। চিঠিখানা লিখেছিলেন নেহেরু ১৭ই আগস্ট, ডাঃ রায় তার উত্তর দিয়েছিলেন ২৪ আগস্ট। নেহেরুর চিঠির কথাই প্রথমে বলা যাক। নেহেরু তার এক জায়গায় লিখেছিলেন, ট্যাণ্ডনের সঙ্গে আমার আসল বিরোধটা আদর্শের বিরোধ, দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধ। সংকটের মুহূর্তে যখন গুরুতর সিদ্ধান্ত নিতে হয়, তখন এই মতবিরোধ হয়ে দাঁড়ায় বাধাস্বরূপ, কাজকর্মেরও বিঘ্ন ঘটায়। তাছাড়া সামগ্রিক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর সঙ্গে আমার কাজ করা আরও কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমান ওয়ার্কিং কমিটির কথা যদি ধরা যায়, সেখানেও ফিরে যেতে আমি চাই, না গেলে কমিটিতেই শুধু আমি ঠুটো জগন্নাথ হয়ে যাবো না, অন্যত্রও তাই। এটা আমার পক্ষেও ভালো হবে না, দেশের পক্ষেও না। তিনি আরও লিখেছিলেন, আমার বিশ্বাস কংগ্রেস যেভাবে কাজ করছে তাতে নানাদিক দিয়েই অবনতি ঘটেছে। কংগ্রেস হয়ে দাঁড়াচ্ছে ভ্রমাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য সঙ্কীর্ণ থেকে সংকীর্ণতর মনোভাবাপন্ন। এতে ইন্ধন জোগাতে আমি চাই না। বাইরে থেকে কংগ্রেসকে আমি পর্যাপ্তভাবে কতোটা সহায়তা করতে পারবো সেটা প্রশ্নসাপেক্ষ, কিন্তু এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে দেশের বৃহত্তর স্বার্থের কথা চিন্তা করে আমি ওয়ার্কিং কমিটির বাইরে থেকে

যতোটা ফলপ্রসূ কাজ করতে পারবো, বর্তমান ওয়ার্কিং সদস্য হিসাবে যদি থেকে যাই, ততটা পারবো না। সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা যদি ওয়ার্কিং কমিটির ওপর প্রভুত্ব স্থাপনা করতে পারে, তাহলে আমার সঙ্গে সরাসরি বিরোধ লেগে থাকবে সব সময়, সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে। এখনকার ওয়ার্কিং কমিটি কিছুটা ঐ দিকে ঝুঁকেছে বলেই কমিটির সঙ্গে আমার খাপ খাচ্ছে না। সরকারের ওপর কংগ্রেস সভাপতি অথবা ওয়ার্কিং কমিটির ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ—যেমন মন্ত্রী নিয়োগ প্রভৃতি থাকার প্রশ্নে এটা পরিষ্কার যে গৃহীত হতে পারে না এই সব, যাতে আমি নিশ্চয়ই প্রধানমন্ত্রী হিসাবে কাজ চালিয়ে যেতে রাজী নই। এখন সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটিতে দরকার হলে কংগ্রেসের পূর্ণ অধিবেশনে এটাই স্থির করতে হবে যে তাঁরা কী ধরনের নেতৃত্ব ও পরিচালনা অনুমোদন করেন। দ্বৈত ও দ্বন্দ্বমূলক নেতৃত্ব বজায় রাখা ভালো নয়, এবং এ ব্যাপারে কোনো জোড়াতালির ব্যবস্থা চলতে পারে না।

এর উত্তরে ডাঃ রায় দীর্ঘ পত্রে নেহেরুর চিন্তাধারাকে সমর্থন করে কংগ্রেসের ঐতিহ্যপূর্ণ নীতি ও আদর্শের কথা বিশ্লেষণ করবার পর লেখেন, আমি আগের চিঠিতে তিনটি বিকল্পের কথা লিখেছিলাম—এক, নেতা থাকবেন একজনই; তিনি হবেন একাধারে কংগ্রেস সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী। দুই, দুজনের মধ্যে পুরো ঐক্যবদ্ধ সহযোগিতা ও সমঝোতা থাকতে হবে। তিন, একজন আরেকজনের অধীন থাকবেন না।

স্বভাবতই প্রথমটি বর্তমান মুহূর্তে কার্যকরী নেই বলে এটি ভাবা যাচ্ছে না, দ্বিতীয়টিও বর্তমান অবস্থায় খুব বাস্তবসম্মত প্রস্তাব নয়। সেজন্য আমি আবার বলছি তুমি নিজে স্থির করো যে তোমার মতে কোন্ কোন্ ব্যক্তিকে দিয়ে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করলে তা আরও উপযোগী হবে।

সম্পাদকদের কথাই আগে ধরা যাক। দুটি নাম দিচ্ছি, একজন হচ্ছেন যুক্তপ্রদেশের লালবাহাদুর শাস্ত্রী, অপরজন হচ্ছেন বোম্বাইয়ের মোরারজী দেশাই। এঁদের মধ্যে মোরারজীকে প্রধান নির্বাচনী সম্পাদক করা যেতে পারে। শাস্ত্রীজীকে আমি নিজে চিনি না, কিন্তু শুনেছি তিনি খুব ভালো লোক।

আমাদের এখন বর্তমান সাধারণ সম্পাদকদের সরে যেতে বলা উচিত। যদি তুমি অনুমোদন করো তাহলে আমি অনুরূপ প্রস্তাব দেবার দায়িত্ব নিতে

পারি। ওয়ার্কিং কমিটির অন্য সদস্যদের নামও আমি প্রস্তাব করতে পারি যদি তুমি একটু সময় করে বসে ঐ নামগুলি ঠিক করে দাও। যদি তুমি এ বিষয়ে সামনাসামনি আলোচনা করতে চাও তাহলে জানাও, আমি সঙ্গে সঙ্গে তোমার কাছে চলে যাবো।

এই হলো চিঠি দুটির মর্মার্থ। এর পরে কী ঘটেছিল তা আগেই বলেছি সুতরাং এর জের টেনে আর লাভ নেই—অন্য প্রসঙ্গে চলে আসি।

আগস্ট সেপ্টেম্বরে প্রধানমন্ত্রী খবর পেলেন যে, বাংলার সীমান্ত এলাকা বিশেষ করে সীমান্তবর্তী জেলা নদীয়া থেকে ভারতীয় মুসলমানদের সরিয়ে এনে ওখানে হিন্দু বসাবার চেষ্টা হচ্ছে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্ভাব্য সংঘাতের কথা ভেবে। প্রধানমন্ত্রী এতে ক্ষুণ্ণ হন। তিনি একটি চিঠিতে ডাঃ রায়কে জানান যে রণকৌশলের দিক থেকে এই ধরনের নীতির প্রয়োগ একেবারে ভুল।

সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতি

কংগ্রেসের শক্তি সংহত করার পর কেন্দ্র এবং প্রদেশ প্রথম সাধারণ নির্বাচনের লড়বার জন্য প্রাথমিক ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা হতে লাগলো। ডাঃ রায়ের সভাপতিত্বে তাঁর বাড়িতে নির্বাচনী বোর্ডের মিটিংগুলো বসতো। তিনি নিয়ম করেছিলেন, কেন্দ্র ও প্রদেশে যাদের নাম প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন দেওয়ার প্রস্তাব উঠবে, নির্বাচনী বোর্ড তাদের ইণ্টারভিউ নেবেন। এ ব্যাপারে চাঞ্চল্য ছিল বিপুল। প্রদেশের বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকা থেকে তার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন দিনের পর দিন সম্ভাব্য প্রার্থীরা। সংখ্যায় তারা ২৩৮ জন। সে এক দৃশ্যই বটে। যাই হোক নলিনীরঞ্জন সরকার অসুস্থতার জন্য রাজনীতি থেকে সরে দাড়ালেন। তিনি ছাড়া আর সব মন্ত্রী ও পরিষদীয় সম্পাদকরা সবাই প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন পেলেন। মুখ্যমন্ত্রীকে বোর্ড দুটি নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে দাঁড়াবার আমন্ত্রণ জানালেন—একটি তাঁর নিজের নির্বাচনী এলাকা বৌবাজার, অন্যটি মেদিনীপুরের মহিষাদল। বিরোধীপক্ষকে চূড়ান্ত মনোনয়ন সম্পর্কে ধোঁকা দেবার জন্যই ঐ শেষোক্ত ব্যবস্থা।

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ছিল পাচটি বড়ো বিরোধী দল। সোস্যালিস্ট ও তাদের সমঝোতা, যুক্ত ফরোয়ার্ড ব্লক, আর সি পি আই (ঠাকুর গোষ্ঠী), ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের নেতৃত্বে জনসংঘ, সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী সংগঠন যার মধ্যে রয়েছে

ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের কৃষক-মজদুর-প্রজা দল, আর সি পি আই, বলশেভিক, ফরোয়ার্ড ব্লক ও কমিউনিস্ট দল।

নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে ডাঃ রায় বলেন, আগামী সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের জয়ের সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল। দেশের বামপন্থী বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থীদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য থাকায় তাদের মধ্যে সংযোগ খুব গভীর ছিল না। ডাঃ রায় বলেছিলেন, নির্বাচনের জন্য বিভিন্ন দল এক হয় বটে, কিন্তু তা থেকে এটা বোঝায় না যে তারা সত্যিকার এক হয়ে সর্বসম্মত কোনো কার্যসূচী নিয়ে সরকারকে চালাতে পারবার ক্ষমতা রাখে।

ডাঃ রায়ের এই বিশ্লেষণ ভবিষ্যতে সত্য হয়ে দেখা দিয়েছিল। বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকার আসন বণ্টন নিয়ে বিরোধীদের পারস্পরিক বোঝাপড়া না হওয়ায় তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিল।

নির্বাচনী প্রচার অভিযান কলকাতায় জোরদার হয়েছিল। বিরোধীরা সভা করছিলেন রাস্তার মোড়ে মোড়ে বটে, কিন্তু কংগ্রেসের প্রচার ছিল সব থেকে ব্যাপক ও ফলপ্রসূ। বড়ো বড়ো নেতা বিশেষ করে কংগ্রেস সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলা ঘুরে গেলেন। গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার মোড়ে মোড়ে নিওন আলোয় প্রচার ছিল কংগ্রেসের বৈশিষ্ট্য।

সর্বভারতীয় নেতাদের ওপর কয়েকটি রাজ্যের নির্বাচনী প্রচার চালানোর ভার ছিল। সে হিসাবে ডাঃ রায়ের ওপর ভার ছিল বিহারের। বিহারের কংগ্রেস নেতা এম পি সিং সেজন্য তাঁর বাড়িতে এলেন ২৪শে জানুয়ারি (১৯৫২) তারিখে। ডাঃ রায়ের চোখ খারাপ থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁর সঙ্গে গিয়ে ধানবাদ ও পুরুলিয়ার দুটি জনসভায় বক্তৃতা দিয়ে এলেন। বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ দু জায়গাতেই এক সঙ্গে নির্বাচনী প্রচার অভিযান শুরু করেছিলেন ডাঃ রায়।

প্রদেশ কংগ্রেস এবং পরে সর্বভারতীয় কংগ্রেস যথারীতি ডাঃ রায়কে ধরলেন এ-জন্য টাকার তহবিল জোগাড় করবার জন্য। ডিসেম্বর (১৯৫১)এর শেষে ডাঃ রায় আমাকে বললেন, তাঁর বিভিন্ন বন্ধুকে তাঁর বাসায় এক বৈঠকে আসবার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে। আমারই স্বাক্ষরিত চিঠিতে তাঁদের কাছে আমন্ত্রণ গেল। পরপর বৈঠক হলো কয়েকটা, ডাঃ রায়ের চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত ভালো টাকাই উঠেছিল বলতে হবে।

(১৯৫২)

ভোটগ্রহণের তিন দিন আগে তাঁর দুই দিনের নির্বাচনী সফরে এলেন পণ্ডিত নেহেরু। তিনি একাধারে কংগ্রেস-সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী। কলকাতা ময়দানে নববর্ষের দিনে তাঁর বক্তৃতা শুনলো পঞ্চাশ হাজার লোক। তাঁর বক্তব্য ছিল কম্যুনিস্ট ও সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের বিরুদ্ধে, তাছাড়া তাঁর একটা অভ্যাস ছিল গুরুত্বপুর্ণ ভাষণে তিনি দেশের কথা তো বলতেনই, বাইরের কথাও বলতেন। পাকিস্তানকে তিনি সতর্ক করে দিলেন, যদি সে কাশ্মীর আক্রমণ করে, তাহলে ভারতও চুপ করে থাকবে না, পুরোপুরি যুদ্ধ শুরু করে দেবে। এই কথায় বিপুল করতালি উঠলো। জনমতও ধীরে ধীরে কংগ্রেসের অনুকূলে ফিরে আসতে লাগলো।

তখনকার দিনে ভোট গ্রহণ সারা রাজ্য জুড়ে একদিনের ব্যাপার ছিল না। প্রথম সাধারণ নির্বাচন ১৯৫২র ৩রা জানুয়ারি থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন দিনে ৫ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলেছিল। সব থেকে মারাত্মক ভোটযুদ্ধ হলো ২২শে জানুয়ারি কলকাতায় ভোটগ্রহণের দিন। সবথেকে আকর্ষণের বিষয় ছিল বৌবাজার নির্বাচনকেন্দ্র, যেখান থেকে মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং প্রতিযোগিতা করছিলেন। সবারই চোখ ছিল এই নির্বাচন কেন্দ্রের দিকে। ডাঃ রায় প্রদেশ কংগ্রেস প্রধান অতুল্য ঘোষকে নিয়ে সারা পশ্চিমবঙ্গে নিজের দলের প্রার্থীদের জন্য নির্বাচনী প্রচার চালাচ্ছিলেন বলে তাঁর নিজের নির্বাচন কেন্দ্রের দিকে তেমন মনোযোগ দিতে পারেন নি। কিন্তু নির্বাচনের তিন দিন আগে তাঁই সবাইকে চমকে দিয়ে তিনি নিজের নির্বাচনী এলাকায় বস্তিতে বস্তিতে পদযাত্রা শুরু করে দিয়েছিলেন, কথা বলছিলেন সাধারণ মানুষের সঙ্গে। এতে ফল হয়েছিল দারুণ। ডাঃ রায়ের মতো মাননীয় ব্যক্তি পায়ে হেঁটে তাদের কাছে আসছেন কথা বলছেন এতে তারা আত্মপ্রসাদ লাভ করলো, আর তারই ফলে তাঁর দিকে পাল্লা ভারী হয়ে পড়লো। সরাসরি তাঁর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে ছিলেন ফরোয়ার্ড ব্লক (মার্ক্সিস্ট) প্রার্থী সত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁকে সমস্ত বামপন্থী দল সমর্থন করছিল। যাই হোক সারা দিনের ভোট গ্রহণ শেষ হয়ে গেলে ডাঃ রায়ের বাড়ির সামনে একদল লোক বিক্ষোভ

প্রদর্শন করতে এলো। বলা বাহুল্য তারা ঠিক অহিংস ছিল না। তখনকার দিনে প্রদেশ কংগ্রেস অফিস ছিল তাঁরই বাড়ির লাগোয়া একটা বাড়িতে। সেই বাড়ির সামনে কিছু কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক একটা পাল্টা বিক্ষোভ মিছিল বার করলো। আমি শুনতে পেলাম, ডাঃ রায়ের বাড়ির সামনে পর পর কয়েকটা বোমা ফাটলো। কাছেই পুলিশ ছিল অপেক্ষা করে সরাসরি পুলিশ কমিশনার হরিসাধন ঘোষ চৌধুরীর অধীনে। তারা সুযোগ পেয়ে বিক্ষোভকারীদের তাড়া করলো। আর তাড়া করতেই হামলাকারীর দল একেবারে ফরসা।

কংগ্রেস এবং বিরোধীদের শিবিরে অনিশ্চয়তা বিরাজ করছিল। কে বলতে পারে কলকাতায় কংগ্রেসের ভাগ্যে কী আছে? ২৮শে জানুয়ারি যখন বৌবাজার কেন্দ্রের ভোট গণনা চলছিল, তখন মুখ্যমন্ত্রী তাঁর অফিসে যথারীতি কাজ করতে লাগলেন। শান্ত এবং অবিচলিত, মুখে কোনোরকম উৎকণ্ঠার চিহ্নমাত্র নেই। থেকে থেকে তিনি পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে যোগাযোগ করছিলেন। বিরোধী পক্ষ যদি বৌবাজার কেন্দ্রে জেতে, তাহলে সহিংস গণবিক্ষোভ সুরু হলে কী রকম করে তার প্রতিরোধ করতে হবে, এই-ই ছিল সেই যোগাযোগের বিষয়বস্তু। দুপুরের পর ডালহাউসি এলাকায় (এখন বিনয় বাদল দীনেশ বাগ) অশ্বারোহী পুলিশ মোতায়েন রাখা হলো, আর সৈন্যদেরও সজাগ করে দেওয়া হলো। বেলা ৩টের পর খবর আসতে লাগলো, দারুণ প্রতিযোগিতা চলার পর ডাঃ রায় তাঁর প্রতিযোগীর থেকে কয়েকশ ভোটে এগিয়ে গেছেন। যতই ভোট গণনা হচ্ছে ততই বাড়তে লাগলো এই ব্যবধান। আমরা যারা তাঁর সঙ্গে অফিসে ছিলাম, তাদের খুবই উৎকণ্ঠায় কেটেছিল সারাটা দিন। তিনি নিজে কিন্তু গণ্ডগোল আর আইনশৃঙ্খলাহীনতার বিরুদ্ধে প্রাচীরের মতো শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে সব কিছু প্রতিহত করছিলেন। সন্ধ্যাবেলা রাস্তার আলোগুলো জ্বলে উঠলো। আমরা বারান্দায় এসে দেখলাম প্রচুর লোক—তাদের মধ্যে যুবক ও যুবতীর সংখ্যাই বেশি—সত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে মহাকরণের সামনে দিয়ে মিছিল করে যাচ্ছে, সঙ্গে তাদের কোনো ব্যানার বা প্লাকার্ড ছিল না। হতাশাগ্রস্ত একটি দল, এদের নেতা কয়েক মিনিট আগে ডাঃ রায়ের কাছে পরাজয় স্বীকার করেছেন। ডাঃ রায় প্রথম সাধারণ নির্বাচনে ৪,১১১ ভোটের ব্যবধানে জিতে গিয়েছিলেন। আমি তাঁর সঙ্গে

যখন তাঁর বাড়ি এলাম, তখন একদল জনতা তাঁকে অভিনন্দন জানাবার জন্য অপেক্ষা করছিল।

আকাশবাণী থেকে মুখ্যমন্ত্রীর বিজয়বার্তা ঘোষণা করা হলো। রাত ৮টা নাগাদ দিল্লী থেকে ফোন এলো। প্রধানমন্ত্রী তাঁকে অভিনন্দন জানাবার জন্য ফোন করেছিলেন। কথা হতে লাগলো দুই বন্ধুতে। ডাঃ রায় তাঁকে জানালেন তাঁর চোখের অবস্থা তাঁকে দিন দিন উদ্বিগ্ন করে তুলছে। নেহেরু বললেন, চোখ বলে কথা, একেবারেই অবহেলা করো না।

যাই হোক, দিল্লী ও কলকাতার উৎকণ্ঠা শেষ হলো। বিধানসভার ২৩৮জন সদস্যসংখ্যার মধ্যে ১৪৩ জনের আসন পেল কংগ্রেস। বেশ ভালোরকম সংখ্যাধিক্যের জোরেই বলতে হবে। কিন্তু ভোটের বাক্স বড়ো বড়ো কয়েকজন নেতার ভাগ্য বিপর্যয় ঘটিয়েছিল। ভোটযুদ্ধে একেবারে সাত সাতটি মাথা কুপোকাৎ। এঁরা হলেন প্রফুল্লচন্দ্র সেন, ভূপতি মজুমদার, নিকুঞ্জবিহারী মাইতি, নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, কালীপদ মুখোপাধ্যায়, হরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী ও বিমলচন্দ্র সিংহ। মাত্র চারজন মন্ত্রী ফিরে এলেন। মুখ্যমন্ত্রী নিজে, হেমচন্দ্র নস্কর, যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা ও শ্যামাপদ বর্মণ। যে হুগলি-মেদিনীপুর গোষ্ঠী কংগ্রেস সংগঠনে আধিপত্য করছিল তারা মুছে গেল। ফলে সংগঠন ও সরকার দুই জায়গাতেই একসঙ্গে আধিপত্য করতে লাগলেন ডাঃ রায়।

সেই সন্ধ্যায় জনগণের উদ্দেশ্যে ডাঃ রায় যে বাণী দিয়েছিলেন তাতে ছিল, ভুলে যাবেন না দরজার কাছে শত্রুরা ওঁৎ পেতে বসে আছে। তারা আমাদের দেশ গঠন ও উন্নয়নমূলক কাজকর্মে বাধা দিতে খুবই তৎপর হবার চেষ্টায় আছে। অভিজ্ঞতা থেকে জানি জনগণের অধিকাংশ কংগ্রেস মনোভাবাপন্ন হলেও আত্মতুষ্টির কারণ নেই। আমাদের শুধু বাইরের শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করলেই হবে না, আমাদের ভিতরেও শত্রু আছে। তাদেরও মোকাবিলা করতে হবে। ঢেলে সাজাতে হবে কংগ্রেসকে, যাতে তরুণ তরুণীরা এখানে কাজ করবার সুযোগ পায়।

নতুন মন্ত্রিসভা নতুন করে গড়া হয় নি। পরাজিত মন্ত্রীরাও যথারীতি অফিসে এসে তাঁদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস সভাপতির ফতোয়া ছিল—পরাজিত মন্ত্রীদের মন্ত্রিসভায় ফিরিয়ে নেওয়া হবে না, উপ-নির্বাচন করেও নয়, পরিষদের সভ্য করেও নয়। পশ্চিমবঙ্গের আইন সভার

তখন তুটো ভাগ ছিল, পরিষদ বা আপার হাউস এবং বিধানসভা বা লোয়ার হাউস।

প্রফুল্লচন্দ্র সেন তখন ভাবছিলেন, রাজনীতি থেকে সরে গিয়ে তিনি খাদি আর গ্রাম উন্নয়ন নিয়ে কাজ করতে থাকবেন। তাঁদের সম্বন্ধে তাঁদের নেতা যে কী ভাবছিলেন সেটা প্রফুল্লবাবু বা কালীপদ মুখোপাধ্যায় তুজনের একজনও ভাবতে পারেন নি। এমনই মানুষ ডাঃ রায়—বিশ্বস্ত ও অনুগত সহকর্মী ও বন্ধুদের সহজে ত্যাগ করতেন না। ৫ই মে (১৯৫২) তারিখে তিনি প্রধানমন্ত্রীকে লিখলেন :

প্রিয় জওহরলাল,

নির্বাচনে আমার সাতজন মন্ত্রী পরাজিত হয়েছেন। অন্য পাঁচজনের কথা আমি ভাবছি না, কিন্তু খাদ্যবিভাগের পি সি সেন এবং শ্রমবিভাগের কে পি মুখার্জী আমার মন্ত্রিসভার খুব প্রয়োজনীয় সদস্যই শুধু নন, তাঁরা তাঁদের নিজের নিজের বিভাগ সম্পর্কে অসাধারণ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অধিকারী। পরের নির্বাচনে প্রার্থী করলে অন্যরা ফিরে না এলেও এঁরা তুজন যে ফিরে আসবেন সে বিশ্বাস আমার আছে। বিধানসভায় এমন কেউ আছেন বলে আমি জানি না যাঁরা এদের শূন্যপদ পূরণ করতে পারবেন। যদিও জানি, এই প্রস্তাবে সমালোচনার ঝড় উঠবে, তাহলেও বাংলার যা পরিস্থিতি, তাতে এঁদের তুজনকে আমার রাখা দরকার, অবশ্য যদি বাস্তবে তা সম্ভবপর হয়।

তোমার বিশ্বস্ত
বিধান

মুখ্যমন্ত্রীর এই চেষ্টার কথা তুটি কাগজ জানতে পেরে খুব লেখালেখি শুরু করে। পরিষদ বা আপার হাউসের মাধ্যমে পরাজিত মন্ত্রীদের ফিরিয়ে আনার বিরুদ্ধে এদের ছিল প্রবল আপত্তি। সত্যিকথা বলতে কী, প্রধানমন্ত্রীর মত ছিল না। তিনি লিখেছিলেন, এতে জনমত অনুকূল হবে না বলে আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি। মন্ত্রিসভা শুরু করার সময় পরাজিত এই মন্ত্রীদের না নিলে কি তোমার চলবেই না?

অবশ্য শেষ পর্যন্ত তাঁর আপত্তি যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করে নিজের মতামতই প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন ডাঃ রায়। কঠোর বিরোধিতা সত্ত্বেও জনপ্রতি-নিধিদের ভোটের মাধ্যমে আপার হাউস বা পরিষদে প্রফুল্ল সেন ও কালীপদ

মুখোপাধ্যায় ফিরে আসতে পেরেছিলেন। এই প্রসঙ্গে ডাঃ রায় লিখেছিলেন, সাধারণ নির্বাচনে হেরে গেলেও এই নির্বাচনে যখন তাঁরা জিতেছেন তখন বুঝতে হবে এঁদের ওপর জনগণের আস্থা আছে। যদি দেখি যে জনমত এ বিষয়ে খুবই কঠোর, তাহলে সম্ভবত এটা হতে পারে যে সাধারণ নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে পরে এদের প্রার্থী হিসাবে দাঁড় করিয়ে ফিরিয়ে আনা যাবে।

এইভাবে ওঁদের দুজনকে মন্ত্রিসভায় রাখা হলো। কিন্তু কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডের কাছ থেকে এই কাজ করার অনুমোদন পেতে ডাঃ রায়কে তিন মাস ধরে সমানে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়েছিল। ১১ই জুন মুখ্যমন্ত্রী তাঁর নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করলেন। আগের সভায় ছিলেন তাঁকে নিয়ে ১৩ জন মন্ত্রী, এবার হল ১৪ জন। আর তার সঙ্গে উপমন্ত্রী যুক্ত হলেন ১৬ জন। এ ব্যাপারটা হলো এই রাজ্যের পক্ষে একেবারে নতুন। এদের নেওয়ার পিছনে যুক্তি ছিল। ডাঃ রায় বলতেন, যে বিরাট উন্নয়নমূলক কর্মযজ্ঞে হাত দেওয়া হয়েছে, তাতে গতি সঞ্চার করার জন্য তরুণতর জনপ্রতিনিধিদের তত্ত্বাবধান প্রয়োজন। বিশেষ করে তাঁরা সরকার ও জনগণের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রেখে কাজকর্ম করতে পারবেন, যা কিনা বিশেষজ্ঞ বা সরকারী কর্মচারী দিয়ে করা সম্ভবপর ছিল না। ডাঃ রায় তাঁর মন্ত্রিসভায় একজন মহিলা মন্ত্রী নিয়ে তাঁকে দিলেন উদ্বাস্তু ত্রাণ দপ্তরের ভার। ইনি লোকসভার নির্বাচনে পরাজিত হওয়া সত্বেও ডাঃ রায় এঁকে নিতে দ্বিধা বোধ করেনি। ইনি হচ্ছেন শ্রীমতী রেণুকা রায়, রাজ্যের মহিলা মন্ত্রী এবং তথনকার মুখ্য সচিব সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের স্ত্রী। কালীপদ মুখোপাধ্যায় ও প্রফুল্লচন্দ্র সেনের কথা ডাঃ রায় প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়ে রেখেছিলেন, কিন্তু শ্রীমতী রায়ের কথা জানাননি। পশ্চিমবঙ্গে নবগঠিত মন্ত্রিসভা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর প্রতিক্রিয়া যা ১২ই জুন কাগজে বেরিয়েছিল তা আদৌ অনুকূল ছিল না। মুখ্যসচিবের স্ত্রীকে মন্ত্রিসভায় নেওয়ায় লোকসভায় ঝড় বয়ে গিয়েছিল। তাই একটি চিঠিতে পণ্ডিতজী ডাঃ রায়কে লিখেছিলেন, পরাজিত প্রার্থীকে মন্ত্রী করা ঠিক হয়নি, যদিও এঁর যোগ্যতা সম্পর্কে তাঁর ধারণা খুব উঁচুই ছিল। বিরোধীপক্ষভুক্ত কমিউনিস্টরা মন্ত্রিসভাকে আক্রমণ করার এই সুযোগ ছেড়ে দেবেন কেন! পোস্টার আর প্লাকার্ডে তাঁরা পশ্চিমবঙ্গের মতো গরীব রাজ্যের এমন মাথাভারী মন্ত্রিসভা সম্পর্কে নানান কটাক্ষ প্রকাশ করতে লাগলেন, বিধান-

সভাতেও কটূক্তি করতে ছাড়লেন না। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, ১৫ বছর পরে যখন যুক্তফ্রণ্টের প্রথম মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছিল, তখন তার মন্ত্রিসভা এই সংখ্যারই কাছাকাছি ছিল।

যাই হোক বিরোধীপক্ষ বিশেষ করে কমিউনিস্ট ব্লক আগের থেকে শক্তিশালী ছিল এবার। পার্টির নবনির্বাচিত নেতা জ্যোতি বসুর সঙ্গে ছিলেন উপযুক্ত উপনেতা (ডেপুটি লিডার) বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়। বঙ্কিমবাবুকে কৃষি সংক্রান্ত বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ বলে গণ্য করা হতো। যাই হোক শক্তিশালী বিরোধীপক্ষ সুযোগ পেলেই আক্রমণ চালাতেন সময় সময়—মন্ত্রিসভা এমন কী কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীদের সম্পর্কেও ব্যক্তিগত কটাক্ষ করতে ছাড়তেন না। কমিউনিস্ট সদস্যরা বিশেষ করে অম্বিকা চক্রবর্তী জওহরলাল নেহেরুকে কখনো কখনো চিয়াং কাইশেকের সঙ্গে তুলনা করতেন। বলতেন, তাঁরও ভাগ্য চিয়াং কাইশেকের মতো হবে। (চিয়াংকে চীনের মূল ভূখণ্ড ছেড়ে পালাতে হয়েছিল)।

চীনদেশে কমিউনিস্টদের বিজয়লাভ ভারতীয় কমিউনিষ্টদের মনোবল বাড়িয়ে দিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় তাঁরা যে সব ভাষণ দিতেন তাতে বোঝা যেতো, তাঁরা স্টালিন ও রাশিয়া থেকে বেশি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন চীনবিপ্লব ও তাঁদের নেতা মাও সে তুং-এর কার্যকলাপ থেকে। এঁরা যে একেবারেই গঠনমূলক সমালোচনা করতেন না এমন নয়, তবে দলের ভাবমূর্তি বাড়াতে হলে আর জনগণের বাহবা পেতে হলে ঐ ধরনের সমালোচনায় কাজ হবে না বলে তাঁরা মনে করতেন—সেই জন্য তাঁদের ঝোঁকই তখন হয়েছিল ধ্বংসাত্মক সমালোচনার প্রতি। তার ওপর সরকারী কার্যকলাপের একটু-আধটু ফাঁক যদি পাওয়া যেতো তো তার আর কথাই নেই, তেড়ে লাগতেন তার পিছনে। এই ধরনের আক্রমণে প্রথম প্রথম তাঁরা বিধানসভা খুবই জমিয়ে তুলতেন, কাগজেও সে সব ছাপা হতো খুব ফলাও করে। জ্যোতিবাবু ও বঙ্কিমবাবু বিতর্কে যোগ দিয়ে যে সব ভাষণ দিতেন, তাতে তখনকার দিনের সমস্যার কথাই থাকতো বেশি, থাকতো গঠনমূলক সমালোচনা—থাকতো মন্ত্রিসভার ওপর বক্র কটাক্ষ। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, বঙ্কিমবাবু আগে ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক, আর তখন সহ-সভাপতি ছিলেন ডাঃ রায়।

যাই হোক, বিরোধী পক্ষের সমালোচনায় মুখর থাকা সত্বেও জ্যোতি বসু ও ডাঃ রায়ের মধ্যে একটা পারস্পরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধার ফল্গুধারা যে বইতো, এ বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। রাজ্যের উন্নয়নের ব্যাপারে ডাঃ রায় যে সত্যিই আন্তরিক ও প্রাণপাত প্রয়াস করছেন, এটা ভিতরে ভিতরে জ্যোতিবাবু বুঝতেন বলেই তাঁর মধ্যে এই শ্রদ্ধার ভাবটা বিদ্যমান ছিল বলে মনে হয়। ডাঃ রায়ের হৃদয়েও জ্যোতিবাবু একটি বিশিষ্ট স্থান করে নিয়েছিলেন, যা ছিল সমস্ত রাজনীতির উর্ধ্বে। পারস্পরিক এই সৌহার্দ্য বহু বছর পর্যন্ত বজায় ছিল, বহু দিন তাঁরা দুজনেই বিধানসভায় ছিলেন এক সঙ্গে।

এ কথার উদাহরণস্বরূপ আমি একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করতে পারি। ডাঃ রায়ের মৃত্যুর পাঁচ বছর পরে প্রথম যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছিল ১৯৬৭ সালের ১লা জুলাই ডাঃ রায়ের জন্ম ও মৃত্যু দিনে। মহাকরণের বারান্দায় ঐদিন ডাঃ রায়ের মর্মরমূর্তির নিচে পুষ্পার্ঘ্য স্থাপন করতেন মুখ্যমন্ত্রী। এই নিয়মই চলে আসছিল। সেদিন মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে কয়েকজন মন্ত্রী বসে আছেন, আমি গিয়ে সবিনয়ে নিবেদন করলাম অনুষ্ঠানের কথাটা। কয়েকজন মন্ত্রী এতে যোগ দিতে অস্বীকার করলেন। কারণ কংগ্রেস ও কংগ্রেস নেতাদের তাঁরা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ মনে করতেন। কিন্তু উঠে দাঁড়ালেন জ্যোতি বসু। মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে বেরিয়ে তিনি এসে দাঁড়ালেন শ্রদ্ধার্ঘ্য দিতে ডাঃ রায়ের মূর্তির সামনে। এ ছবি কি কখনো আমি ভুলবো?

রাজ্যের জন্য ডাঃ রায়ের উন্নয়ন কর্মসূচি

নির্বাচনের পরেই প্রথম বড়ো যে কর্মসূচি ডাঃ রায় ঘোষণা করেছিলেন, তার মধ্যে মধ্যবিত্ত বেকারদের ত্রাণের জন্য তিনটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার কথা ছিল। প্রথমটা ছিল গ্রামীণ শহর সংগঠনের কথা। দ্বিতীয়টি, মেদিনীপুর জেলার কাঁথিতে একটি আধুনিক লবণ কারখানা খোলার কথা। আর তৃতীয় প্রস্তাব হচ্ছে আরও পাঁচটি ট্রলার নিয়ে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার কথা। বেকার সমস্যা সমাধানের পথে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে আটটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হলো। এতে আশা করা হলো যে, দুই লক্ষ গ্রামের মানুষ এবং চার লক্ষ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ উপকৃত হবেন। গ্রামীণ শহর (ভিলেজ টাউনশিপ) পরিকল্পনায় বিভিন্ন কারিগরি বিষয়ে শিক্ষণপ্রাপ্ত হতে পারবেন এক হাজার নয় শত জন মধ্যবিত্ত

মানুষ। এর জন্য কম-বেশি চার কোটি টাকা দরকার হবে বলে তিনি উল্লেখ করেছিলেন। গ্রামীণ শহরের এই পরিকল্পনাটা আজকের দিনে নতুন বলে মনে হবে না, কিন্তু সেদিন এটা অভিনব ব্যাপার বলেই সবার কাছে প্রতিভাত হয়েছিল। একশটি গ্রাম নিয়ে একটি করে গ্রামীণ শহর গড়ে উঠবে, যেখানে গ্রামের ফসল নিয়ে আসবে গ্রামের মানুষ, বিক্রি-টিক্রি করে আবার প্রয়োজনীয় সওদা করে গ্রামে ফিরে যাবে। এ জন্য বহু দূরের পথ ঠেঙিয়ে দূর দূর শহরে আর আসতে যেতে হবে না তাদের। এই-ই ছিল মূল পরিকল্পনা। এই প্রসঙ্গে ১৯৩৬ সালে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে রামমোহন রায়ের জন্মদিন উপলক্ষে আহূত এক জনসভায় নেহেরু যে ভাষণ দিয়েছিলেন, সে কথা আমার মনে পড়ে যায়। তিনি বলেছিলেন, সে যুগে সতীদাহ নিবারণ কল্পে রামমোহন যা করেছিলেন তা যে কী নিদারুণ বিপ্লবাত্মক ছিল, সে কথা আজ ঠিক বোঝা যাবে না। আমারও সেই কথা। ডাঃ রায়ের ঐ গ্রামীণ শহর গঠনের পরিকল্পনা যে কতখানি বিপ্লবাত্মক ছিল সে দিনের সে কথা আজকের দিনে ঠিক হৃদয়ঙ্গম করা যাবে না।

তৈল শোধনাগার

সেই ১৯৫২ সালেই ডাঃ রায়ের মনে জেগেছিল কলকাতায় একটি তৈল শোধনাগার তৈরি করার কথা। গঙ্গার মুখে এমন কোন জায়গায় ঐ শোধনাগার স্থাপন করা যেতে পারে যেখানে তৈলবাহী জাহাজ আসবার যাবার সুবিধার জন্য উপযুক্ত গভীর জলপ্রবাহ রয়েছে। এই বিষয়ে তিনি বন্দর কর্তৃপক্ষীয় বিশেষজ্ঞদের প্রতিবেদন বা রিপোর্ট নিয়েছিলেন। ভারত সরকার তখন পূর্বাঞ্চলে তৃতীয় একটি তৈল শোধনাগার স্থাপনের জন্য ক্যালটেক্স অ্যাণ্ড কোম্পানীর সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছিলেন। ২২শে এপ্রিল ডাঃ রায় প্রধানমন্ত্রীকে কলকাতার কাছেই ঐ তৃতীয় এক লক্ষ টনের তৈল শোধনাগার স্থাপনের সপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে একটি চিঠি লিখেছিলেন মনে আছে। তার যুক্তির ভিত্তি ছিল, মধ্য প্রাচ্যের অশোধিত তেল নিয়ে বোম্বাই মাথা ঘামাক, কিন্তু ব্রহ্মদেশ ও ইন্দোনেশিয়া থেকে যে তেল পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়, তার শোধনাগার কলকাতার আশেপাশে হলে সব দিক থেকে সুবিধা হয়। কলকাতার শিল্পাঞ্চলে জ্বালানী গ্যাসের প্রচণ্ড অভাব রয়েছে। এই অভাব পূরণ করবে ঐ শোধনাগার থেকে উৎপন্ন বাড়তি গ্যাস। তাছাড়া কলকাতায় রয়েছে বহু ভারী

রাসায়নিক শিল্পের কারখানা, শোধনাগার হলে বহু ছোটখাট রাসায়নিক শিল্প গড়ে উঠবে, যার ফলে এ রাজ্যের কারিগরী শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণরা চাকরি পাবে, রাজ্যের সর্বাত্মক বেকার সমস্যারও কিছুটা সুরাহা হবে।

গেঁওখালির বন্দর ও ফারাক্কার জলাধার

কলিকাতা বন্দরে ভীড় কমাবার জন্য একটি সহ-বন্দর গেঁওখালিতে স্থাপন করার বিষয়টি ডাঃ রায় প্রধানমন্ত্রীর গোচরে আনলেন মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে। সেই সময় কলকাতা বন্দরের অবস্থা এমন হয়েছিল যে সাত হাজার টনের বেশি মাল নিয়ে কোনো জাহাজ গেঁওখালি ঢুকতে পারতো না। তাই কলকাতায় আসবার মুখে জাহাজগুলো ভিজাগাপত্তম বন্দরে মালের ভার বেশ কিছুটা কমিয়ে তারপরে আসতো। কিন্তু গেঁওখালির কাছে বন্দর হলে, জাহাজ-গুলোকে সে অসুবিধা ভোগ করতে হবে না। বরং বি এন আর-এর (এখন দক্ষিণ পুর্ব রেলওয়ে) কোলাঘাট স্টেশনের সঙ্গে রেল সংযোগ ঘটিয়ে রেলপথে মাল নেওয়া দেওয়ার সুযোগ আরও সুগম হবে। আর সেই সঙ্গে কলকাতা বন্দরেও ভীড় কমবে। ডাঃ রায় এই চিঠিতে প্রধানমন্ত্রীকে এও জানিয়েছিলেন যে মুর্শিদাবাদ জেলার মাথার ওপরে একটি জলাধার তৈরি করে গঙ্গার জল ভাগীরথী খাতে চালিত করে হুগলি নদীতে এনে ফেলা যাবে। এতে হুগলি নদী পুনর্জীবিত হবে, নিম্ন এবং মধ্য বঙ্গ ও মুর্শিদাবাদ জেলার সঙ্গে একটা চলাচলের পথও খুলে যাবে। আসল কথা, সাগরের নোনা জল এসে নদীর বুক যে ক্রমাগত বুজিয়ে ফেলছে, এটা রোধ করতে হবে।

আমরা জানি, এই দুটি প্রকল্পের জন্য ডাঃ রায় লিখিত ও মৌখিক, দুই ভাবেই কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে লড়াই চালিয়েছিলেন। আজ, অর্থাৎ ঐ ঘটনার বিশ বছর পরে হলদিয়া বন্দর ও তৈল শোধনাগার এবং ফারাক্কা জলাধার দুই-ই বাস্তবায়িত হয়েছে, কিন্তু তাঁর মূলে ছিল ডাঃ রায়ের ঐ পরিকল্পনা, যা নিয়ে তিনি ১৯৫২র মার্চ-এপ্রিলে কেন্দ্রের সঙ্গে অতো লেখালেখি করেছিলেন।

যাইহোক, এই বছরেই গ্রীষ্মকালে বিধান সভার বিরোধীপক্ষ তাঁদের প্রথম খাদ্য আন্দোলন শুরু করলেন। তাঁদের দাবি ছিল চাল ও গমের রেশনের পরিমাণ বাড়াতে হবে, বিশেষ করে মেহনতী শ্রমিকদের জন্য। আর সস্তা দরে আরও খাদ্য চাই, এই দাবি নিয়ে রোজ মিছিল বেরুতে শুরু করলো। রফি

আহম্মেদ কিদোয়াই তখন আবার কংগ্রেসে ফিরে এসে কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী হয়েছেন। তিনি কলকাতায় এসে একদিন সকালে ডাঃ রায়ের বাড়িতে মুখ্যমন্ত্রী ও বিরোধী পক্ষীয় নেতা, বিশেষ করে জ্যোতি বসুর সঙ্গে দেখা করলেন। আলোচনা যখন চলছে, তখন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির চারিপাশ দিয়ে স্লোগানমুখর মিছিল ঠিক পথ পরিক্রমা করছে।

ভেবে ভেবে এক সূত্র বার করা হলো। রফি সেটা প্রধানমন্ত্রীকে জানালেন। প্রধানমন্ত্রী ২২ জুলাই মুখ্যমন্ত্রীকে পত্রে যা জানালেন, তার মোদ্দাকথা হলো এই যে, কেন্দ্র কী করে যে আরও ভরতুকি দেবে এই ব্যাপারে, তা তিনি বুঝতে পারছেন না। তাঁর মতে কোথাও নিশ্চয়ই একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। পরিস্থিতি ছিল খুবই ভালো, জনসাধারণও খুশিমনে মেনে নিয়েছিলেন, কিন্তু সেটা যেভাবেই হোক তালগোল পাকিয়ে গেছে। তিনি এ-ও লিখেছিলেন, তোমার খাদ্য বিভাগের অফিসাররা খুব যে দক্ষ তা মনে হচ্ছে না। কেন্দ্র সম্পর্কে বলতে পারি, আমাদের পক্ষ থেকে যা যা ওয়াদা দেওয়া হয়েছিল তা পুরণ করা হয়েছে।

তিনি আরো লিখেছিলেন, কলকাতার এই সব গোলোযোগের কারণটা হচ্ছে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক, খাদ্য আন্দোলনের সঙ্গে এর সম্পর্ক খুব কম। আমার জানিত তথ্য এই যে, তোমার বর্তমান খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেনের নিয়োগে ব্যক্তিগতভাবে তাদের আপত্তিই এর মূল। আমি আশঙ্কা করেছিলাম যে, এঁর নিয়োগে বেশ কিছু লোকের মধ্যে বিরক্তি দেখা দেবে এবং সেই মর্মে আমি তোমাকে চিঠিও লিখেছিলাম। অকারণে তুমি এনন একটা পরিস্থিতির আবর্তে পড়ে গেছো! এ থেকে যে রকম করেই হোক তোমাকে বেরিয়ে আসতে হবে।

এই চিঠির উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেনের সপক্ষে জোরালো যুক্তি দিয়েই লেখালেখি করেছিলেন, এ হচ্ছে বিরোধীদের মধ্যে ক্ষমতা অর্জনের রাজনীতির খেলা, খাদ্য একটা অছিলা মাত্র। যদিও সমস্ত আন্দোলনটাই রাজনৈতিক, তবু ঠিক এই প্রফুল্ল সেন বা তাঁর খাদ্য নীতির বিরুদ্ধে নয়। প্রফুল্লবাবু প্রত্যেক খুটিনাটি নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা না করে কিছু করেন না। সেজন্য খাদ্য আন্দোলনের পুরো দায়িত্ব আমি নিজের ঘাড়ে নিচ্ছি। এই রাজনৈতিক আবর্ত থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবেই। তুমি ভেবো না, এখন পর্যন্ত পরিস্থিতির মোকাবিলা আমি ঠিকমতোই করে আসছি।

১৪ই আগষ্ট ভিয়েনার বিখ্যাত ডাক্তার লিণ্ডনারকে দিয়ে চোখের ছানি কাটাবার জন্য ভিয়েনা চলে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু যাবার আগে একটি সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে তাতে তিনি সেই প্রথম জোর দিয়ে বললেন যে বিহারের কিছু বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল বাংলার মধ্যে আসা দরকার। এ নিয়ে বিধান সভায় জনৈক কংগ্রেস সদস্য-আনীত প্রস্তাবও পাশ হয়ে গেছে। ডাঃ রায়ের যুক্তির ভিত্তি ছিল নিছক প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক, ভাবাবেগ নয়। ফারাক্কা জলাধার ও সেতু সম্পর্কে যেমন বলেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের নিম্ন ও দক্ষিণ অংশের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন দরকার। দরকার হুগলি নদীর পুনর্জীবন, যার ওপর রাজ্যের ভবিষ্যৎ বাণিজ্য ও সমৃদ্ধি নির্ভর করছে—ঠিক তেমনি বললেন, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার সঙ্গে মুর্শিদাবাদ মালদা এলাকার সঙ্গে সংযোগসাধনের জন্য বিহারের সন্নিহিত অঞ্চল থেকে কিছুটা ভূখণ্ড পাওয়া দরকার। আবার সাঁওতাল পরগণার কিছু অংশও পশ্চিমবঙ্গে আসা উচিত, যার ভাষা, আচার-ব্যবহার, জীবন যাপনের ধরণ ধারণ পূর্ববাংলার উদ্বাস্তুদের সঙ্গে বেশি খাপ খায়, আর সেজন্য সেখানে তাদের সহজেই পুনর্বাসন দেওয়া যেতে পারবে।

এই হলো দুই প্রতিবেশী রাজ্যের মধ্যে রেষারেষির শুরু। ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত এটি চলেছিল। ঐ সালেই রাজ্যসভা বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করে দুই রাজ্যের সীমানা পুনর্বিন্যাস করতে থাকে। সাংবাদিক সম্মেলন ও বিধান সভায় ঐ ভূখণ্ড দাবি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ও বাংলার কংগ্রেস নেতারা, বিশেষ করে অতুল্য ঘোষ যে সব ভাষণ দেন, তার প্রতিক্রিয়ায় প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে একখানা কড়া চিঠি আসে। সমস্যার সমাধানে বাংলার নেতারা ভুল পথে পা বাড়াচ্ছেন, এই ছিল তাঁর মত। দুই প্রতিবেশী রাজ্যের মধ্যে বিরোধের আশঙ্কাই তাঁকে বিচলিত করেছিল বেশি। ১৭ই আগষ্টের চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন :

প্রিয় বিধান,

তুমি ইয়োরোপ চলে গেছো। কিন্তু যাবার আগে যে মত বিরোধের সূচনা তুমি করে গেছো, তা আমি খুবই দুঃখজনক বলে মনে করি। অতুল্য ঘোষকে আজই আমি চিঠি লিখেছি, তার কপি এই সঙ্গে পাঠালাম।

প্রীতি নিও

জওহরলাল নেহেরু

ডাঃ রায়ের ভিয়েনা যাবার আগে দুই নেতার মধ্যে পত্র বিনিময় হয়েছিল। তাতে দেখা যায়, জওহরলাল তাঁর চক্ষুর অবস্থা সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে তাঁর ভিয়েনা যাত্রাকে ত্বরান্বিত করতে বলছেন। আর বলছেন দিল্লীতে ৯ই থেকে ১২ই আগষ্ট পর্যন্ত ওয়ার্কিং কমিটির যে মিটিং হবে তাতে তাঁর পক্ষে যোগ দেওয়া সম্ভব কি না, কারণ ঐ সময়ই তাঁর ভিয়েনা যাওয়ার কথা। ঐ চিঠিতে আরও একটা খবর ছিল। পার্লামেণ্ট ভবনের পাথরের সিঁড়িতে পড়ে গিয়ে জওহরলাল পায়ে চোট পেয়েছিলেন। এই খবরটা দিয়ে জওহরলাল লিখছেন আঘাত অবশ্য বেশি নয় দিন কয়েকের মধ্যেই সেরে যাবে। আপাতত একটু খুঁড়িয়ে হাঁটছি, এই যা। এ চিঠির উত্তরে ডাঃ রায় লিখেছিলেন যে অপারেশনের পর চোখের দৃষ্টি বাড়বে বলে তিনি আশা করেন। বাজেটের সময় অতসী কাঁচ দিয়েও বাজেট পড়তে তাঁর অসুবিধা হচ্ছিল। ডাঃ রায় ভিয়েনা যাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত থাকবেন বলে ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে যোগদান করতে পারবেন না বলে জানিয়েছিলেন ঐ চিঠিতে। আর জানিয়েছিলেন, তুমি দয়া করে মনে রেখো যে তুমি আর যুবকটি নেই। হাঁটুতে যদি ব্যথাটা লেগেই থাকে, তাহলে ওর একটা এক্স-রে করিয়ে নেওয়া দরকার।

প্রায় আড়াই মাস ইয়োরোপ ও আমেরিকায় কাটিয়ে ডাঃ রায় চোখের পুনর্জীবিত দৃষ্টিশক্তি এবং নতুন কর্মোদ্যম নিয়ে কলকাতায় ফিরে এলেন। শরতের এক কুয়াশাচ্ছন্ন সকালে প্লেন থেকে নামলেন ডাঃ রায়, সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর বন্ধু সহকর্মী ও গুণগ্রাহীবৃন্দ। প্লেনের সিড়ির নিচেই আমি দাঁড়িয়েছিলাম।

কারণ তাঁর মালপত্রের টিকিটটা তিনি নেমেই আমার হাতে দেবেন। আমি সেই টিকিট নিয়ে তাঁর জিনিসপত্র বেছে বের করে নেবো। যাই হোক, বেশি বর্ণনা দিয়ে লাভ নেই। ফেরার পথে দেখা গেল কাতারে কাতারে লোক দাঁড়িয়ে আছে তাঁকে দেখবার জন্য।

ইয়োরোপ আমেরিকায় চোখ কাটাবার পর তিনি যে ঘুরেছিলেন, তা বিনা উদ্দেশ্যে নয়, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কলকাতার ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালীর উন্নততর ব্যবস্থা কী করা যায় তার পরিকল্পনা করা, পয়ঃপ্রণালীজাত গ্যাসের উৎপাদন-প্রণালী সম্পর্কে খোঁজ-খবর করা, কয়লা থেকে পিচ ও পিচজাতীয় দ্রব্যের

উৎপাদন কারখানা ও এ্যান্টিবায়োটিক ঔষধ তৈরির কারখানা স্থাপনের ব্যবস্থা করা।

ইতিমধ্যে দেশে ভারত পাকিস্তানের মধ্যে যাতায়াতের জন্য পাসপোর্ট প্রথা চালু করার যে প্রস্তাব দুই দেশের সম্মতিক্রমে নেওয়া হয়েছিল, যার ফলে দুই বাংলারই উদ্বাস্তু-স্রোত একটু আটকানো যেত, তাই নিয়ে পাকিস্তান খালি গড়িমসি করতে লাগলো। কোন্ তারিখ থেকে এই প্রথা চালু হবে সেই তারিখ আর পাকিস্তান কিছুতেই দেয় না। ফলে একটা অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হলো। উদ্বাস্তু-স্রোত আরও বাড়তে লাগলো। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাও তীব্র হতে লাগলো। এই অবস্থার কথা জানিয়ে মন্ত্রিসভার অস্থায়ী নেতা প্রফুল্লচন্দ্র সেন প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখলেন। এই অক্টোবরে পাকিস্তান সরকার পাসপোর্ট প্রথা বন্ধ রাখায় যে সমস্যা দেখা দিয়েছে তার বিশদ আলোচনা ছিল এই চিঠিতে। পাসপোর্ট প্রথার ভীতিও বাংলার হিন্দুদের মধ্যে প্রবলভাবে সঞ্চারিত হওয়ায় দলে দলে তারা বাংলায় আসতে আরম্ভ করেছে। ঐ প্রথা চালু হবে রব তোলায় আর তার পরে চালু না হওয়ায় এই বিপত্তির সৃষ্টি হয়ে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করছে। মন্ত্রিসভা মনে করে, এই অনিশ্চয়তার অবসান এখুনি হওয়ার প্রয়োজন। হয়তো পাসপোর্ট প্রথা এখুনি চালু করা হোক, আর নয়ত ও প্রস্তাব একেবারেই বাতিল করে দেওয়া হোক।

এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী চিঠি লিখলেন ডাঃ রায়কে ২৫শে অক্টোবর। ডাঃ রায় ইয়োরোপ থেকে ফিরবার পর। তত দিনে পাসপোর্ট প্রথা চালু হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে সফর করতে এসে এক দিনের জন্য কলকাতায় কাটিয়ে গিয়েছিলেন। চিঠিতে নেহেরুজী যা লিখেছিলেন, তাতে ছিল দুই বাংলার উদ্বাস্তু চলাচল ও পাসপোর্ট প্রথার সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণ। তিনি লিখেছিলেন, পাসপোর্ট প্রথা চালু হওয়াতে কিছু লোক ভয় পেলো এই কথা ভেবে যে, তারা বোধ হয় পরে আর আসতে পারবে না। ফলে আসবার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। পাকিস্তান ঐ প্রথা চালু করার তারিখ এক মাস পিছিয়ে দিতে চাইলো। আমরা রাজী হলাম না। বললাম, তাহলে ঐ প্রথা একেবারে উঠিয়ে দাও। অনিশ্চয় অবস্থা চলতে দেওয়া যায় না, সেটা বিপজ্জনক। আসলে পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল নয়, দ্রুত অবনতি ঘটছে। সম্ভবত দলে দলে লোক চলে আসার এটাই প্রধান কারণ।

মনে রাখতে হবে, গত বছর আর এ বছরের সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বহু হিন্দু ও-বাংলায় ফিরে গেছে। যত এসেছে, গেছে তার থেকে বেশি। আমার বিশ্বাস, পাকিস্তান যে পাসপোর্ট চালু করো বলে রব তুলেছিল, তার অন্যতম কারণ হচ্ছে এটি। যাই হোক, পাসপোর্ট প্রথা চালু হওয়ায় উদ্বাস্তু-স্রোত সঙ্গে সঙ্গেই কিছুটা ঠেকানো গেছে। কিছু লোক আটকে পড়েছিল, এ কথা ঠিক। কিন্তু তাদের পরীক্ষা-টরিক্ষা করে এ-পারে ঠিকই আসতে দেওয়া হয়েছে। এ নিয়ে কোনো সমস্যা দেখা দিয়েছে বলে আমার মনে হয় না। ইতি-মধ্যে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখেরা চিৎকার শুরু করে দিয়েছেন। আগে চেঁচাতেন লোক আসছে কেন বলে, এখন চেঁচাচ্ছেন লোক কেন আসছে না বা আসতে পারছে না বলে। আমার মনে হয়, পাসপোর্ট প্রথার মাধ্যমে স্রোতের গতি যে কিছুটা রুদ্ধ করা গেছে, সেটা ভালো হয়েছে। যারা স্থায়ীভাবে বা অস্থায়ীভাবে আসতে চায় আসুক, তাদের আসা-যাওয়ায় কোন ব্যাঘাত ঘটবে না। কিন্তু হঠাৎ বিরাট ভীড় এসে যদি এক সঙ্গে হাজির হয়, তখনই দেখা দেয় নানান সমস্যা।

ডাঃ রায় ফিরে এসে প্রধানমন্ত্রীর চিঠির উত্তর দিলেন। এই উত্তরের তারিখ হচ্ছে ২৯।৩০শে অক্টোবর ১৯৫২। তাতে তিনি লিখেছিলেন, ১৮ই আগস্ট আমার চোখের অপারেশন হয়। কিন্তু অক্টোবরের মাঝামাঝি পর্যন্ত চোখের ব্যথা কমে নি, যদিও অস্ত্রোপচারের ঘা সেরে গিয়েছিল। তারপর আবার চোখের উপযুক্ত চশমার কাচ পাওয়ার অসুবিধা দেখা দিলো। শেষ-পর্যন্ত অবশ্য ঠিকমত কাচ পেয়ে গেছি।

উদ্বাস্তু প্রসঙ্গ অলোচনা করে ঐ চিঠিতে তিনি পাকিস্তান সরকারের অসহযোগিতার কথা উল্লেখ করেন। তারপরে লেখেন বাংলার সীমারেখা বাড়িয়ে দেবার দাবির কথা। এ দাবি উঠেছিল বিধানসভায়। ডাঃ রায় লিখলেন, এ ছিল বেসরকারী প্রস্তাব। আমি সমর্থন করিনি। কিছু একটা বলে আমাকে প্রশ্নটা এড়িয়ে যেতে হয়েছিল। কারণ সরকারের প্রতি এটা বন্ধুত্বপূর্ণ আহ্বান ছিল না। বলা হয়েছিল, যেহেতু ওড়িষ্যা ও বিহার সরকার উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধানে সাহায্য করার জন্য উদ্বাস্তুদের যে সব জায়গায় বসাতে চেয়েছিলেন সে সব জায়গা তাদের পছন্দ না হওয়ায় তারা ফিরে এসেছে, সেইহেতু ঐ দুই প্রদেশের সরকারকে বলা হোক বাংলার সীমান্তের কাছাকাছি

আমাদের সুবিধামতো জায়গা আমরা পছন্দ করে দেবো তাতে তাদের প্রশাসনিক বা সার্বভৌমিক অসুবিধা যাই হোক না কেন। এই প্রশ্ন এইভাবে ওঠার জন্যই আমাকে ভাষণটি দিতে হয়েছিল। তোমার অবগতির জন্য একটা কপি যত শীঘ্র সম্ভব আমি পাঠাবো। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ কী করছেন আমি জানি। আমি কাল অথবা পরশু তাঁর সঙ্গে কথা বলবো। তিনি যে ঠিক পথে চলছেন এ আমি মনে করি না, আর সে কথা আমি তাকে বলবোও।

চিঠিতে ডাঃ রায় লিখেছিলেন, নিউইয়র্কে নান (বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত) এর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। মেননের সঙ্গেও দেখা হয়েছিল। নিউইয়র্ক ছাড়ার আগে মেননের একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল। আমার মনে হয় এখন সে ভালো আছে। গতকাল এস. কুরেশির সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে এবং তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্বপূর্ণ কথাবার্তা হয়েছে।

১৮ই ডিসেম্বর নেহেরুজী ডাঃ রায়কে একটি কৌতুকপূর্ণ ব্যক্তিগত চিঠি লেখেন। লেখেন যে, দু-তিন দিন আগে বিখ্যাত বেহালাবাদক ইহুদী মেনুহিনের স্ত্রী ডায়ানা মেনুহিনের একটি চিঠি পেয়েছি। চিঠিতে তিনি লিখেছেন জুরিখে কোথাও তোমার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল। এবং সে দেখা হওয়ায় তিনি খুব খুশি হয়েছিলেন। তিনি তোমাকে 'মহৎ রাহাজানিকারক ডাঃ বি. সি. রায়' বলে বর্ণনা করেছেন। এ বর্ণনাটা আমার ভালো লেগেছে। তোমার কী মনে হয় ?

ঐ তারিখে প্রধানমন্ত্রী আরও একটা চিঠি লিখেছিলেন। তাতে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন সম্পর্কিত প্রশ্নটি ছিল।

নয়াদিল্লী
১৮ই ডিসেম্বর ১৯৫২

প্রিয় বিধান,

ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন সম্পর্কিত প্রশ্নটি নিয়ে তোমাকে আমি আলাদাভাবে এই চিঠি লিখছি, আমার ভয় হচ্ছে ভবিষ্যতে ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠন সংক্রান্ত এই সব প্রশ্নে আমাদের বিশেষ ভাবে জড়িয়ে পড়তে না হয়। আশা করি তোমার বাংলার লোকেরা এ জিনিস আবার শুরু করে দেবে না। এ বিষয়ে যতটা সম্ভব বন্ধুত্বপূর্ণ উপায়ে এগিয়ে যাবার পরামর্শই আমি তোমাকে দেবো। খুব ভালো হয় যদি তুমি বিহারের শ্রীবাবু ও অন্যান্যদের সঙ্গে কথা বলতে পারো। ৩০শে তারিখে ওয়ার্কিং কমিটির যে অধিবেশন বসছে

আশা করি তাতে যোগ দিতে তুমি আসছো। সে সময় শ্রীবাবুও এখানে আসবেন।

তোমার স্নেহের

জওহর

(৯)

১৯৫৩

কলকাতা মহানগরীর একটা বড়ো সুবিধা এই যে, এটি হচ্ছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে যাতায়াতের একটি কেন্দ্রস্থল। পৃথিবীর তাবৎ দেশের পার্লামেণ্টারি প্রতিনিধিদল, ভারতীয়দের সহায়তায় ভারতে বিশেষ করে পশ্চিম-বঙ্গে বাণিজ্য সংস্থা গঠনে অভিলাষী ইয়োরোপীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়; তারও পরে বিদেশাগত ভি আই পিরা ত আছেনই। এদের কত লোককে যে মুখ্যমন্ত্রীর অভ্যর্থনা জানাতে হতো তার ইয়ত্তা নেই। এদের মধ্যে আমেরিকার লোকই তখন আসত বেশি। তিনি যখন রাজ্যের প্রথম পঞ্চম বার্ষিকী পরিকল্পনাকে রূপ দিতে ব্যস্ত, তখন তাঁর সেই অমূল্য সময় নষ্ট করে ঐ ধরণের বহু অতিথি এসে উপস্থিত হতেন। একসময় বিরক্ত হয়ে তিনি মন্তব্য করে-ছিলেন, এই আমেরিকানরা ভাবে কী ? যেহেতু তারা সহায়তা দিচ্ছে সেই হেতু তারা অনবরত লোক পাঠাবে পরিকল্পনার কাজ কেমন হচ্ছে তা দেখার জন্য, আর উপদেশ দেবার জন্য ?

অবশ্য এমন কয়েকজন আবার ছিলেন যাদের পরামর্শের তিনি মূল্য দিতেন এবং যাদের উপস্থিতিতে তিনি খুবই আনন্দিত হয়েছিলেন। এই বছরের জানুয়ারিতে এমনি দুজন অতিথি এলেন, একজন হচ্ছেন স্যর জর্জ সুস্টার এবং ক্লিমেণ্ট অ্যাটলি। স্যার জর্জ সুস্টার তিরিশ দশকে ভারতের অর্থবিষয়ক সদস্য (ফাইনান্স মেম্বার) ছিলেন এবং উদারনৈতিক মনোভাবাপন্ন একজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ছিলেন। ডাঃ রায় তাঁর উপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তাঁর সঙ্গে মহাকরণে বসে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম পঞ্চম বার্ষিকী পরিকল্পনা নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন। স্যর জর্জ পরে পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভারতের এই প্রয়াসের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন।

ওর পরে এলেন ক্লিমেণ্ট অ্যাটলি। তিনি রেঙ্গুনে সমাজতান্ত্রিক কনফারেন্সে যোগ দেবার পথে কলকাতায় থেমেছিলেন। ভারতের এই বিশ্বস্ত বন্ধুকে

চাক্ষুষ দেখবার অভিলাষ আমার পূর্ণ হলো যখন তাকে মহাকরণের লাউঞ্জে এক সকালবেলায় স্বাগত জানাবার সৌভাগ্য লাভ করলাম। সাধারণ ইংরেজদের তুলনায় দেখতে মানুষটি একটু ছোটখাটো, চিবুকের হাড় বেশ ফুটে বেরুনো আর মাথাজোড়া টাক। বয়সের ভারে একটু নুয়েও পড়েছেন তখন।

সহাস্যমুখে আমার দিকে যখন তাকালেন, আমার মনে হলো ওঁর মধ্যে সন্তসুলভ একটা ভাব আছে। আমি মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানিয়ে ওঁকে আসন গ্রহণ করতে আমন্ত্রণ জানালাম। ক্লিমেণ্ট এ্যাটলির সেইসব ভাষণ এবং ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে তাঁর ভারতের স্বাধীনতা বিষয়ক বিলটির সুকৌশলে উত্থাপন প্রভৃতির কথা আমার মনে গভীরভাবে ছাপ ফেলেছিল। টোরি দলের বিরোধিতা এবং যে কায়েমী স্বার্থ দুই শতাব্দী ধরে ভারতের জনগণকে অন্যায়-ভাবে অধীনতাপাশে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন, তাদের প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ভারতকে ক্ষমতা হস্তান্তর করার মূলে তাঁর প্রয়াস ছিল না কি? ভারত এখন স্বাধীন, আর সেজন্য কৃতজ্ঞ জাতি হিসাবে আমাদের সত্যিকারের একজন বন্ধুকে ভুলে যাওয়া উচিত নয়।

জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে হায়দরাবাদের নানাল নগরে জওহরলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন বসেছিল। এই অধিবেশনের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল ভাষার ভিত্তিতে রাজ্যগুলির পুনর্গঠন, ভারতের পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা এবং সাম্প্রদায়িকতা। এয়ারওয়েজ ইণ্ডিয়ার একটি ডাকোটা বিমানে করে আমরা সকালবেলাতেই কলকাতা ছেড়ে গেলাম। ওড়িষ্যার উপকূল ধরে মাদ্রাজ পর্যন্ত বঙ্গোপসাগর দিয়ে উড়ে যাবার অভিজ্ঞতা সেই আমার প্রথম। বিশাখাপত্তমের কাছে আমি একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখেছিলাম যা আমি আজও পর্যন্ত পরিষ্কার স্মরণ করতে পারি। সুনীল সাগরের বুকে আমি একটা টকটকে লাল চিহ্ন দেখতে পেয়েছিলাম। প্লেনখানা যতই এগুচ্ছে ততই চোখে পড়ছে ঐ রকম অনেক লাল চিহ্ন। চিহ্নগুলো যেন একটা কেন্দ্রে এসে পর পর মিশে যাচ্ছিল। এই লাল চিহ্নবাহিত পথরেখার নিচে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ সামুদ্রিক মাছ সাঁতার কাটতে কাটতে একই লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হচ্ছিল। এইভাবে যেতে যেতে তাদের শরীর থেকে বোধহয় তৈলাক্ত কোনো পদার্থ নিসৃত হয়ে ঐ সব লাল চিহ্নের সৃষ্টি করছিল। এসব দৃশ্য আমি ছ সাত হাজার ফুট উঁচু থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম।

যাইহোক, মাদ্রাজ ও বাঙ্গালোরে একটু থেমে প্লেনখানা উড়ে চললো হায়দরাবাদে। ডাঃ রায়ের সঙ্গে আমরা তিনজন ওখানে গিয়ে পৌঁছলাম বেলা প্রায় সাড়ে তিনটের সময়। অভ্যর্থনা সমিতি থেকে বাংলার ভি আই পিদের জন্য যে সুন্দর বাড়িখানা ঠিক করে দেওয়া হয়েছিল, আমরা গিয়ে সেখানে উঠলাম সারাদিনের ক্লান্তিকর পথপরিক্রমার পরে।

বিষয় নির্বাচনী কমিটির মিটিংএর দ্বিতীয় দিনে ডাঃ রায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ওপর প্রস্তাব উত্থাপন করে সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যকলাপের নিন্দায় মুখর হয়ে উঠলেন। তিনি বললেন, সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যকলাপ পশ্চিমবঙ্গে ও কাশ্মীরে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের সমস্যা আরও ঘোরালো করে তুলছে। তাঁর যুক্তির ভিত্তি ছিল প্রধানত গান্ধীজী প্রবর্তিত প্রধান নীতিসমূহ। সেটা কী? না মতান্তর ও মতপার্থক্য দূর করতে হবে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও মানিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে।

ডাঃ রায়ের ভাষণে ছিল তথ্য ও যুক্তি। কিন্তু তাঁর প্রস্তাবের সমর্থক হিসাবে উঠে কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী সেখ আবদুল্লা তাঁর বিপরীত পথে গিয়ে জনসংঘ নেতা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে সরাসরি আক্রমণ করে বসলেন। ডঃ মুখোপাধ্যায় পূর্বে তাঁর এক বিবৃতিতে বলেছিলেন কাশ্মীর বিধানসভার পক্ষ থেকে বিনাসর্তে ভারতভুক্তির কথা ঘোষণা করা উচিত। সেখ আবদুল্লা তাঁর ভাষণে মহাত্মা গান্ধীর নামে শপথ করে যখন বললেন যে, হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সম্প্রদায়িকতাবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্য তিনি জীবন পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত আছেন, তখন জনতার মধ্যে প্রচুর করতালি ধ্বনিত হতে লাগল। তাঁর ভাষণ তিনি শেষ করলেন এই বলে যে, ভারতের পতাকার প্রতি অন্য সব ভারতীয়দের যে শ্রদ্ধা, সেই শ্রদ্ধা কাশ্মীরের জনগণেরও আছে।

সেই সময় অবশ্য কী নেহেরু কী ভারতীয় জনগণ, কেউই ভাবতে পারেন নি যে কংগ্রেসের সংগঠন ভূমি থেকে সেই হচ্ছে সেখসাহেবের শেষ ভাষণ। এবং আগামী দিনে এই বীরপুরুষটি যে কী ভূমিকা নিতে যাচ্ছেন সে সম্পর্কেও কেউ কিছু ভাবতে পারেন নি।

মাস কয়েক পরে ডাঃ রায়ের এক বন্ধু আমেরিকা থেকে এদেশে বেড়াতে এসেছিলেন। এঁর নাম মিঃ শর্মা। ইনি এবং এঁর ইংরেজ স্ত্রী মাসখানেকের

মতো ডাঃ রায়ের বাড়িতে অতিথি হিসাবে ছিলেন। ইনি কাশ্মীর বেড়াতে গিয়ে কিছু মূল্যবান তথ্য পান, যা থেকে বোঝা গেল যে কাশ্মীরের অবস্থা প্রকৃতপক্ষে খুব ভালো নয়। ২রা জুলাই ডাঃ রায় নেহরুকে দীর্ঘ এক পত্র লিখে কাশ্মীরে প্রকৃতপক্ষে যা ঘটছে, সে কথা জানিয়ে ওসম্পর্কে আরও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে উপদেশ দিলেন। নেহরুর উত্তর এলো প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। পরে ১৯৫৪ সালে ডাঃ রায় যখন কাশ্মীরে এক মাস বিশ্রাম নেবার জন্য গিয়েছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে আমারও সেখানে যাবার সৌভাগ্য হয়েছিল। কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী তখন গুলাম মহম্মদ। সবাই জানেন শ্যামাপ্রসাদ কাশ্মীরে বন্দীজীবনের কঠোরতার জন্য মারা যান। গুলমার্গের যে ডাকবাংলো থেকে আবদুল্লাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল আমরা গিয়ে উঠেছিলাম সে ডাক বাংলোতেই। এখানেই আমরা এক সামান্য ভেড়া চড়ানো মানুষের কথা জানতে পারি যে কিনা হঠাৎ দেখতে পায় ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে হানাদারের দল। এই লোকটির প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব আর সাহসই সেদিন কাশ্মীরকে রক্ষা করেছিল। সে যদি সময় মতো কর্তৃপক্ষকে এই বিপদের কথা না জানাতে পারতো (যার ফলে সেনাদল সতর্ক হয়ে গিয়েছিল) তা হলে কী যে সর্বনাশ হতো কে জানে।

আমরা ১৬ই জানুয়ারি রাত আড়াইটায় বিমানবন্দরের দিকে রওনা হলাম। আমাদের বিশেষ বিমানখানা ওখানেই ছিল, কিন্তু পাইলট ডাঃ রায়কে জানালেন, কর্তৃপক্ষের আদেশে সমস্ত রাত্রিকালীন আকাশ পর্যটন নিষিদ্ধ হয়েছে। সেটা কি নিরাপত্তার কারণে, না প্লেনের গর্জন ক্লান্ত অতিথিদের নিদ্রার ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে সেইজন্য? কে জানে!

তখন কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রী ছিলেন জগজ্জীবন রাম আর তিনি হায়দরাবাদ অধিবেশনে উপস্থিতও ছিলেন। সেজন্য ডাঃ রায় বিমানবন্দরের কর্তৃপক্ষকে বললেন, ওঁর সঙ্গে ফোনে কথা বলুন। বলুন যে, ডাঃ রায় বিমানে রওনা হবার জন্য এখানে অপেক্ষা করছেন। ওঁরা তাই করলেন। জগজ্জীবনবাবু সঙ্গে সঙ্গে অনুমতি দিলেন। সেই অনুসারে প্লেন প্রস্তুত হতে লাগল ওড়বার জন্য। প্রায় রাত তখন চারটে, আমরা আকাশে উড়লাম। গোড়া থেকেই প্লেনে খুব বাম্পিং হতে আরম্ভ করলো। জানালা দিয়ে যেদিকে তাকাই নিকষ কালো অন্ধকার! দেখতে দেখতে কেমন একটা ভয় আর অস্বস্তি জেগে ওঠে

মনে। কিন্তু ডাঃ রায় তাঁর আসনের সঙ্গে বেল্ট এঁটে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছেন। তাঁর শান্ত নিশ্চিন্ত মুখচ্ছবি আমাদের মনে যেরকম করে চিরকাল ভরসা জাগিয়ে এসেছে, এবারেও তাই করলো। দেখতে দেখতে আমিও ঘুমিয়ে পড়লাম।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ওপর বেতার ভাষণ

হায়দরাবাদ থেকে ফেরার পর ডাঃ রায় আকাশবাণী থেকে প্রথম ভাষণ দিলেন প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ওপর। লোকে প্রথম জানতে পারলো কীভাবে ঐ পরিকল্পনা রূপায়িত হতে চলেছে। এই পরিকল্পনার প্রস্তাবিত মোট ব্যয়বরাদ্দ হচ্ছে ২০০০ কোটি টাকা। ১৪০০ কোটি টাকা হচ্ছে কেন্দ্রীয় আওতাভুক্ত এবং ৬০০ কোটি টাকা হচ্ছে রাজ্য আওতাভুক্ত। পশ্চিমবঙ্গের জন্য বরাদ্দ হচ্ছে (পাঁচ বছরের জন্য) ৬৯˙০১ কোটি টাকা। এর মানে হচ্ছে মাথাপিছু ব্যয়বরাদ্দ বাৎসরিক ১২ টাকা মাত্র। রাজ্যের অর্থনীতিতে আশাপ্রদ সংযোজন হিসাবে খুবই কম টাকা; আবার অনেকে মনে করলেন, পঞ্চমবার্ষিক পরিকল্পনার ফলে অর্থস্ফীতি ঘটাও অসম্ভব নয়।

মুখ্যমন্ত্রী বললেন, অগ্রাধিকারের দিক থেকে সমাজসেবাকেই সবার ওপর স্থান দেওয়া হয়েছে। রাজ্যসরকার এ ব্যাপারে ব্যয়বরাদ্দ রেখেছেন ২৫˙৩৪ কোটি টাকা, সেচ ও বিদ্যুতের জন্য ১৬˙০৩ কোটি টাকা। এর পর আসছে যান-বাহন ও যোগাযোগ, তার জন্য ১৫˙৭৫ কোটি টাকা, কৃষি ও গ্রামোন্নয়নের জন্য ১০˙৪৯ কোটি টাকা। গড় হিসাব ধরলে পশ্চিমবঙ্গে মোট বরাদ্দের ৩৬˙৯ শতাংশ পেয়েছে সমাজসেবা, ২২˙৯ শতাংশ যানবাহন ও যোগাযোগ এবং ২৩˙৩ শতাংশ সেচ ও বিদ্যুৎ। রাজ্যগুলির মধ্যে মাথাপিছু ব্যয়বরাদ্দের দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গের স্থান দ্বিতীয়। প্রথম হচ্ছে বোম্বাই।

একথা অস্বীকার করা যায় না যে, পশ্চিমবঙ্গের তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরি-কল্পনা মূলত বিধানচন্দ্র রায়ের সৃষ্টি। প্ল্যানিং কমিশনের নির্দেশ উপদেশ থাকলেও তিনি যেভাবে এই কর্মযজ্ঞকে সুষ্ঠু রূপায়ণের পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন তা সত্যিই বিস্ময়কর। এ যেন তার সৃষ্টিশীল মনেরই এক অভূতপূর্ব আত্মবিকাশ, অন্যান্য রাজ্যের অন্যান্য মুখ্যমন্ত্রীদের তুলনায় তাঁর কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে সমধিক।

নলিনীরঞ্জন সরকারের মৃত্যু

২৫শে জানুয়ারি রবিবার ডাঃ রায় তাঁর প্রাত্যহিক অবৈতনিক রোগী দেখার পালা সবে শেষ করেছেন, এমন সময় জরুরী টেলিফোন এলো তাঁর বন্ধু ও সহ-কর্মী নলিনীরঞ্জন সরকারের বাড়ি থেকে। কয়েক মাস ধরেই তিনি শয্যাগত। অর্থমন্ত্রী থাকা কালেই তাঁর ষ্ট্রোক হয়েছিল। সেই থেকেই শুয়েছিলেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে। তাঁর ডাক্তারদের একজন ফোনে জানালেন, সকালের দিকে শ্রীসরকারের গুরুতর হৃদরোগের আক্রমণ হয়েছে, অবস্থা খুব আশঙ্কাজনক। আমি ফোনটা ডাঃ রায়ের ঘরে সংযুক্ত করে দিলাম। এবং তার কয়েক মিনিট পরেই ডাঃ রায় তাঁর বন্ধু শ্রীসরকারের বাড়ি দক্ষিণ কলকাতার লোয়ার সার্কুলার রোডের ওপর অবস্থিত রঞ্জনীর দিকে ছুটলেন। তাঁর জন্য এক দল ডাক্তার ওখানে প্রতীক্ষা করছিলেন। ডাঃ রায় রোগীকে পরীক্ষা করে একজন ডাক্তারকে প্রেসক্রিপশন লিখিয়ে দিলেন মুখে মুখে এবং তাঁর নির্দেশ অনুসারে ডাক্তারের দল যতখানি সাবধানতা অবলম্বন করা সম্ভব সবই করলেন। ফলে একটু পরে রোগী একটু আরাম বোধ করলেন।

আমার নিজের মনে আছে অন্য একটি দিনের কথা। ১৯৫২র দুর্গাপূজার পর আমি একবার ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ মনে হলো তাঁর অসুখ হবার পর বেশ কয়েক মাস আমি তাঁকে দেখি নি, বিজয়ার পর তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করা উচিত। এই কথা ভেবে ড্রাইভারকে বললাম গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে নিতে। গাড়ি সেই মতো তাঁর বাড়ির মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালো। তাঁর মার্বেল পাথরের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে উঠতে ভাবছিলাম, অবাক কাণ্ড। কী পোর্টিকোয় কী সিঁড়ির কাছে একটি লোককেও দেখতে পেলাম না। অথচ সুস্থ যখন ছিলেন তখন লোকে একেবারে গিস গিস করতো বাড়িটা। আমি জানতাম কোন্ ঘরে ওঁকে রাখা হয়েছে। সেইমতো ঘরে ঢুকে দেখি বিছানায় কুঁকড়ে শুয়ে আছেন, কাছে একটি অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান তরুণী নার্স মাত্র। শ্রীসরকার আমার দিকে তাকিয়ে আমাকে চিনতে পারলেন মনে হলো। কিন্তু অমন যাঁর স্বাস্থ্য ছিল এ কী চেহারা হয়ে গেছে তাঁর! পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে শুয়ে আছেন, শীর্ণ বিশীর্ণ, কী দেহে কী মনে নির্জীব এক অসহায় ব্যক্তি। তাঁর স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরটি পর্যন্ত নেই। কোনো রকমে আকারে ইঙ্গিতে এবং খুব ক্ষীণ কণ্ঠে লোকের সঙ্গে একটু আধটু আলাপ করতে পারেন মাত্র।

কিছুক্ষণ থেকে চলে আসবার সময় ভাবছিলাম চল্লিশ বছরেরও ওপর যে মানুষটি বাংলার রাজনীতিতে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছেন, আজ তাঁর কী শোচনীয় অবস্থা!

যাই হোক, সেই রবিবারেই চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ের হিন্দুস্থান ইন্সিওরেন্স ভবনে নলিনী সরকার মশাইয়ের এক আবক্ষ মার্বেল পাথরের মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেছিলেন রাজ্যপাল ডঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠান যখন চলছিল নলিনীবাবু তাঁর রোগশয্যা থেকে খবরাখবর নিচ্ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষ হলে যথারীতি তাঁকে তা জানানো হলো।

ঐদিন বিকেলেই তাঁর অবস্থার অবনতি ঘটলো। ডাঃ রায় আবার ছুটলেন তাঁর বাড়ি। কিন্তু এবার তিনি গিয়ে পৌঁছনোর আগেই নলিনীবাবু মারা গেলেন। ওঁর কাছ থেকে ফিরে এসে ডাঃ রায় ওপরে নিজের শোবার ঘরে না গিয়ে তাঁর ক্লিনিকের পাশের ঘরে চুপচাপ বসে রইলেন একা। দেখতে দেখতে দুজন রিপোর্টার এসে উপস্থিত। ডাঃ রায় ধীরে ধীরে বিবৃতিস্বরূপ বলতে লাগলেন, তাঁর জীবনের গত চল্লিশ বছরের ঘটনাক্রম আমি প্রীতির সঙ্গে লক্ষ্য করে এসেছি। তিনি ছিলেন বাংলার সেই বৃহৎ পঞ্চজনের একজন। পঞ্চজন এর দুজন চলে গেলেন, শরৎ বসু ও নলিনী সরকার। পড়ে রইলাম আমরা তিন-জন—আমি, তুলসীচরণ গোস্বামী ও নির্মলচন্দ্র চন্দ্র। আর পড়ে রইলো সেই সব দিনের স্মৃতি, দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর যখন আমরা একযোগে কাজ করে গেছি। আমার আগে চলে যাওয়ার জন্য নলিনীকে আমি সত্যিই হিংসা করি।

শেষ কথাটি বলার সঙ্গে সঙ্গে স্টেটসম্যানের চীফ রিপোর্টার অমল দাশগুপ্ত প্রতিবাদ করে উঠলেন—বললেন, না ডাঃ রায়, এই কথাটা আপনি দয়া করে প্রত্যাহার করে নিন। এ কথাটা আমরা অন্তত ছাপাচ্ছি না।

সকালের কাগজে সেটাই দেখা গেল। শেষের বাক্যটি কোনো কাগজে ছাপা হয়নি। যাই হোক, এইভাবেই ঘটলো পুরুষসিংহ এবং কৃতিমানুষ নলিনীরঞ্জন সরকারের জীবনাবসান।

বাৎসরিক বাজেট

পরের মাসে বাজেটের জন্য রাজ্যের বিধানসভার অধিবেশন ডাকা হলো। উদ্বোধনী ভাষণে ২রা ফেব্রুয়ারি রাজ্যপাল হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সরকারের

প্রধান প্রধান কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করলেন। তার মধ্যে সব থেকে উল্লেখযোগ্য ছিল, জমিদারী প্রথা বিলোপের বিল, পশ্চিমবঙ্গ সিকিউরিটি বিল এবং সিটি সিভিল কোর্ট ও সিটি সেসন কোর্ট গঠন করার জন্য বিল। আর ছিল সাতটি উন্নয়ন প্রকল্প, যার মধ্যে ছিল আটটি উন্নয়ন ব্লক। একশটি গ্রাম নিয়ে একটি গ্রামীণ শহর—এই হচ্ছে এক একটি ব্লক। আরও একটি পরিকল্প সরকার শেষ করার আশা রাখেন, সেটি হচ্ছে কলকাতার দক্ষিণ অঞ্চলের সন্নিহিত তেইশ হাজার একরেরও বেশি জমি নিয়ে গঠিত একটি জল নিকাশী পরিকল্প, যার নাম সোনারপুর আরা পাঁচ মাতলা জলনিকাশী পরিকল্প। এই পরিকল্পটি হাতে না নিলে কলকাতার কিছু অংশ জলের তলায় চলে যেতে পারতো। এছাড়া উত্তর-পুর্ব কলকাতার লবণ হ্রদের জমি উদ্ধার করে শহরের ভীড় কিছু কমাবার পরিকল্পনাও করেছিলেন ডাঃ রায়। এজন্য দুজন ডাচ বিশেষজ্ঞ আনিয়েছিলেন ডাঃ রায়, যারা সব কিছু দেখে শুনে সরকারকে এ বিষয়ে সুষ্ঠু নির্দেশ উপদেশ দিতে পারবে। ডাঃ রায়ের মৃত্যুর পর এই পরিকল্পের কাজ বিলম্বিত হয়ে গেলেও বর্তমানে যে লবণ হ্রদে শহর গড়ে উঠছে এতো দেখতেই পাচ্ছি।

কলকাতা থেকে তিরিশ মাইল দূরে কাঁচড়াপাড়ায় সরকারের নিজস্ব এবং সরকার পরিচালিত যক্ষ্মা হাসপাতালের শয্যাসংখ্যা বাড়িয়ে এক হাজার করা হলো—এর রোগী ছিল অধিকাংশই উদ্বাস্তু। এর টাকা এসেছিল কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রক থেকে।

বিধানসভা চলাকালেই ১৫ই ফেব্রুয়ারি অর্থ কমিশনের সুপারিশ প্রকাশিত হয়ে রাজনৈতিক মহলে বিশেষ নৈরাশ্যের সঞ্চার করলো। দেশমুখ অ্যাওয়ার্ড যেখানে ছিল বার্ষিক ৯.৬০ কোটি টাকা, সেখানে বিভাজ্য রাজস্ব ও অনুদান বাবদ পশ্চিমবঙ্গ পাচ্ছে মোট ৭.৫৪ কোটি টাকা মাত্র এবং আয়কর ও পাটকরের আয়ের বেশি অংশ চাওয়া হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ থেকে, কিন্তু তা আদৌ মেনে নেওয়া হয় নি। কমিশন স্থির করলেন আয়করের বিভাজ্য অংশ থেকে শতকরা ১১.২৫ পাবে পশ্চিমবঙ্গ। এর ফলে যে বিশেষ নৈরাশ্য সৃষ্টি হবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আয়করের শতকরা ৭৫ ভাগই দেয় সম্মিলিতভাবে বাংলা ও বোম্বাই। নৈইমেয়ার অ্যাওয়ার্ড অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ পেতো শতকরা কুড়ি, কিন্তু বঙ্গভঙ্গের পর দেশমুখ অ্যাওয়ার্ড-এ সেটা কমিয়ে দেওয়া হল শতকরা ১৩.৫-এ। আয়করের অংশ এইভাবে ক্রমাগত কমিয়ে দেওয়ার ফলে রাজ্য ও

কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে একটা অপ্রসন্নতার সুর সৃষ্টি হলো। কখনো কখনো রাজ্য ও কেন্দ্রের সম্পর্ক এমন তিক্ত হয়ে দাঁড়াতো যে, সম্পর্ক একেবারে ভেঙে পড়ার মুখে চলে যেতো।

১৭ই ফেব্রুয়ারি ডাঃ রায় অর্থমন্ত্রী হিসাবে যে বাজেট পেশ করলেন, তাতে সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন প্রচেষ্টারই চিত্র ফুটে উঠলো। ১৯৫২-৫৩র সংশোধিত বাজেটে রাজস্ববাবদ আয় ধরা হলো, ৩৮.৩০ কোটি টাকা, ব্যয় ধরা হলো ৪২.১৩ কোটি টাকা, ঘাটতির পরিমাণ ৫.১১ কোটি টাকা।

বাজেট পেশ করার পর চার দিনের দিন ডাঃ রায় বিহারে চলে গেলেন ডি, ভি, সির তিলাইয়া বাঁধ ও বোকারোর বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য। ২১শে ফেব্রুয়ারি থেকে ভারতের বৃহত্তম সর্বার্থসাধক উন্নয়ন পরিকল্প দামোদর উপত্যকা পর্ষদ বা দামোদর ভ্যালী করপোরেশন (ডি,ভি,সি) আংশিকভাবে কার্যকরী হলো। উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে নেহেরু এলেন লেডী মাউন্টব্যাটেনকে সঙ্গে নিয়ে। শুধু এই প্রকল্পেই প্রথম পর্যায়ের সরাসরি যা সুফল হবে, তার পরিমাণ আন্দাজ ৩৮.২৬ কোটি টাকা। তিলাইয়া, কোনার, বোকারো, মাইথন, পাঞ্চেত পাহাড় ও দুর্গাপুর, এই পাঁচটি প্রধান নির্মাণ কেন্দ্রের ১৫০০টি পাকা বাড়ি এমনভাবে তৈরি হয়েছিল., পরে যা দিয়ে শহর গড়ে উঠতে পারবে।

স্তালিনের মৃত্যু

৬ই মার্চ সারা পৃথিবী স্তম্ভিত হয়ে গেল এম জোসেফ ভিসারিওনোভিচ স্তালিনের মৃত্যু সংবাদ যখন প্রচারিত হলো। এখানে বিধানসভা কোনো কাজ শুরু হবার আগেই বন্ধ হয়ে গেল। রাষ্ট্রপ্রধানের প্রতি যত রকমে শ্রদ্ধা দেখানো উচিত, তত রকমেই তা করা হলো সরকার থেকে।

পাকিস্তানী প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ

১৮ই এপ্রিল পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল গুলাম মহম্মদ নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করে মহম্মদ আলীকে প্রধানমন্ত্রী করলেন। মহম্মদ আলী তখন বিদেশে খুব উঁচু এক কূটনৈতিক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই মহম্মদ আলীর বাবা নবাব আলতাফ আলী ছিলেন পূর্ব বাংলার বগুড়ার এক মস্ত

বড়ো জমিদার। মহম্মদ আলী সুরাওয়ার্দি সাহেবের খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন, ছিলেন যুক্তবঙ্গের শেষ অর্থমন্ত্রী। উদার মনোভাবাপন্ন মানুষ বলে পরিচিত ছিলেন তিনি, নাজিমুদ্দিনের থেকে কম সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি ছিল আলতাফ আলী মহম্মদ আলী দুজনেরই। মনে হল, দুই বাংলার পারস্পরিক সম্পর্ক এবার ক্রমশই উন্নতিলাভ করবে। একদিন সকালে কলকাতা হয়ে ঢাকা যাওয়ার পথে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ আলী হঠাৎ এসে হাজির হলেন ৩৬ নম্বর ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটে ডাঃ রায়ের বাড়িতে। দুজনে রুদ্ধদ্বার কক্ষে বসে আলোচনায় রত হলেন আধ ঘণ্টা ধরে। খবরের কাগজের লোকই বলুন আর জনসাধারণই বলুন কেউই জানতে পারে নি এই অঘোষিত হঠাৎ সাক্ষাৎকারের ঘটনা।

জমিদারী প্রথা

৭ই মে সরকার যে অন্যতম প্রধান আইনগত ব্যবস্থা চালু করলেন, সেটি হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ এস্টেট্স অ্যাকুইজিশন বিল ১৯৫৩, জমিদারী প্রথা বিলোপ আইন বলে যেটি জনসাধারণের মধ্যে পরিচিত। ৫৩টি ধারা সম্বলিত এই আইনে আছে জমিদার ও অন্যান্য মধ্যবর্তীদের সমস্ত সত্ব বিলোপ করে ক্ষতিপূরণ দিয়ে সম্পত্তি অধিগ্রহণের ব্যবস্থা। মধ্যবর্তীরা একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত খাস জমি রাখতে পারে বটে, কিন্তু তাদেরকে সরকারের অধীনে সরাসরি ভাড়াটিয়া বলে গণ্য করা হবে। ভূগর্ভের খনি সংক্রান্ত সত্বও জমিদার এবং অন্য মধ্যবর্তীদের কাছ থেকে অধিগৃহীত হবে, সম্পত্তি অধিগ্রহণজনিত ক্ষতিপূরণের টাকা পর্যায়ক্রমে দেওয়া হবে, ছোটখাটো জমির মালিকদের সব থেকে বেশি সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা হলো সম্পত্তির মোট বাৎসরিক আয়ের ১৫ গুণ, আর বড়ো বড়ো জমি-মালিকদের সম্পত্তির মোট বাৎসরিক আয়ের চার গুণ টাকা। আইনটির প্রধান চারটি নীতি ছিল সমস্ত জমি আসবে রাজ্যের অধিকারে, মধ্যবর্তী কোনো ভাড়া আদায়কারীর স্বার্থ থাকবে না; জমি হবে লাঙল যার জমি তার, এই নীতির ভিত্তিতে বণ্টিত। সরকার বিধানসভায় বললেন, এই আইন একটি লক্ষ্যে পৌছবার উপায় মাত্র। জমিদারী প্রথা বিলোপ বিলটি গৃহীত হলেই নতুন ভূমিসংস্কার বিল আসবে। এই দুটি বিল একটি অপরটির পরিপূরক; জমির ঠিকা প্রথার ধরণ-ধারণ তথা অর্থনীতি একেবারে বদল করে দেবে।

এই বিলের ফলে জমিদারদের আভিজাত্য দ্রুত ভেঙে যেতে লাগলো। জমিদারদের বিরাট বিরাট অট্টালিকাগুলির রক্ষণাবেক্ষণ আর করা যাবে না বলে সেগুলি তারা বিক্রি করে দিতে লাগলেন। বর্ধমানের মহারাজা ছিলেন তখনকার দিনে সব থেকে বেশি পরিমাণ জমির মালিক। তাঁর বড়ো বড়ো অট্টালিকার কিছু তিনি দাতব্য বিষয়ে পরিবর্তিত করলেন, কিছু করলেন বিক্রি, যার একটিতে এখন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে রাজ্য সরকার ঐ সব অট্টালিকা কেনবার জন্য দেখতে লাগলেন। এগুলি জাতিগঠনমূলক কাজকর্মের ব্যাপারে কাজে লাগে কি না, সেটাই ছিল তাঁদের দেখার উদ্দেশ্য। অন্য বিভাগগুলির মধ্যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিভাগই স্কুল কলেজ বা হাসপাতাল করার উপযোগী অট্টালিকাগুলি কেনার ব্যাপারে অগ্রগামী হয়েছিলেন। তখন দেখতাম অনেক জমিদারই ডাঃ রায়ের বাড়িতে আনাগোনা করছেন। এঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন লালগোলার রাজাসাহেব। এঁর মুর্শিদাবাদ জেলার বাড়িটা মানসিক হাসপাতাল করার জন্য সরকার নিয়ে রেখেছিলেন। মহারাজা পি এন ঠাকুরের বাড়ি এমারেল্ড বাওয়ার রাজ্যের কেন্দ্রীয় পাঠাগারের জন্য কেনা হয়েছিল। দীঘাপতিয়ার কুমার সাহেবও তাঁর দার্জিলিঙের বাড়িটা বিক্রি করার জন্য তখন লেখালেখি করছিলেন।

মাউন্ট এভারেস্ট বিজয় ও পর্বতারোহণ শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন

কলকাতাসহ সমগ্র দেশ চমকিত হয়ে ১লা জুন তারিখে শুনতে পেলো যে পৃথিবীর সর্বোচ্চ এবং অজেয় গিরিশৃঙ্গ মাউণ্ট এভারেস্ট বিজিত হয়েছে। শৃঙ্গে আরোহণ করেছেন দুজন, একজন নিউজিল্যাণ্ডের লোক আর একজন ভারতীয়, স্যর এডমণ্ড হিলারি এবং তেনজিং নোরগে। এঁরা দুজন শৃঙ্গে উঠেছেন ২৯শে মে তারিখে। একটি ব্রিটিশ পর্বতারোহণ দলের সদস্য ছিলেন এঁরা দুজন। ২৯শে মে শৃঙ্গে উঠলেও সারা পৃথিবীতে এ খবরটা বেতারযোগে জানানো হয় ১লা জুন ইংল্যাণ্ডের রাণীর অভিষেকের দিনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, —রাণীর অভিষেকের দিন ছিল ২রা জুন।

২৫শে জুন তারিখে স্যর জন হাণ্ট, স্যর এডমণ্ড হিলারি, গ্রেগরি ও তেনজিং নোরগে মহাকরণে এলেন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে। ডাঃ রায়ের কাছে এটি মাত্র সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার ছিল না। এভারেস্ট বিজয়কে কেন্দ্র করে

সারা দেশে বিশেষ করে তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছিল। তারা চাইছিল হিমালয়ের রহস্যকে জানতে, পর্বতারোহণের ব্যাপারে মেতে উঠতে। ডাঃ রায় সে জন্যই এ সুযোগটা ছাড়লেন না। এঁদের সঙ্গে আলোচনা করতে বসলেন, পর্বতারোহণ শিক্ষণের কোন কেন্দ্র খোলা যায় কিনা। এ ব্যাপারে তিনি সাহায্য চাইলেন তেনজিং-এর। ছেলেরা যাতে উঁচু উঁচু পর্বতশৃঙ্গে ওঠবার রীতিনীতি রপ্ত করতে পারে, তার জন্য দার্জিলিঙে একটি পর্বতারোহণ কেন্দ্র স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এই কেন্দ্রের প্রথম ডিরেক্টারের পদ গ্রহণ করলেন তেনজিং নোরগে। যুবকল্যাণ পরিকল্পের অধীনে দার্জিলিঙ জেলার পাহাড়ী এলাকায় ছাত্রাবাস খোলা হয়েছিল। এগুলিকে শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাথমিক শিবির হিসাবে কাজে লাগানো হবে বলে স্থির হলো। পরে ২৬শে ডিসেম্বর জওহরলাল নেহেরু ডাঃ রায়কে এক চিঠিতে প্রস্তাব দিয়ে পাঠালেন যে, হিমালয়ান মাউণ্টেনিয়ারিং ইনষ্টিটিউট (হিমালয় পর্বতারোহণ কেন্দ্র) খোলা হোক তেনজিংকে ১৯৫৪ ১লা জানুয়ারি থেকে প্রধান শিক্ষণদাতা হিসাবে নিযুক্ত করে। তাঁর বেতন হবে ৫০০ টাকা, তার সঙ্গে ভাতা থাকবে ২৫০ টাকা। এক কথায় এইভাবেই তৈরি হয়েছিল ঐ পর্বতারোহণ কেন্দ্রটি।

দিল্লীর বঙ্গভবন

রাজধানী দিল্লীতে মন্ত্রীরা ও অফিসাররা থাকবার জায়গার বড়ো অভাব বোধ করতেন। ডাঃ রায় সেজন্য উপযুক্ত একটা বাড়ি খুঁজছিলেন। দিল্লীতে তাঁর ৪২ নম্বর র‍্যাটেণ্ডন রোডেব আস্তানায় একদিন সকালে খবর এলো যে একটি সুন্দর এক তলা বাংলো বাড়ি বিক্রি আছে। কোন এক অভিজাত পরিবারের বাড়ি ছিল সেটা; ডাঃ রায় আর দেরি না করে সেটি দেখে এসে কিনে ফেলতে মনস্থ করলেন। পরে কলকাতায় ফিরে এসে মন্ত্রী ভূপতি মজুমদার ও চীফ ইঞ্জিনিয়ারকে দিল্লী পাঠালেন বাড়িটা ঠিক কতো দাম হতে পারে তা আন্দাজ করে আসতে। সেই অনুসারে রাজ্য সরকার কয়েক লক্ষ টাকা দিয়ে ওটি কিনে নিয়েছিলেন ১৯৫৩র প্রথম দিকে। এইভাবে যখন বঙ্গভবন কেনা হলো, তখন অন্য রাজ্যের ওখানে ঐ রকম নিজস্ব কোন বাড়ি বা গাড়ি ছিল কিনা সন্দেহ। রাজ্যসভায় ডাঃ রায়ের রাজনৈতিক বিরোধিপক্ষ এর বিরুদ্ধে

অবশ্য অপপ্রচার করতে ছাড়েনি, তাঁদের মতে এ নাকি একদম বাজে খরচ। এমন কি কংগ্রেসী কর্তাদের কান ভারী করতেও তারা পেছপা হয়নি। কথাটা নেহেরু যখন তাঁর কানে তুললেন, তখন দৃঢ়ভাবে তিনি তাঁর কাজের সমর্থনে যুক্তি দেখিয়েছিলেন। বলেছিলেন, মন্ত্রী আর অফিসারদের কাছ থেকে কাজ চাইবো, আর তাদের সুখ-সুবিধা দেখব না—এ হয় না। দিল্লীর রাস্তায় রাস্তায় আমার লোকেরা ঘুরে বেড়াবে আশ্রয়ের খোঁজে, এ আমি হতে দেব না।

এক কথায় 'বঙ্গভবন' এর উৎপত্তি এইভাবেই। দেখতে দেখতে এই বঙ্গভবন দিল্লীতে বাঙালীদের সংস্কৃতিচর্চার একটি মিলন কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ালো। এই বঙ্গভবনের দেখাদেখি অন্য রাজ্যও তাদের নিজস্ব ভবন গড়ে তুলতে লাগলো দিল্লীতে।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু

২২শে জুন ডাঃ রায় খবর পেলেন যে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। শ্রীনগরে এক বন্দীশিবিরে তিনি তখন ছিলেন। ওখানেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন। জম্মু ও কাশ্মীর সরকারের আদেশ অমান্য করে তিনি তাঁর কয়েকজন জনসংঘ দলের সঙ্গীসহ ও রাজ্যে ঢুকতে গেলে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ১১ই মে তারিখে হৃদরোগে আক্রান্ত হবার আগের দিন। তাঁকে বন্দীশিবির থেকে শ্রীনগরেই একটি নার্সিং হোমে ভর্তি করা হয়। ২৩শে জুন ভোর ৩-৪০ মিনিটে হৃদরোগে তিনি মারা গেছেন বলে জম্মু কাশ্মীর সরকার ঘোষণা করলেন। খবরটা এলো ঝড়ের মতো, আর সারা কলকাতা ফেটে পড়লো বিক্ষোভে। ২৪ তারিখের মধ্যরাত্রে তাঁর মরদেহ এসে পৌছলো দমদম বিমানবন্দরে। জুন মাসের অমন গুমোট গরম উপেক্ষা করে বিশাল এক শোকাহত জনতা বিমানবন্দরে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছিল। তাঁর মৃতদেহের সঙ্গে রাত্রের অন্ধকারে শোভাযাত্রার এত ভীড় কলকাতা বোধহয় এর আগে আর কখনো প্রত্যক্ষ করে নি। কংগ্রেস ভবনকে লক্ষ্য করে সেই শেষ রাত্রিতে সে কী ইট পাটকেল ছোঁড়াছুড়ি! এ সম্পর্কে বলতে গিয়ে ডাঃ রায় নেহেরুকে লিখেছিলেন, আমার থেকে আমার বাড়িটার শহীদত্ব অনেক বেশি। সেই ১৯৩৯ সালে প্রতিপক্ষ কংগ্রেসীদের আক্রমণ, তারপরে একে একে মুসলীম লীগ প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক দলগুলো

থেকে শুরু করে কম্যুনিস্টরা পর্যন্ত, কে-না আক্রমণ চালিয়েছে এই বাড়ির ওপর ?

যাই হোক, শ্যামাপ্রসাদের দাদা রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর ভাইয়ের মৃত্যু-সংবাদ ডাঃ রায়কে জানালেন ২৩শে জুনের সকালবেলা। দেশের সর্বস্তর থেকে ক্রমাগত দাবি উঠতে লাগলো এ মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে তদন্ত করা হোক। ডাঃ রায়কে বলা হলো, আপনি শেখ আবদুল্লার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করুন।

ডাঃ রায় তখ্খুনিই তাই করলেন এবং কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রীকে স্পষ্ট ভাষায় এই তদন্তের দাবির কথা জানাতে দ্বিধা করলেন না। কাশ্মীরের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী শেখ আবদুল্লা পরে ওঁকে প্রস্তাব দিলেন, আপনি নিজে কাশ্মীরে আসুন। এসে নিজেই ওঁর মৃত্যুর কারণ তদন্ত করে দেখুন।

কথাটা সেই মুহূর্তে ডাঃ রায় রাখতে পারেন নি। জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে ডাঃ রায় ইয়োরোপ রওনা হচ্ছিলেন। শেখ আবদুল্লার এই প্রস্তাব এসে পৌঁছলো মাত্র তাঁর রওনা হবার আগের দিনটিতে। তখন যাত্রার ব্যবস্থা হয়ে গেছে, কী করে আর তা স্থগিত রেখে কাশ্মীর রওনা হওয়া যায় ?

উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও মন্ত্রীদের ভূমিকা

পরিকল্পনা মন্ত্রী গুলজারিলাল নন্দাকে ১৯৫২র ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে লেখা প্রধানমন্ত্রীর একটি চিঠির কপি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে এলো, যাতে কর্মচারী ও মন্ত্রীদের ভূমিকার কথা আলোচিত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে :

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূল খসড়ায় এই ভূমিকা যে একের ক্ষেত্র থেকে অন্য ক্ষেত্রে একেবারে ভিন্ন, সেটা বলা ছিল। মন্ত্রীরা শুধু নীতি নির্ধারণ করবেন ; সেগুলি কার্যে পরিণত করার ব্যাপারে তাঁরা হস্তক্ষেপ করবেন না, সেগুলির দায়িত্ব কর্মচারীদের, এটা আমার কাছে তখন অতি পুরাতন প্রথা বলে মনে হয়েছিল। বিলেতের মন্ত্রীরা (শ্রমিক সরকার তখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত) অতীতে আমাকে প্রায়ই বলতেন কর্মচারীদের সঙ্গে নিয়ে কাজ করার অসুবিধার কথা। তাদের সঙ্গে ওদের প্রায়ই বনিবনা হতো না। সমাজের ওপর বিজ্ঞানের প্রভাব বলে বার্টাণ্ড রাসেলের যে বইখানায় কর্মচারীদের ক্রমবর্ধিত ক্ষমতার কথা লিপিবদ্ধ আছে সেখানা থেকে কিছু অংশ তুলেও দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী :

কর্মচারীদের এই ক্ষমতা বৃদ্ধি সকলের কাছেই ক্রমাগত বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া যে বৃহত্তর সংগঠন এনে দিয়েছে তারই

অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে কর্মচারীদের ক্ষমতা বৃদ্ধি। কীভাবে একে নিয়ন্ত্রিত করা যায় সেটাই হচ্ছে আমাদের সময়কার অন্যতম গুরুত্বপুর্ণ রাজনৈতিক সমস্যা। কর্মচারীদের ক্ষমতা যদি সীমাবদ্ধ করে না রাখা যায়, তাহলে সমাজ-তন্ত্রের মানে হয়ে দাঁড়াবে একদল প্রভুর বদলে আর এক দল প্রভুর আবির্ভাব! পুঁজিবাদীদের আগেকার সব ক্ষমতাই কর্মচারীরা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়ার মতো করে পেয়ে যাবে।

চিঠিখানা মুখ্যমন্ত্রী তাঁর মুখ্যসচিব—এস এন রায়কে পাঠিয়ে দিলেন মাথায় একটি মন্তব্য লিখে 'মুখ্যসচিব' 'চিত্তাকর্ষক'।

এক্ষেত্রে আমি বলবো পশ্চিমবঙ্গে অন্তত একটি ক্ষেত্রে এই অভিযোগ ছিল সম্পূর্ণ সত্য। কোনো এক জরুরী বিভাগের সচিবকে জানি, তাঁর স্বভাবই ছিল ডাঃ রায়ের কাছে সরাসরি ফাইল নিয়ে আসা এবং তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে তাঁর মত জেনে নিয়ে সেইমতো ফাইলে নোট করে নেওয়া। বিভাগীয় মন্ত্রী (হরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী) সব সময় তাঁর সচিবের সঙ্গে একমত হতে না পেরে তাঁর নিজের মতামত ফাইলে লিখতেন ; কিন্তু চতুর সচিবটি জানতেন তিনি স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর সমর্থন পাবেন, কারণ আগে থেকেই তিনি তাঁর মত জেনে রেখেছেন। সেই অনুসারে দেখা যেতো, বিভাগীয় মন্ত্রীর মতামত অনেক সময় গ্রাহ্য না হয়ে বিভাগীয় সচিবের মতামত গৃহীত হয়ে গেল। এই ধরণের ঘটনা এমন পর্যায়ে উঠেছিল যে বিভাগীয় মন্ত্রী মহাশয় বিরক্ত হয়ে পদত্যাগ পর্যন্ত করতে উন্মুখ হয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য তাঁর পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করে নিতে তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে তিনি যখন হেরে গেলেন, তখন সচিবটির হলো পোয়া বারো। এর পরে বেশ কয়েক বছর ধরে তিনি ঐ বিভাগের ওপর দিব্যি ছড়ি ঘুরিয়ে চলে গেলেন নিরংকুশভাবে।

এক পয়সার যুদ্ধ : ট্রাম ভাড়ার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ

পশ্চিবঙ্গ সরকারের পক্ষে জুলাই মাসটা ছিল খুব আবর্তসংকুল। কলকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানী সেকেণ্ড ক্লাসের ভাড়া এক পয়সা বাড়িয়ে দিয়েছিল। ব্যস আর যাবে কোথায়, হৈ হৈ কাণ্ড! ট্রাম ভাড়া প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি হলেন ডাঃ সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু কমিটির সব থেকে জোরদার কণ্ঠস্বর

ছিল কমিউনিস্ট পার্টির। তাঁদের কথা ছিল, বেশি ভাড়া কেউ দেবেন না। এবং এর জন্য তাঁরা পিকেটিং শুরু করে দিলেন। ৩রা জুলাই সকালের দিকে জ্যোতি বসু সহ চারজন এম এল এ গ্রেপ্তার বরণ করলেন। আন্দোলন ক্রমশই হিংসাত্মক আকার ধারণ করলো, পটকা ছোঁড়া থেকে শুরু করে ট্রামে আগুন দেওয়া পর্যন্ত ঘটে গেল। সারাদিনে সব শুদ্ধ গ্রেপ্তার হলেন ৫৮৮ জন।

মুখ্যমন্ত্রীকে ইতিমধ্যে যেতে হলো ইয়োরোপে ৫ই জুলাই তারিখে। তাঁর এক আত্মীয়ার টিউমারের চিকিৎসা এবং সেই সঙ্গে তাঁর ডান চোখের অপারেশনের তারিখ নির্দিষ্ট হয়েছিল ২৩শে জুলাই।

মুখ্যমন্ত্রী প্রায় বছরে একবার করে ইয়োরোপ যেতেন বিভিন্ন সরকারী প্রকল্পের ব্যাপারে। সেই নিয়ে বিধান পরিষদে (আপার হাউস) বিরোধী পক্ষের নেতা অধ্যাপক নির্মলকুমার ভট্টাচার্য ঠাট্টা করে তাঁকে আখ্যা দিয়েছিলেন সিন্ধবাদ নাবিক। এই ঠাট্টায় ডাঃ রায় চটেন নি, তিনি বরং এটা উপভোগই করেছিলেন।

যাই হোক, যেদিন তিনি রওনা হলেন সেদিন কলকাতা মোটেই শান্ত ছিল না। তাঁকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে বিমানবন্দরে কয়েকজন মন্ত্রী এবং উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মী উপস্থিত ছিলেন। তখনকার পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল হীরেন সরকার এবং কমিশনার হরিসাধন ঘোষচৌধুরীর দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, স্বাধীনতার মূল্য কী তা জানেন ত? অনন্ত সতর্কতা। কথাটা মনে রাখবেন।

ওঁরা জানালেন, পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে তাঁরা কোনোরকম ত্রুটি করবেন না।

ডাঃ রায় রওনা হবার আগে অবশ্য একটি বিবৃতি দিয়ে গিয়েছিলেন। তাতে ট্রাম কোম্পানীর এই এক পয়সার ভাড়া বাড়ানোর সমর্থন ছিল। এর কারণস্বরূপ তিনি বলেছিলেন, সারা দেশের মধ্যে কলকাতার ট্রাম ভাড়াই সব থেকে কম। আর এই এক পয়সা বাড়ানোর ফলে যা দাঁড়ালো, তাতে ১৯৭২ সালে সরকার যখন ট্রাম কোম্পানী অধিগ্রহণ করবেন, তখন ক্ষতিপূরণ যা দিতে হবে তার পরিমাণ অনেক কমে যাবে।

কিন্তু কে কার কথা শোনে? ট্রাম ভাড়া প্রতিরোধ কমিটি ডাঃ রায়ের অনুপস্থিতির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করলেন। ৯ই জুলাই তাঁরা হরতাল ঘোষণা

করলেন। কলকাতা যেন ডামাডোলে পরিণত হলো। ট্রাম-বাস তো চলতে দেওয়া হলোই না, অর্ধপাল্লার ট্রেনগুলোকে পর্যন্ত আটকানো হলো। তাতে অগ্নিসংযোগের ঘটনাও বিরল ছিল না।

ঘটনা ক্রমেই ঘোরালো হয়ে উঠতে লাগলো। অস্থায়ী মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন এবং পুলিশমন্ত্রী কালীপদ মুখোপাধ্যায় প্রথমটায় যতটা পুলিশের ক্ষমতার ওপর নির্ভর করছিলেন, ততটা জনমত গঠনের দিকে মন দেন নি। শান্তি শৃঙ্খলার পরিস্থিতি দিন দিন খারাপ হয়ে দাঁড়াতে লাগলো। ১৬ই জুলাই কিছু কিছু মিলিটারির সাহায্যও নিতে হলো। মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর ঐদিন পুলিশমন্ত্রী সাংবাদিকদের বললেন, শক্তি দিয়ে শক্তির প্রতিরোধ করতে সরকার বদ্ধপরিকর।

এই কথাতে তখনকার সরকারী মনোভাবই প্রতিফলিত হলো, আর সঙ্গে সঙ্গে যেন বারুদের স্তূপে অগ্নিসংযোগ ঘটলো। ১৭ই জুলাই দক্ষিণ কলকাতার এক বিরাট এলাকার নিয়ন্ত্রণ জনতা যেন ছিনিয়ে নিলো নিজের হাতে। ছ রাউণ্ড গুলি চালালো পুলিশ। প্রফুল্ল সেন এইবার বুঝলেন সমূহ বিপদ। তাই তাড়াতাড়ি প্রতিনিধিস্থানীয় নাগরিকদের এক সভা ডেকে পরিস্থিতির পর্যালোচনা করলেন। কেউ বললেন, বিষয়টা ট্রাইবুন্যাল বসিয়ে স্থিরীকৃত হোক, আবার কেউ বললেন, না বর্ধিত ভাড়া প্রত্যাহার করে নেওয়া হোক।

পরদিন ১৮ই জুলাই মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর সরকার ট্রাম কোম্পানীর কর্তৃপক্ষকে ঐ ট্রাইবুন্যাল বসানোর সিদ্ধান্ত নিতে বললেন। এবং ট্রাইবুন্যালের মতামত সাপেক্ষে বর্ধিত ভাড়া নেওয়া স্থগিত রাখতে বললেন। ট্রাম কোম্পানী পরদিন জানালেন, ঠিক আছে। তাই মেনে নেওয়া হলো।

ঐ সঙ্গে সরকার কিন্তু ১৪৪ ধারা তুলে নিলেন না এবং এই ব্যাপারে যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তাদের মধ্যেকার কয়েক শ্রেণীর লোককে মুক্তিও দিলেন না। কিন্তু বিরোধিপক্ষ নাছোড়বান্দা। আসল দাবিতে তাঁদের জয় হয়েছে, এটাতেই বা তাঁরা জিততে চাইবেন না কেন? তাঁরা ঠিক করলেন, যতক্ষণ না আটক ঐ লোকদের ছাড়া হচ্ছে এবং ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করে না নেওয়া হচ্ছে, ততক্ষণ তাঁরা সমানে আন্দোলন চালিয়ে যাবেন; সরকারকে নতিস্বীকার করতে তাঁরা বাধ্য করাবেনই।

সাংবাদিকদের ওপর হামলা

পরদিন বেলা প্রায় পাঁচটার সময় ১৪৪ ধারা অমান্য করে ৩০০ লোক জমায়েত হলো কলকাতা ময়দানের অক্‌টরলোনি মনুমেণ্ট (এখন শহীদ মিনার) এর তলায়। ওদিকে অত বড়ো পরাজয়ের পর কয়েকজন উঁচু সারির মন্ত্রীর মেজাজ ভালো ছিল না। পুলিশেরও সেই অবস্থা। বিশ্রাম নেই, কিছু নেই দিনের পর দিন তারা আক্রমণের মোকাবিলা করে চলছিল। তারাও তৈরি হচ্ছিল সংঘাতের জন্য। দেখা গেল সভা আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই এক ট্রাক ভর্তি পুলিশ মেয়ো রোড ধরে সভাস্থলের দক্ষিণ পূর্বে এসে হাজির হয়েছে। তারা ছুটে গেল সভার দিকে, লাঠিচার্জ করলো, জনতাও পালালো। মার খেয়েছিল অনেকেই, তাদের ধরে ধরে পুলিশ ভ্যানে পোরা হলো। সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফাররা যখন সভার বিবরণী ও চিত্র গ্রহণ করছিল, তখন তাদের একদলের ওপরে পুলিশ হামলা করলো। আহত হলো ১৮ জন। তাদের মধ্যে দুজনকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হলো। ছজন সাংবাদিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

সাংবাদিকদের ওপর এই হামলার কথা শুনে পুলিশমন্ত্রী কালীপদ মুখোপাধ্যায় সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ কমিশনারকে নিয়ে লালবাজারে ছুটে গেলেন এবং নিজেই ধৃত সাংবাদিকদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলেন। তাদের শুশ্রূষা ও চিকিৎসা করার পর ছেড়ে দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরের দিন কাগজে কাগজে সাংবাদিকদের ওপর হামলার ছবি বেরিয়ে গেল, পুলিশী বর্বরতার ওপর গরম গরম সম্পাদকীয়ও লেখা হলো। সরকারের যেটুকু তাগদ অবশিষ্ট ছিল, এর ফলে তাও ভেঙে পড়লো। মহাকরণে উঁচু সারির মন্ত্রীরা এলেন রীতিমত সশস্ত্র প্রহরীবেষ্টিত হয়ে। কংগ্রেস সংগঠন বলতে যা বোঝাতো তা এই আন্দোলন শুরু হবার সময় থেকেই পর্দার আড়ালে চলে গিয়েছিল। তাই নিজেদের অবস্থা ভালো করে বুঝেই মন্ত্রীরা ২৩শে জুলাই তারিখে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করে নিলেন। প্রতিরোধ আন্দোলনের সেটা আবার ২৩ দিন। সরকার শুধু এটুকু করেই ক্ষান্ত থাকতে পারলেন না, সাংবাদিক নিগ্রহের তদন্ত করবার জন্য কলকাতা হাইকোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত জজ এস কে ঘোষকে নিয়োগ করতে বাধ্য হলেন।

তার আগে ১৯শে জুলাই প্রফুল্লচন্দ্র সেন ডাঃ রায়ের সঙ্গে টেলিফোনে

যোগাযোগ করলেন। ডাঃ রায় তখন সুইজারল্যাণ্ড। প্রফুল্লবাবু তাঁর স্বাভাবিক শান্ত কণ্ঠে ডাঃ রায়কে যত শীঘ্র সম্ভব কলকাতা ফিরে আসতে বললেন, কারণ তাঁরা নিজেরা পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে পারছিলেন না। ভিয়েনার ডাক্তারকে দিয়ে ডাঃ রায়ের চোখ অপারেশন করানোর কথা ছিল ২৩শে জুলাই, কিন্তু সেটা আর হলো না, ডাঃ রায় প্রথম যে প্লেনে যায়গা পেলেন সেই প্লেনেই ফিরে এলেন দেশে। ৩০শে জুলাই মধ্যরাত্রির খানিকটা আগে তিনি বিমানবন্দর থেকে তাঁর বাড়ি এসে পৌছলেন। সাংবাদিকদের ওপর হামলা হওয়ার জন্য যে পুলিশ কর্তাটি আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছিলেন, যাঁর অপসারণের দাবিতে সাংবাদিকরা সোচ্চার হয়েছিলেন, তিনি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। গভীর রাত্রের দিকে অল্প একটু সময় দেখা করার পর ঐ পুলিশ কর্তাটি যখন চলে গেলেন, তখন তিনি অনেকটা আশ্বস্ত হয়েছেন।

কলকাতা পৌছবার ১২ ঘণ্টার মধ্যে মন্ত্রিসভার বৈঠক ডেকে তার পরে ঘোষণা করলেন ডাঃ রায়, বিচারপতি প্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে একটি 'একজনের কমিশন' গঠন করা হলো। এই কমিশন ট্রামের ভাড়ার সম্পূর্ণ কাঠামোটা পর্যালোচনা করে দেখবেন, আর সেই সঙ্গে এও দেখবেন, ট্রামের দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া বাড়ানোর ব্যাপারটার পিছনে কতোটা অর্থকরী কারণ বিদ্যমান রয়েছে।

তাঁর সহকর্মীদের কাছ থেকে শুনে পরিস্থিতিটা বুঝে নেবার পরে ডাঃ রায় গোপনে আনন্দবাজার পত্রিকার সুরেশচন্দ্র মজুমদারকে ডেকে পাঠালেন। সুরেশবাবুর দুটি প্রভাবশালী কাগজই (আনন্দবাজার ও হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড) তখন সরকারের বিরুদ্ধে গিয়েছিল। ডাঃ রায়ের বাড়িতে তাঁতে আর সুরেশবাবুতে যে গোপন বৈঠক হয়েছিল সে সম্পর্কে কেউ কিছু জানতে পারে নি। এরপরে তিনি অমৃতবাজার পত্রিকার তুষারকান্তি ঘোষকে খবর পাঠালেন আলোচনা করবার জন্য। এক কথায় এইভাবে ব্যক্তিগতভাবে আলাপ আলোচনা করে তিনি সুরেশবাবু আর তুষারবাবুর হৃদয় জয় করতে সমর্থ হলেন। দেখা গেল দুটি পত্রিকা গোষ্টিরই সরকার সম্পর্কিত মনোভাব ধীরে ধীরে নমনীয় হয়ে আসছে।

ডাঃ রায় দোসরা আগস্ট মহাকরণে আন্দোলনের নেতা সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় আর হেমন্ত বসুর সঙ্গে বৈঠক করলেন। আর তার পরের দিনই ট্রাইবুন্যালের নিয়োগ ঘোষিত হলো। তাছাড়া যাঁরা সহিংস ঘটনার সঙ্গে জড়িত হয়ে

গ্রেপ্তার হয়েছিলেন, তাঁদের সম্পর্কে উদারনীতি নিয়ে সরকার জামিন নিয়ে তাদের ছেড়ে দেবার ব্যবস্থার কথাও ঘোষণা করলেন। ঐ দিনই ডাঃ রায় প্রধান-মন্ত্রীকে চিঠি লিখলেন সব কথা জানিয়ে। আন্দোলনজনিত অশান্তির ব্যাপারে বিচারাধীন বন্দীর সংখ্যা কম ছিল না। সংখ্যায় তারা ৩,২৫৪ জন। আন্দোলনের নেতারা সংগ্রাম বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। ফলে আন্দোলনেরও সমাপ্তি ঘটলো, যদিও কাগজে যখন ঐ ব্যাপার নিয়ে আদালতের বিচার-কাহিনী বেরুতে লাগলো, তখন দু এক জায়গায় কিছু উত্তেজনা দেখা গিয়েছিল বটে। তবে আন্দোলন শেষ হওয়ায় কলকাতা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলো।

৪ঠা নভেম্বর বিচারপতি পি বি মুখোপাধ্যায় তদন্তসাপেক্ষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, সাংবাদিকদের ওপর সুপরিকল্পিত হামলার যে অভিযোগ উঠেছিল তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তাছাড়া কর্মরত সাংবাদিকদের তাঁদের কর্তব্যকর্মে বাধা দানের অভিযোগও সত্য ছিল না।

বেকার সমস্যার সমাধানে বৃহৎ পরিকল্প

কলকাতার অবস্থা আবার স্বাভাবিক হয়ে এলে ডাঃ রায় তাঁর তৈরি একটি বৃহৎ পরিকল্পের কথা সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করলেন। রাজ্যের বেকার সমস্যার সমাধানে খুব বড়ো আকারে কিছু একটি করার দরকার ছিল। তিনি জানালেন, এই পরিকল্পে হাজার হাজার লোকের কর্মসংস্থান হবে, এতে সরকারের খরচ হবে ২৬·৫ কোটি টাকারও বেশি। এইসব প্রস্তাবে ছিল তিন হাজার শিক্ষক ও সমাজ-কর্মীর নিয়োগ, গৃহনির্মাণ, নতুন কুটিরশিল্প এবং শেষে দুর্গাপুরে একটি কোক কয়লার গ্যাস কারখানা স্থাপন। এই কোক কয়লার কারখানার জন্য ন'কোটি টাকা আলাদা করে রাখা হলো। এই কারখানাটিই দুর্গাপুর শিল্প এলাকা গড়ে ওঠার অঙ্কুরস্বরূপ, যা কিনা পরে 'ভারতের রুঢ়' বলে পরিচিতি লাভ করেছিল পরবর্তীকালে। এই কারখানা শুধু বহুমূল্য কোক কয়লাই তৈরি করবে না, তৈরি করবে সহ-শিল্প হিসাবে টার, অ্যামোনিয়াম সালফেট ও বেঞ্জিন।

কলকাতার কাছে বিরাট জলাভূমি বুজিয়ে ওখানে বাড়ি তৈরি করার পরিকল্পও ছিল। তার জন্য ধরা হলো ৭·৫ কোটি টাকা। এরই নাম উত্তর এলাকার লবণ হ্রদের জমি উদ্ধারের প্রকল্প। রাজ্যের নিম্ন ও মধ্য আয়ের

লোকজনের জন্য এখানেই গড়ে উঠবে নতুন এক উপনগরী। ডাঃ রায় ইয়োরোপে থাকাকালীন হল্যাণ্ডে একটি ডাচ কারিগরী সংস্থার সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনা করেছিলেন এই বিষয়ে। সেই অনুসারে ওদের প্রতিনিধি পি ওয়েস্টব্রুক ডাঃ রায়ের সঙ্গে মহাকরণে দেখা করতে এলেন ২১শে নভেম্বর তারিখে। ওদের সংস্থাকে দেওয়া হবে মোট ৪ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা চূড়ান্ত প্ল্যান বা পরিকল্পনা প্রস্তুত করার জন্য। এই কথাই স্থির হয়েছিল। এবং ঐ প্ল্যান আগামী জানুয়ারি থেকে শুরু করে ন'মাসের মধ্যে উপস্থাপিত করতে হবে। ঐ এলাকার উত্তর অংশের ৫ বর্গমাইল অংশের জন্য হুগলি নদী থেকে পলিমাটি উঠিয়ে জমি উন্নয়ন করা হবে। দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত বাকি ১৫ বর্গমাইল এলাকার জল পাম্প করে বার করে কলকাতা কর্পোরেশনের বৃষ্টির জল নিকাশী নালা দিয়ে বের করে দেওয়া হবে। দক্ষিণাঞ্চলের কিছু অংশ যার পরিমাণ হবে মোট ৪ বর্গমাইল, সেটা একটি সরোবরে পরিণত করা হবে টালিগঞ্জ এলাকায় জল সরবরাহ করার জন্য। এ ছাড়া টালির নালা বলে যা খ্যাত, সেটিরও সম্প্রসারণ এবং পুনর্খনন এই পরিকল্পনার অন্তর্গত ছিল। প্রসঙ্গক্রমে একটা পুরানো কথা বলা যেতে পারে। লবণ হ্রদ বুজিয়ে ফেলার পরিকল্পনা নতুন নয়। ১৮৩০ সালে ভারত সরকার এটি বুজিয়ে ফেলে কলকাতা মহাগরীর সম্প্রসারণ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু অর্থের অভাবে তা পরিত্যক্ত হয়। ১৮৬৬ সালে সল্ট লেক রিক্লামেশন কোম্পানী পর্যন্ত গঠিত হয়েছিল কাজ করার জন্য। কিন্তু সেও শেষ পর্যন্ত ফলপ্রসূ হয় নি। বর্তমান শতাব্দীর তিরিশ দশকেও একটা চেষ্টা হয়। কলকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের সি ডাবলিউ গারনার আই সি এস-কে সভাপতি করে একটি কমিটিও তৈরি করা হয়, কিন্তু নানা কারণে তাঁরাও কাজ করতে সক্ষম হন নি।

কিন্তু ডাঃ রায়ের চেষ্টায় এ কাজ রূপায়িত হবার পথে এগিয়ে যেতে থাকে। আমরা জানি, কার্যকরীভাবে এই কাজ আরম্ভ হয় ১৯৬২ সালের মার্চে, আর তা চলতে থাকে ১৯৭০ সালের ২রা নভেম্বর পর্যন্ত। বিদেশী ঠিকাদারদের সাহায্যেই কাজটা এগোচ্ছিল, কিন্তু জমি সংক্রান্ত ব্যাপারে আদালতের ইনজাংসন ইত্যাদি জারি হওয়ায় কাজটা ব্যাহত হয়ে পড়ে। দেখা যায় জমি উদ্ধারের কাজ ৫ বর্গমাইলের মতো সমাপ্ত হয়েছে, কলকাতার টিউব রেলওয়ের কাজ শুরু হলে যে মাটি পাওয়া যাবে, 'সেই মাটি দিয়ে জমি

যোগানোর কাজ চলতে পারবে। বাড়ি তৈরি করার মতো জমি যা পাওয়া যাবে, তা হচ্ছে ৬ বর্গমাইল পরিমিত জায়গা। ৫ লক্ষ লোকের এতে জায়গা হবে বলে আশা করা যায়। একে ভাগ করা হয়েছে ১-২ করে ৫টি সেকটরে। দাম পড়বে আন্দাজ ২৭৫০ থেকে সাত হাজার টাকা করে কাঠা।

লবণ হ্রদের উন্নত এলাকায় লোকে বাড়ি করতে আরম্ভ করেছে। এখন পর্যন্ত প্রায় ১৫০০ গৃহ ব্যক্তিগতভাবে তৈরি হয়ে গেছে। নগরী হিসাবে এর সম্ভাবনা উজ্জ্বল সন্দেহ নেই। ৭৩তম কংগ্রেস অধিবেশন এখানেই বসেছিল এবং এখানকার নামকরণও করা হয় এই পরিকল্পের উদ্যোক্তার স্মৃতিতে—বিধান নগর।

কিন্তু বলতে বলতে অনেক দূর এগিয়ে এসেছি, আবার আমাদের যথাস্থানে ফিরে যেতে হবে। প্রদেশ পুনর্গঠনের প্রশ্নটি বিবেচনা করবার জন্য উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন একটি কমিশন বসানোর কথা ঘোষণা করলেও এই প্রসঙ্গে ভারত সরকারের দুটি প্রশ্ন প্রধানমন্ত্রীর মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। এক, কমিশনের গঠন; দুই, এর কর্মপ্রণালী ইত্যাদি। সেপ্টেম্বর মাসে প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীকে একটি চিঠি লিখে সম্ভাব্য নাম বিবেচনার্থে জানাতে বললেন। তাঁর মতে, সুপ্রিম কোর্টের কোনো বিচারপতিই এই ব্যাপারে উপযুক্ত বিবেচিত হতে পারেন। আর কমিশনের কর্মপ্রণালী সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর মত হচ্ছে, ব্যাপকতর দৃষ্টিভঙ্গিতে কমিশন প্রদেশ পুনর্গঠনের কথাটা বিবেচনা করবে, সীমারেখার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ নিয়ে তত মাথা ঘামাবে না।

॥ ১০ ॥ ॥ ১৯৫৪ ॥

কলকাতার চৌরঙ্গীতে যে বাড়িটিতে কংগ্রেস ভবন স্থাপিত হয়, সেই বাড়িটির দখল সংক্রান্ত ব্যাপারে নানান দোষারোপ ১৯৫৪-এর প্রথম দিকেই সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির কানে যায়। কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে জওহর-লাল নেহেরু সে সব কথা ডাঃ রায়ের গোচরে আনেন এবং এ নিয়ে দুজনের মধ্যে কিছু পত্র বিনিময়ও হয়েছিল। সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক প্রফুল্ল চক্রবর্তী দিল্লী থেকে ছুটে আসেন নিজেই এ ব্যাপারে তদন্ত করতে। এরই কাছাকাছি সময়ে আবার একটি খনির মালিকানা সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের এক সাধারণ সম্পাদকের নামে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল।

আমি এই সাধারণ সম্পাদকটিকে দেখেছি, মন্ত্রীদের ঘরে গিয়ে নিজের সংস্থার শেয়ার কেনাবার জন্য তাঁদের কাছে তদ্বির তদারক করছেন। কংগ্রেসের স্থানীয় লোক বলে এবং প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বের আস্থাভাজন ছিলেন বলে ইনি ধোঁকা দিয়ে বেশ মোটা টাকাই জোগাড় করে ফেলতে পেরেছিলেন। ডাঃ রায় সব শুনেটুনে নিজেই এর তদ্বির করা শুরু করলেন। সকালের দিকে ডাঃ রায় একদিন তাঁর অফিসে একাই বসে আছেন, এমন সময় বড়ো একজন ব্যারিস্টার যিনি ওঁর মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়েছিলেন, তিনি কিছু কাগজপত্র ডাঃ রায়ের সামনে এনে দিয়ে বললেন, কীভাবে তিনি মিথ্যা এক খনির শেয়ার কেনার ব্যাপারে বিশ হাজারের মতো টাকা প্রতারিত হয়ে বসে আছেন। ডাঃ রায় কাগজগুলি নিয়ে খুঁটিয়ে পড়তে লাগলেন। তাঁর শান্ত মেজাজের ওপর ক্রোধের ঢেউ জাগলো। তিনি বুঝলেন, কংগ্রেস সংগঠনের মুখে ঐ রকম লোক কলঙ্কের কালিমা লেপন করবে। তিনি মন স্থির করে প্রদেশ কংগ্রেস প্রধানকে ফোন করলেন, বললেন, সাধারণ সম্পাদককে সরাতেই হবে। না, আমি কোনো কথা শুনবো না।

অগত্যা সরাতেই হলো সাধারণ সম্পাদককে। এই বিষয়ে তিনি নেহেরুকে চিঠি লিখে জানালেন, টাকা পয়সা সংক্রান্ত ব্যাপারে কলঙ্ক থাকার জন্য সাধারণ সম্পাদককে তার পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ইতিমধ্যে কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে অতুল্য ঘোষ সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটিকে একটা লম্বা চিঠি দিলেন নিজ সম্পর্কিত দোষারোপের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে। তার একটা কপি তিনি ডাঃ রায়কেও দিয়েছিলেন। তাঁর এই চিঠিতে অতুল্যবাবু জানালেন যে, বঙ্গীয় প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিতে তিনি যখন ক্ষমতায় এলেন ১৯৫০এর সেপ্টেম্বরে, তখন তাঁদের সংগঠনের ঋণ ছিল বিশ হাজার টাকা। সংগঠনের কোনো বই বা আসবাবপত্র তখন ছিল না বললেই হয়। সুভাষ বসুর পদত্যাগের পর কোনো জনসভাও হয় নি। তিনি সভাপতি হবার পরই জেলায় জেলায় জনসভা হতে থাকে, যদিও কমিউনিস্টদের প্রতিবন্ধকতায় কলকাতায় তেমন সাফল্যের সঙ্গে সভা হতে পারে নি।

ঘটনার ওপর যবনিকাপাত এখানেই। মোটকথা, অভিযোগের বিরুদ্ধে অতুল্যবাবু বেশ জোরালো প্রতিবাদই উপস্থাপিত করতে পেরেছিলেন।

হরিণঘাটার জন্ম

মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে যে সব সমস্যা তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল, তার মধ্যে কলকাতার খাটালগুলি অন্যতম। তিনি খাটাল সরিয়ে বোম্বাইয়ের দুগ্ধ কলোনীর মতো একটি দুগ্ধ কলোনী তৈরি করে সেখানে গরুগুলোকে ঠিক মতো রাখবার পরিকল্পনা করলেন। তাঁর মন্ত্রিসভার অন্যতম সহযোগী ডাঃ আর আমেদ ও তাঁর অধীনে একদল অফিসার ডাঃ রায়কে এই পরিকল্পনা রচনার কাজে সহায়তা করছিলেন। হরিণঘাটা কোথায় আজ আমরা তা জানি, নদিয়া জেলার এক অখ্যাত গ্রাম, কলকাতা থেকে মাত্র ৪০ মাইলের মধ্যে। ৩রা জানুয়ারি ডাঃ রায় এর ভিৎপ্রস্তর স্থাপন করলেন আনুষ্ঠানিক-ভাবে। এই কাজের উপযুক্ত মনে হওয়াতেই জায়গাটাকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। এখানে ছিল তিন হাজারেরও বেশি একর জমি, যেখানে গরুর খাদ্য জন্মানো যেতে পারবে অনায়াসেই, গরুদের রাখাও যাবে সযত্ন ব্যবস্থায় এবং উপযুক্ত যন্ত্রপাতির আধুনিক দোহশালা এখানেও গড়ে উঠতে পারবে। ভিৎপ্রস্তর স্থাপনকালে ডাঃ রায় বলেছিলেন, কলকাতা থেকে খাটাল উচ্ছেদের পরিকল্পের ফলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দিক দিয়ে একটা নতুন সূচনা দেখা দেবে। এতে যে শহরে শুধু ভালো দুধই জোগান দেওয়া যাবে এমন নয়, সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীণ অর্থনীতিতেও একটা ভারসাম্য রচিত হবে, নতুন নতুন কর্মসংস্থান দেখা দেবে। কলকাতা থেকে খাটাল সরানোর ব্যাপারটা আজকের চিন্তা নয়, এ চিন্তা করা হয়েছিল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সময়ে। কলকাতা পৌরসভার প্রথম মেয়র হিসাবে তিনিই জিনিসটা ভেবেছিলেন সবার আগে।

১৯৪৯-৫০ সালে হরিণঘাটায় পরীক্ষামূলকভাবে একটি ক্ষুদ্র দোহশালা স্থাপিত হয়েছিল অবশ্য। ঐ সময় দৈনিক ২০০ লিটার দুধ যোগান দেওয়া যেতো। ১৯৫৩-৫৪তে দুধের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ালো দশ হাজার লিটারে। নতুন পরিকল্প অনুসারে প্রায় ২২ হাজার গরু রাখবার ব্যবস্থা হলো হরিণঘাটা ও কল্যাণীতে। কিন্তু কলকাতা থেকে হরিণঘাটা খানিকটা দূরে থাকায় বেলগাছিয়াতেও একটি দোহশালা স্থাপন করার কথা চিন্তা করা হলো—যেখান থেকে কলকাতায় বেশ কিছু পরিমাণ দুধ যোগান দেওয়া যায়। ১৯৬২ সালে বেলগাছিয়াতে ২৩ একর জমিতে কেন্দ্রীয় দোহশালা স্থাপন করা হলো। ১৯৭২-এ এই বেলগাছিয়া আর হরিণঘাটা মিলিয়ে তৈরি দুধের পরিমাণ বেড়ে

দাঁড়িয়েছিল ১ লক্ষ ৭০ হাজার লিটার।

কারিগরি-সম্পন্ন উপযুক্ত লোক পাবার জন্য রাজ্যসরকার পশুপালন ও দোহশালা পরিচালন শিক্ষণের জন্য হরিণঘাটাতে একটি শিক্ষায়তনও গড়ে তুললেন। এতে ডিপ্লোমা পেতে হলে দু বছরের শিক্ষণ গ্রহণ করা দরকার।

চিত্তরঞ্জন ইঞ্জিন কারখানা

হরিণঘাটা দুগ্ধ কলোনির অনুষ্ঠান সারার তিন দিন পরে মুখ্যমন্ত্রী গেলেন চিত্তরঞ্জনে। স্বাধীন ভারতের প্রথম রেলওয়ে ইঞ্জিন তৈরির কারখানা ও কারখানাকে কেন্দ্র করে একটি নগরী গড়ে উঠেছিল এখানে। শততম ইঞ্জিনটি তৈরি হলে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর সঙ্গে সেটি আনুষ্ঠানিকভাবে চালাবার উৎসবে যোগদানের জন্যই ডাঃ রায় সেখানে গিয়েছিলেন। তাঁর পক্ষে সেটি খুবই আনন্দের দিন। তাঁর ভাষণে তিনি বললেন, পাঁচবছর আগে এই চিত্তরঞ্জন ছিল কয়েকটি সাঁওতালী গ্রামের সমষ্টি মাত্র। তখনকার কেন্দ্রীয় যানবাহন ও রেলমন্ত্রী গোপালস্বামী আয়েঙ্গার রেলওয়ে ইঞ্জিন তৈরির কারখানা স্থাপনের উপযুক্ত জায়গা খুঁজছিলেন। ডাঃ রায় তাঁকে উপযুক্ত জায়গাই বেছে দিলেন এবং তাঁর প্রস্তাব সঙ্গে সঙ্গেই গৃহীত হয়ে গিয়েছিল। তবে প্রথম প্রথম কাজটা সহজ হয় নি। জমি জরিপ করার সময় যে দলটি গিয়েছিল কাজ করতে, তাদের ওপর তীর ধনুক নিয়ে রীতিমত হামলা চালিয়েছিল স্থানীয় অধিবাসীরা, এরা ছিল অধিকাংশই সাঁওতাল। এদের হামলায় কিছু লোক মারাও গিয়েছিল। উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা থাকা সত্ত্বেও সাঁওতালেরা জমি ছাড়তে রাজী ছিল না। সমীক্ষক দল কাজেকাজেই ফিরে গিয়ে ডাঃ রায়কে সব কথা জানায়। সেই দিনই সন্ধ্যা-বেলা ডাঃ রায় একটি বিশেষ সেলুনে করে রেলযোগে রওনা হয়ে যান। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তখনকার মুখ্যসচিব সুকুমার সেন এবং ভূমি রাজস্ব বিভাগের অফিসাররা। পরদিন সকালে পৌঁছে ডাঃ রায় ক্ষুব্ধ সাঁওতালদের সঙ্গে নিজে কথা বললেন। কাছাকাছি জায়গায় তাদের জমি ত দেওয়া হবেই, সঙ্গে সঙ্গে তিনি এ কথাও বললেন, নতুন কারখানায় তাদের কাজও দেওয়া হবে।

এদের সঙ্গে কথা বলেও তিনি পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেলকে বললেন,

শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য পুলিশ পাহারা বাড়িয়ে দিতে। কৌশল-দক্ষ ডাঃ রায় একদিকে হাতে রাখলেন শক্তি, অন্যদিকে দিলেন উদার আহ্বান এবং এইভাবে তিনি ঐ কুৎসিৎ পরিস্থিতির মোকাবিলা করলেন, নইলে ইঞ্জিন তৈরির পরিকল্পনা মূলেই বিনষ্ট হয়ে যেতো। গোপালস্বামী আয়েঙ্গারের সঙ্গে একটি কমিটি মিটিং-এ, কেমন করে তিনি এই কারখানার নাম প্রখ্যাত দেশনেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নামে রাখার প্রস্তাব করে তা মঞ্জুর করিয়ে নিয়েছিলেন, সে কথাও ঐ অনুষ্ঠানে প্রদত্ত তাঁর ভাষণে তিনি বর্ণনা করলেন, বললেন— চিত্তরঞ্জন কারখানা আজ বিরাট হয়েছে, বহু আকারের ইঞ্জিন তৈরি করছে, সারা দেশের এ একটা গর্বের বস্তু।

কল্যাণী কংগ্রেস

স্থির হয়েছিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ৫৯তম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন বসানো হবে পশ্চিমবঙ্গে। মতিলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে ১৯২৮ সালে এই রকম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন হয়েছিল কলকাতায়। ডাঃ রায় এ উদ্দেশ্যে কল্যাণীর নতুন নগরী বেছে নিলেন দুটি উদ্দেশ্যে। প্রথমত নতুন নগরী হিসাবে কল্যাণী সর্বভারতীয় প্রচার লাভ করবে; দ্বিতীয়ত, ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ও হাজার হাজার সভ্যদের জন্য যে সুবিধা টুবিধা করে দেওয়া হবে, সেগুলি স্বাভাবিক-ভাবেই স্থায়িত্ব লাভ করে নগরীর উন্নয়ন ঘটাবে। কংগ্রেস অধিবেশন এই প্রথম একটি টাউনশিপ-এ বসলো এবং যে রকম সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তার জন্য নেতারা ও সভ্যরা ভূয়সী প্রশংসা করে গিয়েছিলেন।

অধিবেশনের অঙ্গস্বরূপ কংগ্রেস প্রদর্শনীর উদ্বোধন করলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ১৫ই জানুয়ারি তারিখে। এই ব্যাপারে সাংগঠনিক সাহায্য ছাড়াও ডাঃ রায় রাজ্যের তখনকার প্রচার অধিকর্তা প্রকাশস্বরূপ মাথুরের প্রভূত সহায়তা পেয়েছিলেন। স্বাধীনতার পর দেশ যে যে কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছে এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কী কী উন্নয়ন করা হবে, তাই সুন্দর করে তুলে ধরা হয়েছিল প্রদর্শনীতে। ১৯২৮ সালে কলকাতার কংগ্রেস প্রদর্শনীর অভিজ্ঞতা ডাঃ রায়ের ছিল। সেই অভিজ্ঞতাই তাঁকে এই প্রদর্শনী আরও সুষ্ঠুভাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। ঐ দিন তিনি ওখানে ষোলটি শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালেরও উদ্বোধন করেন ও একটি জলনিকাশী পাম্পিং

কেন্দ্রেরও উদ্বোধন করেন। কংগ্রেস নগর থেকে আড়াই মাইল দূরে নতুন কল্যাণী রেল স্টেশনটিও গড়ে উঠেছিল তখন।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলা দরকার। ১৯৫৩র শেষের দিকে ডাঃ রায় মহাকরণের রোটাণ্ডায় কিছু প্রথিতযশা সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও শিল্পীদের একটি বৈঠক ডেকেছিলেন। পতিত জমি উদ্ধারের দিক থেকে ওঁর সোনারপুর-আরাপাঁচ একটি বিশিষ্ট পরিকল্প ছিল। সেটিও স্লাইড-সহযোগে উনি সবাইকে দেখাচ্ছিলেন। বলছিলেন,—দেখুন, এখানে ক্ষেতের কাজের কতো সুযোগ এসে গেছে, কিন্তু সে কাজে মন না দিয়ে সবাই গ্রাম ছেড়ে কলকারখানার কাজ খুঁজতে ব্যস্ত। এদের মনকে ফেরাতে হলে আপনাদের সাহায্য দরকার। আপনাদের লেখা ও শিল্প-মাধ্যমই এ-কাজটা করতে পারে বলে আমার বিশ্বাস।

তাঁর কথা শুনে সভার অনেকেই অনেক রকম বক্তব্য পেশ করেন, কিন্তু প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী পঙ্কজকুমার মল্লিক তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেন এক রবীন্দ্র সঙ্গীতের মাধ্যমে। সেটি হলো—'ফিরে চল মাটির টানে / যে মাটি চেয়ে আছে মুখের পানে।' ডাঃ রায় শিল্পীর বক্তব্য হৃদয়ঙ্গম করলেন, তাঁর ভালোও লাগলো, তিনি পঙ্কজবাবুকে তৎক্ষণাৎ দেখা করতে বললেন তাঁর সঙ্গে। এবং দেখা হবার পর বললেন,—একটা স্কীম দিতে পারো, সাত দিনের মধ্যে?

পঙ্কজবাবু সম্মতি দিলেন। তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার দপ্তরের অধিকর্তা ছিলেন প্রকাশস্বরূপ মাথুর, আর প্রোডাকশন অফিসার ছিলেন প্রখ্যাত নাট্যকার মন্মথ রায়। মন্মথবাবুর সঙ্গে বসে পঙ্কজবাবু একটি পরিকল্প রচনা করে পেশ করলেন নির্দিষ্ট দিনের মধ্যেই। এই-ই হলো 'লোকরঞ্জন শাখা'র জন্মকথা। মাথুর গোড়ার দিকে এই পরিকল্পের অনুকূলে না থাকলেও ডাঃ রায় লোকরঞ্জন শাখা-পরিকল্পের অনুমোদন দিতে দ্বিধা করেন নি। এবং মাত্র মাস দেড়েক কি মাস দুইয়ের মধ্যে উক্ত শাখায় কিছু কর্মী ও শিল্পী নিয়োগ করে প্রায় দিনরাত খেটে কল্যাণী কংগ্রেস প্রদর্শনীর মঞ্চে পঙ্কজবাবু মন্মথবাবুর দুটি রচনা উপস্থাপিত করলেন, একটি নাটক, নাম 'মহাভারতী' ও অপরটি নৃত্যনাট্য, 'যাত্রা হলো শুরু'। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ও সদস্যরা আগ্রহের সঙ্গেই এ-দুটি দেখেন এবং খুবই খুশি হন। সারা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গই হলো এদিক থেকে পথিকৃৎ। পরে অন্যান্য রাজ্যেও এ ধরনের

সংস্থা গড়ে উঠেছিল অবশ্য। পণ্ডিত নেহেরু মঞ্চে উঠে উচ্ছ্বসিত ভাষায় বললেন,—'একমাত্র বাংলাই দেখছি আমার মতাদর্শকে যথাযথ রূপায়িত করতে পারলো।'

'লোকরঞ্জন' শাখার কর্মস্থল তখন ছিল ওয়েলেসলিতে প্রচার বিভাগের গুদাম বা স্টোরের ওপর তলায়। কেমন মহড়া টহড়া হচ্ছে দেখবার জন্য ডাঃ রায় নিজে একদিন ওখানে গিয়েছিলেন। 'মহাভারতী' হচ্ছে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলার ভূমিকার একটি কাহিনীরূপ। আর 'যাত্রা হলো শুরু' হচ্ছে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার একটি প্রতীকী রূপায়ণ।

'লোকরঞ্জন' শাখার কর্মস্থল পরে ওয়েলেসলি থেকে অস্থায়ীভাবে উঠে যায় কিরণশঙ্কর রায় রোডের নিউ সেক্রেটারিয়েট ভবনের পাঁচতলায়। ডাঃ রায় সেখানেও গেছেন ওঁদের কাজকর্ম দেখতে। তখনো নিউ সেক্রেটারিয়েট ভবন পুরোপুরি তৈরি হয় নি, এমন কি লিফটও হয় নি। অস্থায়ী একটি লিফট কোনো মতে তৈরি করা হয়েছিল ডাঃ রায়ের জন্য। ওখানে অফিসগুলো যখন জাঁকিয়ে বসতে লাগলো একে একে, তখন 'লোকরঞ্জন' শাখার কর্মস্থল উঠে গেল বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটে, বউবাজার পোস্ট-অফিসের ওপর তলায়। সেখান থেকেও অনেক পরে উঠে যায় পাকাপাকিভাবে আচার্য জগদীশ বসু রোডে, এণ্টালি বাজারের সামনে, অধুনা-গঠিত 'জেম্'-সিনেমার উল্টো দিকে।

কিন্তু লোকরঞ্জনের ঠিকানা বলতে বলতে অনেক দূর এগিয়ে এসেছি, আবার পিছিয়ে যেতে হবে। পিছিয়ে যেতে হবে কল্যাণী-কংগ্রেসের সমকালীন ঘটনায়।

কাঁচড়াপাড়ার অস্থায়ী বিমান অবতরণ-কেন্দ্রে কংগ্রেস সভাপতি নেহেরু এসে নেমেছিলেন। তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে গিয়েছিলেন ডাঃ রায় ও অভ্যর্থনা সমিতির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ। সেখান থেকে কল্যাণী কংগ্রেস নগর পর্যন্ত সাড়ে চার মাইল পথের দুধারে হাজার হাজার লোক দাঁড়িয়েছিল তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য। একটি সুন্দর বাগানের মধ্যে একতলা নতুন বাড়িতে নেহেরুজীর বাসস্থান ঠিক করা হয়েছিল। বাগানে ছিল সারি সারি গোলাপের গাছ। আর ঐ বাগানেরই এক কোণে ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং বসবার জন্য সুদৃশ্য এক সাজানো প্যাণ্ডেল তৈরি হয়েছিল। ২২শে জানুয়ারি সাবজেক্টস্ কমিটি-মিটিং-এর শেষ দিনে,—ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

সংক্রান্ত প্রস্তাব তুলতে গিয়ে ডাঃ রায় বলেন,—স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রথম পাঁচ বছরের মধ্যে ভারত যে সব কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছে, তার পরিমাণ আমেরিকা ও রাশিয়া তাদের প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় যা করতে পেরেছিল, তার থেকে ঢের বেশি।

পরদিন কল্যাণী-অধিবেশনে রেকর্ডসংখ্যক লোক জমায়েত হয়েছিল। লোক এসেছিল ট্রেনে, ট্যাক্সিতে, বাসে, গরুর গাড়িতে, রিক্সাতে, সাইকেলে করে, এমন কি পায়ে হেঁটেও। কংগ্রেস অধিবেশনের প্রথম দিনে দুপুরের পর লোক যা হয়েছিল, তা পাঁচ লক্ষের কম হবে না। অধিবেশন শুরু হবার ঠিক আগের মুহূর্তে ডাঃ রায় যখন মঞ্চে উঠলেন, তখন লক্ষ্য করলেন, এক কোণে কিছু ধুলো আর ছেঁড়া কাগজের টুকরো পড়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁটা চেয়ে নিয়ে তিনি সবার সামনে নিজেই ঝাঁট দিতে আরম্ভ করলেন। সকলে অবাক। একদল স্বেচ্ছাসেবক তাড়াতাড়ি ছুটে এসে তাঁর কাজে হাত লাগালো। আর ঠিক সেই সময়েই এসে পড়লেন নেহেরু। দুই নেতাই পরস্পরের মুখের দিকে তাকালেন, দুজনেরই মুখে বিচিত্র হাসির রেখা।

এম এন রায়ের মৃত্যু

কংগ্রেস অধিবেশনের দুটো দিন পরে, তখনো অধিবেশনের হৈ চৈ মিলিয়ে যায় নি, হঠাৎ-ই কলকাতায় খবর এলো, মানবেন্দ্রনাথ রায় (এম এন রায় বলেই সমধিক খ্যাত) আর ইহজগতে নেই। ২৫শে জানুয়ারি রাত ১১-৪০ মিনিটের সময় দেরাদুনে তিনি মারা গেছেন। রাশিয়ার বিপ্লবের প্রথম দিকে তিনি 'কমিনটার্ন'-এর দশজন সভ্যের একজন ছিলেন, লেনিনের একজন ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। এম এন রায় তাঁর ইয়োরোপীয় স্ত্রীকে নিয়ে ভারতে এসেছিলেন শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করবার জন্য।

বিধানসভার বাজেট অধিবেশন

বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে এবার হলো এক অতুলনীয় কাণ্ড। রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর প্রারম্ভিক ভাষণ পড়তে গিয়ে বিরোধিপক্ষের দিক থেকে প্রবল বাধা পেলেন। রাজ্যপালের পক্ষে এ রকম বাধা পাওয়া এই প্রথম। বিরোধীদের বক্তব্য, রাজ্যপাল তাঁর ভাষণ পাঠ

করার আগে বাইরে এসে উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল-শিক্ষকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন। তাঁরা তাঁদের কতকগুলি অর্থনৈতিক দাবি আদায়ের জন্য গভর্নমেণ্ট-ভবনের কাছে বসে অবস্থান-ধর্মঘট করছেন আজ পাঁচ দিন। যতগুলি শিক্ষক-আন্দোলন এযাবৎ হয়েছে, এটি যে তার মধ্যে অন্যতম সুবৃহৎ আন্দোলন, এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। অল বেঙ্গল টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন (এ বি টি এ) দিয়েছেন এই আন্দোলনের ডাক। এই এ বি টি এ হচ্ছে কম্যুনিষ্ট প্রভাবিত।

কিন্তু যা বলছিলাম। বিরোধিপক্ষের চেঁচামেচিতে ১৫ মিনিট রাজ্যপাল তাঁর ভাষণ পড়তে পারেন নি। তারপরে যখন বিরোধিপক্ষ কক্ষ ত্যাগ করে বেরিয়ে গেল, তখন তিনি আবার পড়া শুরু করলেন। প্রসঙ্গত বলে রাখি, রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার নিজে ছিলেন শিক্ষক, তাঁর জীবনের অর্জিত কপর্দকটি পর্যন্ত তিনি ছাত্র ও শিক্ষকদের কল্যাণে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করে গেছেন।

রাজ্যপাল তাঁর ভাষণে যখন খাদ্যের ব্যাপারে একটি উজ্জ্বলতর দৃশ্য তুলে ধরলেন, তখন সারা কক্ষ আনন্দে মুখরিত হয়ে উঠলো। কারণ সে বার রাজ্যে আমন ধানের ফসল হয়েছিল খুব ভালো, যাকে বলে 'বাম্পার ক্রপ্'। মুখ্যমন্ত্রী এবং খাদ্যমন্ত্রী দুজনেই খাদ্যনীতি সংক্রান্ত বিষয়ে খুব সতর্ক ছিলেন, কণ্ট্রোল প্রথা উঠিয়ে দেবার ঝুঁকি নেন নি। চালের ব্যাপারে স্বয়ম্ভর না হয়ে এটা তাঁরা নেনই বা কী করে? খাদ্যের কোনো কোনো উপকরণের কণ্ট্রোল অবশ্য তাঁরা আংশিক উঠিয়ে নিয়েছিলেন।

যাই হোক, পরদিন, অর্থাৎ ১৬ই ফেব্রুয়ারি শিক্ষক-ধর্মঘটের জের হিসাবে যে গণ্ডগোল আরম্ভ হলো কলকাতায়, চরম উচ্ছৃঙ্খলতার দিক থেকে তা অন্যতম বলে সবার স্মরণে থাকবে। রাজ্যপাল-ভবনের দক্ষিণে, ময়দানের দিকে, পুলিশের সঙ্গে মিছিলকারীদের সংগ্রাম চলেছিল ঘণ্টাখানেক ধরে। মিছিলকারীরা তাদের দাবির ব্যাপারে সরকারকে বাধ্য করবে বলে বিধানসভা ভবনের দিকে এগিয়ে গেলে পুলিশ বাধা দেয়। এই থেকে মারপিট ও দাঙ্গাহাঙ্গামার সূত্রপাত। মারা যায় চার জন, আহত হয় ৬৫ জন। ৪৪ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে, তার মধ্যে ডঃ সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ছয় জন অন্য এম এল এ-ও ছিলেন।

ডাঃ রায় বিধানসভা থেকে সোজা বাড়ি চলে এসেছিলেন, ঘটনার কথা কিছুই জানতেন না। তিনি বাড়ি থেকে দক্ষিণ কলকাতায় তাঁর এক আত্মীয়ের

বাড়িতে গিয়েছিলেন। লালবাজার থেকে পুলিশের ডেপুটি কমিশনার জরুরী টেলিফোন করলেন,—'মুখ্যমন্ত্রী কোথায় বলতে পারেন কী? তাঁকে পরিস্থিতির কথা জানাতে চাই। দ্রুত অবনতি ঘটছে।'

আমি সঙ্গে সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করলাম, জানালাম পরিস্থিতির কথা। ডাঃ রায় আর দেরি করলেন না, সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন নিজের বাড়ির উদ্দেশে। এবং খুবই সৌভাগ্যের কথা বলতে হবে, তাঁর বড়ো ষ্টুডিবেকার গাড়িতে তিনি চড়েন নি, উঠেছিলেন তাঁর এক বন্ধুর ছোট্ট অষ্টিন গাড়িতে। বন্ধু নিজেই চালাচ্ছিলেন গাড়ি। পরে আমি তাঁর কাছ থেকে শুনেছিলাম, গাড়ি গিয়ে পড়েছিল হাঙ্গামাকারী জনতার মধ্যে। তিনি চোখ থেকে চশমাটা খুলে মুখের সামনে খবরের কাগজ মেলে ধরেছিলেন তাই রক্ষে, তাঁকে চিনতে পারলে ঐ ক্ষিপ্ত জনতা যে কী করতো কে জানে। ডাঃ রায় ত সেই মুহূর্তে তাদের কাছে শান্তিহননকারী পরম শত্রু। যাই হোক, ডাঃ রায়ের ঐ বন্ধুটি পরে আমাকে বলেছিলেন,—'ভাগ্যিস চিনতে পারে নি! নেহাৎ দৈব বলেই বেঁচে গেছি!'

বাড়ি ফিরেই ডাঃ রায় লালবাজারে পুলিশ হেডকোয়ার্টারের কণ্ট্রোল রুমে চলে গেলেন। প্রধান সচিব এস এন রায়কেও ডেকে নিলেন। আলোচনা করে যখন বুঝলেন যে, পরিস্থিতি যে রকম ঘোরালো হয়েছে, তাকে আয়ত্তে আনতে পুলিশী ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নয়, তখন বাধ্য হয়ে মিলিটারি ডাকতে হলো তাঁকে। রাত তখন সাড়ে আটটা। ফোর্ট উইলিয়াম থেকে মিলিটারি এসে উপদ্রুত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়লো। বড়ো রাস্তাগুলি থেকে হাঙ্গামাকারীরা সরে পড়লো। সরে পড়ে গলি-ঘুঁজি আশ্রয় করলো। মধ্যরাত্রি নাগাদ সেই সব গলি-ঘুঁজিও পরিষ্কৃত হলো, অবস্থাও আয়ত্তে এলো।

২৮শে ফেব্রুয়ারি, স্বাধীনতার পর সেই প্রথম.—বিরোধিপক্ষ বিধানসভায় একটি মুলতুবী প্রস্তাব তোলবার সামর্থ্য অর্জন করতে পেরেছিল ধর্মঘটী শিক্ষকদের বিষয় নিয়ে। ঐ মুলতুবী প্রস্তাবের উত্তরে ডাঃ রায় তাঁর ভাষণ-প্রসঙ্গে যা বলেছিলেন, তা ভবিষ্যৎবাণীর মতো। তিনি বলেছিলেন,—'সরকারের বিরুদ্ধে যে সব ছাত্রদের ক্ষেপিয়ে দিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের উচ্চ-মাধ্যমিক স্কুল-শিক্ষকরা, সেই সব ছাত্ররাই একদিন ঐ শিক্ষকদের হেনস্তা করবে, এই সম্ভাবনার কিন্তু উদ্ভব হয়ে রইলো।'

আজ বহু শিক্ষক কথাটি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছেন মনে হয়।

১৯৫৪-৫৫র বাজেট

অর্থদপ্তরও ছিল মুখ্যমন্ত্রীর হাতে। তিনি তাই বাজেট পেশ করলেন বিধানসভায় ১৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখে। এতে যে আর্থিক চিত্র ফুটে উঠলো তা আশাব্যঞ্জক নয়। রাজস্ব আদায় খাতে ধরা হয়েছে ৩৯.৯৩ কোটি টাকা, আর খরচ হচ্ছে ৫৩.৩১ কোটি,—তার মানে ঘাটতি হচ্ছে ১৩ কোটি টাকারও বেশি। সংবিধান-অনুসারে কর-বণ্টনের যে ব্যবস্থা, তার পরিবর্তন দরকার বলে তিনি মন্তব্য করলেন। বললেন,—পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপারে এটি আরও বাস্তবসম্মত হওয়া উচিত। এখানকার শিল্পক্ষেত্রের সম্পদ রাজ্যসরকারের করবহির্ভূত ব্যাপার বললেই হয়। এই অবস্থার নিরসনের জন্য রাজ্যসরকার 'ট্যাক্সেশন এনকোয়ারি কমিশন' ও ভারতসরকারের কাছে দরবার করছে।

পরের মাসের প্রথম সপ্তাহেই ডাঃ রায় দিল্লী গেলেন উক্ত কর-অনুসন্ধান-কমিশন-এর সামনে সাক্ষ্য দিতে। ২রা মার্চ দিল্লীতেই তিনি একটি সাংবাদিক সম্মেলন ডাকলেন এবং একটি দেওয়াল-ম্যাপের সাহায্যে সাংবাদিকদের বুঝিয়ে দিতে লাগলেন—কেন্দ্র থেকে তাঁর রাজ্য কেন আরও বেশি আথিক সহায়তা চাইছে। রাজ্য যেখানে ৪০ কোটি টাকা আয়কর দেয়, সেখানে রাজ্যের প্রাপ্য অর্থ মাত্র সাড়ে ছয় কোটি। এটা কেন হবে ?

৪ঠা মার্চ ডাঃ রায় উক্ত কমিশনের সামনে রাজ্যসরকারের হয়ে ৬টি স্মারক-লিপি পেশ করলেন। কমিশনের কর্তা ছিলেন ডঃ জন মাথাই।

ডাঃ রায়-ফজলুল হক সাক্ষাৎকার

ইতিমধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন দ্রুত ঘটে যাচ্ছিল। যুক্ত বাংলার ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী আবুল কাসেম ফজলুল হক যাকে 'শের-ই বঙ্গাল' বলা হতো, তিনি পাকিস্তান সৃষ্টির প্রথম কয়েক বছরে রাজনৈতিক দিক থেকে একেবারে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গিয়েছিলেন বলা চলে। কিন্তু তিনি 'ইউনাইটেড ফ্রন্ট পার্টি' গঠন করে ওখানে ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে ভোট-যুদ্ধে নেমে পড়েন। তাঁর দল তদানীন্তন শাসক-

দল মুসলিম লীগকে পর্যুদস্ত করে ঐ দলের নেতা নুরুল আমিনকে হারিয়ে দেন। (এই নুরুল আমিন স্বাধীন বাংলাদেশের সৃষ্টি হবার পর বিচ্ছিন্ন পাকিস্তানের ভাইস প্রেসিডেণ্ট হয়েছিলেন পরবর্তীকালে।)

যাই হোক, হক সাহেব পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে ৩০শে এপ্রিল কলকাতায় এলেন চার দিনের সফরে। জনগণের মধ্যে বিপুল উদ্দীপনা। যেখানেই তিনি যান, সেখানেই বীরের সম্বর্ধনা। ২রা মে তিনি মহাকরণে এলেন ডাঃ রায়ের সঙ্গে দেখা করতে। ডাঃ রায় ঘর থেকে সামনের বারান্দায় বেরিয়ে এলেন তাঁকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাতে। সে এক দৃশ্য বটে। দুই নেতা পরস্পরের আলিঙ্গনে আবদ্ধ আর চারিদিকে মহাকরণের অফিসার ও কর্মচারীরা ভীড় করে দেখছেন সেই দৃশ্য !

এর পরে ঘরের মধ্যে শুরু হলো দুই নেতার আলোচনা। সীমান্তে স্বাভাবিক বাণিজ্য আবার যাতে চালু হয় এবং দুই বাংলার মধ্যে যাতায়াতের ক্ষেত্রে যাতে ভিসা প্রথা উঠিয়ে দেওয়া হয়,—একমত হয়ে দুজনেই সেই মতো ব্যবস্থা নেবেন কথা হলো। দুই বাংলার দুই মুখ্যসচিব এই মাসেই যত তাড়াতাড়ি হয় বসবেন সম্ভবপর প্রস্তাবগুলি তৈরি করবার জন্য। দরকার হলে সে সব বিবেচনা করে দেখবার জন্য দুই মুখ্যমন্ত্রী আবার বসবেন বৈঠকে। কিন্তু এই বৈঠক আর হয় নি। কারণ মহম্মদ আলীর নির্দেশে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার হক-মন্ত্রিসভাকে বাতিল করে, পূর্ব পাকিস্তানের প্রশাসনের দায়িত্ব নিয়ে নিলেন ৩০শে মে করাচী থেকে প্রকাশিত একটি ঘোষণার মাধ্যমে। হক সাহেব দাবি করেছিলেন, পূর্ব পাকিস্তানের জন্য স্বায়ত্তশাসন ; প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক বিষয় ও মুদ্রা শুধু থাকবে কেন্দ্রের হাতে।

যাই হোক, সেদিনকার কথা বলি। হকসাহেব মহাকরণের সভা-ভবন থেকে বেরিয়ে অপেক্ষমান সাংবাদিকদের কাছে এক বিবৃতি দেন। তাতে দুই বাংলার মধ্যে যাতায়াতে যে অসুবিধা ও বাধাবিঘ্ন ছিল তা দূরীকরণের আশ্বাস ছিল। আর ছিল পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার আশ্বাস। তিনি বলেছিলেন, 'এই উদ্দেশ্যসাধনের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে আমার মন্ত্রি-সভায় আমি অন্তত দুইজন হিন্দু মন্ত্রী নেবো।'

বঙ্গব্যবচ্ছেদে তিনি যে খুশি হন নি, সেটা কলকাতায় প্রদত্ত তার অন্যান্য ভাষণ থেকেও বোঝা গিয়েছিল।

পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে চন্দননগরের সংযুক্তি

পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে ফরাসী অধিকৃত চন্দননগরের সংযুক্তির জন্য ডাঃ রায় অনেকদিন থেকেই চেষ্টা করছিলেন। তাঁর চেষ্টাতেই এ বিষয়ের জন্য 'ঝা অনুসন্ধান কমিটি' বসে। এই কমিটির সুপারিশ অনুসারে চন্দননগরের ভারতভুক্তি তথা পশ্চিমবঙ্গভুক্তির কথা লোকসভায় ঘোষণা করা হলো ৮ই মে তারিখে। চন্দননগরবাসীদের ভারতীয় নাগরিকত্বদানের ব্যাপারও খুব তাড়াতাড়ি করা হবে বলে সরকার স্থির করেন। 'চন্দননগর (মার্জার) অ্যাক্ট ১৯৫৪' জারী হওয়ায় ২রা অক্টোবর থেকে চন্দননগর চলে এলো ভারতে, তথা পশ্চিমবঙ্গে। অবসান হলো চন্দননগরের ২৬৬ বছর ব্যাপী ফরাসী শাসন। ডাঃ রায়ের বহু কৃতিত্বের মধ্যে এটিও একটি।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সহায়তা দানের জন্য কেন্দ্রের কাছে পশ্চিমবঙ্গের দাবি

রাজ্যের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার রূপায়ণের জন্যে কেন্দ্রের কাছে আরও আর্থিক সহায়তা দাবি করে ক্রমাগত চাপ দিচ্ছিলেন ডাঃ রায়। প্ল্যানিং কমিশন ও বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রীকে লেখা তাঁর চিঠির কপির একটি বিরাট স্তূপই গড়ে উঠেছিল ঐ সংক্রান্ত ফাইলে, আর সেটা তিনি তাঁর অফিস-ঘরে সযত্নে রক্ষা করে চলতেন। কেন্দ্রীয় কর্তাদের কাছে যতই তেতো লাগুক না কেন ডাঃ রায় তাঁর মতামত প্রকাশের দিক থেকে ছিলেন অত্যন্ত স্পষ্টবাদী। ১ লা মে তিনি প্রধানমন্ত্রীকে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষ বছরের খতিয়ান জানাতে গিয়ে বললেন, 'পশ্চিমবঙ্গে রাজ্যের পরিকল্পনার জন্য খরচ ধরা হয়েছে বছরে ৬৯.১ কোটি টাকা। তাহলে বছরের গড় দাড়াচ্ছে ১৩.৮ কোটি। প্ল্যান বাবদ খরচের অগ্রগতি ৫১-৫২থেকে ৫৪-৫৫ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ৫৩.৭ কোটি। তাহলে দেখা যাচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকার তার লক্ষ্য পূরণের জন্য ১৫.৫ কোটি টাকা দিতে অপারগ হয়েছিলেন। পরিকল্পনার প্রাপ্তির দিক হলো পশ্চিমবঙ্গকে পাঁচ বছরে বাড়তি ১১½ কোটি টাকা তুলতে হবে করের মাধ্যমে। চার বছরে ৯ কোটি টাকা তোলা গিয়েছিল। খোলা বাজার থেকে ধার হিসাবে পরিকল্পনাকালীন সময়ে ১০ কোটি টাকা তোলার অনুমতি পেয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ। এদিক থেকে ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ তুলে ফেলেছে ৭.৩৫ কোটি টাকা।

একটা জিনিস ডাঃ রায় একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না, সেটা হচ্ছে গ্রীষ্মকালের দুর্দান্ত গরম। তাঁর অফিস-ঘরে খুব বড়ো বিশেষ ধরনের শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র বা এয়ারকণ্ডিশনার রাখা হয়েছিল ঘরটাকে দস্তুরমতো ঠাণ্ডা রাখার জন্য। এটা ও ঘরে এখনো রয়েছে। এই রকম তাঁর বাড়ির শোবার ঘরখানাও ঠাণ্ডা রাখা হতো। কিন্তু ঘর ছেড়ে প্রায়ই ত তাকে যেতে হতো বাইরে জনসভা বা অন্যান্য অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ রাখবার জন্য। ফলে তাঁর মানসিক ও শারীরিক ক্লান্তি দুই ই দেখা দিলো। তাই ঠিক করলেন, এক মাসের ছুটি নিয়ে কাশ্মীর বেড়িয়ে আসবেন। জম্মু ও কাশ্মীরের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী বক্সী গোলাম মহম্মদ তাঁকে নিমন্ত্রণ জানিয়েই রেখেছিলেন, তার ওপরে লিখে জানালেন, গুলমার্গে তাঁর জন্য সারি সারি সব বাংলোগুলোই সংরক্ষিত করে রাখা হয়েছে, ডাঃ রায় দয়া করে অবশ্যই আসুন।

মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে মুখ্যমন্ত্রীদের এক অধিবেশনে যোগ দিতে ডাঃ রায় গেলেন দিল্লী। সেখান থেকে একটা ভাড়া করা বিমানে সরাসরি শ্রীনগরে যাবেন স্থির করলেন। তাঁর দলে সবশুদ্ধ ১৪জন লোক। তাঁর ভাইপো সুবিমল রায়, তাঁর স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা, আর সেই সঙ্গে ছিলেন আরও আত্মীয়-স্বজন। সুবিমলবাবু তখন একজন উদীয়মান ব্যারিষ্টার বা ব্যবহারজীবী, পরে সুপ্রিম কোর্টের বিচারক হয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, ডাঃ রায়ের সঙ্গে আমিও গিয়েছিলাম দিল্লী। তাঁর সঙ্গে কাশ্মীরে থাকবারও ব্যবস্থা হয়েছিল আমার। দিল্লীতে ভারতীয় জাতীয় বিমানবহরের ম্যানেজার মিঃ দারুওয়ালার সঙ্গে দেখা করতে নির্দেশ দিলেন আমাকে, আমাদের জন্য একটা ডাকোটা বিমান ঠিক করে দিতে বলো।

আমি সেইমতো দেখা করলাম। দলে লোক কতো শোনবার পর তাঁরা যখন মালপত্রের বহরের কথাটা শুনলেন, তখন একেবারে আঁতকে উঠলেন, বললেন, এতো সব বইতে পারবে না ডাকোটা। আমি একটা ভাইকিং ঠিক করে দিচ্ছি, আর সঙ্গে দিচ্ছি আমাদের একজন দক্ষ পাইলটকে।

তার মানে আরও অনেক টাকার খেলা। ডাঃ রায়কে যখন কথাটা গিয়ে বললাম, তখন একটু ভেবে বললেন, তা হোক, বেশি টাকা লাগলে আর কী করা যাবে।

তাঁর সময়ে তিনি ভারতের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক হিসাবে লক্ষ লক্ষ টাকা উপায় করেছেন, সেজন্য শ্রেষ্ঠ জিনিস ব্যবহার করতেই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। সেই অভ্যাস কি সহজে ছাড়া যায়? যদিও মুখ্যমন্ত্রী হবার পর তাঁর আয় একেবারেই কমে গিয়েছিল। এর অনিবার্য ফল হয়েছিল এই যে, সেই জীবনে যে-সব সম্পত্তি করেছিলেন, সেই সব একে একে বিক্রি করে দিতেন টাকার দরকার পড়লে।

যাইহোক, ভাড়া-করা বিমানে আমরা শ্রীনগর রওনা হলাম ২৪শে মের দুপুরে, আর পৌছলাম বিকেল বেলায়। কতক্ষণই বা লাগলো? শ্রীনগর বিমানবন্দরে বক্সী গোলাম মহম্মদ ও আরও অনেকে ডাঃ রায়কে সম্বর্ধনা জানাতে ফুলের মালা নিয়ে এগিয়ে এলেন। তারপরে আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো ভি আই পি লাউঞ্জে। এখানে চা-পানের ব্যবস্থা ছিল। তাড়াতাড়ি চা খেয়ে আমি মালপত্রের তদারকিতে গেলাম। ওগুলি গাড়ি আর জীপে বোঝাই করা হচ্ছিল গুলমার্গ যাত্রার জন্য। বক্সী সাহেবের ব্যক্তিগত সচিব মিঃ ওয়ারিকু আমাদের তদারকী করছিলেন গুলমার্গ পৌছে বাংলোয় স্থিতি হওয়া পর্যন্ত। পাহাড় টাহাড় পেরিয়ে, গুলমার্গ পৌছতে পৌছতে অবশ্য সূর্য ডুবে গিয়ে অন্ধকার নেমে এসেছিল। উচ্চতায় গুলমার্গ ন হাজার ফিট; সমতল থেকে এলে প্রথম প্রথম একটু শ্বাস কষ্ট হয়। তা সে যাই হোক, গেটের কাছে একটি ছোট দুই-ঘরের বাংলো আমার জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিল। ঘরের ভিতরে একটা কাঠ-জ্বালানো ফায়ারপ্লেস ছিল। তাতেই গরম হচ্ছিল ঘর। খাবার দাবার কোথা থেকে এসেছিল জানিনা, খেয়েছিলাম খুব তৃপ্তি করে, আর ঘুমিয়েও ছিলাম খুব ভালো, এটুকু মনে আছে। গেটের কাছে যে সব পাহারাদার ছিল, তাদের মধ্যেকার লম্বাচওড়া এবং ভদ্র হাবিলদারটিকে ডেকে নিয়ে পাশের ঘরে থাকতে দিয়েছিলাম, যাতে রাত্রে নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারি। সকাল বেলা ঘুম যখন ভাঙলো, তখন জানালার কাঁচের ভিতর দিয়ে বরফ-ঢাকা পাহাড়ের চুড়োগুলি দেখা গেল ভোরের আলোয় ঝলমল করছে। তাদের মধ্যে খাড়া দাঁড়িয়ে আছে বিশাল 'সুনমেরু' পাহাড়।

গুলমার্গে তিন সপ্তাহ আমরা ছিলাম। এই তিন সপ্তাহ ডাঃ রায় খুব খুশি মনে কাটিয়েছিলেন। বয়স তখন তাঁর বাহাত্তর। ঐ বয়সেও তিনি খিলান-মার্গ যাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। ওঁর সঙ্গে আমরা সবাই আরও উঁচুতে খাড়া

খাড়া পাহাড়ী রাস্তা ডিঙিয়ে উঠে গেলাম ঘোড়ায় চড়ে। তিনি হার্টের জন্য কিছু পিল, আর অন্য সব ওষুধ সঙ্গে নিতে ভোলেন নি। ঐ ১২ হাজার ফুট উঁচুতে উঠে কেউ যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে? সাবধানের মার নেই।

ডাঃ রায়ের কোনো কষ্টই হয়নি ঐ উঁচুতে। বরং আমাদের কারুর কারুর পাহাড় ডিঙোতে গিয়ে একটু আধটু মাথা ঘুরে গিয়েছিল বা গা গুলিয়ে উঠেছিল। ওকে দেখে মনে হচ্ছিল, যা ওর স্বাস্থ্য, তাতে আরও দশ বছর উনি নিশ্চয়ই বেঁচে থাকবেন, কিন্তু আমার ধারনাটা পুরোপুরি ঠিক হয় নি, উনি দশ পূর্ণ হবার দু বছর আগেই চলে গিয়েছিলেন।

যাইহোক, গুলমার্গে প্রতি সপ্তাহের শেষে বক্‌সী গুলাম মহম্মদ ডাঃ রায়ের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন ঝুড়িভর্তি বিখ্যাত কাশ্মীরী মেওয়া নিয়ে। কলকাতা থেকে পঙ্কজকুমার মল্লিক মশাইকে গুলমার্গে ডেকে পাঠানো হলো। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় তিনি তাঁর সুমধুর কণ্ঠে আমাদের রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনিয়ে তৃপ্তিদান করতেন।

কিন্তু কাশ্মীর অন্য অনেকের পক্ষে বেদনার স্মৃতি বহন করছিল। আগের বছরকার শ্যামাপ্রসাদের শোচনীয় মৃত্যুর কথা ছেড়েই দিলাম, একজন কাশ্মীরী শিখ ড্রাইভারের কাছ থেকে শোনা একটি বেদনাদায়ক কাহিনীর কথাই বলি। কাশ্মীর আক্রমণের সময় পাঠান হানাদাররা তার মা, বাপ আর বড়ো ভাইকে যে ভাবে খুন করেছিল, তা শুনলে চোখে জল আসে। তারা লুট করে নিয়ে গিয়েছিল তার দুটি ছোট বোনকে, তাদের আর্তনাদ যেন এখনো আকাশে বাতাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বলতে বলতে অমন জোয়ান মানুষটি ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিল, বলেছিল,—'বাবুজী তবু আমি জিন্দা আছি এবং থাকবো; ভাগ্য কি আমাকে একটিবারও সুযোগ দেবে না বদলা নেবার জন্য?'

জানি না, পাকিস্তানের সঙ্গে দু-দুটো যুদ্ধ হয়ে গেছে, এর মধ্যে সেই সুযোগ সে পেয়েছিল কিনা।

গুলমার্গের একজিকিউটিভ অফিসার জানকীনাথ কাচরু আমাদের জন্য খুব খাটতেন। ডাঃ রায় খুব খুশি ছিলেন তাঁর ওপর। একদিন তিনি তাঁর মেয়ে শীলা কাচরুকে সঙ্গে নিয়ে এলেন। তখন সবেমাত্র বিজ্ঞানে ইণ্টার-মিডিয়েট পাস করেছে সে। ডাঃ রায়কে কথায় কথায় মেয়েটি জানালো—তার

ডাক্তারী পড়ার খুব ইচ্ছা, কিন্তু অত খরচার পড়া চালানোর সঙ্গতি তার বাবার নেই।

ডাঃ রায় মেয়েটিকে কয়েকটি প্রশ্ন করে ঠিক ঠিক উত্তর পাওয়ায় খুব খুশি হলেন। বললেন,—'আচ্ছা যাও, দেখি তোমার জন্য কিছু করতে পারি কিনা।'

বাপ আর মেয়ে চলে যাবার পরই তিনি আমাকে ডিক্‌টেশন দিয়ে একটি লম্বা টেলিগ্রাম পাঠালেন জি ডি বিড়লার কাছে। তিনি তখন বোম্বেতে। দিল্লীর মেডিক্যাল কলেজে পড়বার জন্য মেয়েটিকে কোনো বৃত্তি দেবার বন্দোবস্ত করে দেওয়া যায় কিনা, এই ছিল ঐ টেলিগ্রামের মোটামুটি বয়ান।

বিড়লা তখন ইরোরোপ রওনা হওয়ার মুখে। কিন্তু ডাঃ রায়ের অনুরোধ তিনি কখনো ঠেলতে পারেন নি। তাই পরদিনই টেলিগ্রাম যোগে তাঁর উত্তর এসে পড়লো তাঁদের শিক্ষা-সংক্রান্ত ট্রাষ্ট থেকে। মেয়েটির বৃত্তির ব্যবস্থা হয়েছে। যতদিন সে পড়বে ততদিন এই বৃত্তি সে পাবে। দু একমাস পরেই আমি জানতে পেরেছিলাম, শীলা দিল্লীর মেডিক্যাল কলেজে যথারীতি ভর্তি হয়েছে। আশা করছি, সে এতদিনে খুব বড়ো একজন ডাক্তার হয়েছে, ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ডাক্তারের আশীর্বাদ ও বদান্যতায়।

ডাঃ রায় তাঁর ব্যক্তিগত কর্মচারীদের প্রতিও যে কতটা দরদী ছিলেন, তার উদাহরণস্বরূপ একটা ঘটনার কথা আমি এখানে উল্লেখ করবো। আমি ঘরে বসে টাইপ করতে ব্যস্ত, এমন সময় খাওয়ার সময় হয়ে গেল। বাইরে তখন ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। জানালা দিয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখি, ট্রেতে করে বেয়ারা আমার লাঞ্চ নিয়ে আসছে, আর মাথায় ছাতা ধরে সমানে এগিয়ে আসছেন ডাঃ রায়, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী নিজে। এ কী জীবনে আমি কখনো ভুলবো? আমার মতো সামান্য কর্মচারীর জন্য এই দরদ, এ কী কখনো ভুলবার? বৃষ্টির জলে খাবার যদি নষ্ট হয়ে যায়? তাই বেয়ারাটাকে অমনভাবে খাবার নিয়ে যেতে দেখামাত্রই ছাতা খুলে সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এলেন নিজে। কজন নেতা বা প্রশাসক বা মুখ্যমন্ত্রী তাঁর অধস্তন কর্মচারীদের জন্য এমন দরদ বোধ করেছেন? খুব কম।

গুলমার্গে তিনসপ্তাহ কাটাবার পর ডাঃ রায় দলবলসহ চলে এলেন শ্রীনগরে। এখানে সরকারী অতিথিভবনে থাকবার জন্য আমরা নিমন্ত্রিত। এইখানে চারদিন আমরা ছিলাম। এই চারদিন বাদে কাশ্মীরে একমাস থাকার পুরো খরচা বহন করেছিলেন ডাঃ রায়। কাশ্মীর সরকারের আতিথ্যের কথা শতমুখে বলেও শেষ করা যায় না, কিন্তু বিদ্যুৎ-সরবরাহ শ্রীনগরে তখন অপ্রতুল থাকায় আলো জ্বলতো মিট মিট ক'রে, তাতে বই-টই পড়ার বড়ো অসুবিধা হতো। পাঁচ দিনের দিন আমরা চলে গেলাম ঝিলম নদীর ওপরে অন্যতম সেরা একখানা হাউস বোটে। এখানেও আমরা ছিলাম চার দিন। পরে শুনেছিলাম ডাঃ রায় গড়ে প্রতিদিন আড়াইশ টাকা করে দিয়েছিলেন হাউস-বোটের মালিককে। যাইহোক, এইভাবে খুব আনন্দে কাশ্মীরে কাটিয়ে আমরা ফিরে এলাম দিল্লী হয়ে কলকাতা।

রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের কাছে স্মারকলিপি পেশ

মে মাসের ২৪ তারিখে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের কাছে স্মারকলিপি পেশ করলেন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি। বিহার, আসাম ও ওড়িষ্যার ৮২ লক্ষ (৮'২ মিলিয়ন) লোক বাস করে পশ্চিমবঙ্গে। সেজন্য পশ্চিমবঙ্গের সীমানা আরও বাড়িয়ে দেওয়া হোক ২১,৩৫২ বর্গ মাইল, এই ছিল তাঁদের দাবি। রাজ্যের আয়তন তখন ছিল ৩০,৭৭৫ বর্গমাইল এবং ১৯৫১ সালের আদমসুমারি অনুসারে লোকসংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ২,৪৮,১০,৩০৮ জন। বিহার থেকে যে সব এলাকা চাওয়া হয়েছিল, তা হলো,—পুর্ণিয়া, মানভূম, ধলভূমের কিছু অংশ, আর সরাইকেলার কিছু অংশ,—সব মিলিয়ে ১৩,৯৪৫ বর্গমাইল। আসাম থেকে চাওয়া হয়েছিল গোয়ালপাড়া এবং গারো পাহাড়,—সবশুদ্ধ ৭১৪৭ বর্গমাইল। আর ওড়িষ্যার বালেশ্বর জেলার উত্তরাংশ থেকে চাওয়া হয়েছিল ২৬০ বর্গমাইল। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি অতুল্য ঘোষ বাংলার দাবি পেশ করবার জন্য প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছিলেন। আর এ জন্য তিনি প্রথম সারির আইনজ্ঞ, শিক্ষাব্রতী ও প্রবীণ রাজ-নীতিবিদদের নিয়ে একটি সাব কমিটিও তৈরি করেছিলেন। স্মারকলিপির মোট অক্ষর সংখ্যা ছিল এক লক্ষ পঁচিশ হাজার, বিভক্ত ছিল ১১টি পরিচ্ছেদে। জুনের প্রথম সপ্তাহে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কমিশনের কাছে

তাঁদের রিপোর্টও পেশ করেছিলেন। এঁরা বলেছিলেন, বিহার ও আসামের সীমান্ত এলাকার মোট প্রায় পনেরো হাজার বর্গমাইল জমি, যার অধিবাসীর সংখ্যা হবে ৬৮ লক্ষ (৬'৮ মিলিয়ন) তা পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে জুড়ে দিতে হবে। এই হিসাব থেকে দেখা যাবে, প্রাদেশিক কংগ্রেস যা চেয়েছিলেন, রাজ্য সরকার তার থেকে দাবির পরিমাণ অনেক কমিয়ে দিয়েছিলেন, যাতে তা আরও বাস্তবসম্মত হয় এবং উক্ত কমিশনের কাছে সহজগ্রাহ্য হয়।

জন্মদিনের অনুষ্ঠান

১লা জুলাই ডাঃ রায় পড়লেন ৭৩ বছরে এবং তাঁর জন্মদিন তিনি পালন করলেন মহাকরণের কাজকর্মে কোন ছেদ না ঘটিয়ে। ডাঃ রায় তাঁর জন্মদিনে আরও সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠতেন, কারণ বেশ কিছুটা সময় তিনি কাটাতেন গীতা আর ব্রহ্মস্তোত্র পাঠ করে। খুব কম লোকই জানতেন যে, ছোটবেলায় তাঁর বাপ-মা যা শিখিয়েছিলেন, সেইমতো রোজ সকালে উঠে নিয়ম ক'রে তিনি গীতা প্রভৃতি পাঠ করতেন।

তাঁর জন্মদিনে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু, গুণগ্রাহী এবং আত্মীয়স্বজনরা আসতেন ফুলের মালা নিয়ে, ফল নিয়ে, মিষ্টি নিয়ে। ভীড় যা হতো, তা নিয়ন্ত্রণ করা সেদিন খুব সহজসাধ্য হতো না।

তাঁর বাবার কাছ থেকে তিনি শিখেছিলেন, 'ধার করবে না, ভিক্ষা করবে না, প্রত্যাখ্যানও করবে না।' কিন্তু কেউ যদি কোনো উপহার নিয়ে আসত স্বার্থপ্রণোদিত হয়ে, তাহলে তিনি তা সোজাসুজি প্রত্যাখ্যান করতেন। তাঁর নিয়ম ছিল, ঐসব ফুল, ফল আর মিষ্টি হাসপাতালে রোগীদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে হবে; কিছু বিলিয়ে দিতে হবে যে-সব স্কুল-কলেজের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী হবার আগে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন, সেই সব বিদ্যায়তনের ছাত্রদের মধ্যে। পরবর্তী কালে দেখেছি ডাঃ রায়ের জন্মদিনের অনুষ্ঠান যেন জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে। অন্যান্য বারের মতো প্রদেশ কংগ্রেস চৌরঙ্গীর কংগ্রেস ভবনে তাঁর সম্মানে এই অনুষ্ঠান করলেন।

ছাত্র-বিক্ষোভ

২৮শে আগষ্ট কেন্দ্রীয় সরকার থেকে একটি সাইক্লোস্টাইল-করা চিঠি পেলেন মুখ্যমন্ত্রী, তাতে ছাত্র-বিক্ষোভ হলে তার মোকাবিলা কী ভাবে করতে

হবে, তার একটি নির্দেশ-তালিকা ছিল। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-বিক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছিল সে সময়, বিশেষ করে লক্ষ্ণৌতে আর ইন্দোরে। শিক্ষার মান এবং ছাত্রদের মধ্যে নিয়ম শৃঙ্খলার উন্নতিসাধন সম্পর্কে কিছু প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকার তখন বিবেচনা করে দেখছিলেন। তাঁদের মতে, ছাত্রদের মধ্যে এই যে শৃঙ্খলার অভাব দেখা দিয়েছে, এর কারণ হচ্ছে শিক্ষার মানের অবনতি, শিক্ষকদের নেতৃত্বের অভাব, দল ও উপদলীয় কলহ, রাজনৈতিক টানাপোড়েন ইত্যাদি। অনেক সময় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপাচার্য নিয়োগ করা হয়েছে শিক্ষাগত যোগ্যতা ছাড়াও অন্য কারণে।

রাধাকৃষ্ণণ-কমিশন যে-সব সুপারিশ করেছিলেন, সেই অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষায়তনগুলির পরিচালন-পর্ষদ নতুন করে গড়তে চেয়েছিলেন, তা সে সেনেটই হোক আর সিণ্ডিকেটই হোক। প্রস্তাব করা হয়েছিল (১) স্কুলের ম্যানেজিং কমিটিগুলি এমনভাবে গঠিত হবে, যাতে দল, উপদল ও রাজনৈতিক প্রভাব অনেক কমে যায় (২) শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা বাড়িয়ে দিতে হবে। এজন্য রাজ্যের সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী অনুষ্ঠানে উপযুক্ত মর্যাদা সহকারে তাঁদের আহ্বান করতে হবে (৩) ছাত্রদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ জাগিয়ে তোলবার জন্য শিক্ষায়তনগুলিতে 'হাউস সিস্টেম, মনিটর'দের পর্ষদ এবং ছোটদের আদালত তৈরি করতে হবে (৪) ধর্মনিরপেক্ষভাবে ছাত্রদের মধ্যে নীতি শিক্ষার প্রচলন করতে হবে।

দুর্গাপুর প্রকল্প

পশ্চিমবঙ্গে কোকচুল্লী ও সংশ্লিষ্ট শিল্পের একটি কারখানা স্থাপনের ব্যাপারে দিল্লীর উৎপাদন-মন্ত্রক ও যোজনা কমিশনের আমলাচক্র নানারকম আর্থিক ও কারিগরী আপত্তি তুলেছিল প্রথম প্রথম। এই নিয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে প্রচুর চিঠি লেখালেখি চলে, মূল্যবান সময়ও নষ্ট হয়। অক্টোবর মাসে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর প্রিয় দুর্গাপুর প্রকল্প নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখলেন। নভেম্বরে আবার তিনি লিখলেন, বললেন,—'কী আথিক কী বেকারত্ব মোচন, দুদিক থেকেই এ রাজ্যকে যদি আবার সামলে উঠতে হয়, তাহলে দুর্গাপুরের উন্নয়নই হচ্ছে তার একমাত্র উপায়। এই প্রকল্প শেষ হলে ১২ হাজার লোকের চাকরি-বাকরি হবে।

লিখতে লিখতে তিনি আরও বললেন,—কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, যে কারণেই হোক যোজনা-কমিশন কিংবা উৎপাদন-মন্ত্রক এ বিষয়ে সাহায্য করছে না, যদিও আমি তাদের আশ্বাস দিয়েছি, এজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কোনো আর্থিক সাহায্য আমরা চাই না।

তখন তাঁর ইচ্ছা ছিল একটি কোকচুল্লী-কারখানা, একটি বৈদ্যুতিক কারখানা ও একটি পিগ-আয়রণ কারখানা গড়ে তোলা, সব মিলিয়ে খরচা দাঁড়াবে ১৫ কোটি। এবং এর খরচ-খরচার হিসাবটা তিনি করেছিলেন নিজের হাতে। এর আগে বিড়লা ভ্রাতারা দুর্গাপুরে একটি আড়াই লক্ষ টনের 'পিগ আয়রণ' এবং একটি ইস্পাত কারখানা তৈরি করার জন্য লাইসেন্স চেয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করেছিলেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার ব্যক্তিগত মালিকানায় এতো বড়ো জিনিষ অর্পণ করতে রাজী হননি। সে খবরটা খবরের কাগজেও বেরিয়ে গিয়েছিল ২৭শে নভেম্বর। দুর্গাপুর-উন্নয়ন এবং দুর্গাপুরকে একটি শিল্পকেন্দ্রে পরিণত করার পিছনে ডাঃ রায়ের প্রভূত যুক্তি ছিল। রেললাইন কাছে, গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড কাছে, নাব্য খালও রয়েছে, যা দিয়ে সস্তায় পরিবহনের কাজ চলতে পারবে, হুগলি বা ভাগীরথী পর্যন্ত। কোকচুল্লীর বাড়তি গ্যাস দিয়ে একটি 'গ্যাস-গ্রিড'ও বসানোর প্রস্তাব ছিল তাঁর।

নতুন সেক্রেটারিয়েট ভবন

সম্প্রসারণশীল বিভিন্ন বিভাগের অফিস-ঘরের প্রচণ্ড অভাব রাজ্য সরকারের সামনে একটা সমস্যার আকারেই দেখা দিয়েছিল বলতে হবে। বেশি ভাড়া দিয়ে নানান বাড়িতে কিছু কিছু জরুরী অফিস বসানো হয়েছিল। এই সব অফিসগুলিকে উঠিয়ে এনে একই বাড়িতে যাতে বসানো যায়, সেজন্য ডাঃ রায় বহুতলবিশিষ্ট একটি অট্টালিকা তৈরির চিন্তা করলেন। পূর্তবিভাগের চীফ ইঞ্জিনিয়ার তিনকড়ি মিত্রকে তিনি এ কাজের প্ল্যান ইত্যাদি নিয়ে এগিয়ে যাবার জন্য নির্দেশ দিলেন। ইঞ্জিনিয়ারদের একটি দল এই পরিকল্প নিয়ে কাজ করতে লাগলো এবং তারই ফলশ্রুতি হলো তখনকার দিনের ভারতের উচ্চতম অট্টালিকা হুগলি নদীর তীরে ইডেন উদ্যানের কাছে ষ্ট্র্যাণ্ড রোডের ওপর তেরোতলা নতুন সেক্রেটারিয়েট-ভবন। মুখ্যমন্ত্রী এর

দ্বারোদ্‌ঘাটন করলেন ৪ঠা সেপ্টেম্বর। রাষ্ট্রসংঘের 'দেশলাই-বাক্স'-আদলের বাড়ির মতো করে সরু ও লম্বা এই অট্টালিকাটির উচ্চতা হচ্ছে ১৯৫ ফিট, লম্ব হচ্ছে ২৭২ ফিট এবং চওড়া ৬০ ফিট ; এতে অফিস-ঘরের সংকুলান-স্থান হচ্ছে ১,৪৩,২৭০ বর্গফিট। এর ফলে সরকারের বেঁচে গেল ৫ লক্ষ টাকা, যা নাকি ভাড়া হিসাবে বিভিন্ন ভাড়া-করা বাড়ির জন্য সরকারকে গুণতে হতো।

উত্তরবঙ্গের বন্যা ও বন্যা-নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের জন্ম

এ বছর পূর্বাঞ্চলের কিছু রাজ্যের প্রতি প্রকৃতিদেবী খুব সদয় ছিলেন না : বিহারের কিছু অংশ, আসাম ও উত্তরবঙ্গে হয়েছিল প্রচণ্ড বন্যা। উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী-প্রেরিত বিশেষ বিপদসূচক বার্তা পেয়ে বিধ্বংসী বন্যার করাল রূপ দেখবার জন্য পণ্ডিত নেহেরু নিজে এসে কোচবিহার উপস্থিত হলেন ৫ই সেপ্টেম্বর। তাঁকে স্বাগত জানাতে কয়েকজন সহযোগী মন্ত্রীসহ ডাঃ রায়ও গিয়েছিলেন সেখানে। সব দেখেশুনে তাঁরা একটি পরিকল্পনা নেবার সিদ্ধান্ত করলেন, যাতে কুশী, তিস্তা, তোর্সা এবং ভারতের দুঃখের নদী বলে অভিহিত ব্রহ্মপুত্র ও তার করদ নদীগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করা যায়। এখানে বসেই নেহেরু নদী উপত্যকা পরিকল্পগুলিকে সুসংহত এবং সুদক্ষ উপদেশ দিয়ে চালিত করবার জন্য একটি কেন্দ্রীয় কমিশন বসাবার কথা চিন্তা করলেন। তাঁর উত্তরবঙ্গ ভ্রমণের দশ দিনের মধ্যেই গঠিত হলো কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ও বিদ্যুৎমন্ত্রী গুলজারীলাল নন্দার উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ বন্যা-নিয়ন্ত্রণ বোর্ড। চেয়ারম্যান হলেন মুখ্যমন্ত্রী, সভ্য হলেন খাদ্য ও ত্রাণমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন, সেচমন্ত্রী ভূপতি মজুমদার, পূর্তমন্ত্রী খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এবং সেচবিভাগের সচিব করুণাকেতন সেন, আই সি এস।

২রা নভেম্বর জওহরলাল নেহেরু কলকাতায় এলেন তাঁর ১৫ দিন ব্যাপী চীন সফরের পর। তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন মাও সে তুং এবং চৌএন লাই। তখনকার দিনে ভারতের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল চীন এবং নেহেরু ও চৌ এশিয়ার এই দুই মহান নেতার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ হওয়ায় রাজনৈতিক পটভূমিকায় একটি নতুন যুগের সূচনা হয়েছিল বলা চলে। ঐ দিন বিকেলে

ময়দানের ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে নেহেরুর ৯০ মিনিট ব্যাপী ভাষণ শুনতে যে সমাবেশ হয়েছিল, তা অভূতপূর্ব ত বটেই বিশালতার দিক থেকে অন্যতম। এই সভায় নেহেরু চীন সম্পর্কেই বললেন বেশি। নয়া চীন যা করেছে সে সম্পর্কে তিনি প্রশংসায় ছিলেন পঞ্চমুখ এবং তাদের বহু ব্যবস্থা আমাদের দেশেও প্রবর্তিত করে সুফল পাওয়া যাবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। এই বিরাট জনসভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন ডাঃ রায়।

তিনটি বিশেষ কাজ

কলকাতায় পোলিও রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল বিলক্ষণ। তাঁর ক্লিনিকে ডাঃ রায় বহু বিকলাঙ্গ শিশুর চিকিৎসা করতেন। এ থেকে তাঁর মনে হলো এই ভয়ানক রোগটির জন্য একটি হাসপাতাল করা দরকার। যেই ভাবা সেই কাজ। তাঁর এক প্রাক্তন ছাত্র হচ্ছেন ডাঃ সন্তোষ বসু। কলকাতার উত্তর-পূর্ব এলাকার বেলিয়াঘাটায় একটি হাসপাতাল করার জন্য তাঁকে কাজে লাগিয়ে দিলেন ডাঃ রায়। গোড়ায় এটি ছিল বে-সরকারী উদ্যোগ। এর জন্য দরকারী যন্ত্রপাতি তিনি দেশের নানা জায়গা এবং দেশের বাইরে থেকেও যোগাড়যন্ত্র করে দিয়েছিলেন। উদ্যোক্তারা এর নাম দিয়েছিলেন 'বি সি রায় পোলিও ক্লিনিক'। নেহেরু নিজে এসে এর দ্বারোদ্ঘাটন করেছিলেন। ঐ দিন প্রধানমন্ত্রী নেহেরু আরও একটা কাজ করেছিলেন। সেটি হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের সর্ববৃহৎ কৃষি কলেজ কল্যাণীতে অবস্থিত 'বিড়লা কলেজ অব এগ্রিকালচার'-এর দ্বারোদ্ঘাটন। ডাঃ রায় জি ডি বিড়লাকে দিয়ে সমস্ত খরচ বহন করিয়েছিলেন। পরিমাণে তা হবে কয়েক লক্ষ টাকা। এই প্রতিষ্ঠানটিই পরে একটি বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পরিণতি লাভ করেছিল, যার ভিত্তি ছিল কৃষি এবং পশু-প্রজনন বিদ্যা। ডাঃ রায়ের বহুবিধ উন্নয়ণমূলক কাজের মধ্যে এটি হচ্ছে অন্যতম।

এ ছাড়া আরও একটি কাজ হয়েছিল। কল্যাণী থেকে প্রধানমন্ত্রী তাঁর কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে দার্জিলিং চলে গেলেন। ৪ঠা নভেম্বর নেহেরু ভারতের প্রথম পর্বতারোহণ-শিক্ষায়তনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করলেন দার্জিলিঙের বার্চহিলে, যেখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার দৃশ্য সুন্দর দেখা যায়। এই শিক্ষায়তনটিই তারপর থেকে সারা পৃথিবীতে 'হিমালয়ান মাউণ্টেনিয়ারিং ইন্‌সটিটিউট' রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

পশ্চিমবঙ্গ পুলিশদের অনশন ধর্মঘট

ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের মন্ত্রীত্বকালেই কিছু পুলিশের লোক তাঁদের আর্থিক দাবি-দাওয়ার জন্য ধর্মঘটের হুমকি দিয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটা কাযে পরিণত হয় নি। কিন্তু এবার সেই ধূমায়িত অসন্তোষ বাস্তবরূপে দেখা দিলো ১০ই ডিসেম্বর; পুলিশের নানান বিভাগ থেকে পাঁচ হাজার লোক অনশন ধর্মঘট করে বসলো কলকাতায়। এখানকার এই ধর্মঘট অবশ্য চলেছিল মাত্র ২৪ ঘণ্টার জন্য। পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে এই আশ্বাস দেওয়া হয় যে তাদের দাবি-দাওয়ার বিষয়, অর্থাৎ বেতন, বাড়ি-ভাড়ার ভাতা এবং খাদ্য বিষয়ের ভরতুকি,—এ-সব ব্যাপার বিবেচনা করে দেখা হবে আগামী চার মাসের মধ্যে। ইতিমধ্যে নেতৃস্থানীয় ৫৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। পুলিশ কমিশনার হরিসাধন ঘোষচৌধুরী যখন মুখ্যমন্ত্রীকে গিয়ে বললেন যে ধর্মঘটীরা ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নিয়েছে, তখন সঙ্গে সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী তাদের ছেড়ে দেবার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু এই আন্দোলনটা শীগগিরই ছড়িয়ে পড়লো জেলান্তরে, হাওড়াসহ পাঁচটি জেলা এতে জড়িয়ে পড়েছিল। প্রথম প্রথম কলকাতায় যা হয়েছিল, এখানেও হলো তাই। অস্ত্রাগার এবং ধনাগারে মিলিটারি মোতায়েন হলো। হাওড়ার অবস্থাই ছিল সব থেকে ঘোরালো। পুলিশের আই-জি হীরেন সরকার খানিকটা ব্যক্তিগত ঝুঁকি নিয়েই হাওড়ার ধর্মঘটী পুলিশদের সঙ্গে দেখা করলেন, কিন্তু প্রথম দিকে তাঁর দিক থেকে যথেষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও সাড়া মেলেনি। ধর্মঘট-চলাকালীন পুলিশের কর্তৃপক্ষ দিনে রাতে সব সময়েই ডাঃ রায়ের অফিস এবং বাড়িতে দেখা করেছেন, নিয়েছেন তাঁর নির্দেশ-উপদেশ। ধর্মঘটের সাতদিনের দিন সরকার ধর্মঘটীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবার সিদ্ধান্ত নিলেন। যদি তারা অবিলম্বে কাজে যোগদান না করে, তাহলে সরকার উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবেন বলে তাদের জানিয়ে দিলেন। ১৭ই ডিসেম্বর ধর্মঘটীদের এক বিরাট অংশ কাজে যোগ দিতে এলেন এবং পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে এলো। এই বিষয়ে সরকার থেকে একটি প্রেস-নোট বার করা হয়েছিল, তাতে অন্যবিধ বিষয়ের সঙ্গে এও বলা ছিল যে 'সরকারের কাছে খবর আছে পুলিশদলের কিছু লোকের সংযোগ আছে কমুনিস্টদের সঙ্গে, তারা শান্তি-শৃঙ্খলাভঙ্গ করবার চেষ্টায় আছে।'

পুলিশদের দু-সপ্তাহব্যাপী ধর্মঘটের শেষের দিকে মুখ্যমন্ত্রী মানসিক ও শারীরিক চাপ অনুভব করছিলেন প্রচণ্ড। যাদের দিয়ে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করবেন, তাদেরই মধ্যে যদি শান্তি-শৃঙ্খলার অভাব দেখা দেয়, তাহলে উদ্বিগ্ন হওয়া স্বাভাবিক। বিশেষ করে পুলিশদলের এক অংশ যে উগ্রপন্থী রাজনীতিকদের প্রভাবের আওতায় এসে পড়বে, এটা তিনি ভাবতেও পারেন নি; শান্ত মনে নিতেও পারেন নি। ক্লান্তির ছাপ তাঁর সর্বদেহে পড়েছিল, রাত্রে ঘুমও হচ্ছিল না ভালো করে। ধর্মঘট যেদিন ভাঙলো, সেদিন তিনি অফিসে এলেন দেরিতে। কিছুক্ষণ পরেই তাঁর ঘরে এলেন মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব এবং পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল। জেলাগুলি থেকে যে সব রিপোর্ট এসেছে, সেগুলি ওঁকে দেখালেন তাঁরা। বেলা দেড়টা নাগাদ তিনি সরকারী প্রেস নোট আর স্বরাষ্ট্রবিভাগের জন্য নির্দেশ ইত্যাদি ডিক্টেশন দিলেন। তখনকার দিনে তিনি অফিসে মধ্যাহ্নভোজন করতেন এবং তারপরে তাঁর পাশের ঘরের ডিভানে আধ ঘণ্টার মতো একটু বিশ্রাম নিতেন। কিন্তু সেদিন তা না করে চট করে উঠে পড়ে কাজকর্ম করার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। অথচ শরীরটা ভালো বোধ করছিলেন না, অসমান পা ফেলতে ফেলতে ধপ করে গিয়ে অফিস চেয়ারে বসে পড়লেন। তাঁর চেহারা দেখেই মনে হচ্ছিল তিনি বেশ অসুস্থ। তিনি বেল্ বাজিয়ে আমাদের ডেকে বললেন যে, শরীরটা তাঁর ভালো নেই বলে বাড়ি চলে যাচ্ছেন, বিকেলে আর অফিসে আসবেন না।

বিকেলে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ী গিয়ে তাঁর সম্বন্ধে খোঁজখবর নিয়ে জানলাম—তাঁর হয়েছে হৃদরোগ। এটি হলো দ্বিতীয় আক্রমণ। প্রথম আক্রমণ হয়েছিল খুব মৃদু আকারে, যখন তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মিটিংএ যাচ্ছিলেন আমেদাবাদ থেকে দিল্লীতে সেই ১৯৩০ সালে। তিনি অসুস্থতার পরোয়া করতেন না, অসুখ-বিসুখ হলে নিজেই রোগের সঙ্গে লড়াই করতেন, কাউকে ডাকাডাকি করতেন না। কিন্তু এবার ডেকে পাঠালেন আত্মীয়স্বজনদের, আর হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ যোগেশ গুপ্তকে। চিকিৎসা চলতে লাগলো। তবে সব থেকে বড়ো চিকিৎসা হলো, তাঁর নিজেরই অদম্য ইচ্ছা শক্তি।

যাইহোক, তাঁর ডাক্তাররা তাঁকে শোওয়ার ঘরে শুয়ে শুয়েই হালকা কাজ করার অনুমতি দিয়েছিলেন। খুব জরুরী চিঠি পড়া বা ডিকটেশন দেওয়া, এর বাইরে কিছু নয়। খুব বেশি ফাইল যেন ওঁকে না দেওয়া হয় বা লোকজন যেন

ওঁর কাছে গিয়ে ভীড় না করে, ডাক্তারদের এই-ই ছিল কড়া নির্দেশ। এমনকি যেদিন ব্লাডপ্রেসারের তারতম্য ঘটতো, সেদিন কাউকেই ঘরে ঢুকতে দিতাম না আমরা। কিন্তু কাজ ছিল তাঁর কাছে খাদ্যের মতো। চিঠি বা ফাইল নিয়ে ঢুকলেই আগ্রহের সঙ্গে তিনি হাত বাড়িয়ে দিতেন।

যেদিন তাঁর অসুস্থতার তৃতীয় দিন, সেদিন তাঁর যাওয়ার কথা ছিল কলকাতা থেকে ১৩০ মাইল দূরে,—রূপনারায়ণপুরে, সরকারী কেব্‌ল ফ্যাকটরীর দ্বারোদ্‌ঘাটন করতে। আয়োজনকারীরা এসে পড়লেন এবং ডাক্তারদের অনুমতি নিয়ে ওঁর ঘরেই মাইক্রোফোন বসানো হলো, এখানে শুয়ে শুয়েই তিনি তাঁর ভাষণ দিলেন, সুদূর রূপনারায়ণপুরে বসে লোকেরা শুনতে লাগলো তাঁর কণ্ঠস্বর। এ ছাড়া, শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতীতেও তাঁর যাওয়ার কথা ছিল। সমাবর্তন উৎসবে বাংলায় তাঁর ভাষণ দেবার কথা ছিল, পণ্ডিত নেহেরু এসেছিলেন আচার্য হিসাবে সভাপতিত্ব করতে। ডাঃ রায়ের হয়ে প্রফুল্লচন্দ্র সেন ভাষণ দিলেন। শান্তিনিকেতন থেকে নেহেরুজী সোজা কলকাতায় এসে পড়লেন তাঁর অসুস্থ বন্ধুকে দেখতে। বাড়ির বাইরে প্রচুর লোক জমে গেল, কিন্তু তারা কেউ দেখতে পেলো না, নেহেরু কেমন করে দু হাতে জড়িয়ে ধরলেন তাঁর প্রিয় বন্ধুকে। আমরা যারা ঘরের মধ্যে ছিলাম, তাদের সৌভাগ্য হয়েছিল এই দৃশ্য দেখবার। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁরা নিভৃত আলাপে মগ্ন হয়ে গেলেন। অবশ্য পনেরো মিনিটের বেশি নয়। অসুস্থ মানুষ যাতে ব্যস্ত না হন, সেদিকে নেহেরুর দৃষ্টি ছিল প্রখর। নেহেরু যখন বিদায় নিয়ে লিফটের কাছ বরাবর গেছেন, তখন ডাঃ রায় একটু অস্বাভাবিক উঁচু গলাতেই তাঁকে ডেকে উঠলেন। নেহেরু সে ডাক শুনে ফিরে দাঁড়ালেন। ডাঃ রায় তাঁর শোবার ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন, হাতে একটা প্যাকেট। এতে ছিল বিশেষ ধরনের রসগোল্লা। আকারে খুব বড়ো, তরমুজের মতো দেখতে। এগুলো তৈরি করতো উত্তরপাড়ার এক কারিগর, নেহেরু বা নেহেরুপরিবারের খুব প্রিয় ছিল। সেজন্য নেহেরু কলকাতায় এলেই তিনি আমাকে উত্তরপাড়ায় পাঠিয়ে ঐ রসগোল্লা আনিয়ে নিতেন। অসুখে বিছানায় শুয়ে শুয়েও ডাঃ রায় এটা ভোলেন নি, আমাকে যথাসময়ে পাঠিয়ে ওটা আনিয়ে রেখেছিলেন; কিন্তু কথায় কথায় প্যাকেটটি দিতে ভুলে গিয়েছিলেন। এবার প্যাকেটটা হাতে তুলে নিয়ে নেহেরু বললেন, 'জিনিসটা কী? নিশ্চয়ই সেই রসগোল্লা?'

দুজনেই হাসতে লাগলেন। কিন্তু আর বেশিক্ষণ দাঁড়ালেন না নেহেরু, চট্ করে ফিরে দাঁড়িয়ে লিফটের দিকে এগিয়ে গেলেন।

॥ ১১ ॥

(১৯৫৫ সাল)

ডাঃ রায়ের অসুস্থতা একটা রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করেছিল। যদি তিনি সত্যিই অপারগ হয়ে পড়েন, তাহলে তাঁর শূন্যস্থান পূর্ণ করবে কে? যে দুজন প্রবীণ মন্ত্রীর পিছনে কংগ্রেস দলের পৃষ্ঠপোষকতা ছিল, সেই প্রফুল্লচন্দ্র সেন এবং কালীপদ মুখার্জী সাধারণ নির্বাচনে জয়ী হয়ে আসতে পারেননি। মন্ত্রিসভার আর সব সদস্যরা এই পদের পক্ষে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠাবান নন, তাঁরা বড়োজোর জেলাওয়ারী নেতা। যাই হোক, তাঁর অসুস্থতার পনেরো দিন পরে তাঁর স্বাস্থ্য আবার ভেঙে পড়লো। একদিন সকালে ওপরে গিয়ে দেখি, তাঁর মুখ খুব গম্ভীর এবং কেমন যেন বিষাদগ্রস্ত, আমাকে বললেন,—অফিসের কাজ নিয়ে আমাকে এখন বিরক্ত করো না।

আমি চিঠি আর ফাইল নিয়ে গিয়েছিলাম, সেগুলি নিয়ে ফিরে এলাম। তাঁর পারিবারিক বন্ধু বিখ্যাত শল্য-চিকিৎসক কর্নেল ললিতমোহন ব্যানার্জী বিশেষ করে তাঁর অসুখের সময় প্রত্যেক দিন সকালবেলায় তাঁকে দেখতে আসতেন। সেদিন সকালে ডাঃ রায় ডাঃ ব্যানার্জীকে বলছিলেন, অসুখ যখন এখনো চলছে, যখন শুয়ে শুয়ে মুখ্যমন্ত্রীর করণীয় কাজের প্রতি সুবিচার করতে পারছি না, তখন এটা রেখে আর কী হবে? ইস্তফা দেই, কী বলুন?

এসব কথা আমি শুনেছিলাম পরে। ডাঃ ব্যানার্জী বলেছিলেন,—'এখনই কোনো সিদ্ধান্ত করা ঠিক নয়, আরও কয়েকটা দিন যাক।'

ডাঃ ব্যানার্জী পরে আমাকে বলেছিলেন,—'আমি পনেরো দিন সময় চেয়েছিলাম। বলেছিলাম,—পনেরো দিনের মধ্যে যদি সুস্থতার লক্ষণ না দেখা যায়, তাহলে বরং পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে দিও।'

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সৌভাগ্যই বলতে হবে, ডাঃ রায় তাঁর উপদেশ শুনেছিলেন এবং এই সংকটও কাটিয়ে ওঠা গিয়েছিল। খুব কম লোকই ডাঃ রায়ের এই মনোভাবের কথা সেদিন জানতে পেরেছিলেন। তাঁর দিল্লী বা কলকাতার কোনো রাজনীতিক বন্ধু এ বিষয়ে অবহিত ছিলেন না।

বিধানসভার বাজেট-অধিবেশনের সময় ত্বরান্বিত হচ্ছিল। এ সময় মন্ত্রিসভার বিশেষ অধিবেশন বসে থাকে, বিভিন্ন বিভাগ থেকে পাঠানো ব্যয়-বরাদ্দের অঙ্ক এই সব অধিবেশনে খুঁটিয়ে দেখা হয়। মুখ্যমন্ত্রী এই সব অধিবেশন (এমনকি সাধারণ মন্ত্রিসভার বৈঠকও) তাঁর বাড়িতে বসাতে চাইলেন।

তাঁর ডাক্তাররা ইতস্তত করছিলেন, কিন্তু তাঁর আত্মপ্রত্যয় তখন ফিরে এসেছিল। তিনি তখনকার অর্থসচিব বিনয়ভূষণ দাশগুপ্তকে ডেকে পাঠিয়ে মন্ত্রিসভার বিশেষ বৈঠকগুলির তারিখ ঠিক করে দিলেন। তাঁর সভাপতিত্বে প্রথম বৈঠক হয়ে গেলে কাছেই অপেক্ষমান ডাক্তাররা তাঁকে পরীক্ষা করে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। এই খাটুনিতে তাঁর কোনোরকম ক্ষতি হয়নি। শুধু তা-ই নয়, অন্যদিনের থেকে তাঁকে সেদিন অনেক বেশি প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল। এর পরে সারা জানুয়ারি মাসটা তাঁর বাড়িতেই মন্ত্রিসভার বাজেট-সংক্রান্ত এবং সাধারণ বৈঠকগুলি একের পর এক বসেছিল।

পণ্ডিত নেহেরু কলকাতা থেকে ফিরে গিয়ে ১০ই জানুয়ারি পর্যন্ত তাঁকে কোনো চিঠিও লেখেন নি বা ফোনেও কথা বলেন নি। সম্ভবত তিনি তাঁর অসুস্থতার জন্যই তাঁকে বিব্রত করতে চান নি। দশই জানুয়ারি তিনি তাঁর শারীরিক কুশলতা জানতে চেয়ে একখানা চিঠি লেখেন, তাতে কলকাতার পরিস্থিতি সম্পর্কে স্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকার সম্পাদক জি এ জনসনের ধারণার কথাও ছিল। চিঠিখানির বয়ান হচ্ছে এই :

প্রিয় বিধান,

তোমাকে শেষ যা দেখে এসেছিলাম, তার পরে তোমার সম্পর্কে আর কোনো খবর পাই নি। আশা করি এর অর্থ হচ্ছে, তুমি ভালোই আছো।

সম্প্রতি স্টেট্‌স্‌ম্যানের সম্পাদক জি এ জনসন আমার সঙ্গে দেখা করে গেলেন। তিনি আমাকে কলকাতা আর কলকাতার গোলমালের কথা বললেন। মাঝে মাঝে যেসব বিক্ষোভ দেখা দেয়, তার কথা বললেন। বললেন শহরে কেমন করে মানুষের অকথ্য ভীড় উপচে পড়ছে, তার ওপর বহু লোক বেকার, যেন গোলযোগের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে কলকাতা, যে কোনো মুহূর্তেই গোলমাল শুরু হয়ে যেতে পারে। সামান্যতম উস্কানিতেই ভীড় জমে যায় এবং কখনো কখনো তারা যা খুশি তাই করে বসে। কোনো মোটর গাড়ি ছোটখাটো

কোনো দুর্ঘটনা ঘটাক, অমনি লোকে গাড়ি থেকে ড্রাইভারকে টেনে বার করে এবং শুধু ড্রাইভারকেই বা কেন, পিছনের আসন থেকে আরোহীকে পর্যন্ত টেনে বার করে মারপিট করতে থাকবে। জনসন সাহেব আমাকে বললেন ছদ্মবেশে একবার কলকাতায় গিয়ে সব কিছু নিজের চোখে দেখে আসতে। তাতে করে পরিস্থিতিটা সহজেই অনুমান করে নিতে পারবো। শান্তভাবেই কথাগুলি বলছিলেন তিনি, কিন্তু এটা অনস্বীকার্য যে কলকাতার পশ্চাৎপটে যে কী বিপজ্জনক পরিস্থিতি ধূমায়িত হয়ে আছে, সে সম্পর্কে তিনি রীতিমত ওয়াকিবহাল। তবে একথা তিনি বলতে চান নি যে বিশেষভাবে একটা কিছু ওখানে ঘটছে বা ঘটতে যাচ্ছে ; তিনি বলতে চাইছেন, ছোটখাটো ঘটনা সব-সময়ে লেগেই আছে, আর যখনই দেখা যাবে কোথাও কিছু শান্তভাব, তখনই বুঝতে হবে, ভিতর থেকে কিছু একটা ধূমায়িত হয়ে ওঠবার অপেক্ষা করছে। জনসন বললেন, এ পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারেন একটি মাত্র লোক, সে হচ্ছো তুমি। কিন্তু সেই তুমি এখন সুস্থ নও। তিনি আমার কাছে এ-ও উল্লেখ করলেন যে, ব্যাপারটা এখন এমন পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে, হাইকোর্টের একজন জজের স্ত্রী নাকি বলেছেন যে, সব ঠিক হয়ে যাবে যদি কম্যুনিস্টদের নিয়ন্ত্রিত করা যায়।

কলকাতা সম্পর্কে জনসন যা আমাকে বলেছেন, তা এমন কিছু নতুন কথা নয়। কিন্তু যে-ভাবে তিনি আমাকে বলেছেন, সেটাই আমার মনে রেখাপাত করেছে বেশি। এটা পরিষ্কার যে, তিনি বিষয়টা উপলব্ধি করেছেন। তাই যদি হয়ে থাকে, তাহলে কলকাতার অন্য ইংরেজরাও অনুরূপ চিন্তা করেছেন। আমি অবশ্য মাত্র খবরটাই তোমাকে জানালাম, আশা করি শীগ্‌গিরই তুমি ভালো হয়ে উঠবে। প্রীতি নিও।

তোমার প্রীতিভাজন

জওহর

এই চিঠির উত্তর দিতে গিয়ে ডাঃ রায় যে সব সমস্যার সম্মুখীন, সে-সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীকে ওয়াকিবহাল করবার সুযোগটা ছাড়লেন না এবং সঙ্গে সঙ্গে সমাধানের জন্য তাঁর সাহায্য চাইলেন। চিঠির তারিখ হচ্ছে ১৯৫৫ সালের ১২ই জানুয়ারি। তিনি লিখলেন—

প্রিয় জওহর,

তোমার ১০ই জানুয়ারির চিঠিতে জনসন সাহেবের সঙ্গে তোমার কথা-বার্তার বিষয় উল্লেখ করেছো, যাতে বাংলা বিশেষ করে কলকাতার পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর আশঙ্কার কথা আছে। পরিস্থিতি সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল আছি। এই পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে মূলতঃ কলকাতা এবং শহরাঞ্চলের বৃহৎসংখ্যক বেকার যুবকের দল। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানে দেখা যায় কলকাতায় ২,৩৪,০০০ লোক আছে, যার মধ্যে শতকরা ৮০ জনই বাঙালী, যাদের কোনো পুর্ণ সময়ের চাকরি-বাকরি নেই ; তারা সেটা খুঁজে বেড়াচ্ছে। এই সংখ্যার ১,৩৬,৫০০ হচ্ছে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর, আর ৯৭,০০০ হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণীর। এই ২,৩৪,০০০ লোকের মধ্যে প্রায় ৭০,০০০ হচ্ছে রিফিউজি বা শরণার্থী। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বেশ বড়ো একটা অংশ, শতকরা প্রায় আশীজন হচ্ছে স্বাক্ষরযুক্ত ; এদেরও বড়ো একটা অংশের কিছু না কিছু কারিগরি বিদ্যা জানা আছে, জানা আছে হাতের কাজ। কলকাতার এটাই হচ্ছে প্রধান সমস্যা।

এ ছাড়া শরণার্থী-সমস্যা ত আছেই। তবে নতুন ব্যবস্থায় এদের অবস্থা ভালো হবে বলে আমার বিশ্বাস এবং যা যা ব্যবস্থা আমরা নিচ্ছি, তার মূলে আছে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি।

এখন তুমি বুঝতে পারছো ১৯৪৯ থেকে কেন আমি উন্নয়নমূলক পরিকল্পগুলি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলাম, রাজ্যের অর্থনৈতিক বাধাবিপত্তি থাকা সত্ত্বেও ? আজ পর্যন্ত আমাদের ব্যয় আমাদের প্রাপ্যের ওপর প্রায় ১০ কোটি টাকা বাড়তি দাঁড়িয়ে গেছে। ১৯৪৯ সালে কলেজের ছাত্রদের জেলান্তরে পাঠানোর জন্য আমি কেন্দ্র থেকে ৯০ লক্ষ টাকা পেয়েছিলাম। জেলান্তরের এই কলেজগুলি খুব ভালো কাজকর্ম করছে। চার বছরের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন মাসিক ৮-১০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২৫-৩০ টাকা করে দিয়েছি। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-দের দুর্মূল্য ভাতা শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ বাড়িয়ে দিয়েছি। তুমি জানো শিক্ষাক্ষেত্রে আরও উন্নয়নের কথা আমি চিন্তা করছি এবং বেশ কিছুসংখ্যক ছাত্রকে কল্যাণীতে পাঠানো যায় কি না ভাবছি।

গত পাঁচ বছর ধরে সারা বাংলা জুড়ে বিদ্যুৎ পরিকল্পের একটি কাঠামো আমি খাড়া করছি। বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে আংশিক দামোদর উপত্যকা পর্ষদ (ডি-ভি-সি) থেকে, আংশিক ময়ূরাক্ষী থেকে, আংশিক কলকাতা বিদ্যুৎ

সরবরাহ পর্ষদ থেকে। গ্রামীণ এলাকা সহ দক্ষিণ বাংলার প্রায় সবটাই আমি করে ফেলেছি এবং এটা করার পিছনে আমার একটা উদ্দেশ্য ছিল। আমি জানি পশ্চিমবঙ্গের কৃষিজীবীদের শতকরা ৭০ ভাগেরই জমিজমা অর্থকরী নয়। আমি এ-ও জানি কৃষিজীবীদের এই অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্য গ্রামীণ এলাকায় কম্যুনিস্টরা কিছুটা প্রতিপত্তি সৃষ্টি করেছে। এসব কারণের জন্যই আমি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প যাতে বিদ্যুৎচালিত হতে পারে, তার জন্য পরিকল্পনা করেছি। এখন সময় এসেছে এগুলি কার্যে পরিণত করবার, আর তা আমি করে চলেছি ধাপে ধাপে। কিন্তু ক্ষুদ্রশিল্প বাঁচে বড়ো শিল্পের পরিপূরক বা সহায়ক হিসাবে। সেজন্যই আমার দুর্গাপুর-পরিকল্পের রূপায়নের জন্য আমি তোমাকে সাহায্য করতে বলছি। কোকচুল্লী যদি কোনো রাজ্য স্থাপিত করতে চায়, তাহলে ১৯৫১র শিল্প-উন্নয়ন এবং নিয়ন্ত্রণ-আইন অনুসারে তাকে আগেভাগে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন নিতে হবে। এই কারণে আমি ধৈর্য ধরে গত দেড় বছর অনুমোদনের অপেক্ষায় বসে আছি, কিন্তু কোনো না কোনো অছিলা দেখিয়ে সে-অনুমোদন এখনো স্থগিত রাখা হয়েছে। তাঁরা যা যা তথ্য চেয়েছিলেন, আমার মনে হয় আমরা তার সবই দিয়েছি। বর্তমান পরিস্থিতি হচ্ছে এই যে, যে এলাকায় আমরা এই পরিকল্প রূপায়িত করতে চাইছি, সে যায়গাটা দামোদর উপত্যকা পর্ষদ (ডি ভি সি) খালি করে দিচ্ছে; এখানে তারা ছোট বড়ো ৩০০টি বাংলো তৈরি করেছিল। আমরা দুর্গাপুর-পরিকল্পের জন্য সমস্তটা নিয়ে নিতে চাই; এখানে প্রাথমিকভাবেই ১২,০০০ লোকের কর্মসংস্থান হবে, পরে এ-সংখ্যা অনেক বেশি বেড়ে যাবে। আমার এই দুর্গাপুর-পরিকল্পের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো আলকাতরা থেকে বাড়তি উৎপাদন বার করা। আমি জানি এটা উন্নয়নের এমনি এক উপাদান যে, মধ্যবিত্ত বেকার যুবকরা এর দিকে খুবই আকৃষ্ট হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই রাজ্যকে বাঁচাবার একমাত্র উপায় হচ্ছে ছোট-বড়ো অনেক রকম শিল্প গড়ে তোলা। খুব বড়ো শিল্পের জন্য আমার তেমন সঙ্গতি নেই, কিন্তু পরিপূরক ছোট ছোট শিল্পসহ বড়ো একটি কি দুটি শিল্প আমরা গড়ে তুলতে পারি, যদি রাজ্যকে আমরা বাঁচাতে চাই। এই আশা নিয়েই আমি সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প, জাতীয় প্রসারণ ব্লক ও অন্যান্য কল্যাণমূলক পরিকল্পগুলি গড়ে তুলতে বিশেষ যত্ন নিচ্ছি। আমি এখন বুঝতে পারছি যে আবহাওয়া বদলে যাচ্ছে, জনগণ সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।

জনগণের সহযোগিতা যদি পাই, তাহলে পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে গেলেও আমি ভয় পাই না।

কলকাতার পরিস্থিতি সম্পর্কে বলতে পারি, আমি এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত আছি, এবং এটুকু গর্ব করে বলতে পারি আমার বর্তমানের শারীরিক দুর্বলতা ও অসুস্থতা সত্ত্বেও আমি তা নিয়ন্ত্রিত করতে পারি যদি তুমি আমাকে সাহায্য করো। আমি এখন অনেক ভালো আছি।

তোমার প্রীতিভাজন
বিধান

॥ ১২ ॥

বাজেট অধিবেশন এবং রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন

৮ই ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বাজেট অধিবেশন শুরু হলো। অসুখের পর এই প্রথম ডাঃ রায় জনসাধারণ ও বিধানসভার সভ্যদের সামনে দেখা দিলেন। যখন তিনি বিধানসভা কক্ষে ঢুকলেন, তখন তাঁর দলের সবার কাছ থেকেই স্বতস্ফূর্ত সাদর অভ্যর্থনা লাভ করলেন তিনি।

১২ই ফেব্রুয়ারি কলকাতায় রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সামনে ডাঃ রায় দুই ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে তাঁর দাবির পিছনে যুক্তি উত্থাপিত করলেন। এ কাজে তাঁকে সাহায্য করছিলেন তাঁর ভূমি-রাজস্ব মন্ত্রী এস কে বসু, কৃষি-মন্ত্রী ডাঃ আর আমেদ এবং ব্যারিস্টার ও রাজ্য সরকারের বিশেষ আধিকারিক অরুণ মুখার্জী। তাঁর দাবির পিছনে এবং বিহার যে সব আপত্তি তুলেছিল, তার বিরুদ্ধে ডাঃ রায়ের যুক্তির ভিত্তি ছিল প্রধানত ভাষাগত, ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক এবং বিশেষ করে প্রশাসনিক ও আর্থনীতিক। এই প্রসঙ্গে উত্তরাঞ্চলের সঙ্গে রাজ্যের কেন্দ্রস্থলের সরাসরি সংযোগের দরকার যে কতখানি, সে সম্পর্কেও তিনি বিশদভাবে তাঁর বক্তব্য বুঝিয়ে বলেছিলেন। জনসংখ্যার প্রবল চাপের কথাও ছিল তাঁর অন্যতম বিষয়বস্তু। এই চাপ অন্যান্য ভারতীয় রাজ্যের থেকে পশ্চিমবঙ্গেই ছিল সব থেকে বেশি। এই চাপ অবশ্যই কমানো দরকার। পশ্চিমবঙ্গ থেকে যে সব এলাকা চাওয়া হয়েছিল, সেগুলি প্রধানত ছিল বিহারের পুর্ণিয়া, মানভূম, সিংভূম ও সাঁওতাল পরগণা জেলায় এবং আসামের গোয়ালপাড়া জেলায়।

কিন্তু এ সম্পর্কে আরও কিছু বলবার আগে একটি ছোট্ট ঘটনার কথা সেরে নেই। ১৯৫৩ সালের ডিসেম্বর থেকে লোকরঞ্জন শাখা চালু হয়েছিল সে কথা বলেছি। এই শাখা ৮ মাস কাজ করার পর ১৯৫৪ আগস্ট থেকে বন্ধ হয়ে যায়। সেই থেকে আট মাস বন্ধ থাকার পর এই শাখা পুনর্গঠিত হয়ে আবার চালু হল ১৯৫৫র এপ্রিল থেকে বৌবাজার পোস্ট অফিসের উপর তলায়। তার মধ্যে সত্যজিৎ রায়ের ছবি বিভূতিভূষণের "পথের পাঁচালী" প্রযোজনার দায়-দায়িত্ব রাজ্য সরকার নিজের হাতে নিয়েছিলেন।

রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের বাকি কথাটা এবার বলি। এই কমিশনের সভ্য ডঃ এইচ এন কুঞ্জরু এবং ডঃ কে এম পানিক্কর আবার দার্জিলিঙে এলেন মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে। বাংলার দাবির উত্তরে বিহার পালটা দাবি করেছিল উত্তরাঞ্চলীয় তিনটি জেলা, দার্জিলিঙ, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার এবং নতুন একটি রাজ্যের সৃষ্টির কথাও বলেছিল, তার নাম হবে উত্তরাখণ্ড। বিহার মালদা জেলাটিও চেয়েছিল, কারণ এই সব জেলাগুলির সঙ্গে পশ্চিম-বঙ্গের কোনো ভূমিসংযোগ ছিল না।

ডাঃ রায় দার্জিলিঙ গিয়ে কমিশনের সঙ্গে প্রায় ৯০ মিনিট ধরে আলাপ আলোচনা করলেন। উত্তরাখণ্ডের দাবির উত্তরে এ কথা বলা হয়েছিল যে, দার্জিলিঙ, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারের মোট জনসংখ্যা হচ্ছে প্রায় কুড়ি লক্ষ, তার মধ্যে নেপালীর সংখ্যা হচ্ছে প্রায় ১.৩৫ লক্ষ অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৬.৮; আর সেখানে বাংলাভাষাভাষীর সংখ্যা হচ্ছে শতকরা ৬১.০।

বিধানসভায় বাজেট-অধিবেশনের কথা বলতে গিয়ে ডাঃ রায় যে ভাষণ দিয়েছিলেন ১৪ই ফেব্রুয়ারি তারিখে, তাতে এই প্রথম জানা গেল যে, সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার যে ধারণা, তার উদ্ভব হয়েছিল এই পশ্চিমবঙ্গে, কেন্দ্র তা গ্রহণ করেছিল। ডাঃ রায় এবং তখনকার উন্নয়ন কমিশনার সুশীল দে, আই-সি এস, এই দুইজনের যুগ্ম প্রয়াসে 'সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা' নামক পরিকল্পের সৃষ্টি। একশটি গ্রামকে কেন্দ্র করে একটি শহর গড়ে তোলাই ছিল এই পরিকল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

১৫ই ফেব্রুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী ১৯৫৫-৫৬র বাজেট পেশ করলেন অর্থমন্ত্রী হিসাবে। বাজেটে ঘাটতি ছিল ৪.৩৭ কোটি টাকা। তাঁর মতে, রাজ্যের 'আসল দুর্দশা' হলো পশ্চিমবঙ্গে যথেষ্ট জমি নেই। আর তাছাড়া শুধু জমি

বিলি করলেই দারিদ্র্য দূর করা যাবে না। ত্রাণ আসবে ছোট, বড়ো উভয় শিল্পের মাধ্যমে।

১৯৫৫-৫৬র শেষে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পশ্চিমবঙ্গের মোট ঋণ গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ১৪০.৯ কোটি টাকা। পশ্চিমবঙ্গে চাকরি-প্রার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় দশ লক্ষ। এদের জন্য শুধু কাজ খুঁজে দিলে চলবে না, প্রতি বছরে বাড়তি ১ লক্ষ ২০ হাজারের জন্য কাজ ঠিক করে দিতে হবে।

দুর্গাপুর প্রকল্পের অনুমতি আদায়ের জন্য পশ্চিমবঙ্গের কর্মচারীদের যে দলটি দিল্লী গিয়েছিলেন, তাঁরা ফিরে এসে মুখ্যমন্ত্রীকে জানালেন যে, এখনো দরজা খুলল না। দিল্লীর একদল আমলা কারিগরী অথবা অন্যান্য অজুহাত তুলে এ অনুমতি কেবলই পিছিয়ে দিচ্ছে। ততদিনে প্রধানমন্ত্রী তাঁর ইয়োরোপ সফর থেকে ফিরে এসেছেন। ডাঃ রায় তাঁকে এ-ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠি লিখলেন ১৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে :

প্রিয় জওহর,

ইয়োরোপ থেকে দেশে ফিরেছো,—স্বাগতম্।

জানাতে দুঃখ হচ্ছে, দুর্গাপুর-প্রকল্প সম্পর্কে কিছুই করা হয় নি। আমি জানি কমিটির বৈঠক হয়েছিল এবং আমাদের সদস্যদের কাছ থেকে জেনেছি, দুর্গাপুর-প্রকল্পের উন্নয়নের ব্যাপারে যতো বাধা সৃষ্টি করা যায় ততটা করা হচ্ছে সব সময়। নানারকম তুচ্ছ আপত্তি তোলা হয়েছে, তার কিছু যুক্তিসঙ্গত, কিছু যুক্তিসঙ্গত নয়। আমার ভয় হচ্ছে, তুমি হস্তক্ষেপ না করা পর্যন্ত কিছুই করা যাবে না।

যে-পুস্তিকাটি তোমাকে দিয়েছিলাম, তাতে আমি যেরকম ব্যাখ্যা করেছিলাম, পরিস্থিতি ঠিক তেমনি আছে। পরিকল্পটি যে নিখুঁত এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তাছাড়া এটি খুব তাড়াতাড়ি রূপায়িত করা যাবে বলে আমার স্থির বিশ্বাস। বহু লোকের এতে চাকরি-বাকরির পথ খুলে যাবে, এ বিশ্বাসও আমার আছে। এবং পরিশেষে, আমিও দেখে যেতে চাই যে বাংলার জন্য স্থায়ী কিছু আমি করে যেতে পারলাম। সেজন্য এই সবগুলি তোমাকে আমি বিবেচনা করে দেখতে অনুরোধ করছি এবং যে-সব বাধার সম্মুখীন আমরা হচ্ছি, সেগুলিও তুমি দূর করে দাও। যে মানুষটি এই পরিকল্পের প্রস্তাব করেছে, সে সৎ এবং এটা খাড়া করার জন্য বিশেষ

যত্ন নিয়েছে, এটা যখন বুঝেছো, তখন এ কাজ তোমার করে দেওয়া উচিত। আমরা, আর যাই হোক, এজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ঋণ চাইছি না। যেটা চাইছি সেটা হচ্ছে অনুমতি,—কারণ কোক এবং কয়লা কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণাধীন। আর তাছাড়া কেন্দ্রের সঙ্গে পরামর্শ না করে আমরা বাংলায় শিল্প উন্নয়ন করতে পারি না।

আমি জেনেছি ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসছে ৫ই মার্চ। পরশু দিন আমার দেখা হয়েছিল শ্রীধেবরভাইয়ের সঙ্গে। আমি তাঁকে বলেছি, ৫ই সকালে আমার পক্ষে বৈঠকে হাজির থাকা সম্ভব হচ্ছে না। বাজেট-অধিবেশন চলছে এবং বৈঠক যখন চলছে তখন অর্থমন্ত্রী হিসাবে আমি বাইরে যেতে পারি না। যা আমি করতে পারি সে হচ্ছে ৫ তারিখে বেলা ৩টের প্লেন ধরে দিল্লী পৌঁছতে পারি প্রায় সাতটার সময়। শ্রীধেবর বললেন, রবিবার সকালে অনেক কাজ থাকবে। যত কাজ হয় ততই ভালো। কিন্তু আমি তোমাকে রবিবার আমাকে এক ঘণ্টা সময় দিতে বলবো, দুর্গাপুর পরিকল্প ছাড়া আরও দুটি জরুরী বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই। প্রাদেশিক ব্যাপার নিয়ে তোমাকে বিব্রত করতে হচ্ছে বলে আমি দুঃখিত, কিন্তু এ ছাড়া কোনো উপায়ও নাই।

আমি এখন আগের থেকে ভালো আছি, যদিও আমার স্বভাবমতো নিজেকে চালিত করছি না; যথাসম্ভব সময়মতো চলতে চেষ্টা করছি।

গতকাল সংবিধানের সহগামী তালিকার ৩৩নং বিষয়টির পরিবর্তনের ব্যাপারে আমরা বিধানসভা ও পরিষদে প্রস্তাব পাশ করেছি। কিছু বিরোধিতা ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও পাস করতে আমাদের কোনো অসুবিধা হয় নি।

তোমার প্রীতিভাজন

বিধান

এরপরে দুজনের মধ্যে চিঠি দেওয়া-নেওয়ার পালা চলে। ১৯শে ফেব্রুয়ারি দিল্লী থেকে নেহেরু লিখলেন:

প্রিয় বিধান,

তোমার ১৮ই ফেব্রুয়ারির চিঠির জন্য ধন্যবাদ। তোমার স্বাস্থ্য যে এখন অনেক ভালো আছে এটা জেনে খুব খুশি হলাম। ৫ই মার্চ অবশ্যই তোমার

জন্য এক ঘণ্টা সময় রাখবো। ভালো হবে যদি তুমি ঐ সন্ধ্যায় আমার সঙ্গে রাতের খাওয়াটাও সেরে নাও, অর্থাৎ ডিনার।

আমি অবিলম্বে দুর্গাপুর-পরিকল্পের বিষয়ে খোঁজ খবর নিচ্ছি।

তোমার প্রীতিভাজন

জওহর

এর উত্তরে ডাঃ রায় লিখলেন ২৩শে ফেব্রুয়ারি :

প্রিয় জওহর,

তোমার চিঠি। সম্ভবত বিষয়টা তোমার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে, আমি ৫ই মার্চ দিল্লী পৌঁছচ্ছি রাত প্রায় সাড়ে সাতটার সময়। সেজন্য ঐ দিন তোমার সঙ্গে এক ঘণ্টা আমি কাটাবার সময় পাচ্ছি না। আমি তোমাকে লিখেছিলাম এক ঘণ্টা আমার জন্য রাখবার কথা ৬ তারিখে।

তোমার সঙ্গে "ডিনার"এ আমি বসতে পারবো কিনা বুঝতে পারছি না, কারণ আমার ডাক্তাররা এখনও আমার খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে ধরাকাট করবার পক্ষপাতী। অবশ্য দিল্লী যেতে এখনো পনেরো দিন সময় আছে, এর মধ্যে হয়ত আমি ব্যাপারটা চালিয়ে নিতে সক্ষম হবো। যাই হোক, যদি ঐ সন্ধ্যায় তোমার সঙ্গে ডিনার-এ না বসতে পারি তো, আমাকে ক্ষমা করো।

তোমার প্রীতিভাজন

বিধান

দিল্লী থেকে এর উত্তর এলো। নেহেরু লিখলেন ২৪ তারিখে :

প্রিয় বিধান,

তোমার ২৩শে ফেব্রুয়ারির চিঠি। বেশ বুঝতে পারছি পথশ্রমের পর আমার সঙ্গে ডিনারে বসতে আসা তোমার পক্ষে ক্লান্তিকর হবে। তোমাকে অবশ্যই চলতে হবে সহজভাবে। তুমি যখন এখানে আসবে, তখন যা তুমি ভালো বুঝবে তাই করো। তুমি বরং আমাকে টেলিফোন করে দিও। যদি না আসতে পারো আমি বুঝে নেবো। কিন্তু সে যাই হোক, আমাকে টেলিফোন করো।

আমি অবশ্যই তোমার জন্য এক ঘণ্টা রাখবো। সময়টা স্থির করা কঠিন হচ্ছে এই জন্য যে, ৬ই মার্চ কখন ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক শেষ হবে জানি না। আমি সারাদিনটাই খালি রাখছি।

তোমার প্রীতিভাজন

জওহর

পরিকল্পনা সম্পর্কে নেহরু-রায়ের ধারণা

ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো ১৯৫৫ সালের মাঝামাঝি। জনমত সুনির্দিষ্টভাবেই বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। যাঁরা পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন, তাঁদের থেকে পশ্চিমবঙ্গ সহ কয়েকটি রাজ্য সরকার ভিন্ন মত পোষণ করতে লাগলেন। ২৯শে মে প্রধানমন্ত্রী দিল্লী থেকে সমস্ত রাজ্য সরকারকেই একটি নোট পাঠালেন; এ থেকে পাঠকরা জানতে পারবেন পরিকল্পনা সম্পর্কে নেহেরুর মতামত কী ছিল। নোটের কিছু উদ্ধৃতি নিচে দেওয়া হলো।

(প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছাসহ প্রেরিত)

ডাঃ বি সি রায়,
পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী,

(পরিকল্পনা সম্পর্কে মন্তব্য)

পরিকল্পনার ক্ষেত্রে অবশ্যই শেষ কথা বলে কিছু নেই। পরিকল্পনার বিস্তৃত বিবরণে যতো তথ্য আসে, তার অদল-বদল হয়ে যাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা যখন তৈরি হয়েছিল, তখন প্রাপ্ত তথ্য ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। এখন আমাদের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজকর্মের অভিজ্ঞতাই শুধু অর্জিত হয় নি, আরও বেশি তথ্য ও পরিসংখ্যান হাতে এসেছে। তা সত্ত্বেও এই তথ্যগুলি মোটেই সুপ্রচুর নয়, এতে সময় সময় আরও তথ্য যোগ করা হচ্ছে।

এমনি করে বাড়তি তথ্য ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পরিকল্পনা হয়ে দাঁড়ায় একটি ধারাবাহিক কর্মপ্রবাহ। এর অবশ্যই একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকা উচিত। বৃহত্তর অর্থে উদ্দেশ্য হিসাবে যা বলা হয়েছে তা হচ্ছে একটি সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর এ কাজ গড়ে তোলা। সংকীর্ণ অর্থে উদ্দেশ্য হিসাবে

যা ধরা হয়েছে তা হচ্ছে—উৎপাদন বৃদ্ধি করা, জীবনধারণের মান উন্নয়ন করা এবং বেকারত্ব লাঘবের ক্রমিক চেষ্টা। আশা করা যাচ্ছে, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে—তার মানে, প্রায় দশ বা এগারো বছর পরে আমরা এই বিপুল বেকার সমস্যার মোকাবিলা করতে সমর্থ হবো এবং বাস্তবে এর শেষও হয়ত ঘটাতে পারবো।

আমাদের সামনে রাখা হয়েছে এ এক অতি উচ্চাশাসম্পন্ন লক্ষ্য বস্তু সন্দেহ নেই। কিন্তু আমরা মনে করি এ আমরা করতে পারবো, অবশ্য যদি আমরা প্রাণপণে কাজ করি আর সতর্কভাবে পরিকল্পনা করি।

পরিকল্পনা শুধু প্রকল্প, পরিকল্প এবং আশু-আরব্ধ কর্মের তালিকা তৈরি নয়। এটা এমন একটা জিনিস যা যথেষ্ট দুরূহ ও জটিল এবং জাতির বিভিন্ন কর্মধারার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতেই হবে। উৎপাদন ও ব্যবহারের মধ্যে ভারসাম্য রাখতেই হবে। আশু কর্তব্য হিসাবে সব সময় দেখতে হবে, কী ভাবে বেকার সমস্যার মোকাবিলা করা যায়। এজন্য দরকার পূর্ণ পরিসংখ্যান এবং হিসাব শুধু উৎপাদন সম্পর্কে নয়, জীবনধারণের মান উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে ওর বর্ধিত ব্যবহার সম্পর্কেও এবং সর্বোপরি বাড়তি যা চাকরি-বাকরির ব্যবস্থা হচ্ছে সে সম্পর্কেও। আপনারা দেখবেন, দুটি বিষয়ের ওপর খুব বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে। একটা হচ্ছে মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনের জন্য বড়ো বড়ো শিল্প গড়ে তোলা, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে ব্যবহার্য দ্রব্যের জন্য গ্রামীণ শিল্পগুলির ব্যাপক সম্প্রসারণ।

পরিকল্পনার কাঠামো সম্পর্কে ডাঃ রায়ের মত ছিল ভিন্ন। জুন মাসের কোনো এক সময়ে তিনি পরিকল্পনা কমিশনের কাছে যে দুইটি আলাদা নোট পেশ করেছিলেন তাতে তাঁর এই মনোভঙ্গি বিশেষভাবে ফুটে উঠেছিল। তাঁর মতে প্রারম্ভিক ভিত্তি যা থেকে দ্বিতীয় পরিকল্পনা গড়ে উঠবে, তা হবে জাতীয় সম্প্রসারণ এবং সমাজ কল্যাণ প্রকল্পের কর্মসূচীর মতো গ্রামীণ উন্নয়নের ধাচ অনুযায়ী। পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য হবে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে দেশের উন্নয়ন করা ; দ্রব্যের উৎপাদন না বাড়িয়ে আমরা ব্যবহার বাড়াতে পারি না।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময় পরিকল্পনাকারীরা ভারতকে অনুন্নত দেশ বলে অভিহিত করেছিল, কিন্তু চতুর্থ পরিকল্পনাকালে এবং তারপরে, দেশ সে অবস্থা কাটিয়ে উঠেছে এবং ভারতকে এখন উন্নয়নশীল দেশ বলেই অভিহিত করা

হয়। কিন্তু তখনকার দিনে অনুন্নত দেশ হিসাবেই বিচার করে ডাঃ রায় বলেছিলেন ঃ এই অনুন্নত দেশে কিছুটা পর্যন্ত উৎপাদন বাড়ানো যেতে পারে— কী গ্রামীণ কী শহরাঞ্চলীয় ক্ষেত্রে জনশক্তি এবং যন্ত্রশক্তি উভয়কেই কাজে লাগিয়ে। এই বাড়তি উৎপাদন স্বাভাবিকভাবেই ব্যবহারের মাত্রা বাড়াতে পারে যদি জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা বাড়িয়ে দেওয়া অর্থাৎ উৎপাদন বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে চাকরি-বাকরিও বাড়িয়ে দেওয়া যায়।

পরিকল্পনা যাতে কার্যকর হয় তার জন্য তিনি নিচের পাঁচটি বিষয় উপস্থাপিত করেছিলেন।

(ক) দেশ এবং জনগণের উন্নয়নের পরিকল্পনা এমন হওয়া উচিত যাতে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে যে পরিকল্পনা তাদেরই ভালোর জন্য করা হয়েছে। তখন তারা নিজেরাই সহযোগিতা করবে এবং বাস্তবক্ষেত্রে শ্রম ও অর্থ দিয়ে একে রূপায়িত করতে চেষ্টা করবে।

(খ) দেশের জন্য মোট যে ভারী মূলধনী দ্রব্য বা উৎপাদকের দ্রব্যের প্রয়োজন তা বরাদ্দ ধরে হিসাব করতে হবে গ্রাম উন্নয়নের পরিকল্পনার ভিত্তির উপর খাড়া করে।

(গ) ব্যবহারী দ্রব্য যে পরিমাণ উৎপাদন করতে হবে তা সে কল কারখানাতেই হোক আর গ্রামেই হোক ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেই হোক, আর সরকারী ক্ষেত্রেই হোক, অনায়াসেই নির্ধারণ করা যায়। উৎপাদনী দ্রব্য পেতে হলে ভারী শিল্প ও কারখানা উন্নয়নের জন্য ব্যবহারী দ্রব্য কমানোর বাধ্য-বাধকতা থাকা বা তার নিয়ন্ত্রণ দরকার নেই।

(ঘ) পরিকল্পনা হবে ধারাবাহিক কর্মপ্রবাহ, তাকে শুধু কয়েকটি বছরের সীমা দিয়ে বাঁধলে চলবে না। সেজন্যই বলছি, নিচে থেকে যদি শুরু করি তাহলে সংস্থান অনুযায়ী উন্নয়নের যে কোনো ধাপে তার গতির সামঞ্জস্য আমরা করে নিতে পারবো।

(ঙ) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিকল্প থেকে বোঝা যাবে যে, এই সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারী শিল্পের উন্নয়ন এবং বৃহদায়তন কলকারখানা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার ব্যপারে বিশেষ সচেতন আছে। এ বিষয়ে দুটি কথা মনে রাখতে হবে। ভারী শিল্প স্থাপনা জনগণের প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে করা দরকার। দ্বিতীয়তঃ গণতান্ত্রিক দেশে ট্যাক্স প্রবর্তনের প্রস্তাব

এমনভাবে করা উচিত, যাতে প্রস্তাবের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত যারা তাদের বেশির ভাগ লোকই যেন বিনা আপত্তিতে সম্মতি দান করেন।

এ ছাড়া অন্য একটি নোটে ডাঃ রায় দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাঠামোর তীব্র সমালোচনা করেন। পরিকল্পনার খসড়ায় মূল যে সব সুপারিশ ছিল তা বিশ্লেষণ করে ডাঃ রায় বলেন, এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে এইসব হিসাব-টিসাবের পুরো রীতিটা হচ্ছে ঘোড়ার সামনে গাড়ি খাড়া করবার উদাহরণ। সাধ্য অনুযায়ী আমাদের লক্ষ্যের মান স্থির করা উচিত—লিপ্সা অনুযায়ী নয়।

ডাঃ রায়ের জীবনী

দক্ষিণ ভারতীয় খ্রীষ্টান কে পি টমাস, হোমা নামে যিনি হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড কাগজে ব্যঙ্গকৌতুক লিখতেন, তিনি ছিলেন ডাঃ রায়ের বন্ধু। সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন তিনি ডাঃ রায়ের সঙ্গে দেশের সমস্যা-টমস্যা নিয়ে কয়েক ঘণ্টা ধরে আলাপ আলোচনা করতে আসতেন। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি অতুল্য ঘোষ টমাসকে ডাঃ রায়ের একটি জীবনী লিখতে বলেন। এ বছর ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবসে একটি বিশেষ বৈঠকে কংগ্রেস থেকে ডাঃ রায়কে ঐ জীবনী উপহার দেওয়ার কথা হয়।

এটা লিখতে গেলে প্রতি পদে ডাঃ রায়ের সাহায্য দরকার। অনেক দ্বিধার পর শেষ পর্যন্ত ডাঃ রায় হোমাকে সময় দিয়ে তথ্য দিয়ে সাহায্য করতে রাজী হয়েছিলেন। তাঁর কোনো দিনপঞ্জী বা অ্যালবাম ছিল না। হোমাকে তিনি প্রশ্নাবলী তৈরি করে নিয়ে আসতে বললেন। হোমার প্রশ্নাবলী অবশ্য ডাঃ রায়ের জীবনের দিকই স্পর্শ করেছিল। তাঁর বাল্যজীবন, ছাত্রজীবন, চিকিৎসক হিসাবে তাঁর পেশা, রাজনীতিতে প্রবেশ এবং শেষ পর্যন্ত প্রথম শ্রেণীর রাজনীতিজ্ঞে তাঁর পরিণতি, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রিত্ব এবং তাঁর নেতৃত্বে দেশের অগ্রগতি, এ সবই ছিল ঐ জীবনীটির উপজীব্য বিষয়। ডাঃ রায় আমাকে ডেকে হোমার প্রশ্নের উত্তর যা হবে, তার ডিকটেশন দিতেন মুখে মুখে।

যাই হোক, বইটি যথা সময়ে সমাপ্ত হয়ে ছেপে বেরুলো ১৫ই আগষ্ট। রাজ্যপালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক বিশেষ সভায় প্রায় চার হাজার

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে লেখক

লোকের উপস্থিতিতে ঐ বই তাঁর হাতে দেওয়া হলো। সেদিন খুব হাসি-তামাশায় মুখর ছিলেন ডাঃ রায়। তাঁর ভাষণ শেষ করে আসনে গিয়ে বসেও আবার উঠে এলেন। মাইকের সামনে এসে বললেন, রাজ্যপাল আমাকে বার বার উল্লেখ করছেন মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী বলে। এটা শুনে আমার মনে পড়লো একটি পরিবারের দুটি ছোট ছেলেমেয়ের কথা। ছোটটি, সেটি—ছেলে, তার দিদিকে জিজ্ঞাসা করলো, হ্যাঁরে দিদি, বিধানসভার নাম হয়েছে কি ডাক্তার বিধান রায়ের নামে? দিদি বললো, হ্যাঁ। কারণ ডাঃ রায় খুব শিক্ষিত মানুষ। শুনে ছেলেটি বললো, অবাক কাণ্ড তাহলে। ডাঃ রায়ের কথা হলে মা কেন সব সময় বলে, মূর্খমন্ত্রী? দিদি বললে, নারে, মা বলে মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু ছেলেটি তা মেনে নেবে কেন? সে যে নিজের কানে শুনেছে মূর্খমন্ত্রী। ডাঃ রায়ের বলার ভঙ্গিতে সভাশুদ্ধ লোক হেসে গড়িয়ে পড়েছিল।

এ কথা বলতে গিয়ে মনে পড়ে গেল হায়দরাবাদের কথা। সেখানে তিনি গিয়েছিলেন সর্বভারতীয় মেডিক্যাল কাউন্সিলের বৈঠকে যোগ দিতে। তাঁর সম্মানে টাউন হলে বিরাট এক সভার আয়োজন করা হয়েছিল। ওঁকে বলা হয়েছিল ওঁর চিকিৎসক-জীবনের কিছু অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে। ডাঃ রায় মুখে মুখে এক ঘণ্টা ধরে দীর্ঘ ভাষণ দিয়েছিলেন। সে ভাষণ তিনি শেষ করেছিলেন এইভাবে:

লণ্ডনের উপকণ্ঠে একবার একদল পথচারী পিস্তল দেখিয়ে একটি যাত্রিবাহী বাস থামিয়ে দিয়েছিল। একজনে বাসে উঠে প্রত্যেক যাত্রীর কাছে গিয়ে ভয় দেখিয়ে তাদের টাকার ব্যাগটি হাতিয়ে নিচ্ছিল। সবার কাছ থেকে এইভাবে টাকা আদায় করে সে বাসের শেষের আসনে বসা এক বুড়ো মানুষের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। বুড়ো তার ব্যাগ ওর হাতে তুলে দিতে দিতে একটু হেসে বললে, দেখ ছোকরা, তোমার বিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছি। আমি ডাক্তার। আমরা ডাক্তাররা মানুষের টাকা আর জীবন দুই-ই নিয়ে থাকি।

সভাশুদ্ধ লোক এখানেও হাসিতে ফেটে পড়েছিল।

ক্রীড়া বিল এবং কলকাতার জন্য স্টেডিয়াম

কলকাতা ময়দানে ফুটবলের মরশুম ছোট অথবা বড়ো রকমের কোনো হিংসাত্মক ঘটনা না হলে শেষই হতো না। ফুটবল অথবা ক্রিকেটের বড়ো-সড়ো

ম্যাচ দেখতে যত লোক চাইতো তাদের সংকুলান হবার মতো কলকাতায় কোনো স্টেডিয়াম ছিল না। ফুটবলের মরশুমে শান্তিশৃঙ্খলার বজায় রাখা সমস্যাই হয়ে দাড়িয়েছিল। এ সব ভেবেই ২৪শে আগস্ট ডাঃ রায় আনলেন কলকাতা খেলাধুলা বিল। বিলে তিনটি বোর্ড গঠন করার প্রস্তাব ছিল। সাধারণ খবরদারি করার জন্য মাথার ওপর থাকবে স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন। স্পোর্টস কনট্রোল কমিটি থাকবে খেলাধুলা ও বিভিন্ন ক্রীড়ার সংগঠনের জন্য আর স্পোর্টস বোর্ড থাকবে অ্যাসোসিয়েশনের সম্পত্তি ও টাকাকড়ির দায়িত্বে। এদের ঋণ নেওয়ারও ক্ষমতা থাকবে, তবে সেটা করতে হবে সরকারের সম্মতি নিয়ে।

১,২৫,০০০ লোক যাতে ধরতে পারে এমন স্টেডিয়াম হবে কলকাতায় আর তা তৈরি করতে খরচ পড়বে আনুমানিক ৫০ লক্ষ টাকা। স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন এবং স্পোর্টস কমিটির করণীয় সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ডাঃ রায় বললেন—এরা খেলাধুলা প্রভৃতির উন্নতি করবে, খেলোয়াড় তৈরি করবে, সাব কমিটি গঠন করবে, যারা চলতি অ্যাসোসিয়েশন এবং বিশেষ বিশেষ খেলাধুলার ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণে হস্তক্ষেপ না করেও অ-খেলোয়াড়-সুলভ আচরণের মোকাবিলা করবে।

রাজ্যের দ্বিতীয় পরিকল্পনার খসড়া ও পরিকল্পনা কমিশন

১৯শে সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গের সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক দল সঙ্গে করে ডাঃ রায় দিল্লী গেলেন পরিকল্পনার খসড়া যাতে গৃহীত হয় সেজন্য বৈঠকে বসতে। মোট ব্যয়বরাদ্দের পরিমাণ ধরা হয়েছিল ৩২২.৮ কোটি টাকা। প্রথম পরিকল্পনা সম্পর্কে ডাঃ রায় যে হিসাব দিলেন তাতে দেখা গেল পরিকল্পনার লক্ষ্যের শতকরা ৯৮ ভাগ অর্থেরই সদ্ব্যবহার করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার খসড়ায় ডাঃ রায় অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন কংসাবতী প্রকল্পকে। এতে মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলা খাদ্যশস্যে উদ্বৃত্ত হয়ে দাঁড়াবে। পরবর্তী বিষয় ছিল উত্তর লবণ হ্রদ এলাকার পুনরুদ্ধার পরিকল্প—মধ্যবিত্ত বাঙালীর গৃহ সমস্যার সমাধানের জন্য। আর দক্ষিণ লবণ হ্রদ এলাকার পরিকল্প হচ্ছে কলকাতার জল সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য। এ ছাড়া জাতীয় সম্প্রসারণ এবং সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য আরও বেশি ব্যয়বরাদ্দের

ব্যবস্থা ছিল। পরিকল্পনার খসড়ায় ব্যয়বরাদ্দ ছিল এই রকম (কোটি টাকার হিসবে):

কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন··· ··· ··· ···	৪২.৩৪
সমাজ উন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ প্রকল্প ··· ···	২৬.৪৫
সেচ ও বিদ্যুৎ শিল্প ··· ··· ··· ···	৭২.৭০
শিল্প ··· ··· ··· ···	২৯.০৯
পরিবহণ ··· ··· ··· ···	৩৫.২৭
শিক্ষা ··· ··· ··· ···	১৮.৭১
চিকিৎসা-সক্রান্ত বিষয়··· ··· ·· ···	১৩.০৯
জনস্বাস্থ্য ··· ··· ··· ···	১৬.৫৩
গৃহ ··· ·· ··· ··	২৮.৭২

পরিকল্পনার আওতায় রাজ্যের আশা ছিল তিন লক্ষ চাকরি সৃষ্টি করার। পরিকল্পনার বছরগুলিতে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকার ওপরকার মানের ছাত্রসংখ্যা বেরুবার কথা প্রায় ১.৪০ লক্ষ। এই পরিপ্রেক্ষিতেই রাজ্যের পরিকল্পনায় এক লক্ষ শিক্ষিত বেকারের চাকরির প্রতিশ্রুতি ছিল।

পশ্চিমবঙ্গের পরিকল্পনার টাকার মধ্যে ৫৭ কোটি টাকা বড়ো বড়ো পরিকল্প যেমন গঙ্গা ব্যারেজ, দুর্গাপুর প্রকল্প, লবণ হ্রদ উন্নয়ন এবং পয়ঃপ্রণালীজনিত গ্যাসের পরিকল্পের জন্য ধরা হয়েছিল। এটা বাদ দিয়ে টাকার অঙ্ক দাঁড়ায় ২৬৫ কোটি। এর মধ্যে পরিকল্পনা কমিশন আপাতত রাজী হয়ে গেলেন মাত্র ১৬১.৪ কোটি দিতে।

বৈঠক থেকে বেরিয়ে এসে ডাঃ রায় অপেক্ষমান সাংবাদিকদের বললেন, খুব নিরাশ হই নি, কারণ রাজ্য সরকারের ক্ষমতা রইলো বাকি সংস্থানটুকু সংগ্রহ করার। সেগুলি সংগ্রহ করে পরিকল্পনা-মাফিক কাজ করা যাবে।

তৃতীয় ইস্পাত কারখানার স্থান দুর্গাপুরে

দেশের তৃতীয় কারখানাটি কোথায় হবে এ নিয়ে বিহারে সিন্ধ্রি আর পশ্চিম বঙ্গের দুর্গাপুর নিয়ে দীর্ঘ দিন ধরে টানাপোড়েন চলছিল। শেষ পর্যন্ত দুর্গাপুরের সপক্ষেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। ব্রিটিশ ইস্পাত মিশন এক বাক্যে দুর্গাপুরকেই

পছন্দ করলেন। কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রদত্ত তাদের রিপোর্টের এই কথাটা কেন্দ্রীয় লোহা ও ইস্পাত মন্ত্রী টি টি কৃষ্ণমাচারী জানিয়ে দিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে। এই অতিকায় কারখানাটির জায়গা বাছা নির্ভর করছিল যতটা অর্থনৈতিক বিবেচনা ও তার সম্ভাব্যতার ওপর—ততটা ব্যক্তিগত প্রভাব প্রতিপত্তির ওপরে নয়। এটা বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ শ্রীকৃষ্ণ সিংহ বা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ব্যাক্তিগত সম্মানের প্রশ্ন নয়—এটা ছিল স্থান নির্বাচনের যৌক্তিকতার ওপর নির্ভরশীল। সব দিক বিচার বিবেচনা করে সব রকম সুযোগ-সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখেই পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরকে বেছে নিয়েছিলেন বিশেষজ্ঞরা। এ নিয়ে টি টি কৃষ্ণমাচারীর সঙ্গে ডাঃ রায়ের কিছু চিঠির আদান-প্রদান হয়েছিল, কিন্তু বাহুল্য বোধে সেগুলি এখানে আর উদ্ধৃত করলাম না। মোটকথা, ডাঃ রায় দুর্গাপুরের সপক্ষে যে সারগর্ভ যুক্তি দিয়েছিলেন তা উপেক্ষা করা যায় নি। দুর্গাপুরে কোকচুল্লীর আগেই তৈরি করে ডাঃ রায় দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তাই ওখানে শিল্প নগরী গড়ে উঠেছিল বলেই তৃতীয় ইস্পাত কারখানা গড়ে ওঠবার সুযোগ পেলো। বিহারের সুযোগ ছিলো না— যদিও কয়লা যোগানোর ব্যাপারে বিহারের যুক্তি ছিল জোরালো। যাই হোক, কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত যেদিন নেওয়া হলো সেদিনটি ছিল শুক্রবার। সন্ধ্যায় অতুল্য ঘোষের ১৯ ক্যানিং রোডের বাড়ি একেবারে জমজমাট। একটা পার্টিই দেওয়া হয়েছিল সেদিন। পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসের সংসদ সদস্যরা সেদিন খুব খুশি মনেই পার্টিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। দিল্লীতে অতুল্য বাবুর তদ্বির-তদারকও ছিল লক্ষ্যণীয়।

রাজ্য পুনর্গঠনের সংশ্লিষ্ট কমিশনের সুপারিশ

দীর্ঘ অপেক্ষার পর রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের ৩০০ পৃষ্ঠা সম্বলিত রিপোর্টটি ৩০শে সেপ্টেম্বর কমিশনের সভাপতি ফজল আলী, কে এম পানিকর এবং পণ্ডিতজী সই করলেন। আধঘণ্টা পরে রিপোর্টটির দুটি কপি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা রুদ্ধনিশ্বাসে অপেক্ষা করছিল কমিশনের রায় শোনবার জন্য। সপ্তাহখানিকের মধ্যেই রিপোর্টটা মুখ্যমন্ত্রীর অফিসে এসে পৌঁছলো। কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের ভূভাগ সামান্য কিছু বাড়লো। বিহারের মানভূম জেলার কিছু অংশ পাওয়া গেল।

উত্তর-বঙ্গের সঙ্গে সংযোগ থাকবার জন্য পুর্ণিয়া জেলার কিছু অংশ পশ্চিমবঙ্গে দেবার প্রস্তাবও ঐ সঙ্গে ছিল।

কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছিল, দেশবিভাগ পশ্চিমবঙ্গে নানান সমস্যার সৃষ্টি করেছে। পাকিস্তান থেকে আগত ৩½ মিলিয়ন (৩৫ লক্ষ) উদ্বাস্তুই শুধু নয়, বাংলার সম্পূর্ণ সংযোগ ব্যবস্থাই ১৯৪৭ সাল থেকে ভাঙনের মুখে পড়েছে। উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে সংযোগ ব্যবস্থা যতখানি সন্তোষজনক হওয়া উচিত ছিল ততখানি ছিল না। সংযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য যে সব প্রস্তাব করা হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের ফরাক্কায় গঙ্গার ওপর একটি জলাধার এবং রেলপথ ও মোটর পথ যুক্ত সেতু নির্মাণ। আরেকটি প্রস্তাব হচ্ছে আসামের ধুবড়ী থেকে আলিপুরদুয়ার হয়ে শিলিগুড়ি পর্যন্ত একটি নতুন রেলপথ খোলা। পরিবহণের পরিপূরক ব্যবস্থা হিসাবে জাতীয় সড়কের অংশ হিসাবে দুটি সংযোগ রক্ষাকারী পথ পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত এলাকায় এক বছরের মধ্যেই তৈরি করতে হবে। (এটা করা হয়েছে)।

কমিশন সব কিছু খুঁটিয়ে দেখে পশ্চিমবঙ্গে বিহারের নিম্নলিখিত অংশ দেবার সুপারিশ করেছেন :

(১) মহানন্দা নদীর পুব দিকে কিষণগঞ্জ মহকুমার অংশ,

(২) উপরোক্ত অংশের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত গোপালপুর থানার একটি অংশ বিহার থেকে এই থানার জাতীয় সড়ক পর্যন্ত বিস্তৃত।

পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের মধ্যে সীমানাগত যে মতদ্বৈধতা, সে সম্পর্কে কমিশনের সিদ্ধান্ত হলো এই :

আমরা পুর্ণিয়া জেলার যে অংশের প্রতি পশ্চিমবঙ্গের দাবি ছিল, তার সবটুকুতেই সম্মতি দান করেছি, শুধু চাস থানা বাদে ; তাছাড়া পুর্ণিয়া জেলার মহানন্দার পুর্বতীরে কিছুটা ভূভাগের যে দাবি ছিল পশ্চিমবঙ্গের, তাও স্বীকার করে নিয়েছি।

এইসব সুপারিশের ফলে পশ্চিমবঙ্গের এলাকা দাঁড়ালো ৩৪,৫৯০ বর্গ-মাইল।

রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশ কাগজে বেরুলো ১০ই অক্টোবর এবং তা রাজনৈতিক মহলে নৈরাশ্যেরই সঞ্চার করলো। রাজ্যসরকার এবং প্রদেশ কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গের সীমানা বাড়ানোর জন্য সুপ্রচুর কাগজ পত্রের মাধ্যমে

যে সব দাবি পেশ করেছিল, তা সম্পূর্ণ গ্রহণ করা হয় নি। মন্ত্রিসভার বৈঠক বসলো—ব্যাপারটা বিচার বিশ্লেষণ করে দেখবার জন্য এবং সিদ্ধান্ত হলো এই যে, বিষয়টা বিধানসভার আওতায় নিয়ে যাওয়া হবে ও বিপুল জনমত সৃষ্টি করতে হবে। আশা করা গিয়েছিল এতে করে মুখ্যমন্ত্রীরই হাত শক্ত করা হবে এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রীর ওপরে তাঁর যে প্রভাব আছে, তার ফলে পশ্চিমবঙ্গের দাবির সপক্ষে কমিশনের সুপারিশগুলির সন্তোষজনক অদল বদল করার সুযোগ পাওয়া যাবে। মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনের মাথা হিসাবে প্রকাশ্যে এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামতে পারেন না, তাই সে কাজটার ভার রইলো কংগ্রেস সংগঠনের ওপর। যেটা তিনি করতে পারবেন সেটা হলো পশ্চিমবঙ্গ এ ব্যাপারে যা চায়, সেটা প্রাঞ্জল করে বোঝাবেন ও তার সপক্ষে যুক্তি দেবেন বিধানসভায়, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। প্রকৃত প্রস্তাবে পরবর্তী কয়েক মাস ধরে ডাঃ রায় সেই কাজই প্রাণপণে করে গেছেন।

প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক কোনার বাঁধ-এর উদ্বোধন

দামোদর উপত্যকা করপোরেশন (ডি ভি সি)-এর উন্নয়নমূলক প্রথম কর্মসূচিতে ছিল চারটি বাঁধ নির্মাণ করার কথা। তার মধ্যে দ্বিতীয়টি হচ্ছে কোনার বাঁধ দশ কোটি টাকা ব্যয়ে আড়াই মাইল লম্বা মাটি ও কংক্রিটে তৈরি। এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন উৎসবে যোগ দিতে পণ্ডিত নেহেরুর বিহারে আসবার কথা অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে। এর আগেই ডাঃ রায় তাঁকে চিঠি লিখে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন বিহার থেকে দুর্গাপুর এসে তাঁর প্রিয় দুর্গাপুর কোক চুল্লীর কারখানা আর দুর্গাপুর ইস্পাতের কারখানা পরিদর্শন করে যেতে। নেহেরুজী তাঁর আমন্ত্রণ গ্রহণও করেছিলেন। সেই মতো ডাঃ রায় ১৫ তারিখ সকালবেলা ট্রেনে করে গয়ায় পৌঁছলেন, আর তার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ প্লেনখানা এসে উপস্থিত হলো। দুজনে একসঙ্গেই চললেন কোনার বাঁধ-এর জায়গায়। দামোদর যেখানে কোনার নদীতে এসে মিশেছে তার প্রায় ২৩ মাইল ওপরে তৈরি হয়েছে কোনার বাঁধ। এর ফলে নিচুর দিকে স্থায়ী সেচ ব্যবস্থায় সুবিধা হবে, জলাধার থেকে তৈরি হবে জল-বিদ্যুৎ, আর বোকারোর বিদ্যুৎকেন্দ্রে ৪০০ কিউসেক ঠাণ্ডা জল সরবরাহ করা চলবে। এ

ছাড়া হয়েছে দশ বর্গমাইল জুড়ে এক বিশাল হ্রদের সৃষ্টি, দেশের উন্নয়নের পক্ষে এ এক বিরাট পদক্ষেপ সন্দেহ নেই।

অনুষ্ঠান শেষ হলো—ডাঃ রায় প্রধানমন্ত্রীকে দুর্গাপুরে নিয়ে গিয়ে তাঁর বৃহৎ প্রকল্পের দুটি মডেল দেখালেন, কোকচুল্লীর আর ইস্পাত কারখানার। তারপরে দুজনে মিলে ঐ প্রকল্পের সম্পর্কেই আলাপ আলোচনা করতে লাগলেন নিবিষ্ট মনে।

বুলগানিন ও ক্রুশ্চেভের সফর

রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী বুলগানিন এবং সোভিয়েট কমিউনিষ্ট পার্টির ফার্ষ্ট সেক্রেটারি নিকিতা ক্রুশ্চেভ ভারত ভ্রমণে আসছেন। তাঁদের যথাযোগ্য সম্বর্ধনা জানানোর জন্য দিল্লী, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গও সমানভাবে তৈরি হচ্ছিল। ১৮ নভেম্বর শুক্রবার এঁরা এসে নামলেন ভারতের মাটিতে সবার আগে দিল্লীতে। পালাম বিমান বন্দর থেকে রাষ্ট্রপতি ভবন পর্যন্ত লোক পথের দুধারে দাঁড়িয়ে তাঁদের স্বাগত জানালো।

রাশিয়ার নেতৃদ্বয়ের পশ্চিমবঙ্গ ভ্রমণের এক সপ্তাহ আগে থেকে প্রতিদিন মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে কয়েকজন মন্ত্রী ও অধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক বসতো তাঁদের উপযুক্ত অভ্যর্থনার ব্যবস্থা সম্পর্কিত পরিকল্পনা নিয়ে। বিমান বন্দরে তাঁদের অভ্যর্থনা, দমদম থেকে রাজভবনে তাঁদের নিয়ে আসা, বটানিক্যাল গার্ডেনে তাঁদের ভ্রমণ, ময়দানের ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে জনসভা, রাজভবনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি খুটিনাটি ব্যাপার নিয়েও মুখ্যমন্ত্রী নিজে মাথা ঘামিয়েছিলেন। বিভিন্ন মন্ত্রীদের মাথায় রেখে ও বিভাগীয় প্রধানদের নিয়ে অনেকগুলি সাব কমিটিও করা হয়েছিল এজন্য।

দিল্লী মাদ্রাজ প্রভৃতি জায়গায় নেতৃবৃন্দের সম্বর্ধনায় যে উৎসাহ ও আতিশয্য দেখানো হয়েছিল, তার ফলে রাজ্য সরকারের কাজ আরও দুরূহ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কারণ আকারে প্রকারে পশ্চিমবঙ্গই সব রাজ্যকে টেক্কা মারবে বলে আশা করা যাচ্ছিল। অবশেষে এসে পড়লো সেই দিনটি : ২৯শে নভেম্বর মঙ্গলবার বেলা দুটো। বুলগানিন, ক্রুশ্চেভ ও তাঁর দলকে নিয়ে ইলিউশিন জেট প্লেন এসে দাঁড়ালো দমদম বিমান বন্দরে। রাশিয়ার নেতৃবৃন্দ যখন রবীন্দ্রনাথের দেশের মাটিতে পা দিলেন, তখন বন্দরের সংরক্ষিত এলাকার বাইরে দাঁড়ানো অসংখ্য

মানুষ একসঙ্গে আনন্দে চিৎকার করে তাঁদের সম্বর্ধনা জানালেন। রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের মালা পরিয়ে বিশেষভাবে নির্মিত মঞ্চে তাঁদের নিয়ে গেলেন। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী দিলেন স্বাগত ভাষণ। উত্তরে রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী বললেন, বাংলার মাটিতে এসে দাঁড়ানো খুবই আনন্দের বিষয়, কারণ ভারতের মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে বাংলা নিয়েছিল একটি বিশিষ্ট ভূমিকা। তাছাড়া ভারতের আর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নেও বাংলার অবদান কম নয়।

ভারতের রাজধানী দিল্লীতে ওঁদের স্বাগত জানাতে যদি দশ লক্ষ লোক ভীড় করে এসে থাকে, তাহলে কলকাতায় দমদম থেকে রাজভবন এই সাড়ে সাত মাইল লম্বা রাস্তায় লোক এসেছিল ঐ সংখ্যার দ্বিগুণ। যে বৃহৎ সম্বর্ধনা কলকাতার জনগণ এঁদের দিয়েছিল, অন্য সব শহরের কার্যকলাপ তার তুলনায় একেবারে ম্লান। একটি খোলা মারসিডিজ বেনজ গাড়ির পিছনের আসনের এক দিকে গলাবন্ধ কোট পরে বসেছিলেন ডাঃ রায়। গাড়িটি এই উপলক্ষ্যে আগাগোড়া লাল রঙ করে দেওয়া হয়েছিল। আর ডাঃ রায়ের সামনে নেতা দুইজন দাঁড়িয়েছিলেন, যাতে পথের দুধারের অগণিত দর্শক তাঁদের ভালো করে দেখতে পায়। তারা ওঁদের দেখছিল আর গোলাপের পাপড়ি ও ফুল দিয়ে অভিষিক্ত করছিল। গাড়িটা যখন চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ দিয়ে যাচ্ছিল, তখন মাঝপথে ভীড়ের চাপে গাড়িটা ভেঙে পড়ে। গাড়িটা থামতেই ভীড় ঠেলে লোকজন এগিয়ে আসে ওদের সঙ্গে করমর্দন করবার জন্য। মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে এছিল বিশেষ উৎকণ্ঠার কারণ। তিনি সঙ্গে সঙ্গে নেমে এসে মান্য অতিথি দুজনকে নিয়ে পিছনের পুলিশ ভ্যানে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন। চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ থেকে রাজভবন পর্যন্ত বাকি পথটুকু তাঁরা রইলেন দর্শকের চোখের আড়ালে, কারণ খালি গাড়িতে করে ওঁদের নিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি আর সমীচীন বোধ করা হলো না। একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন নেতৃদ্বয় কিন্তু পরে রাত্রিবেলা আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে শুনেছিলাম তাঁরা এমনিতে খুব খুশি ছিলেন, কারণ পশ্চিমবঙ্গে তাঁরা যে গণ সম্বর্ধনা লাভ করলেন, তা পৃথিবীর কোনো দেশের অতিথিই এ পর্যন্ত পান নি। রাশিয়ানরা সাধারণভাবে ভালো খাইয়ে, তাঁরা বা তাঁদের সঙ্গের লোকজন যে পরিমাণ খাবার খেলেন, তা পরিবেশনকারীদের যে বিস্ময়ের উদ্রেক করেছিল, এটা না বললে সত্যের

অপলাপ করা হবে। বুলগানিন ও ক্রুশ্চেভের জন্য যে বিশেষ ধরনের খাবার করা হয়েছিল তা'র প্রতি সুবিচার করতে তাঁরা দ্বিধা করেন নি। আমিও সে রাত্রে রাজভবনের পাশের একটি ঘরে বসে সে সব খাদ্যের সদ্ব্যবহার করবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হই নি।

পরের দিন বুলগানিন ও ক্রুশ্চেভকে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে গণসম্বর্ধনা জানানো হলো। নেহেরু এলেন দিল্লী থেকে এসভায় সভাপতিত্ব করতে। তিনি নিজেই অতিথিদের নিয়ে এলেন রাজভবন থেকে বক্তৃতা মঞ্চে। এই সময় রাজ্য সরকার আরও বেশি সতর্ক ছিলেন। রাজভবন থেকে বক্তৃতা-মঞ্চ পর্যন্ত অশ্বারোহী পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল, জনগণও ছিল যথেষ্ট শৃঙ্খলাবদ্ধ। এ ঘটনার আগে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউতে গাড়ি ভেঙে পড়ার ঘটনায় নেহেরু একটু বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন, কলকাতায় পা দিয়েই মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করেছিলেন তিনি। সভা আরম্ভের ঠিক পনেরো মিনিট আগে বেলা আড়াইটের সময় বক্তৃতা-মঞ্চর কাছে ভি আই পি গাড়িটি এসে থামলো। গাড়ি থেকে নামলেন নেহেরু, বুলগানিন ও ক্রুশ্চেভ। গোলাকার এবং শিল্পসম্মত বক্তৃতা মঞ্চের ওপরে মান্য অতিথিদের নিজেই নিয়ে গেলেন নেহেরু। তারপরে সিঁড়ি বেয়ে মঞ্চে উঠলেন একে একে রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য বিশিষ্ট রাশিয়ার ব্যক্তিবর্গ; তাঁদের মধ্যে একজন মহিলা মন্ত্রীও ছিলেন; এঁদের খানিকটা পিছনেই ছিলাম আমি। এঁরা যখন বিশাল জনসমুদ্রের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছিলেন, তখন অপার বিস্ময়ের রেখা ফুটে উঠেছিল তাঁর মুখাবয়বে। জনসংখ্যার অনুমান করা হয়েছিল বিশ লক্ষ। মহিলা মন্ত্রীটি তো বিস্ময়ে একেবারে হতবাক! নেহেরু বর্ণনা করলেন, এতো বড়ো সভা ভারতে আর কোথাও হয় নি। তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ ভাষণে দর্শকদের তুষ্ট করেছিলেন সন্দেহ নেই—ঘন ঘন হাততালি তার প্রমাণ। ভাষণ শেষ করে নেহেরু রাশিয়ার নেতৃদ্বয়কে কিছু বলতে আহ্বান করলেন। ভেবেছিলাম ক্রুশ্চেভের আগে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে বুলগানিনই প্রথম ভাষণ দেবেন। কিন্তু তা নয়, ক্রুশ্চেভই উঠলেন সবার আগে। সম্ভবত কম্যুনিস্ট দেশে পার্টির এক নম্বর ব্যক্তিটি দেশের প্রধানমন্ত্রীর থেকেও বেশি ক্ষমতা ধরেন এবং তার মর্যাদাও বেশি।

মহানগরীর এই বিপুল সম্বর্ধনার পর ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে বুলগানিন ও ক্রুশ্চেভ কলকাতাকে বিদায় জানিয়ে রেঙ্গুনে চলে গেলেন একটি বিশেষ রাশিয়ান প্লেনে।

নেতাজীর মহাপ্রয়াণ সম্পর্কে তদন্ত

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মহাপ্রয়াণকে কেন্দ্র করে যে রহস্যের জাল বিস্তৃত হয়েছে, তা ভেদ করবার জন্য একটি ভারতীয় দল জাপানে পাঠানোর প্রস্তাব সম্পর্কে ডাঃ রায়ের মতামত জানতে চেয়ে তাঁকে নেহেরুজী একখানি চিঠি লেখেন দিল্লীতে ১১ই নভেম্বর তারিখে।

প্রিয় বিধান,

সুভাষ বসুর দেহভস্ম এখন টোকিওর মন্দিরে রয়েছে বলে যে কথা শোনা যায়, সে সম্পর্কে আমি তোমাকে কয়েকদিন আগে একটি চিঠি দিয়েছিলাম; আমি তোমার পরামর্শ চেয়েছিলাম যে, এ বিষয়ে আমাদের কী করা উচিত, আর তাঁর পরিবারের সঙ্গেই বা কীভাবে এ সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করা উচিত।

টোকিওতে আমাদের রাষ্ট্রদূত হচ্ছেন বি আর সেন। তিনি এখন এখানে। গতকাল তাঁর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তাঁর পরামর্শ হচ্ছে, খুব ভালো হয় যদি বিভিন্ন বিষয়ের তদন্ত করবার জন্য আমরা ছোট একটি দল জাপানে পাঠাই। স্বভাবতই এটা তাঁরা করতে পারেন জাপান সরকারের সক্রিয় সহায়তা নিয়ে। বি আর সেন বলছেন জাপান সরকার সানন্দেই এ সাহায্যটুকু করবে। তাঁরই পরামর্শ হচ্ছে তদন্তকারী দলটিতে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি থাকতে পারেন। যেমন (১) একজন সরকারী কর্মচারী, (২) সুভাষ বসুর পরিবারের একজন লোক, (৩) একজন প্রাক্তন আজাদ হিন্দ ফৌজ বাহিনীর লোক।

শেষোক্ত শ্রেণীর জন্য তিনি উল্লেখ করেছেন সাহ্‌নওয়াজ খানের নাম। সাহ্‌নওয়াজ এখন এখানে আমাদের একজন সংসদীয় সচিব। এই পরামর্শ সম্পর্কে তোমাকে আমি একটু ভেবে দেখতে বলছি। মোট কথা জাপান সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা এবং সাক্ষ্য হিসাবে যা পাওয়া যায় তা সংগ্রহ করার জন্য ছোট একটি দলকে টোকিও পাঠানো আমিও সঙ্গত মনে করছি।

অবশ্য খুব বড়ো একটি অসুবিধা তাঁদের ভোগ করতে হবে। যেখানে দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল বলে অনুমান করা হয়, সেই ফরমোসায় তাঁরা যেতে সক্ষম হবেন না।

যাই হোক তুমি এ বিষয়ে ভেবে দেখো, যখন আমাদের দেখা হবে তখন এই নিয়ে আমরা আলোচনা করতে পারবো।

তোমার প্রীতিভাজন

জওহর

(১৩)

(১৯৫৬)

প্রথম সর্বভারতীয় ব্যাঙ্ক ধর্মঘট

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে নতুন বছরটি শুরু হয়েছিল বেআইনী সর্বভারতীয় ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের অনুজ্জ্বল অধ্যায় দিয়ে। ব্যাঙ্কের লোকেদের সব থেকে বড়ো ধর্মঘট। টাকা দেওয়া নেওয়া বন্ধ ও ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের ক্রমাগত বিক্ষোভ প্রদর্শনের ফলে ব্যাঙ্ক শিল্পে যে বিপর্যয় দেখা গেল সে বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার মাথা না ঘামিয়ে পারেন না। ৩রা জানুয়ারি মহাকরণে ডাঃ রায় ব্যাঙ্কের ম্যানেজারদের ডেকে পাঠালেন যাতে এই অচল অবস্থার অবসান ঘটানো যায়। ব্যাঙ্ক ম্যানেজারদের সঙ্গে কথা বলার পর সাংবাদিকদের তিনি পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝিয়ে দিলেন। তাঁর যুক্তির সপক্ষে তিনি একটি উদাহরণ দিলেন। একজন দাতা দান করবার জন্য তাঁকে একটি চেক দিয়েছিলেন, কিন্তু সেই টাকা তিনি বিলি করতে পারলেন না চেকটা ভাঙাতে পারলেন না বলে।

ব্যাঙ্ক হচ্ছে কেন্দ্রের আওতাভুক্ত বিষয়। যদি শ্রমিকদের কোনো অসন্তোষ কোথাও থেকে থাকে, তাহলে সে বিষয়ে বিবেচনা করতে পারে একমাত্র ব্যাঙ্ক সংগঠনগুলি যারা কাজ দিয়েছে, আর বিবেচনা করতে পারে ভারত সরকার, যারা ব্যাঙ্ক নিয়ন্ত্রিত করছে। কিন্তু রাজ্যসরকার চুপচাপ বসে থাকতে পারে না এই জন্য যে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের কার্যকলাপ জনসাধারণের ওপর দীর্ঘস্থায়ী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে। এ সম্পর্কে সরকার একটি প্রেস নোটও বার করেছিলেন। তাতে বলা হয়েছিল, এখন যখন রোয়েদাদ চালু হয়েছে, তখন চুক্তির বিরুদ্ধে ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা কোনো কার্যকলাপ হাতে নিলে তা বেআইনী বলে গণ্য হবে। রাজ্যসরকার বিক্ষোভ প্রদর্শন, হুমকি এবং যোগদানেচ্ছু কর্মচারীদের বাধা দান—এসব আর বরদাস্ত করবেন না।

কিন্তু ধর্মঘটীদের ওপর এই প্রেস নোটের প্রতিক্রিয়া হয়েছিল কতোটা? সরকারী কার্যকলাপ দূরে থাকুক, ভারতীয় কম্যুনিস্ট দল যাঁরা এই ধর্মঘট ডেকেছিলেন এবং কর্মচারীদের বড়ো অংশের প্রতিনিধিত্ব করেন বলে দাবি

করেন, তাঁরা কী কেন্দ্র কী রাজ্য, দুই সরকারকেই চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বসলেন। এই সংগ্রামে ধর্মঘটীরা, যাদের নেতৃত্ব করছিলেন সর্বভারতীয় ব্যাঙ্ক ফেডারেশনের সেক্রেটারি প্রভাত কর, ভূপেশ গুপ্ত এবং রণেন সেন, তাঁরা প্রথম পর্যায়ে জিতে গেলেন। তাঁরা প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চাইলেন এবং তা পেলেনও। মহানগরীর টাকা লেনদেনের প্রতিষ্ঠান বন্ধ রইল চতুর্থ দিনের জন্য। প্রায় ৩৬ জন সদস্যসহ এই প্রতিষ্ঠানটি সপ্তাহখানিক আগে কাজকর্ম স্থগিত রেখেছিলেন কর্মচারীদের এই অভিযোগে যে, ঘন ঘন ধর্মঘট আর উপস্থিত কর্মচারীর সংখ্যার অপ্রতুলতার জন্য তাঁরা চেক সংক্রান্ত কাজকর্ম ঠিক পেরে উঠছিলেন না। সর্বভারতীয় ব্যাঙ্ক কর্মচারী সমিতি দু-দিনের ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল কর্মচারীদের অসন্তোষকে মূর্ত করে তোলার জন্য। তাদের অসন্তোষ সম্পর্কে সমিতির ব্যাখ্যা ছিল, ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ তাদের বেতন বে-আইনীভাবে কমানোর ব্যবস্থা করেছেন।

৫ জানুয়ারি সকালে ডাঃ রায় কয়েকটি প্রধান প্রধান ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের সঙ্গে আলোচনা করলেন দিল্লী রওনা হবার আগে। এই বৈঠকের পর ডাঃ রায় অপেক্ষমান সাংবাদিকদের জানালেন, টাকা লেনদেনের প্রতিষ্ঠানটির কাজ শুরু করা যাচ্ছে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কগুলি তাদের কাছে উপস্থাপিত দৈনন্দিন চেকগুলির আদায় দিতে তৈরি হতে পারছে। কলকাতায় চেক সংক্রান্ত আদায়ের সাপ্তাহিক পরিমাণ হচ্ছে ৫০ কোটি টাকা।

কয়েক শ্রেণীর ব্যাঙ্ক কর্মচারী, সংখ্যায় এঁরা হবেন মোট কর্মচারী সংখ্যার শতকরা ৫০। এঁদের বেতন কাটার বিষয়টি এসেছে শিল্প বিরোধ (ব্যাঙ্কিং কোম্পানীজ) আইন প্রবর্তনের ফলশ্রুতিতে। এই বিরোধের সালিশী হয়ে গেছে এবং ধর্মঘট হলে (ধর্মঘট হয়েছিল) তা রোয়েদাদের সময় হবে এবং সেজন্য ধর্মঘট বে-আইনী—এই ছিল রাজ্য সরকারের ঘোষণা। ধর্মঘটী কর্মচারীদের ১৫ জন নেতাকে আটক করা হলো আটক আইন অনুযায়ী। ধর্মঘটের প্রথম দিনে শতকরা ৮০ জন কর্মচারীই কাজে আসেন নি। এ ছাড়া পরিস্থিতি শান্তিপুর্ণই ছিল। দু দিনের ধর্মঘট শেষ হলে কর্মচারীরা ৯ জানুয়ারি কাজে যোগদান করলেন তাঁদের নেতাদের প্রতি আরও বেশি আস্থা ও আনুগত্য নিয়ে। বাস্তবিক পক্ষে কম্যুনিস্ট আওতার ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের এ এক বিরাট জয়।

সাগরদ্বীপ ভ্রমণ

পশ্চিমবঙ্গই একমাত্র রাজ্য যার উত্তরে রয়েছে শুভ্র তুষারশোভিত পর্বতমালা, আর দক্ষিণে রয়েছে সুনীল সমুদ্রের তরঙ্গবেষ্টিত বারিরাশি। সাগরদ্বীপ সুন্দরবনেরই একাংশ—যে সুন্দরবন হচ্ছে সৌন্দর্যের আকর, রয়েল বেঙ্গল বাঘের লীলাভূমি, আর যেখানে কয়েক শতাব্দী ধরে মানুষের বসতি নেই। প্রতি বছর জানুয়ারি মাসে মকর সংক্রান্তির দিনে দেশের ভিন্ন প্রদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ ধর্মপ্রাণ নরনারী আসেন এই সাগরদ্বীপে, গঙ্গা ও বঙ্গোপসাগরের মোহানায় পুণ্যস্নান করে ধন্য হন। এবার মকর সংক্রান্তি পড়েছিল ১৪ জানুয়ারি শনিবার। এই উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী ওখানে যাবেন বলে স্থির করেছিলেন। তাঁর যাওয়া সাধারণ তীর্থযাত্রীর মতো পুজা আর স্নানের জন্য নয়। তিনি সারাক্ষণ ১৩ বর্গ মাইলের সাগরদ্বীপটি পর্যবেক্ষণ করে দেখবেন, এখানকার সম্ভাব্য ফসল কী এবং অন্যান্য সম্পদই বা কী কী থাকতে পারে এখানে। এখানে শহরাঞ্চল গড়ে তোলা যায় কি না, তার সম্ভাবনাও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবেন তিনি।

আর এজন্য অফিসারদের একটি দলকে বলা হলো তাঁর সঙ্গে যেতে। ডাঃ রায় গঙ্গাসাগরে যাবেন শুনে কয়েকজন দাতা এগিয়ে এলেন টাকা নিয়ে কপিল মুনির মন্দির যাতে সংস্কার করা হয় তার জন্য, আর প্রচুর ফল নিয়ে এলেন সাধু সন্ন্যাসী আর তীর্থযাত্রীদের মধ্যে যাতে বিলি করা হয় তার জন্য।

১৩ই তারিখ সকালবেলা এক সার গাড়ি বেরুলো ডাঃ রায়ের বাড়ি থেকে। তিনি ত রইলেনই, সঙ্গে রইলেন তাঁর পরিবারের লোকজন, ব্যক্তিগত কর্মচারীদের কয়েকজন, আর ভৃত্যবর্গ। দুপুরবেলা আমরা পৌছলাম ডায়মণ্ড হারবার জেটিতে। সেখান থেকে সাগরদ্বীপের দিকে যাত্রা হলো শুরু ষ্টীমারে করে। এ শুধু একক ষ্টীমারের যাত্রা নয়, যেন এক ছোটখাটো নৌবহরই সমুদ্রযাত্রা শুরু করছিল। তখনকার পুলিশের আই জি হীরেন্দ্রনাথ সরকার ছিলেন তাঁর লঞ্চে। চব্বিশ পরগণার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বিনয়রঞ্জন গুপ্ত তাঁর সহযোগী অফিসারদের নিয়ে রইলেন অন্য একটি লঞ্চে। আর একটি লঞ্চে ছিলেন সেচ বিভাগের ইঞ্জিনিয়াররা। ভারত সেবাশ্রম সংঘের স্বামী বিজয়ানন্দকে দেওয়া হয়েছিল একটি লঞ্চ, তাতে ছিলেন তিনি, আর স্তূপীকৃত কলা আর কমলালেবু। এ ছাড়া ছিল পুলিশের পাহারাদার বোটগুলো। মাঝ গঙ্গায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট

আর তাঁর অফিসাররা মুখ্যমন্ত্রীর ষ্টীমারে এসে উঠলেন সুন্দরবনের অনুন্নত এলাকার ম্যাপ ও অন্যান্য বিবরণাদি নিয়ে। ঐসব এলাকায় মিষ্টি (পানীয়) জল পাওয়া দুষ্কর। বন্যার জল এসে মাঠের ধান ভাসিয়ে নিয়ে যায়, অধিবাসীদের দুর্দশার আর সীমা পরিসীমা থাকে না। এসব নিয়ে আলোচনা চললো দু-ঘণ্টারও ওপর এবং দুর্গত এলাকার উন্নয়নের জন্য কয়েকটি প্রকল্পের বিষয়ে মোটামুটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেল। আমরা যখন সাগরদ্বীপের কাছাকাছি পৌছলাম তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। আমাদের আগে যেসব লঞ্চ ও দেশী নৌকা তীরে ভিড়ে নোঙর করেছিল, সেইরকম শত শত নৌযানের আলো সারি সারি জ্বলছিল, আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম দূর থেকে।

আমাদের দেশে অধিকাংশ লোকই যে এখনো ধর্মীয় আচরণ আঁকড়ে রয়েছে সেটা প্রত্যক্ষ করলাম পরদিন ভোরবেলা, যখন লক্ষ লক্ষ লোক সমুদ্রস্নান করতে শুরু করলো। রাত্রিটা বিশ্রাম নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর দলও গিয়ে পৌছলেন গঙ্গাসাগর মেলায়। পুরোহিতরা গঙ্গাজল ছিটিয়ে তাঁকে আশীর্বাদও করলেন। মেলায় গিয়ে তার বিধিব্যবস্থা দেখে তিনি গেলেন কপিল মুনির মন্দিরে। মন্দিরটি ভেঙে গেছে শুধু নয়, পাড় ভেঙে সমুদ্র তাকে গ্রাস করবার জন্যও উন্মুখ। ডাঃ রায় বিপজ্জনক সীমানার বাইরে নতুন একটি জায়গায় নতুন মন্দির তৈরি করবার জন্য তখুনি দশ হাজার টাকা দান করবার কথা ঘোষণা করলেন।

আমরা যেভাবে এসেছিলাম সে ভাবেই ফিরে চললাম। একটা জিনিষ আমার নজরে পড়েছিল, সেটা হচ্ছে একটা ডুবে যাওয়া জাহাজের চিমনি। কয়েক ফুট জলের ওপরে জেগে আছে চিমনিটা। শুনলাম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ওখানে একটি সওদাগরী জাহাজ ডুবে গিয়েছিল, তারই চিমনিটা মাথা তুলে অন্য সব জাহাজের কর্মচারীদের সাবধান করে দিচ্ছে, খবরদার আমার যা হয়েছে তোমাদের যেন কখনও তা না হয়। ঐদিন বিকেলেই আমরা কলকাতায় ফিরে এসেছিলাম।

রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন সংক্রান্ত নাটকীয় ঘটনা

সাগর থেকে ফেরার পরই মুখ্যমন্ত্রী শুনতে পেলেন পশ্চিমবঙ্গের সীমানার পুনর্বিন্যাস সম্পর্কে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সে সম্পর্কে নানারকম উদ্বেগজনক প্রতিবেদন। যা শোনা গেল তা

হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের দাবিদাওয়া সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়েছে। রাজ্য কংগ্রেসের কার্যকরী কমিটি সঙ্গে সঙ্গে একটি জরুরী বৈঠক ডেকে প্রতিবাদস্বরূপ একটি প্রস্তাব পাশ করলেন। কংগ্রেসের রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সাব কমিটিতে ছিলেন কংগ্রেস সভাপতি ইউ এন ধেবর, পণ্ডিত নেহেরু এবং মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। তাঁরা বঙ্গ বিহারের মতবিরোধ-সংক্রান্ত বিষয়ে বাংলা ও বিহারের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা ও পরামর্শ করেও কোনো সিদ্ধান্তে পৌছতে পারেন নি। রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন বিহার থেকে যে এলাকা দিতে বলেছিলেন, ভারত সরকার তা পরিমাণে অর্ধেক করে দিয়েছে বলে বাংলার কাগজগুলিতে খবর বেরিয়ে গেল। নৈরাশ্যব্যঞ্জক এই সব খবরের জন্যই ডাঃ রায় চার দিনের জন্য তাড়াতাড়ি দিল্লী রওনা হয়ে গেলেন। কংগ্রেসীরা বললেন, পশ্চিমবঙ্গের দাবিদাওয়া নিয়ে নেহেরুর কাছে এক্ষুনি দরবার করা দরকার। সময় একটুকুও নষ্ট করা উচিত নয়। আপনি এক্ষুনি রওনা হোন।

সেইমতো প্রদেশ কংগ্রেস প্রধান অতুল্য ঘোষকে নিয়ে তিনি দিল্লী রওনা হয়ে গেলেন ১৫ তারিখ বিকেলবেলা। এবং দিল্লী পৌছেই কংগ্রেসের রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সাব কমিটির সঙ্গে দেখা করলেন তিনি। তিনি ও অতুল্য ঘোষ প্রতিনিধিত্ব করলেন পশ্চিমবঙ্গের, আর বিহারের প্রতিনিধিত্ব করলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ শ্রীকৃষ্ণ সিংহ। প্রশ্নটি ছিল কিষণগঞ্জ মহকুমার বিহারে থেকে যাওয়া নিয়ে। অথচ কমিশনের নির্দিষ্ট সুপারিশ ছিল, এটি পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে উত্তরবঙ্গের সঙ্গে রাজ্যের বাকি অংশের সংযোগ সাধন করবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় নেতারা পশ্চিমবঙ্গের নেতাদের বললেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার এ রকম কোনো সিদ্ধান্তই নেন নি, বাংলার কাগজে যা বেরিয়েছে তা সম্পূর্ণ ভুল খবর। কিন্তু ১৫ জানুয়ারি তারিখে ঘটনা হঠাৎ অন্য রকম হয়ে গেল। বিহার দলে তাদের মুখ্যমন্ত্রী ছাড়া ছিলেন অনুগ্রহ-নারায়ণ সিংহ ও কৃষ্ণবল্লভ সহায়। ব্যাপারটা যা ঘটেছিল তা নিজের ভাষায় না বলে ডাঃ রায়ের একটি চিঠির বয়ান তুলে দেওয়া যাক। এটি তিনি লিখেছিলেন মাস দেড়েক পরে নেহেরুকে :

১৫ জানুয়ারি আমরা রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কে ভারত সরকারের প্রস্তাব নিয়ে আলাপ আলোচনা করছিলাম। শ্রীবাবু, অনুগ্রহবাবু ও কৃষ্ণবল্লভ সহায় ছিলেন সেখানে। শ্রীবাবু দুই প্রদেশের এক হয়ে যাওয়ার

প্রস্তাব দিলেন, আমিও তা মেনে নিলাম। ২৩ জানুয়ারি ওয়ার্কিং কমিটি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, এই প্রস্তাব ছিল তারই ভিত্তি। এই আট দিন বাংলার মানুষ এমন কি কংগ্রেসীরা পর্যন্ত বাংলা বিহার সম্পর্কিত এই পরিবর্তিত প্রস্তাবের ব্যাপারে বিশেষ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল।

তখনকার দিনে সবাই ধারণা করেছিল যে বাংলা বিহারের এই এক হয়ে যাওয়ার বিষয়টির উদ্ভাবক ছিলেন ডাঃ রায়। সত্যি কথা বলতে কী আমারও ছিল সেই ধারণা। কিন্তু ১লা মার্চ ডাঃ রায় যখন আমাকে একখানা চিঠির ডিকটেশন দিচ্ছিলেন, তখনই আমার ভুলটা গেল ভেঙে। ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত নেওয়া পর্যন্ত এই প্রশ্নটির ব্যাপারে খুব গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়েছিল সন্দেহ নেই।

১৬ জানুয়ারি গভীর রাত্রে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের রিপোর্ট সম্পর্কে ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হওয়াতে বোঝা গেল, কাগজে যা বেরিয়েছিল তা থেকে এতে একটি বস্তু বিশেষ তফাৎ হয়ে গেছে। বিহারের সীমান্ত এলাকা থেকে বাংলাকে যা দেবার জন্য সুপারিশ করেছিল কমিশন, তার একটি থানা এবং পুরুলিয়ার ছোট একটি এলাকা বাদে সবটাই গ্রহণ করে নিয়েছেন ভারত সরকার। আসল কথা, ডাঃ রায় রবিবার হঠাৎ দিল্লী গিয়ে পড়ায় তাঁর প্রভাবে কেন্দ্রীয় সরকার তাঁদের পূর্ব সিদ্ধান্ত বদলে ফেলেছিলেন। ভারত সরকারের ইস্তাহারে বলা হয়েছিল, বিহার থেকে যেসব এলাকা হস্তান্তর করার কথা, কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী তা থেকে মানভূমের পুরুলিয়া জেলার কিছু অংশ বাদ যাবে, এই অংশ থেকে যাবে বিহারে।

ফিরে এলেন ডাঃ রায় দিল্লী থেকে। কলকাতায় সবাই বলতে লাগলেন শুনলাম, ডাঃ রায় খুব সামলে দিয়েছেন। রবিবার তিনি দিল্লী চলে গেলেন চট করে তাই রক্ষে। তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাব না পড়লে কমিশনের সুপারিশে বেশ বড়ো রকমের কাটছাঁট হতো। কমিশনের সুপারিশ মতো যেখানে পশ্চিমবঙ্গে আসবার কথা ছিল মোট ৩,৪০০ বর্গমাইল যায়গা, সেখানে এলো ২,৯০০ বর্গমাইল।

ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত বিহারে কম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে নি। ১৭ জানুয়ারি কিষণগঞ্জের একটি বাজারে প্রায় ২০০জন বিক্ষোভকারী ছাত্র হানা দিয়ে দোকানপাট লুট করে। পুরুলিয়াতেও ঘটেছিল ঐ রকম ঘটনা। দেশের ঐক্যে এইরকম ফাটল ধরবার উপক্রম করতে রাজনৈতিক দলগুলি

বিশেষ করে বামপন্থীরা এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে চাইলো সাধারণ মানুষের ভাবপ্রবণতা ও উত্তেজনাকে উসকে দিয়ে। কিন্তু সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বোম্বাই। বোম্বাই শহরকে কেন্দ্রীয় শাসনাধীন রাখার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ভারত সরকার, তারই প্রতিক্রিয়ায় প্রচণ্ড বিক্ষোভ। এবং সে বিক্ষোভ এমনই আকার নিয়েছিল যে মোট ১১৪ বার গুলি চালনা করতে হয়েছিল। ওড়িষ্যা এবং গুজরাটের পরিস্থিতিও খুব ভালো ছিল না।

বাংলা বিহার এক হয়ে যাওয়া সম্পর্কে ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত

ভাষাভিত্তিক বিচ্ছিন্নতাবাদের বিপজ্জনক প্রবণতাকে উলটে দেবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের মুখ্যমন্ত্রীদ্বয় দিল্লী থেকে ২৩ জানুয়ারি সোমবার একটি যুগ্ম বিবৃতি দিলেন বাংলা বিহারের এক হয়ে যাওয়ার প্রস্তাব করে। নেহেরু এই বিবৃতিকে অভিনন্দন জানালেন। ডাঃ রায় ও ডঃ সিংহকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রস্তাব পাস করলেন ওয়ার্কিং কমিটি। শোনা গেল বাংলা ও বিহারের যুগ্ম প্রদেশের নতুন নাম সম্ভবত হবে পুর্ব প্রদেশ।

২৪ জানুয়ারি মঙ্গলবার সকালে ডাঃ রায় দিল্লী থেকে এসে নামলেন দমদমে। তাঁর মন্ত্রিসভার কয়েকজন সদস্য ছাড়া অতুল্য ঘোষ ও সাংবাদিকরা ছিলেন বিমান বন্দরে। সাংবাদিকদের তিনি বললেন, ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত এবং আমাদের যুগ্ম বিবৃতি ছাড়া আর কিছু বলবার নেই।

আমি তখন দাঁড়িয়েছিলাম অতুল্যবাবুর ঠিক পিছনেই। কয়েকজন সাংবাদিক অতুল্যবাবুর দিকে ফিরে তাঁকেই প্রশ্ন করলেন, প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে আপনি কি এই প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন? অতুল্যবাবু সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, আমরা আছি ডাঃ রায়ের পিছনে।

পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা এ ঘটনায় হকচকিয়ে গিয়েছিল। মন্ত্রিসভার বৈঠক ডেকে ডাঃ রায় বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট আলাপ আলোচনা করলেন। বামপন্থীরা এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে লাগলো। বিহারে মতপার্থক্য দেখা গেল। কী বাংলা কী বিহার কোথাও জনগণের প্রতিক্রিয়া অনুকূল ছিল না।

১ ফেব্রুয়ারি রাজ্যপাল বিধানসভা ও বিধান পরিষদের যুগ্মসভা ডেকে রাজ্য পুনর্গঠন বিল সম্পর্কে কোনো কথা না বলতে সবাইকে অনুরোধ করলেন, এর ফলে প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে বন্ধুত্বপুর্ণ সম্পর্কে ফাটল ধরতে পারে এই

ছিল তাঁর আশংকা। ঐদিন প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যকরী পরিষদ তাঁদের বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর এই উদার দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা করলেন।

অমৃতসর কংগ্রেস

পরের সপ্তাহে ডাঃ রায় তাঁর পরিবারের কয়েকজন ও ব্যক্তিগত কয়েকজন এবং আমাকে নিয়ে অমৃতসর রওনা হয়ে গেলেন বাৎসরিক কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদান করতে। বিড়লাদের ব্যক্তিগত প্লেনখানা বেশ ভালভাবেই চালিয়ে নিয়ে গেলেন একজন মহিলা বৈমানিক মিস মাথুর। পাটনা ও লক্ষ্ণৌতে একটুক্ষণ থেমে আমরা অমৃতসর বিমানবন্দরে গিয়ে পৌছলাম বিকেলবেলা। ওখানে একটি বাড়ির অংশ নির্দিষ্ট করা ছিল ডাঃ রায় ও তাঁর দলবলের জন্য। ঐ বাড়িরই অন্য অংশে ছিলেন বোম্বাইয়ের মুখ্যমন্ত্রী মোরারজী দেশাই। দুই নেতা একই বাড়িতে থাকলেন বটে, কিন্তু খাদ্যের ব্যাপারে দুজনে ছিলেন ভিন্ন। মোরারজী ছিলেন নিদারুণ নিরামিষাশী, কিন্তু ডাঃ রায় তা নন। সঙ্গতি রাখবার জন্য ডাঃ রায়ও নিরামিষ খাবার দিতে ফরমাশ করলেন। বয়সে এবং রাজনীতিতে মোরারজী ছিলেন ডাঃ রায়ের কনিষ্ঠ। ডাঃ রায় ডাকতেন মোরারজী বলে। ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন দুজনে, বহু বিষয়ে দুজনের মতৈক্যও ছিল। মোরারজীর দলে ছিলেন গান্ধীজীর এক নাতনী আর সর্দার প্যাটেলের মেয়ে মণিবেন প্যাটেল। তাঁর বাবার জীবিতকালে মণিবেন বেশ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। একদিন সকালে ডাঃ রায়, যখন প্রাতরাশ করছিলেন মণিবেন এসে হাজির তাঁর কাছে, এসে জিজ্ঞাসা করলেন, বিধানবাবু, আমাকে কি আপনি ভুলে গেছেন, ছেড়ে দিয়েছেন আমাকে? (আপ হামকো ছোড় দিয়া?) সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন ডাঃ রায়, আমার স্বভাব আমি কাউকেই ছেড়ে দেই না, আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মেয়েকে ত কিছুতেই না।

আমি জানতাম কথাটা কতদূর সত্যি। প্যাটেল মারা গেছেন, আর সেই সঙ্গে রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে মণিবেনও গেছেন প্রায় অদৃশ্য হয়ে। কথাটা শুনে মণিবেনের চোখ ছলছল করে এলো, গলা ধরে গেল, তিনি তখুনি কোনো কথা বলতে পারলেন না।

জি ডি বিড়লা কয়েক দশক ধরে সেই স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় থেকে ভারতীয় নেতাদের স্থান দিয়ে আসছেন। এখানেও অর্থাৎ অমৃতসরেও তাঁর

প্রসঙ্গে নেহেরু ২৭শে ফেব্রুয়ারি একটি চিঠি দিয়েছিলেন। তার উত্তর দিলেন ডাঃ রায় ১লা মার্চ তারিখে। বাহুল্যবোধে চিঠির সবটুকু তুলে না দিয়ে প্রয়োজনীয় অংশটুকু তুলে দিচ্ছি। ডাঃ রায় প্রসঙ্গক্রমে লিখেছিলেন :

২৪শে জানুয়ারি আমি যখন কলকাতা ফিরে এলাম, তখন এখানকার অধিকাংশ লোকই ঐ এক হয়ে যাওয়া প্রস্তাবের ভিতরে কী কী বিষয় ছিল তা জানতো না। আমার প্রেস নোট বেরিয়েছিল ১লা ফেব্রুয়ারি। বহু লোক যাঁরা বিরুদ্ধে ছিলেন তাঁরা ঐ মিলন-প্রস্তাব আবার বিবেচনা করে দেখতে লাগলেন। তার আগে পর্যন্ত লোকে খুব ক্ষুব্ধ ছিল এই ভেবে যে অনেকবার বাংলা ভাগ করা হয়েছে, কিন্তু এবার একেবারে বিহারের সঙ্গে মিশে যেতে চলেছে। আমি সে জন্য আমার নোটে মার্জার কথাটার বদলে মিলন বা ইউনিয়ন কথাটা ব্যবহার করার সুপারিশ করেছি। কিন্তু প্রতিরোধ তবু ছিল।

২০শে ফেব্রুয়ারি রাজ্যপালের ভাষণের ওপর যে বিতর্ক হয়েছিল আমি তার উত্তর দিচ্ছিলাম। বিরোধী পক্ষের একজন সদস্য বিধানসভার সামনে একটি সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করলো, সেটি হলো এই :

দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে (১) ভাষার ভিত্তিতে রাজ্যের সীমানা পুনর্বিন্যাস করতে, (২) বাংলা ও বিহারের মিশে যাওয়ার চেষ্টাকে ব্যাহত করতে সরকার কোনো ফলপ্রসূ ব্যবস্থা নিয়েছেন কি না সে বিষয়ে কোনো উল্লেখ নেই।

আমি অধ্যক্ষকে উল্লিখিত (১) ও (২) বিষয় দুটিকে আলাদা করতে বললাম আর তারপরে ২নং বিষয়ে বিরোধীপক্ষের ডিভিশন চাওয়া সম্পর্কে আমি বৈধতার প্রশ্ন তুললাম, যাতে এই সভা ঘোষণা করতে পারেন, তাঁরা মিলনের পক্ষে কিনা।

সংশোধনীটি আলাদা করে ভোটে ফেলা হলো, কিন্তু বিরোধীপক্ষ ডিভিশন চাইলেন না, আর তার ফলে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মূল প্রস্তাবটি ১৫১-৪৮ ভোটে গৃহীত হয়ে গেল। আমার মুখ্য সচেতক সঙ্গে সঙ্গে এই মর্মে নোটিশ জারি করলেন—উক্ত পরিস্থিতিতে ঘোষণা অনুযায়ী ২৪শে ফেব্রুয়ারি প্রস্তাবটি সরকার আর সভার সামনে তুলতে চাইছেন না।

এ সত্ত্বেও আমি বলবো, ভোটটি ছিল নঞর্থক (নেগেটিভ)। সেজন্য বিধান সভার কংগ্রেসী সভ্যদের আমি মার্জার বা এক হয়ে যাওয়ার সপক্ষে তাঁদের নাম সই করতে বললাম। অধ্যক্ষ ছাড়া বিধানসভার সভ্যসংখ্যা হচ্ছে ২৩৭, তার

মধ্যে ১৭১ জন আমাদের দলের লোক। আমি ১৫০জনের বেশি সদস্যের সই জোগাড় করেছি। আমি সেই কাগজপত্র পাঠাচ্ছি গোবিন্দবল্লভের কাছে।

বাংলার মানুষ দেখা যাচ্ছে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে গেছে :

(১) কম্যুনিষ্ট ও পি এস পি প্রভৃতিরা। এদের কাজই হচ্ছে বিভ্রান্তি আর গোলমালের সৃষ্টি করা। কম্যুনিষ্ট পার্টি চাইছে ভাষার ভিত্তিতে পুনর্গঠন। তারা গুর্খাদের জন্য দার্জিলিঙে আলাদা এলাকা চাইছে। বাংলা পুর্ণিয়ার কোনো অংশ পাক এও তারা চাইছে না, কারণ ওখানকার লোকের তা ইচ্ছা নয়। তারা এই ভাষাভিত্তিক পুনর্গঠনের ব্যাপারটা গ্রামে পর্যন্ত নিয়ে যেতে চাইছে, যাতে সব জায়গায় একটা গোলমালের সৃষ্টি হয়। আমি তাদের এই সব উদ্ভট ব্যাপার সম্পর্কে আদৌ চিন্তান্বিত নই।

(২) বহু সৎ কংগ্রেসী ও অন্তরা আছেন যাঁরা দেশের জন্য ভাবেন। তাঁরা ভাবছেন যে, এই এক হয়ে যাওয়ার প্রস্তাবের আগে রাজনৈতিক পরিস্থিতি কংগ্রেসের অনুকূলে যে রকম ছিল এখন তা নেই এবং সেজন্য আগামী নির্বাচনের মুখোমুখি হওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। গত পনেরো দিনের মধ্যে ছোটখাটো কয়েকটি পৌর নির্বাচন হয়ে গেল ; তাতে বহু যায়গাতেই কংগ্রেস হেরে গেছে। কংগ্রেসীরা হকচকিয়ে গেছে। এখনো সামলে উঠতে পারে নি। অপর পক্ষে আমি মনে করি, কংগ্রেসীরা আত্মতুষ্টিতে ভরপুর ছিল। এই প্রস্তাব হঠাৎ তাদের সেই ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে।

আমি এবং আমার বন্ধুরা এই অবসাদের বিরুদ্ধে প্রাণপণ কাজ করে যাচ্ছিলাম। বামপন্থীরা ২১ তারিখে হরতাল ডেকে প্ররোচনা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছিল। আমি সে টোপ গিলি নি। তাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল সংগ্রাম। যদি পুলিশী ব্যবস্থা বা অ্যাকশন হতো তাহলে তারাই লাভবান হতো। কিছু লোক কিন্তু অন্য রকম ভাবছিল, তারা চাইছিল আমরা যেন হরতালের প্রতিরোধ করি। কিন্তু তা করি নি, আমি এটা হতে দিয়েছিলাম। আমি জনগণের কাছে এই প্রস্তাবের ব্যাখ্যা করার উপযুক্ত সময় পাবার জন্য একটু কালহরণ করতে চাইছিলাম। আমি বুঝতে পারছি, ঢেউ এবার ঘুরছে, আমাকে শুধু সময়ের অপেক্ষা করতে হবে। কিছু সময় পেলে আমরা জনসাধারণকে ঠিকই বোঝাতে পারবো যে, দেশকে ঐক্যবদ্ধ এবং কংগ্রেসকে সজীব রাখতে এই-ই হচ্ছে একমাত্র সমাধান।

যাই হোক, আমি তোমাকে তিনটি বিষয়ে ভেবে দেখতে বলছি :

(১) কিছুকাল পরে অথবা একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই দুটি রাজ্য পৃথক্ হয়ে যেতে পারে কি ?

(২) যদি পারে তাহলে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশ যেভাবে ভারত সরকার সংশোধন করেছেন, সেভাবে কার্যকরী হতে পারে কি ? স্বভাবতই কোনো অচলাবস্থা চলতে পারে না। এক হয়ে যাওয়া যদি স্থগিত থাকে, তাহলে কমিশনের সুপারিশ অবশ্যই কার্যকরী করতে হবে।

(৩) পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকে রূপায়িত করতে আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করলে কেমন হয় বলে তুমি মনে করো ?

এই সব প্রশ্নের উত্তর দরকার যত তাড়াতাড়ি হয়।

এইখানেই লম্বা চিঠিখানার শেষ। ১৭ই মার্চ বিধানসভাকে মুখ্যমন্ত্রী জানালেন, যদি এক হয়ে যাওয়ার প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়, তাহলে পশ্চিমবঙ্গ বিষয়ে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের যা সিদ্ধান্ত—তা কার্যকর করার প্রশ্ন উঠবে। তিনি বললেন, মার্জার প্রস্তাব বাতিল হয়ে যাওয়ার পর যদি দেখা যায় সীমানা পুনর্বিন্যাসের কোনো ব্যবস্থা না রেখেই বিলটি সামনে এসেছে, তাহলে যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের প্রাপ্য আমরা পাচ্ছি ততক্ষণ লড়তে হবে। আমাদের স্বার্থরক্ষার জন্য যে প্রস্তাব দিয়েছি, তা যদি না থাকে তাহলে বিলটি বাতিল করার অধিকার আমাদের আছে।

এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হবার জন্য তিনি দিল্লী গিয়ে ২৪ ও ২৫শে মার্চ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থের সঙ্গে দেখা করলেন। পন্থই রাজ্য পুনর্গঠন বিলটির প্রবর্তনা করছিলেন। এই দেখাশোনা অবশ্য বিফলে যায় নি। ডাঃ রায় বিধানসভায় যা বলছিলেন ওখানেও তাই বললেন। ইতিমধ্যে তিনি বাংলা বিহারের মিলন (মার্জার নয়) নিয়ে একটি ফরমুলা তৈরি করেছিলেন। পাঠকদের জানতে ইচ্ছা করতে পারে মনে করে তার মূল বিষয়গুলো এখানে তুলে দিচ্ছি :

(১) মিলিত রাজ্যের নাম হবে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার যুক্তপ্রদেশ, ত্রিবাংকুর ও কোচিন যুক্তপ্রদেশের মতো।

(২) নিশ্চিত আশ্বাস চাই, প্রতি রাজ্যের সংস্কৃতি ও ভাষা সুরক্ষিত থাকবে। যুক্তপ্রদেশের থাকবে দুটি সরকারী ভাষা, বাংলা ও হিন্দী। সারা রাজ্য জুড়ে দুটি ভাষাই চলবে।

(৩) যদি একটি রাজ্য অন্যটির ওপর আধিপত্য করতে আসে, তাহলে এই মিলন কার্যকর হবে না। অনেক বিষয়েই প্রতি রাজ্য নিজের মতো চলবে, প্রধান প্রধান সমস্যার ব্যাপারে থাকবে মিলিত প্রয়াস।

(৪) এই যুক্তরাজ্যে রাজ্যপাল থাকবেন একজন, পাবলিক সার্ভিস কমিশন থাকবে একটি।

(৫) মন্ত্রিসভা থাকবে একটি এবং একটি বিধানসভা। যে অংশের থেকে মুখ্যমন্ত্রী আসবেন, তার অপর অংশ থেকে ইচ্ছা হলে একজন উপ-মুখ্যমন্ত্রী নেওয়া যেতে পারবে। এই রকম নিয়ম চালু করা উচিত যে, মুখ্যমন্ত্রী পর্যায়ক্রমে একবার এ অংশ থেকে, আরেকবার অন্য অংশ থেকে, বেছে নিতে হবে।

(৬) স্থানীয় পরিষদ থাকবে দুটি, এ অংশে একটি ও অংশে আরেকটি।

(৭) সাধারণভাবে বলা যেতে পারে, দুই অংশেরই ভিতরকার কাঠামো যা ছিল তাই থাকবে এবং একের ব্যাপারে অপরে হস্তক্ষেপ করবে না।

(৮) রাজ্যের প্রধান রাজধানী স্বভাবতই হবে কলকাতা। পাটনাকে করা যেতে পারে দ্বিতীয় রাজধানী। বিধানসভা দুজায়গাতেই বসতে পারে পর্যায়ক্রমে।

বলতে বলতে পিছিয়ে গিয়েছিলাম, আবার এগিয়ে আসি। বলছিলাম, দিল্লীতে ২৪শে মার্চ আমাদের মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলেন। এ দেখাশোনা যে সফল হয়েছিল তাও বলেছি। আসলে ডাঃ রায় পড়েছিলেন উভয়-সংকটে। তিনি জানতেন মার্জার পরিকল্পনা যদি বাংলার লোক না নেয়, আর ও দিকে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশ যদি রাজ্য পুনর্গঠন বিলে না থাকে ও বাংলা যদি তাঁর প্রাপ্য ভূভাগ থেকে বঞ্চিত হয়, তাহলে তাঁর নিজের রাজনৈতিক জীবন যে প্রচণ্ড ধাক্কা খাবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। আর সেই ধাক্কা সামলানো তাঁর পক্ষে খুব কঠিন হয়ে উঠবে।

যাইহোক, দিল্লী থেকে ফেরার পর তিনি তাঁর নতুন ফরমুলা মিলন বা ইউনিয়ন নিয়ে খুব মাথা ঘামাতে লাগলেন। এ বিষয়ে আইনগত এবং

সাংবিধানিক যে সব জিনিস খুঁটিয়ে দেখবার ছিল, সে সব দেখছিলেন মুখ্যসচিব সত্যেন্দ্রনাথ রায় কয়েকজন অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে।

মার্জার-এর ব্যাপার নিয়ে দক্ষিণ কলকাতায় ডাঃ রায় যে সভা করেছিলেন সে কথা বলেছি, কিন্তু এবার তিনি আর একটি সভা করতে চাইলেন উত্তর কলকাতায়। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কলকাতার লোকের মনোভাব ভালো করে বুঝে নেওয়া। অনেক ভেবেচিন্তে শোভাবাজার রাজবাড়ি ঠিক করা হলো। এ বাড়ির মালিক হচ্ছেন রাজা রাধাকান্ত দেবের বংশধররা। এখানেও তাঁকে সভাস্থলের ফটকের বাইরে বিক্ষোভকারীদের মুখোমুখি হতে হলো। দক্ষিণ কলকাতার থেকে এদের সংখ্যা এবার বেশি, গালাগালিতেও এরা বেশি দক্ষ। ডাঃ রায়কে কিছুতেই সভার জায়গায় যেতে দেবো না, এই ছিল ওদের পণ। ডাঃ রায় গাড়ি থেকে নামামাত্র বিক্ষোভকারী কয়েকজন যুবক তাঁকে ঘিরে ধরলো। আমি তাঁর কাছ থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে ছিলাম। অবাক্ হয়ে গেলাম—কয়েকজন তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁর জামা ছিঁড়ে দিলো, অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালিও দিতে লাগলো। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কংগ্রেস সমর্থকদের ধ্বস্তাধ্বস্তি। ডাঃ রায় নিজেও কয়েকজনকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছিলেন। কয়েক মিনিটের জন্য এই ধ্বস্তাধ্বস্তি করবার পর তিনি বক্তৃতা-মঞ্চে উঠতে পেরেছিলেন শেষ পর্যন্ত। ঐ দিন ভোরবেলা কংগ্রেসের কয়েকজন প্রথম সারির নেতা তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকরা ঐ সভায় থাকবে যে কোনো বিক্ষোভের মোকাবিলা করবার জন্য। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তা হয় নি। কেন হয় নি তার ব্যাখ্যা দু রকম হতে পারে। প্রথমত, কংগ্রেসের নেতারা তাঁদের কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করতে অপারগ হয়ে পড়েছিলেন, আর নয়ত তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ কি একসঙ্গে দুটো খেলা খেলছিলেন? অবস্থা দেখে এই প্রশ্ন মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

ডাঃ রায় মঞ্চে রইলেন প্রায় দুই ঘণ্টা। দর্শকদের মধ্যে কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আপনাকে প্রশ্ন করতে চাইবো আপনি কি ততক্ষণ থাকবেন এখানে?

ডাঃ রায়ের উত্তর—হ্যাঁ যতক্ষণ আমার শরীরে কুলোবে অবশ্য।

লক্ষণীয় এই যে, উত্তর কলকাতা জেলা কংগ্রেস কমিটির চাঁইরা কেউ হাজির ছিলেন না, একমাত্র সভাপতি কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ ছাড়া।

প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি অতুল্য ঘোষ দক্ষিণ কলকাতা আর উত্তর কলকাতা এই দুটি সভাতেই হাজির থাকেন নি। সভায় যাঁরা ছিলেন তাঁদের অধিকাংশই শান্ত হয়ে ডাঃ রায়ের কথা শুনে গেছেন, কিন্তু কেউ কেউ আবার তাঁকে বিব্রত করেছিলেন উল্টোপাল্টা প্রশ্ন তুলে। জ্ঞাতব্য কিছু জানবো এই ইচ্ছা তাঁদের ছিল না; তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল ঐ এক হয়ে যাওয়ার বিষয়টি নিয়ে তাঁকে হাস্যাস্পদ করে তোলার চেষ্টা করা।

ইতিমধ্যে একদল সাদা পোষাকের পুলিশ এসে পড়ে সভাস্থলের বাইরে মোতায়েন হলো। সত্যি কথা বলতে কী, এদের জন্যই বৃদ্ধ মানুষটি তাঁর গাড়িতে উঠতে পেরেছিলেন অক্ষত অবস্থায়। বাইরে তাঁকে খুব বিচলিত দেখাচ্ছিল। কারও সঙ্গে কোনো কথা বললেন না—বাড়ি ফিরে সোজা ওপরে উঠে গেলেন।

১৪ই ও ১৫ই এপ্রিল রাজধানীতে ঘন ঘন আলোচনা চলতে লাগলো বাংলা ও বিহারের দুই মুখ্যমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী গোবিন্দবল্লভ পন্থের সঙ্গে। বিষয়টা অবশ্য ছিল দু প্রদেশের মিলন। দুই রাজ্য সরকারের দুই মুখ্যসচিব উপস্থিত ছিলেন আর ছিলেন অতুল্য ঘোষ। আলোচনার শেষে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টি ভালো করে খুঁটিয়ে দেখবেন বলে পনেরো দিনের সময় চেয়ে নিলেন।

ইতিমধ্যে দুটি সংসদ সদস্য পদের উপনির্বাচনের সময় হয়ে গিয়েছিল, একটি মেদিনীপুরে, অন্যটি উত্তর কলকাতায়। ডাঃ রায় ভোটারদের সামনে ঐ মিলন বা মার্জারের বিষয়টি তুলে ধরলেন, আর মার্জার-বিরোধীরা তাঁর এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণও করলো। ডাঃ রায় একদিন অশোক সেনকে ডেকে পাঠালেন। কলকাতা হাইকোর্টের একজন দুর্ধর্ষ ব্যারিস্টার দারুণ প্র্যাকটিশ এঁর। আগে এঁকে রাস্ট্রসংঘে ভারতের প্রতিনিধিদের অন্যতম হিসাবে পাঠানো হয়েছিল। সেখানে ইনি বেশ নামও করেছিলেন। ডাঃ রায় এঁর সঙ্গে ঐ মিলন প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ আলোচনা করলেন। ডাঃ রায়ের এই প্রস্তাবের যে উদ্দেশ্য ছিল তা বুঝতে পেরে তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ এক মত হলেন অশোক সেন। আর ডাঃ রায়েরও পছন্দ হলো ওঁকে। উত্তর কলকাতার উপনির্বাচনে সংসদ সদস্য পদের কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে মনোনীত হলেন অশোক সেন। মার্জার বিরোধী দল মার্জার বিরোধী কমিটির সম্পাদক মোহিত

মৈত্রকে দাঁড় করালেন তাঁর বিরুদ্ধে। ডাঃ রায় যখন ফরোয়ার্ড কাগজ চালাতেন তখন তার সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করতেন এই মোহিত মৈত্র। বলা বাহুল্য, এই নির্বাচন-দ্বন্দ্বের ওপর উভয় দলই সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে দ্বিধা করলেন না, সবার দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো এই নির্বাচনের দিকে। অশোকবাবু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একেবারে নবাগত, কিন্তু সংগঠক হিসাবে তিনি রীতিমত প্রতিভার পরিচয় দিলেন এবং তাঁর নির্বাচনী এলাকার বেশ কিছু তরুণ দলকে কংগ্রেসের পক্ষে নিয়ে এলেন। কিন্তু কংগ্রেসের থেকে কংগ্রেস বিরোধী পক্ষের সুবিধা ছিল বেশি। তাদের লাগসই শ্লোগান, যেমন—বাংলাকে বিহারের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে, জাতি হিসাবে বাঙালী মরতে চলেছে, বাংলা বাঁচাও, কংগ্রেসকে হারাও, এ সব সহজেই সাধারণ ভোটারদের অভিভূত করে ফেলেছিল।

খড়্গপুরে ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউশন অব টেকনোলজির প্রথম সমাবর্তন উৎসব

খড়্গপুরের ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির পরিচালন পর্ষদের সভাপতি হিসাবে ডাঃ রায় এর প্রথম সমাবর্তন উৎসবে ভাষণ দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন পণ্ডিত নেহেরুকে। এই ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠাও ডাঃ রায়ের একটি কীর্তি। সময়টা হবে ১৯৫০-৫১ সাল। কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী হিসাবে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ পাঁচটি আঞ্চলিক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের একটির জন্য যায়গা ঠিক করে দিতে বললেন ডাঃ রায়কে। ডাঃ রায় সঙ্গে সঙ্গে মেদিনীপুর জেলার খড়্গপুরের হিজলী বলে যায়গাটি ঠিকঠাক করে দিয়ে কলেজ স্থাপনার ব্যবস্থা করে দিলেন। কলকাতা থেকে বেশি দূরে নয়, মাত্র একশো মাইল। মৌলানা বলেছিলেন, পশ্চিম বাংলাকে এ জন্য মনোনীত করতে পারি যদি ডাঃ রায় নিজে এর সমস্ত দায়িত্ব নিতে পারেন। সে হিসাবে ডাঃ রায়ই ব্যক্তি হিসাবে এর সব দায়িত্ব নিয়েছিলেন এবং এর সভাপতি হয়েছিলেন। তিনি বিখ্যাত পণ্ডিত ও বিজ্ঞানী ডঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষকে এর প্রথম পরিচালক নিযুক্ত করেছিলেন। এবং তিনি ও ডাঃ রায় দুজনে মিলে গোড়াপত্তন করেছিলেন এই প্রখ্যাত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজটির। আগে আগে এর পরিচালকবর্গের সভা ডাঃ রায়ের বাড়িতেই হতো। তাঁর মূল্যবান সময় তিনি এই কলেজটির জন্য যথেষ্ট ব্যয় করেছেন, যেমন

করেছেন অন্য সব প্রতিষ্ঠান, যথা—চিত্তরঞ্জন সেবাসদন, ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন, যাদবপুরের কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং এ্যাণ্ড টেকনোলজি এবং কে এস রায় যক্ষ্মা হাসপাতাল প্রভৃতির জন্য। এই সব প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা, এদের সমস্যা এবং কী করলে ভালোভাবে তার মোকাবিলা করা যায়, এ সব ছিল তাঁর নখদর্পণে। প্রতি শনিবার ও রবিবারের সন্ধ্যা ছিল এই সব প্রতিষ্ঠানের বৈঠকের জন্য নির্দিষ্ট। সমস্যাসংকুল পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীত্বর কঠিন দায়িত্ব পালন করেও এ সব কাজ তিনি অবলীলায় করে গেছেন। একবার তাঁর এক বন্ধু জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এ সব কাজ করার উদ্বৃত্ত সময় ও শক্তি আপনি পান কী করে?

অল্প একটু হেসে তিনি উত্তর করেছিলেন, এরা হচ্ছে আমার সন্তানের মতো, আমার প্রথম প্রেম—দলীয় রাজনীতির কচকচি থেকে একটু সরে থাকাও বটে।

এই সব সভায় ডাঃ রায় তাঁর অতিথিদের খেতে দিতেন—গরম সিঙাড়া, তাঁর বিশ্বস্ত বেয়ারা কার্তিকের তৈরি কফি আর সন্দেশ। নিউ মার্কেটের এক ইহুদী কারিগরের তৈরী ছানা দেওয়া এক রকমের বিস্কুটও তিনি অনেক সময় আনিয়ে নিতেন আমাকে দিয়ে। কিন্তু সভার শেষে এই সব বিখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তিরা আমার ঘরে আসতেন পান খাবার জন্য। এঁদের মধ্যে ডঃ ত্রিগুণা সেন ছিলেন অন্যতম। আমি যে পান খেতে ভালবাসি তা তাঁরা জানতেন, আর তাঁদেরকে গোটাকতক পানের খিলি দিয়ে আমিও ধন্য এবং সম্মানিত কম হই নি।

২১শে এপ্রিল ডাঃ রায় হিজলি গেলেন নেহেরুকে স্বাগত জানাতে। এখানে সমাবর্তন ভাষণে নেহেরু শুভবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষের প্রতি তাঁর একান্ত আবেদন জানালেন, প্রাদেশিকতার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সময় হয়েছে। দেশকে ধ্বংস থেকে বাঁচাতে হলে অশুভবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষের বিরুদ্ধে আপনারা রুখে দাঁড়ান। নিজের রাজ্য সম্পর্কে সচেতন হতে বাধা নেই, কিন্তু অপর রাজ্যের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হওয়া, অপরকে অস্বীকার করা, অপরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা—এগুলিই খারাপ। আর সব থেকে জরুরী হচ্ছে, যাকে আমি বলি—ভারতের ভাবগত একতা বা মিলন।

এইভাবে নেহেরু বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে তাঁর বন্ধু যিনি নিদারুণ বাধাবিপত্তির মধ্যেও তাঁর মিলনের পরিকল্পনার জন্য লড়াই করে যাচ্ছেন তাঁকেই সমর্থন জানিয়ে গেলেন।

মে মাসের প্রথম সপ্তাহে ডাঃ রায় ছিলেন দিল্লীতে। ৩রা মে ভোরবেলায় তিনি ফোনে কলকাতার উত্তর-পশ্চিম নির্বাচনী এলাকার নির্বাচনের ফলাফল জানতে পারলেন। গত রাত্রেই এই ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছিল। ৪২নং র‍্যাটেনডন রোডের বাড়িতে যখন ফোনটি এলো, আমি তখন তাঁর কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলাম। খুব শান্ত ভাবেই খবরটা তিনি শুনলেন। বামপন্থী প্রার্থী যিনি, তিনি অশোক সেনকে হারিয়ে দিয়েছেন। তিনি ভোট পেয়েছেন ৮৪,৯৫৩, আর অশোকবাবু পেয়েছেন ৫১,৮৮০ ভোট। আমাকে তিনি বললেন, আবার কলকাতাকে ধরো। ধরলাম, তিনি মুখ্যসচিবকে বললেন আইন শৃংখলা সম্পর্কে খুব সতর্ক থাকতে।

জরুরী আলোচনার জন্য অতুল্য ঘোষকে দিল্লীতে থেকে যেতে বলা হলো। ভোটের দুঃসংবাদ শুনে ডাঃ রায় প্রথমেই অতুল্যবাবুকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। রুদ্ধদ্বারকক্ষে দুজনে মিলে অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা হলো। ঐ দিন আরও একটি দুঃসংবাদ তিনি শুনলেন। তাঁর অন্যতম সহকর্মী আইন মন্ত্রী এস কে বসুর মৃত্যু। কলকাতা থেকে ৯০ মাইল দূরে মুর্শিদাবাদ জেলায় মোটর দুর্ঘটনায় তিনি হঠাৎ মারা গেলেন। মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে বিমান বন্দরে গিয়ে প্রথম ফ্লাইটেই কলকাতা চলে এলেন।

ঐ ৩রা তারিখে সকাল আটটায় অফিসে পৌছেই তিনি আমাকে লম্বা একটি প্রেস নোটের ডিক্‌টেশন দিতে লাগলেন। ফুলস্ক্যাপ কাগজের দুই পৃষ্ঠা ব্যাপী তাঁর এই বিবৃতিতে তিনি প্রথম খবর দিলেন: বাংলা বিহার মিলনের প্রস্তাব তিনি প্রত্যাহার করে নিচ্ছেন। যেমন তিনি মার্জার প্রস্তাব নিজে নিজে একক ভাবে গ্রহণ করেছিলেন, তেমনি প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তও তিনি নিলেন। একা মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে বরাবর তা-ই করতেন, কী রাজনৈতিক কী প্রশাসনিক প্রধান প্রধান সিদ্ধান্তগুলি নিজেই নিয়েছেন, পরে এ নিয়ে আলোচনা করেছেন সংশ্লিস্ট লোকজনদের সঙ্গে। তাঁর দীর্ঘ বিবৃতির শেষের দিকে তিনি বললেন:

নির্বাচনের ফলাফল কাল যা ঘোষণা করা হয়েছে, তাতে আমাকে এই কথাই ভাবিয়ে তুলেছে যে ঐ প্রস্তাব নিয়ে আমার আর এগোনো উচিত কিনা। অবশ্য এ ধরনের একটি মাত্র নির্বাচন থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায় না—ঐ সম্পর্কে জনগণের প্রকৃত মতামত কী, তবু এই রায় আমরা অস্বীকারও করতে পারি

না। গত ২৪শে জানুয়ারি তারিখে আমাদের যে সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশিত হয়েছিল তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমি আগের মতোই গভীর আস্থাশীল। এখনো আমার বিশ্বাস, কিছু ক্ষুদ্র ভূভাগ পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হলেই পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা মিটবে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই সংসদীয় উপনির্বাচনের মধ্য দিয়ে যে জনমত প্রকাশ পেয়েছে, তার কাছে আমাকে মাথা নত করতেই হবে। আমার কথা আমি বলতে পারি—প্রস্তাব প্রত্যাহার করে জনমতের কাছে নতিস্বীকার করাই আমি উচিত মনে করি। আমাদের প্রতিবেশী রাজ্যগুলির ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসবার জন্য বাংলার মানুষ সঠিক সিদ্ধান্তই নেবে এই আশা করছি। বিষয়টা আমি কেন্দ্রীয় সরকারকে জানাচ্ছি।

আমি যখন শর্টহ্যাণ্ড থেকে কথাগুলি টাইপ করছিলাম, তখন আমার ঘরের ঘণ্টা দু দুবার বেজে উঠলো। খুব অধৈর্য হয়ে পড়েছিলেন তিনি। আমি টাইপ শেষ করার আগেই তিনি কপি চাইছিলেন। আমি অল্প একটু সময় চেয়ে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলেন তিনি। এ রকম অবস্থায় আমরা খুব কম কথা বলতাম আর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাঁর ঘরে থেকে বেরিয়ে যেতাম। কয়েক মিনিট পরেই তাঁর ঘরে গেলাম, তিনি টাইপ করা কাগজখানা আমার হাত থেকে প্রায় ছিনিয়েই নিলেন বলা যেতে পারে। একটু অদল বদল করে তিনি প্রচার অধিকর্তা পি এস মাথুরকে ডেকে পাঠালেন আর কপিটা তাঁর হাতে দিয়ে বললেন, এখখুনি খবরের কাগজগুলিতে দিয়ে দাও।

পরের দিন কলকাতার কাগজগুলির প্রথম পৃষ্ঠায় তাঁর ছবি দিয়ে বড়ো বড়ো হরফে ছাপা হয়ে তাঁর বিবৃতি বার হয়ে গেল। একজন প্রথম সারির রাজনীতিবিদের এই প্রত্যাহার যেমন শোভনীয় হওয়া দরকার ছিল তেমনি হয়েছিল। ঐ ৪ তারিখেই তিনি বিহারের মুখ্যমন্ত্রীকে একখানা চিঠি লিখলেন, সঙ্গে তাঁর প্রেস বিবৃতির একখানা কপি পাঠাতে ভুললেন না—যদিও বিহারের কাগজগুলিও খবরটা ছেপেছিল ফলাও করে।

প্রিয় শ্রীবাবু

কাল প্রেসে যে বিবৃতি দিয়েছি তার একটা কপি এইসঙ্গে পাঠালাম। উত্তর কলকাতার সংসদীয় উপনির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয়ই এই বিবৃতির ভিত্তি। বিরোধী দল যে বিষয়টা বড়ো করে তুলেছিল সেটা হচ্ছে বাংলা ও

বিহারের মিলনের প্রশ্ন। আপনি দেখবেন আমি জনগণের রায় মেনে নিয়ে ঐ বাংলা বিহার মিলনের প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নিয়েছি। আমি এ সম্পর্কে গোবিন্দবল্লভ পন্থকে লিখেছি।

আপনার বিশ্বস্ত
বি সি রায়

এ নিয়ে গোবিন্দবল্লভের সঙ্গেও কিছু পত্র বিনিময় হয়েছিল ডাঃ রায়ের, বাহুল্যবোধে সেগুলি এখানে আর তোলা হলো না। কিন্তু মিলন প্রস্তাবের প্রত্যাহারে বিহার খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল, তারা ধাক্কাও পেয়েছিল খুব। ডাঃ রায়ের সিদ্ধান্তে দুঃখ প্রকাশ করে বিহারের খ্যাতনামা তিনজন মন্ত্রী বিবৃতিও দিয়েছিলেন। তাঁরা হচ্ছেন এম পি সিংহ, কে বি সহায় এবং হরিনাথ মিশ্র। কিন্তু বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিক্রিয়ার কোন লেখাজোখা বিবরণ নেই। সম্ভবত বুঝেছিলেন, কী ভীষণ প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছিল ডাঃ রায়কে।

পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীদের প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে। তাঁরা বাংলা বিহারের মিলনের প্রশ্নে যে সব বিক্ষোভ সত্যাগ্রহ ইত্যাদি করছিলেন, তা প্রত্যাহার করে নিলেন। অবশেষে ১৪ই জুন দীর্ঘ প্রতীক্ষিত ৪৯টি ধারা সম্বলিত বিহারের কিছু অংশ পশ্চিমবঙ্গে দেবার বিলটির খসড়া কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হাতে এসে পৌছলো। বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ (অঞ্চল হস্তান্তর) বিল নামে পরিচিত—এটি রাষ্ট্রপতি পাঠিয়েছেন উভয় রাজ্যের বিধানসভার মতামতের জন্য। অঞ্চলের পরিমাণ হলো ২,৯০০ বর্গমাইল (জনসংখ্যা প্রায় ১'৪ মিলিয়ন), পশ্চিমবঙ্গের এলাকার পরিমাণ তাহলে বেড়ে দাঁড়ালো ৩৩,৯৪৪ বর্গমাইল। লোকসভায় পশ্চিমবঙ্গের আসন বাড়িয়ে করা হলো ৩৪ থেকে ৩৬, আর বিধানসভায় করা হলো ২৪২ থেকে ২৫২।

আজ সেই বিগত দিনের নাটকীয় কাহিনী লিখতে বসে অনেক কথা মনে পড়ছে। কলকাতা আর দিল্লীতে অনেক উত্তেজিত মুহূর্ত আমি দেখতে পেয়েছিলাম, শুনতে পেয়েছিলাম অনেক উত্তেজিত কথা টেলিফোন মারফৎ। অনেক নেপথ্য ঘটনার সাক্ষী হচ্ছে দিল্লীর সেই ৪২ র‍্যাটেণ্ডন রোডের বাড়িটি। একবার বাংলার এক সংসদ সদস্য এসে ডাঃ রায়কে জানালেন, অঞ্চল হস্তান্তরের বিলটি দেরি করিয়ে দেবার এক জঘন্য ষড়যন্ত্র হচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে ডাঃ রায় আমাকে বললেন, পাতিলকে টেলিফোনে ধরো ত? এস কে পাতিল তখন ছিলেন সংসদে কংগ্রেস দলের মুখ্য সচেতক। তাঁর উদ্দেশ্যে টেলিফোনেই তিনি গর্জে উঠলেন, এটা নিয়ে তোমরা মজা করছো নাকি, অ্যাঁ!

আর যায় কোথায়, পাতিল তাঁর মনোভাব বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি বিলটি আনলেন লোকসভায়। ছয়মাস পরে নাটকের ওপরে যবনিকাপাত হলেও দুই রাজ্যের মধ্যে তিক্ততার শেষ হয় নি। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী অনেক চেষ্টায় পরে এই তিক্ত মনোভাব একেবারে দূর করে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

বিধান রায়ের ৭৫তম জন্মদিন

কলকাতায় ১লা জুলাই তাঁর ৭৫তম জন্মদিনে তিনি কথায় কথায় কম্যুনিজম আর ধর্ম সম্পর্কে তাঁর ধারণার কথা বললেন। সোভিয়েট নেতা ক্রুশ্চেভ আর বুলগানিনের সঙ্গে কলকাতাতেই তাঁর কথাবার্তা হয়েছিল এ নিয়ে। সে কথা বর্ণনা করতে গিয়ে ডাঃ রায় বললেন, তাঁরা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নন, কিন্তু আমি তাঁদের বললাম, আমি বিশ্বাসী। বললাম, বাংলা তথা ভারতের লোক যতদিন বিশ্বাস করবে যে অতিপ্রাকৃত শক্তি একটা আছেই, ততদিন এ দেশে কম্যুনিজম হবে না।

তাঁর ভাষণ তিনি শেষ করলেন একটি কবিতা দিয়ে, যার ভাবটা হলো, চিরতরে চোখ বুজবার আগে আমার চোখে থাকবে আমার এই দেশের আলো।

ভগবান বোধ হয় তাঁর কথা শুনে তাঁর এই প্রার্থনা পুরণ করেছিলেন।

রাজ্যপাল হরেন্দ্রনাথের মৃত্যু

বিগত ২৫।২৬ বছরের মধ্যে কলকাতার রাজ্যপাল ভবনে থাকা-কালীন কর্মরত অবস্থায় মারা গেলেন দুজন রাজ্যপাল। গত ৪০ দশকে পেটের অপারেশনের ব্যাপারে মারা গিয়েছিলেন লর্ড ব্রাবোর্ন। তিনি বিদেশী শাসক হওয়া সত্ত্বেও লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের কাছ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত সমবেদনা পেয়েছিলেন লেডী ব্রাবোর্ন। সেই একই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল ডঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের বেলায়। ৭ই আগস্ট

হৃদ্‌রোগে তিনি হঠাৎ চলে গেলেন। ঐ দিনই বিকেলবেলা তাঁর হৃদ্‌-রোগের খবর পেলেন ডাঃ রায় মহাকরণে বসে এবং তাড়াতাড়ি করে তিনি রওনা হচ্ছেন রাজভবনের দিকে, এমন সময় আরেকটি টেলিফোন এলো—রাজ্য-পাল এই মাত্র মারা গেলেন। ডাঃ রায় নিজে বিচলিত হলেও নিজের হাতে রাজ্যপালের দেহ অভিষিক্ত করে দিলেন। রাজভবনে সারা রাত দেহটি রাখবার ব্যবস্থা যে ভাবে হবে তার নির্দেশ দিলেন। পরের দিন সৎকারের কাজ হবে বলে স্থির হলো। রাজ্যপালের স্ত্রী বঙ্গবালা দেবীকে তিনি বললেন একটি কথা, মৃত্যু সব সময়ই শোকের, কিন্তু আমি সুখী যে আমাদের জনপ্রিয় রাজ্যপাল কর্মরত অবস্থায় মারা গেছেন।

বিহার পশ্চিমবঙ্গ (অঞ্চল হস্তান্তর) বিল

মুখ্যমন্ত্রীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ঠিক ধরে ফেললো যে বিলে একটি জিনিস নেই, সেটি হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের অন্য অংশের সঙ্গে উত্তর অঞ্চলের কোনো সংযোগস্থল। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ৪ঠা জুলাই একটি প্রস্তাব পাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী এই মর্মে যে এই বিলটির সংশোধন করা হোক প্রয়োজনমতো। রাজ্য ও তার জনগণের অস্তিত্বের জন্য উত্তর অঞ্চলে একটি সংযোগস্থল থাকা দরকার। তার জন্য জমির একটা খণ্ড দরকার প্রায় ১৭০ বর্গ মাইলের মতো। এই প্রস্তাব অবশ্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মেনে নিয়েছিলেন, পশ্চিমবাংলার উত্তর ও দক্ষিণ এলাকার মধ্যে সেই প্রথম সংযোগ সাধন হয়েছিল।

জাপান ভ্রমণ

ডাঃ রায়কে একটা সমস্যা খুবই ভাবনায় ফেলেছিল, সেটা হচ্ছে ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যার ব্যাপারে রাজ্যের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প তেমন কোনো কাজে আসতে পারছে না। এ দিক দিয়ে জাপান যে বিপুল সার্থকতা লাভ করেছিল সে বিষয়ে তিনি অবহিত ছিলেন, আর সেজন্য পশ্চিম বাংলায় তিনি জাপানের কিছু প্রণালী বা ধরণধারণ প্রবর্তন করতে চাইছিলেন। নিজের চোখে সে সব দেখলে ভালো হতো মনে করে তিনি ৬ই সেপ্টেম্বর রাত্রে এক মাসের জন্য জাপান ভ্রমণ করবেন বলে টোকিওর উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলেন। বাইরের দেশে যখনই যেতেন তখনই তিনি কোনো না কোনো নতুন শিল্পের সন্ধান

নিয়ে আসতেন। এবারও সেটা করতে তাঁর ভুল হয় নি। ব্রিটিশ, আমেরিকা, রাশিয়া ও স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার কোনো কোনো দেশ এই রাজ্যের নতুন শিল্পে ইতিমধ্যেই অংশগ্রহণ করেছিল—এবার এলো জাপান। জনগণের উপকারের জন্য এই দেশের উর্বরা মাটিতে পূর্ব ও পশ্চিমের মিলিত জ্ঞান ও আলো এসে পড়তে লাগলো।

১৯৫৬-র বিধ্বংসী বন্যা

৭ই অক্টোবর কলকাতা ফিরে এলেন ডাঃ রায়। তুমুল বৃষ্টির জন্য বন্যা হয়েছে সে খবর তাঁর কানে পৌঁছেছিল, কিন্তু দেশে ফিরে তাঁর সহযোগী প্রফুল্লচন্দ্র সেনের কাছ থেকে শুনলেন সে বন্যার প্রকোপ কতখানি। সবশুদ্ধ ১০,১৮৫ বর্গমাইল বন্যার কবলে পড়েছিল—তার মানে, সমগ্র রাজ্যের একের তিন অংশ। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা ৮ লক্ষ ৩৬ হাজার আর ক্ষতিগ্রস্ত গৃহের সংখ্যা ১ লক্ষ ৮৪ হাজার। এইরকম প্রলয়ংকরী বন্যার সমস্যার মোকাবিলা করা রাজ্যের পক্ষে আদৌ সহজ ব্যাপার ছিল না। ডাঃ রায় সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ নিয়ে দুই পথে কাজ করতে লাগলেন এক সঙ্গে। গঠন করলেন পশ্চিমবঙ্গ বন্যাত্রাণ কমিটির, আর তার অফিস বসালেন নিজের বাড়িতে। বাঙালী স্বভাবতঃই ভাবপ্রবণ। প্রত্যেক সকালে আমি দেখতাম, দলে দলে লোক আসছে দানসামগ্রী নিয়ে। কারও হাতে টাকাকড়ি, কারও হাতে কাপড়চোপড় বা অন্য কিছু। আসছে স্কুলের ছেলেমেয়েরা, বস্তীবাসীরা, লক্ষ-পতিরা আসছে, আসছে রাজা মহারাজারা। বর্ধমানের মহারাজাধিরাজের এক মেয়েকে দেখেছিলাম তাঁদের পরিবারের তরফ থেকে এক বাণ্ডিল কাপড়চোপড় নিয়ে আসতে। সবাই ডাঃ রায়ের হাতে দানসামগ্রী তুলে দিতে ব্যগ্র। ডাঃ রায় সকালে এ জন্য কিছু সময় আলাদা করে রেখেছিলেন। দেখতে দেখতে তাঁর বাড়ির একতলাটা দানসামগ্রীতে ভরে গেল। পুরোনো কাপড়চোপড় নিয়েই আমরা সমস্যায় পড়েছিলাম বেশি। তার মধ্যে কতগুলি এতো ময়লা যে কী বলবো, কিন্তু তবু তা নিতে হবে। যত তুচ্ছই হোক দানের জিনিস নেবো না বলে ফিরিয়ে দেওয়া যায় না। সন্ধ্যায় তাঁর চিঠিপত্র যা আসতো তা খুলতাম আমি। অন্য সময়ে যে পরিমাণ চিঠি আসতো—এখন আসতে লাগলো তার কয়েকগুণ বেশি। এই সব চিঠি খুলে যা দেখলাম তাতে আমার চক্ষু-

স্থির। বহু লোক বা সমিতি দান পাঠিয়েছে চেকে। টাকার অঙ্ক নানা রকম। চার সংখ্যার অঙ্ক থেকে এক সংখ্যার অঙ্ক পর্যন্ত আছে। সর্বনাশ! এ সবের হিসাব রাখবে কে? যদি কোনোটা হারিয়ে যায় বা ব্যাঙ্কে দেওয়ার পর প্রাপ্তিস্বীকার না করা হয় তাহলে আমাদের অবস্থা কী দাঁড়াবে? এক রাত্রে অভ্যাগতরা সব চলে গেলে আমি ওপরে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গিয়ে চিঠিপত্রের রাশি দেখালাম—তাতে চেকও আছে আবার কাঁচা টাকার নোটও আছে। তিনি তখন তাঁর রাতের খাবার সেরে নিচ্ছিলেন। বললেন, ভাবছো কেন? রীতিমত অফিস বসছে। বন্যাত্রাণ কমিটিই ও-সবের ভার নেবে।

আমি তখন এক এক সময় অবাক হয়ে ভাবতাম, ডাঃ রায় কোন টাকার জন্য আবেদন জানালেই লোকেরা অমনি ব্যগ্র হয়ে সাড়া দিতো, এটা হতো কোন্ যাদুতে? এই সব দাতব্য টাকাকড়ি বা সামগ্রীর ব্যাপারে তাঁর অমলিন সাধুতা ছিল বলে? না কি, দেশবাসীর ছিল তাঁর উপর অগাধ বিশ্বাস, সেইজন্য?

আদর্শ গ্রাম-পরিকল্প

জাপান থেকে ফেরার ঠিক দশ দিন পরে দুই লক্ষ পরিবারের ঘড়-বাড়ি আবার গড়ে দেবার জন্য আদর্শ গ্রাম-পরিকল্পের নক্সা-টক্সা সব তাঁর তৈরি হয়ে গেল। একদল কারিগরী বিদ্যায় নিপুণ ব্যক্তির সাহায্যে প্রস্তুত ম্যাপ, তালিকা পরিসংখ্যানসহ ২১ পৃষ্ঠাব্যাপী ছাপানো এই পরিকল্পের পুস্তিকা সাংবাদিকদের হাতে দেওয়া হলো। প্রত্যেক আদর্শ গ্রামে থাকবে একটি করে সমাজকেন্দ্র, স্কুল, বাজার, সমবায় বিপণি, শিল্পকেন্দ্র ও ইঁটতৈরির মাঠ। জল সরবরাহ, সেচ, উপযুক্ত স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা ও অন্যান্য দরকারী সুযোগ সুবিধা সবই থাকবে। বাড়িগুলি তৈরি হবে ইঁটের। প্রত্যেকটি গ্রামে থাকবে ৩০ ফুট চওড়া রাস্তা, এই রাস্তার সঙ্গে সংযোগ থাকবে জেলা সদরের। আদর্শ গ্রামের জন্য যে যায়গা বাছা হবে তার প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ রাখা হবে বাড়িঘর তৈরি করার জন্য, বাকি অংশে থাকবে রাস্তা, পার্ক আর খেলার মাঠ। গোচর জমিও থাকবে, আর থাকবে গাছপালা যা থেকে জ্বালানী কাঠ পাওয়া যাবে। প্রত্যেক গ্রামে থাকবে শস্যবীজ আর সারের গুদাম-ঘর। এগুলি পরিচালিত হবে সমবায়ের ভিত্তিতে। আদর্শ গ্রামের এই ধারণাটা ছিল তাঁর নিজের, আর সেটাই বেরিয়ে এলো তাঁর পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে।

যা-ই হোক, বাংলার এই প্রলয়ংকরী বন্যার ধ্বংসলীলা দেখবার জন্য নেহেরুকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তিনি দমদমে বিশেষ বিমান থেকে নেমে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে উঠলেন একটা হেলিকপ্টারে। এই হেলিকপ্টারের পিছনে পিছনে চললেন কয়েকজন মন্ত্রী একটি ডাকোটা বিমানে। বিমানে কয়েকটা আসন খালি রয়েছে দেখে আমিও উঠে পড়লাম। মন্ত্রী বিমলচন্দ্র সিংহের অনুমতি নিয়ে তাঁর পাশের আসনে বসে পড়লাম। নদিয়া জেলার নবদ্বীপে পৌঁছে আমরা দেখতে পেলাম, একতলা বাড়িগুলো সব জলের তলায়। এখানে ওখানে কয়েকটির ছাদ শুধু জেগে আছে, আর সবই জল শুধু জল! অবাক হয়ে ভাবছিলাম মানুষগুলো কোথায় গেল? স্ত্রী-পুরুষ-ছেলেমেয়ে আর তাদের গরুবাছুর? তারা কি বেঁচে আছে? কে দেবে উত্তর? নিচে যা দেখছি তাতে প্রাণের কোনো চিহ্নও নেই কোনখানে। আমার খুব ভয় হলো। ওপর থেকে বন্যাকবলিত জনপদ দেখার অভিজ্ঞতা সেই আমার প্রথম।

সম্রাট হেইলে সেলাসি ও চৌ এন লাই-এর আগমন

রাজ্য সরকারের একটা প্রধান কাজ হচ্ছে বিদেশ থেকে যে সব মান্য অতিথিরা আসেন, তাঁদের প্রতি যোগ্য অভ্যর্থনা জ্ঞাপন। নভেম্বর-ডিসেম্বরেই অতিথিদের চাপটা পড়ে সাধারণত বেশি। প্রথম এবার যিনি এলেন তিনি আর্ল এটলি, তার পরে এলেন ইথিওপিয়ার সম্রাট হেইলে সেলাসি। মার্শাল টিটোকে যেমন হাওড়া ষ্টেশনে কার্পেট বিছিয়ে জাঁকজমকের সঙ্গে অভ্যর্থনা জানানো হয়েছিল বছরখানেক আগে, এঁকেও তাই জানানো হলো। মার্শাল টিটোর সময় যত লোক হয়েছিল, এঁর সময়ও তাই হলো। সম্রাট বন্যাজনিত বাংলার ক্ষয়ক্ষতির কথা শুনেছিলেন, তাই মুখ্যমন্ত্রীর বন্যাত্রাণ তহবিলে বেশ মোটা অঙ্কই দান করলেন। এর পরে এলেন চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই। দমদম বিমান বন্দর ছুঁলেন তিনি তৃতীয় বারের মতো, আর নগর ভ্রমণে এলেন দ্বিতীয় বারের জন্য। বিমান-বন্দরে তাঁকে বিপুল অভ্যর্থনা জানানো হলো। দমদম থেকে রাজভবন পর্যন্ত পথের দুধারে জড়ো হওয়া লোকের সংখ্যাও কম ছিল না। চৌ বললেন, কলকাতার অভ্যর্থনা মনে রাখবার মতো।

ডাঃ রায় উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত। লোকেরা আপনাকে ভালোবাসে, তাই শান্তির দূত হিসাবে আপনাকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে সারা অন্তরের শুভেচ্ছা দিয়ে।

১৯৫৭র সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে বামপন্থীদের আয়োজন

১৯৫২র সাধারণ নির্বাচনে যে রকম দেখা গিয়েছিল, ১৯৫৬র শেষে আসন্ন নির্বাচন উপলক্ষে বিভিন্ন বামপন্থী শিবিরে তেমনি পারস্পরিক সমঝোতা নিয়ে কর্মতৎপরতা লক্ষ্য করা গেল। কম্যুনিষ্ট পার্টিকে দেখা গেল প্রজা সোস্যালিষ্ট পার্টির সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আসতে তাঁরা আগ্রহী, অথবা তা যদি না হয় তাহলে এবার যে কোনো রকম সমঝোতায় আসতে তাঁরা আরও বেশি ব্যগ্র হয়েছেন। ৬ই নভেম্বর একটি প্রেস বিবৃতির মারফৎ জানা গেল, তাঁদের দুই দলের মধ্যে একটা রফা হয়েছে। ১৯৫২-এর নির্বাচনে ছিল ৭০জন কম্যুনিষ্ট প্রার্থী। এবার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১০১। পি এস পি, ফরোয়ার্ড ব্লক, ফরোয়ার্ড ব্লক (মার্কসিষ্ট) ও বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী পার্টিসহ কমিউনিষ্ট দলের সঙ্গে সমঝোতায় এসে প্রার্থী দিলেন ৭০, ফরোয়ার্ড ব্লক ২৬, ফরোয়ার্ড ব্লক (মার্কসিষ্ট) ১০। কম্যুনিষ্ট প্রার্থীদের নামের তালিকা সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য দেওয়া হলো। যেখানে মৈত্রীবন্ধন হয়েছে সেখানে ঠিক হলো—একে অপরের প্রার্থীকে দলগতভাবে মদত দেবেন। দলের নেতারা যুক্তভাবে প্রচার অভিযান চালাবেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও ঠিক হলো, পি এস পি প্রার্থীরা কম্যুনিষ্ট শিবিরের কোনো সক্রিয় সমর্থন আশা করবেন না। এ সত্ত্বেও বলবো, কংগ্রেস শিবিরের বিরুদ্ধে কংগ্রেস বিরোধীরা ঐক্যবন্ধনের ক্ষেত্রে ১৯৫২-৫৩তে যা হয়েছিল, তার থেকে এক ধাপ এগিয়ে গেলেন।

প্রশ্ন উঠতে পারে, কংগ্রেস এ সময় কী করছিল ? কংগ্রেসের পক্ষে অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করবার জন্য কংগ্রেস পরিষদ দলের নেতা ডাঃ বি সি রায় নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে কলকাতার বেলিয়াঘাটায় সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির একটি অধিবেশন আহ্বান করলেন। যদিও বৈঠকে বেশি সময়ই আলোচনা হলো সুয়েজ খালে ইংরেজ ফরাসীর আক্রমণ নিয়ে—আলোচনা হলো দিল্লীতে কলম্বো পাওয়ার্স কনফারেন্স হবার পরই চেকোশ্লোভাকিয়ার ওপর রাশিয়ার আক্রমণ নিয়ে, তবু পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্যরা এই বৈঠকের ফলশ্রুতিস্বরূপ আসন্ন নির্বাচনের ভিত্তি প্রস্তুত করতে ব্যর্থ হন নি বলা যায়।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই

১৯৫২র নির্বাচনের সময় যে রকম হয়েছিল এবারেও মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে দিনে রাতে পশ্চিমবঙ্গ সংসদীয় বোর্ডের বৈঠক বসতে লাগলো। কিন্তু এবার বেশির ভাগ সভ্যই পুনর্মনোনয়ন পাচ্ছেন বলে নতুন প্রার্থীদের ভীড় তেমন দেখা যাচ্ছিল না। সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি অতুল্য ঘোষ জানালেন, ২১শে ডিসেম্বর তারিখে বিগত নির্বাচনের মতো এবারও অভিযানের সূচনা করা হবে স্থির হয়েছে বিগ্রেড প্যারেড গ্রাউণ্ডের নির্বাচনী জনসভায়, পণ্ডিত নেহেরুর ভাষণ দিয়ে।

বেলেঘাটার কংগ্রেস অধিবেশন শুরু হয়েছিল ৯ই নভেম্বর। বিশিষ্ট একজন অতিথিও দেখতে এসেছিলেন এই বৈঠক। তিনি হচ্ছেন ইন্দোনেশিয়ার প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রমানজালু। কংগ্রেস অধিবেশন হচ্ছে দলগত ব্যাপার, এখানে কোন রাজ্যপালকে কখনো যোগ দিতে দেখি নি। তাই পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল যিনি ৮ই নভেম্বর শপথ নিয়েছেন তিনি এ অধিবেশনে আসায় আমি খুব অবাক হয়েছিলাম। অধিবেশনে জনগণ ও সাংবাদিকের দৃষ্টি যথারীতি বেশি আকর্ষণ করেছিলেন নেহেরু, বিধান রায় এবং ইন্দোনেশিয়ার প্রধানমন্ত্রী।

যাই হোক, কংগ্রেসের এই অধিবেশন ডাঃ রায় তথা পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের পক্ষে ছিল বিশেষ লাভের বিষয় এবং আসন্ন নির্বাচন সম্পর্কে তাঁদের আত্মবিশ্বাসও কম ছিল না। নির্বাচন শুরু হচ্ছে পরবর্তী বছরের প্রথম দিকেই।

(১৪)

(১৯৫৭)

২রা জানুয়ারি সকালবেলা আমার অফিস ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ দেখি সিঁড়ি থেকে উঠে আমারই দিকে এগিয়ে আসছেন একজন চেনা মানুষ—ইনি হচ্ছেন সুকুমার সেন, ভারতের প্রথম মুখ্য নির্বাচন-কমিশনার। পৃথিবীর সব থেকে বড়ো গণতান্ত্রিক দেশের নির্বাচনপর্ব দক্ষতার সঙ্গে পরিচালিত করে পরে ইনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সুদান সরকার তাদের দেশে নির্বাচন সংগঠন এবং নির্বাচন ব্যবস্থা গড়ে তোলবার জন্য আমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিল। আর সে কাজটা তিনি এতো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেছিলেন যে, কৃতজ্ঞতা-স্বরূপ সে দেশের লোক তাঁর নামে একটি রাস্তারই নামকরণ করেছিল।

সুকুমার সেনকে যাঁরা জানতেন তাঁরা নিরপেক্ষ প্রশাসক হিসাবে তাঁকে সবাই শ্রদ্ধা করতেন। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়কে মুখ্যসচিব হিসাবে তিনি যে সব নোট দিতেন তা অনেক সময়ই তাঁর মত অনুযায়ী হতো না। কিন্তু তা সত্ত্বেও দুজনের প্রতি দুজনের শ্রদ্ধা ছিল সমান। আমি এর একটা উদাহরণও দিতে পারি। ১৯৪৯ সালের কথা। মুখ্যসচিব হিসাবে সুকুমার সেন এবং স্বরাষ্ট্র বিভাগের কয়েকজন অফিসার পুর্বাঞ্চলীয় প্রদেশগুলির এক বৈঠকে যোগ দিতে শিলং গিয়েছিলেন, সঙ্গে আমিও ছিলাম। উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনই ছিল এই বৈঠকের আলোচ্য বিষয়। পশ্চিমবঙ্গের দল স্থান নিয়েছিল ডাঃ রায়ের রায় ভিলায়। একদিন মধ্যাহ্ন ভোজনের শেষে ডাঃ রায়ের সামনে সুকুমার সেন একটা সিগারেট ধরালেন। ডাঃ রায় তাঁর দিকে একটু ক্ষণ তাকিয়ে থেকে তারপরে বললেন, সুকুমার, দিনে তুমি অনেক বেশি সিগারেট খাও দেখছি। ডাক্তার হিসাবে আমি তোমাকে বলছি, তুমি তোমার হৃদ্‌যন্ত্রের বিশেষ ক্ষতি করছো।

সুকুমার সেন খুব লজ্জা পেলেন, কিন্তু সিগারেটটা ফেলেও দিলেন না। আমাকে তিনি চুপিচুপি বললেন, ওঁর মতো অমন নামজাদা ডাক্তারের নিষেধ ত ফেলতে পারি না, তাই চেষ্টা করবো প্রতিদিনের সিগারেটের সংখ্যা ছয়ে কমিয়ে আনতে।

১৯৫০-এরই কোনো সময় হবে সেটা। প্রধানমন্ত্রী নেহেরু ডাঃ রায়ের সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন এই মর্মে যে, ভারতের মুখ্য নির্বাচন-কমিশনার পদে কাকে নিয়োগ করা যায়। এই বিষয়ে তাঁর কাছ থেকে একটি চিঠি এসেছিল, ডাঃ রায় সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিয়েছিলেন। সুকুমার সেনের সঙ্গে কথা বলে তাঁরই নাম পাঠিয়ে দিয়েছিলেন প্রস্তাব করে। আর এই ভাবেই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিব হয়েছিলেন ভারতের মুখ্য কমিশনার। তার পরে মুখ্যসচিব হলেন সত্যেন্দ্রনাথ রায়।

যাই হোক সুকুমার সেন তাঁর প্রাক্তন জুনিয়ার সহযোগী মৃগাঙ্কমৌলী বসু আই সি এস-এর ঘরে ঢুকলেন। শ্রীবসু তখন ছিলেন স্বরাষ্ট্র সচিব আর ছিলেন স্বরাষ্ট্র (সংবিধান ও নির্বাচন) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত, পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনের তারিখগুলি নির্ধারিত করার ভার ছিল সেজন্য এঁরই ওপর। দুজনের কথাবার্তার পর মুখ্য নির্বাচন-কমিশনার ঘোষণা করলেন যে, পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ নির্বাচন শুরু হবে ১লা মার্চ, শেষ হবে ১৪ই মার্চ। পরে অবশ্য এই

তারিখটা বাড়িয়ে করা হয়েছিল ৩১শে মার্চ। কিন্তু কলকাতায় নির্বাচন কবে হবে, সেই তারিখ সম্পর্কে রহস্যজনকভাবে কেউ কোনো উচ্চবাচ্য করলেন না। তখনকার দিনে কিছু কিছু নির্বাচনী এলাকার ফলাফল ঘোষণা করে দেওয়া হতো অন্যান্য নির্বাচনী এলাকার নির্বাচন হবার আগেই। এতে বিশেষ কোনো দলের সুবিধা হতো বেশি। কংগ্রেস ছিল সব থেকে বড়ো দল, আর প্রত্যেক নির্বাচনী এলাকা থেকেই দাঁড়াতো তাদের প্রার্থী, সেজন্য এই ব্যবস্থায় তাদেরই লাভ হতো।

পাঁচদিনের কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দিতে ডাঃ রায় ইন্দোর রওনা হলেন ৩রা জানুয়ারি। আগেকার মতো জি ডি বিড়লার ব্যক্তিগত বিমানখানা এসে দাঁড়ালো দমদম বিমান বন্দরে ডাঃ রায়কে ইন্দোর নিয়ে যাবার জন্য। আমরা তার আগেই ট্রেনে করে দিল্লী রওনা হয়েছিলাম ইন্দোর যাবার পথে। ডাঃ রায়ের একদিন আগেই ইন্দোর পৌছলাম। আমাদের ইন্দোর স্টেশন থেকে নিয়ে যাওয়া হল একজন লক্ষপতি শেঠের প্রাসাদে। দোতলাটা ডাঃ রায় ও তাঁর পরিবারবর্গের জন্য রাখা হয়েছে, আর তখনকার কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী জগজীবন রামের জন্য রাখা হয়েছে। বাড়ির মধ্যেই ছিল ভি আই পিদের জন্য আলাদা আলাদা রান্নার ব্যবস্থা, আর শিবির-বাসীদের জন্য শিবিরের কাছেই রান্না হতো। প্রাসাদের মালিক হচ্ছেন জৈন, সেজন্য অতিথিদের জন্য তৈরি হতো নিরামিষ খাবার।

পরের দিন আমরা বিমান বন্দরে গেলাম ডাঃ রায় ও তাঁর পরিবারের লোক-জনদের আনতে। বিমান থেকে নেমে ডাঃ রায় অপেক্ষমান জনতার দিকে এগিয়ে গেলেন, তার মধ্যে তাঁর গৃহস্বামীও ছিলেন। ওঁকে মালা পরালেন তাঁরা। সম্বর্ধনার পালা শেষ হলে ডাঃ রায় আমাকে মালপত্রগুলি সব দেখেশুনে নিয়ে পিছনে পিছনে আসতে বললেন। বিমানের ভিতরে দেখি স্যুটকেশ পোটলা-পুটলি মহিলা ব্যাগ এসব ছড়ানো রয়েছে এখানে ওখানে। এই সব মালপত্রের ব্যাপারে আমি বরাবরই পুরোনো বেয়ারা কার্তিকের সাহায্য পেয়ে থাকি। বিমান থেকে নামতে নামতে আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, কলকাতায় প্লেনে ওঠবার সময় যতগুলি মালপত্র গুণে নিয়েছিলি এখন তার সঙ্গে সব মিলিয়ে পেয়েছিস তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

ব্যস নিশ্চিন্ত। আমরা খুশি মনেই সেই প্রাসাদের অভিমুখে রওনা হলাম জিনিসপত্র নিয়ে। বিমানবন্দর থেকে শহরে যেতে যেতে দুপাশের কালো মাটির চেহারা দেখছিলাম অবাক হয়ে। কালো মাটির উধাও মাঠ, তাতে তুলো বোনা হয়েছে শুধু। আমরা গ্রামের মাঠে ধান দেখতে অভ্যস্ত, কিন্তু মধ্যপ্রদেশে ধানের বদলে তুলো বোনা হয়। ওখানে সপ্তাহখানেক থাকাকালীন সময়ে গ্রামাঞ্চলে বেড়িয়েছি। দেখেছি, উধাও তুলো বোনা মাঠের এখানে ওখানে কারখানার লম্বা লম্বা চিমনি দাঁড়িয়ে ধূমোদ্গীরণ করছে, আর তার পাশে পাশে শোভা পাচ্ছে ক্ষুদে ক্ষুদে তুলোর গাছ।

যাইহোক, বাড়ি ফিরে মালপত্রগুলি দোতলায় পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে তাঁবুর ভিতরে একটু বসেছি, অমনি তলব হলো। ডাঃ রায়ের মুখ কালো, বললেন, দুটো বড়ো সুটকেশ পাওয়া যাচ্ছে না।

তারপরেই পাশে দাঁড়ানো লক্ষপতি গৃহস্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, চক্রবর্তী আজ একটু ঢিলেমি দিয়েছে দেখছি।

এরপরে আমার দিকে ফিরে বললেন, গেল কোথায় সুটকেশ দুটো? ওদের পাখা নেই যে বিশেষ প্লেন থেকে উড়ে যাবে। খুঁজে আনো। কার্তিককে সঙ্গে নাও।

আমি ত হতবাক। দমদমে ওঠবার সময় মালপত্র কতো ছিল, আমি তা জানবো কী করে, আর আমি তা হারানোর জন্য দায়ীই বা হবো কেমন করে? আমার একটু রাগও হলো। তাঁর সঙ্গে আসা অতো মহিলা আর ছেলে-পিলেদেরই দোষী করলাম মনে মনে। ইন্দোর কংগ্রেসে তারা এসে কী করবে? আর যদি আসতেই হয়, তাহলে অতো মালপত্রই বা সঙ্গে আনা কেন?

কী আর করা যাবে, বিমানবন্দরের দিকে যেতে যেতে হঠাৎ একটি কথা মনে হলো। বিমানের পাইলট বা চালকের কেবিনে তো উঁকি দিয়ে দেখি নি! যেই ভাবা সেই কাজ। বন্দরে পৌঁছে তাড়াতাড়ি চালকের কুটুরিতে ঢুকে দেখি, দুটি সুটকেশ দিব্যি সাজানো রয়েছে, ওগুলি সঙ্গে সঙ্গে নামিয়ে এনে গাড়িতে তোলবার ব্যবস্থা করলাম। বাড়ি পৌঁছে ডাঃ রায়কে সমস্ত বললাম। কাউকে যদি মনে কষ্ট বা আঘাত দিয়ে থাকেন, তাহলে তাদের মনের অবস্থা কী হতে পারে এটা বোঝার এক অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল ডাঃ রায়ের। তিনি

আবার ব্যথা ভুলিয়ে দেবার প্রক্রিয়াও জানতেন ভালো রকম। দোষটা যে আমার নয়, কার্তিকের, এটা বুঝতে তাঁর দেরি হয় নি। শান্ত গলায় আমাকে বললেন, বুঝতে পেরেছি কার্তিকের দোষ হয়েছে। কিন্তু তুমিও ত আনাচে কানাচে উঁকি দিয়ে দেখবে কোনো কিছু জিনিস টিনিস কোথাও পড়ে রইল কিনা? দেখেছো ত, আমার দলে যে সব ছেলেপিলে বা মেয়েরা থাকে তারা অগোছালো হবেই।

৩রা জানুয়ারি দুপুরবেলা সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন বসবে ঠিক ছিল। বাড়ির সামনে তাঁর আর জগজীবনরামের জন্য দুটি গাড়ি অপেক্ষা করছিল। ডাঃ রায় যথাসময়ে ওপর থেকে নেমে এসে জগজীবন বাবুর ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে দরজায় আস্তে আস্তে টোকা দিতে লাগলেন। কোন সাড়া না পেয়ে বলে উঠলেন, কী হে জগজীবন, তৈরি হওনি? যাবে না? ততক্ষণে জগজীবনবাবুর জামাকাপড় পরা হয়ে গিয়েছিল। তিনি ঘরের বাইরে আসতেই ডাঃ রায় হাসতে হাসতে বাংলায় বলে উঠলেন, জগু যাবে ত চলো, একসঙ্গে যাই।

জগজীবনবাবু উত্তর করলেন, নিশ্চয়ই একসঙ্গে যাবো। চলুন।

দুজনে একই গাড়িতে উঠে রওনা হয়ে গেলেন। আমরা গেলাম পিছনে পিছনে ছোট গাড়িটায়। যে কদিন ইন্দোরে ছিলাম, ডাঃ রায় রোজই এসে জগজীবনবাবুর দরজায় টোকা দিতেন, তারপরে একসঙ্গে বেরিয়ে যেতেন দুজনে।

ঠাণ্ডা স্বভাবের মানুষ জগজীবনরাম বয়সে, রাজনীতিতে, দলগত প্রবীণতায় ডাঃ রায়ের ছোট ছিলেন, কিন্তু দুজনের মধ্যে স্নেহ প্রীতি ও শ্রদ্ধার বন্ধন ছিল অটুট। ১৯৫০এ জগজীবনবাবু যখন কলকাতায় আসতেন, তখন উঠতেন এসে ডাঃ রায়ের ওয়েলিংটন স্ট্রিটের বাড়িতে। একবার এরকম হলো যে উনি এলেন দু একদিনের জন্য থাকতে, অথচ ডাঃ রায় তখন শহরে নেই। ভি. আই. পিদের দেখাশোনা করার ভার ছিল আমার ওপরে। কলকাতা হচ্ছে সর্বাত্মক রেশনিং এলাকা, ভাল চাল পাওয়া খুবই দুষ্কর। তাই ওঁর খাবার টেবিলে যখন সরু বাসমতী চালের ভাত দেওয়া হলো, উনি আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, রেশনের দোকানে কি এ চাল পাওয়া যায়?

আমি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলাম, না কিন্তু দিল্লীর চাল কেবল দিল্লীর নেতাদের জন্য কিছু আমাদের কাছে রাখা আছে। এ বাড়ি হচ্ছে বিরাট এক ডাক্তারের

বাড়ি, সে জন্য ডাক্তার চান না যে তাঁর অতিথিরা এখানে এসে পেট খারাপে ভুগুন।

জগজীবনবাবু খুবই উপভোগ করেছিলেন এই সকৌতুক মন্তব্য।

তুলসীচরণ গোস্বামীর মৃত্যু

কিন্তু যা বলছিলাম। ইন্দোর কংগ্রেস থেকে ডাঃ রায় যে দিন ফিরবেন সেদিনই খবর পেলেন যে তাঁর বন্ধু তুলসীচরণ গোস্বামী মারা গেছেন। বহুদিন ধরে রোগে ভুগছিলেন তিনি। তুলসী গোস্বামী বাংলার পঞ্চবৃহৎ-এর একজন ছিলেন। তিনি, বিধান রায়, শরৎ বসু, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র আর নলিনীরঞ্জন সরকার। বাংলার রাজনীতির প্রতিটি ছাত্রই জানে, এই মৈত্রীবন্ধন হয়েছিল কংগ্রেসের কর্তৃত্ব দখল করবার জন্য যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের বিরুদ্ধে। বিশ ও তিরিশের দশকে ছাত্র ও যুব সম্প্রদায়ের কাছে তুলসীবাবু ছিলেন আদর্শ স্বরূপ তাঁর অসাধারণ বাগ্মিতার জন্য। এর বিশেষ স্ফুরণ দেখা গিয়েছিল তখন, যখন তিনি মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বাধীনে কেন্দ্রীয় সংসদ সভায় স্বরাজ্য পার্টির মুখ্য সচেতক ছিলেন। আভিজাত্য ও রোমান্টিক ধরনের জীবন যাপনের জন্যও তাঁর প্রসিদ্ধি ছিল। কিন্তু এই তুলসী গোস্বামীই যখন চল্লিশ দশকের গোড়ার দিকে নাজিমুদ্দিন-মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী হলেন, তখন তাঁর পুরানো দিনের মহিমার জ্যোতি তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন। কোথায় গেল তাঁর সেই অসামান্য বাগ্মিতা? ১৯৩৭এ শরৎবাবুর পাশে বিরোধী পক্ষে যখন তিনি বসতেন, তখন তাঁর বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হতেন শ্রোতারা। কোথায় গেল সেই ক্ষুরধার বক্তৃতার মেজাজ আর সুর? ডাঃ রায় অভিজ্ঞ ডাক্তার হিসাবে বুঝেছিলেন, তাঁর বন্ধুর দিন ঘনিয়ে এসেছে। তাই তাঁর মৃত্যুতে তিনি শোক পেলেও অপ্রত্যাশিত খবর হিসাবে বিচলিত হন নি।

১৯৩৬এর লক্ষ্ণৌ থেকে কংগ্রেস অধিবেশন দেখে আসছি। (১৯২৮-এর কলকাতা কংগ্রেসের কথা ভালো মনে নেই, তখন আমি খুব ছোট, স্কুলের নীচু ক্লাসে পড়ি।) কিন্তু ইন্দোর কংগ্রেসের মতো এমন নীরস অধিবেশন কখনো দেখি নি। আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে ডাঃ রায় একটি প্রস্তাব তুললেন, মোরারজী দেশাই তা সমর্থন করলেন। বহু বছরের মধ্যে এই প্রথম ঘটলো— আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে প্রস্তাব তোলা হল, অথচ সে বিষয়ে নেহেরু কিছু

বললেন না। ডাঃ রায় খুবই উৎসাহের সঙ্গে প্রস্তাবটি তুলেছিলেন সন্দেহ নেই। মিশরে রাষ্ট্রসংঘ যে ব্যবস্থা নিয়েছে তার তারিফ করলেন। এ আশাও প্রকাশ করলেন যে, হাঙ্গেরী থেকে সোভিয়েট-সৈন্য শীগগিরই তুলে নেওয়া হবে।

কংগ্রেস অধিবেশন শেষ হয়ে গেলে ডাঃ রায় বক্তৃতা-মঞ্চ থেকে নেমে এলেন। কলকাতা থেকে নেহেরু পরিবারের জন্য তিনি একটিন মিষ্টি এনেছিলেন, সেই টিনটা তাঁর গাড়ি থেকে নিয়ে আসতে বললেন। টিনটা হাতে এসে পৌঁছলে সেটা নিয়ে তিনি ভিড় ঠেলে সামনে এগোতে লাগলেন। আমি আর তাঁর রক্ষীরা দু দিক থেকে লোক সরিয়ে তাঁর পথ করে দিতে লাগলাম। রাস্তার একটা বাঁকের মুখে তিনি দাঁড়ালেন। এখান দিয়ে নেহেরুর গাড়ি যাবে। সন্ধ্যা তখন প্রায় হয়ে গেছে, চারিদিকে অন্ধকার নেমে এসেছে। তার ওপর ভিড়ের চাপ ক্রমশই বাড়ছে, তারা জানেও না যে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন আর কেউ নয় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং। লোকগুলো সাধারণ কৃষিজীবী মানুষ, নেহেরুকে দেখবার জন্য ঠেলাঠেলি করছে। ভিড়ের হাত থেকে তাঁকে বাঁচাবার জন্য আমি আর রক্ষীরা বৃথাই চেষ্টা করলাম। প্রায় ১৫ মিনিট পরে দেখলাম বিরাট একখানা লিমোসিন গাড়ি ভিড়ের মধ্য দিয়ে এগিয়ে আসছে, সমবেত জনতা উল্লাসে চিৎকার করে উঠছে। গাড়িখানা যত কাছে আসছে জনতা ততই অধৈর্য হয়ে উঠতে লাগলো। একটা বিরাট ধাক্কায় ডাঃ রায় পড়ে যান আর কী! কিন্তু ততক্ষণে তাঁকে আড়াল করে আমরা দাঁড়াতে পেরেছিলাম তাই কোনো দুর্ঘটনা ঘটে নি। নেহেরু তাঁর দীর্ঘদেহী বন্ধুকে দূর থেকে দেখেই চিনতে পেরেছিলেন, তাই তাঁর গাড়ির গতি অতি ধীর হয়ে গেল। ডাঃ রায় হাতের টিনটা নেহেরুর দিকে ছুঁড়ে দিলেন। নেহেরুও সঙ্গে সঙ্গে লুফে নিলেন সেটা। নিয়ে পাশে তাঁর মেয়ে ইন্দিরার হাতে দিয়ে দিলেন। প্রধানমন্ত্রীর গাড়ির দেহরক্ষীরা অমনি চকিত হয়ে উঠলো, কেউ কিছু ছুঁড়ে দিল না প্রধানমন্ত্রীর দিকে? কিন্তু যিনি ছুঁড়লেন আর যিনি নিলেন দুজনের মুখে হাসি। তারা নিশ্চিন্ত হল। গাড়িটা যতক্ষণ দেখা গেল উভয়ে উভয়ের দিকে হাত নাড়তে লাগলেন। পরে যখন বাড়ি ফিরলাম তখন শুনলাম ডাঃ রায় হাঁটুতে একটা চোট পেয়েছেন। যাইহোক, তার পরের দিন অর্থাৎ ৭ই জানুয়ারি আমরা ইন্দোরকে বিদায়

জানিয়ে সেই বিশেষ বিমানে কলকাতা ফিরে এলাম। বিমান যখন দমদমে পৌঁছলো তখন রাত প্রায় ৭টা।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস

কলকাতায় ডাঃ রায়ের জন্য বহু কাজকর্ম অপেক্ষা করছিল। তার মধ্যে বিশেষ জরুরী ছিল পার্টি সংগঠনের কাজ। পার্টিকে তৈরি করতে হবে সাধারণ নির্বাচনের জন্য, মাস কয়েক মাত্র সময় আর হাতে রয়েছে। সাধারণ মানুষের কাছে নেহেরুর জনপ্রিয়তা ছিল অতুলনীয়। ডাঃ রায় বাংলায় তাঁর কর্মসূচি সাজালেন অনেক বাছাবাছি করে। সেই সূচিতে সরকারী কাজও ছিল, দলের কাজও ছিল। ১৯৫২-এর মতো এবারেও তাঁকে নিয়ে শুরু হয়েছিল নির্বাচনী প্রচার অভিযান।

১৪ই জানুয়ারি নেহেরু কলকাতায় এলেন ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৪৪তম অধিবেশনের উদ্বোধন করতে। বিজ্ঞান কংগ্রেসের সাধারণ সভাপতি ছিলেন ডাঃ রায়। বাইরের কয়েকটি দেশের বৈজ্ঞানিকদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল এবং তাঁদের বেশ বড়ো একটা দল ভারতে এসেছিলেন অধিবেশনে যোগ দিতে আর বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এ দেশ কতটা উন্নতি করেছে, সে সব কথাও জানতে। নেহেরু তাঁর ভাষণে বিজ্ঞানীদের উদ্দেশ করে বলেছিলেন, আপনারা শুধু নিজেদের জগতেই বাস করবেন না, নিজেদের সৃষ্টির ফল যেখানে ফলছে তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গজদন্ত মিনার-এ বাস করা মোটেই উচিত নয়। বিজ্ঞান যদি নীতি ও আদর্শের ক্ষেত্র থেকে পুরোপুরি সরে দাঁড়ায়, তাহলে এর যা শক্তি তা ব্যবহার করা হবে অকল্যাণের জন্য। এরপরে সভাপতির আলখাল্লা পরিহিত ডাঃ রায় ভাষণ দিতে উঠলেন। তাঁর ভাষণ তিনি তিনবার আমাকে ডিক্‌টেশন দিয়ে তৈরি করিয়ে নিয়েছিলেন। আর ডিক্‌টেশন দেবার সময় প্রায়ই বই দেখে নিতেন, চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ওপরে বই। তাঁর ভাষণের বিষয়বস্তু ছিল যতদূর মনে পড়ে কেমোথেরাপি . প্রাণীজগতে বিশেষ করে মানুষের শরীরে এর প্রতিক্রিয়া। তাঁর ভাষণের শেষের দিকে তিনি যা বললেন তা দার্শনিকের বক্তব্য বলে মনে হলো। বিজ্ঞানীদের তিনি বললেন, মনুষ্য সমাজের উন্নতির জন্য আপনাদেরও অনেক কিছু করার আছে। এমন সমাজ তৈরি করতে হবে যেখানে মানুষ শান্তিতে

বাস করতে পারে, প্রকৃতি এবং প্রতিবেশী মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে স্বচ্ছন্দে বাস করতে পারে।

বিজ্ঞান কংগ্রেস পর্ষদের জন্য পূর্ব কলকাতায় একটি বাড়ি তৈরির ব্যবস্থাও তাঁর ছিল। দুদিন পরে বিজ্ঞান কংগ্রেসে যোগদানকারী সভ্য ও অতিথিদের সামনে তিনি তার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন।

এই সঙ্গে ময়দানের বিশাল জনসভায় ১০০ মিনিট ধরে পণ্ডিত নেহেরু যে ভাষণ দিয়েছিলেন, সে কথাও উল্লেখ করা দরকার। তাঁর বক্তব্যে প্রাধান্য পেয়েছিল কাশ্মীর এবং দেশের উন্নতির কথা। তিনি বললেন, গত দশ বছরে ভারত যতখানি উন্নতি সাধন করেছে, অন্য কোন দেশ তা পারে নি।

তখনকার দিনে কংগ্রেসের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল কম্যুনিস্ট পার্টি। তাদের উদ্দেশ করে তিনি বললেন, আপনারা এ কথা ভুলে যান যে, যে নীতি আপনারা অনুসরণ করছেন তা একশো বছরের পুরোনো। এর মধ্যে পৃথিবী অনেক বদলে গেছে। আমি এ-কথাই জোর দিয়ে বলতে চাই, আমাদের পার্টি ভারতে কম্যুনিস্ট পার্টি বা প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টি থেকে সমাজতন্ত্রের পক্ষে ঢের বেশি কাজ করেছে। রাশিয়া যে অন্য একটি সমাজতন্ত্রী দেশ হাঙ্গেরীর ওপর হামলা করেছে, সে কথা উল্লেখ করে নেহেরু বললেন, এই ঘটনা কম্যুনিস্টদের হতবুদ্ধি করে ফেলেছে।

তাঁর মতে কংগ্রেস ও কম্যুনিস্ট ভাবধারার আসল তফাৎ হচ্ছে, কম্যুনিস্টরা বোঝে বিপ্লব মানেই হিংসাত্মক কার্যকলাপ, আর সব কিছুই ভেঙে ফেলে নতুন করে গড়ার পরিবেশ তৈরি করা। কিন্তু কংগ্রেসের চিন্তাধারা গড়ে উঠেছে এই থেকে যে, ফরাসী ও রাশিয়ার বিপ্লবের সময় যে পরিস্থিতি ছিল, তা এখন বদলে গেছে। তিনি বললেন, এই কথাটা বুঝবার মতো কম্যুনিস্ট ভাইদের বুদ্ধি নেই দেখা যাচ্ছে।

নেহেরুর এই নির্বাচনী সভায় পাহারা দেওয়ার কাজ অনেক জোরদার করা হয়েছিল। আর এ কাজের ব্যবস্থা করেছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি অতুল্য ঘোষ তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে। কংগ্রেস সমর্থকদের লরী বোঝাই করে এনে প্রথম দিককার সারিগুলিতে বসানো হয়েছিল। অনেকে লাঠির মাথায় কংগ্রেসের ফ্ল্যাগ বেঁধে নিয়ে এসেছিলেন বিরোধী পক্ষরা গোলমাল বাধাবার উপক্রম করলে এই লাঠি ব্যবহার করা চলবে, এই ভেবে। কেউ

কেউ আবার লাঠির বদলে লোহার ডাণ্ডাও নিয়ে এসেছিলেন। চেম্বার অব কমার্স আধা ছুটি ঘোষণা করেছিলেন, যার ফলে খেটে খাওয়া মানুষ আর বাবুরাও জনসভায় যোগ দিতে পারে। সভায় কতো লোক হয়েছিল এই নিয়ে জল্পনা-কল্পনার অবধি ছিল না। কদিন ধরে ট্রামে বাসে শুধু ঐ এক কথা, ময়দানের সভায় ক লক্ষ লোক হয়েছিল বলো তো?

কংগ্রেস ভাবাপন্ন কাগজগুলি সংখ্যা দিয়েছিল দশ লক্ষ। কিন্তু অকংগ্রেসী কাগজগুলি তা মানতে রাজী নয়। তারা বললে, চার পাঁচ লক্ষের বেশি নয়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়ি

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহুতলাবিশিষ্ট নতুন বাড়ির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন ডাঃ রায় ১৮ই জানুয়ারি। ১৮৭৩ সালে তৈরি বিখ্যাত সেনেট হাউস ভেঙে এটি তৈরি হবে। এর পরে উদ্বোধন করলেন ইউনিভারসিটি কলেজ অব মেডিসিন-এর। এবং এই কাজ দিয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকীর সূচনা করা হলো। পুরানো সেনেট হাউসটির জন্য অনেকে আক্ষেপ করতে লাগলেন। কিন্তু ডাঃ রায় বললেন, প্রয়োজন অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়কে চলতে হবে। সময়ের সঙ্গে তাল রেখে চলতে হবে। আরও যায়গার প্রয়োজন। আধুনিক ব্যবস্থা সবই থাকা চাই। এজন্য নতুনকে যায়গা দিয়ে পুরাতনকে সরে যেতেই হয়, আক্ষেপ করলে চলবে কেন?

কলকাতার জন্য নির্বাচনী তারিখ

পশ্চিমবঙ্গের সংসদীয় এবং পরিষদীয় উভয় নির্বাচনেরই তারিখ টারিক দিয়ে ভোটগ্রহণের বিস্তৃত কর্মসূচীর কথা নির্বাচনী কমিশন ঘোষণা করলেন ২৩শে জানুয়ারি। ১লা মার্চ শুরু হয়ে ভোট গ্রহণ চলবে ৩১শে মার্চ পর্যন্ত। কলকাতার ২৬টি নির্বাচনী এলাকার ভোটগ্রহণ করা হবে ১৪ই মার্চ। আর ভোট গণনা করা হবে স্থির হলো ১৭ই মার্চ তারিখে।

পথের পাঁচালী ছবি

সত্যজিৎ রায় তখন সিনেমা জগতে একেবারেই অপরিচিত। তিনি তার জীবনের প্রথম ছবি তুলেছেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথের পাঁচালী।

কিন্তু অর্থের অভাবে ছবিটা শেষ করতে পারছেন না। সে জন্য মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে তাঁর সাহায্য চাইলেন। এ হচ্ছে ১৯৫৪ সালের কোনো একটা সময়ের কথা, ডাঃ রায় যখন হৃদরোগে আক্রান্ত অবস্থায় অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর শরীর তখনও বাইরে বেরোবার মতো সুস্থ হয়ে ওঠেনি বলে তাঁর বাড়িরই নিচের তলার হলঘরে ছবির শো দেখাবার বন্দোবস্ত করা হলো তাড়াতাড়ি। বিকেলের দিকে দীর্ঘকায় এক যুবক এসে উপস্থিত হলেন পরনে ধুতি এবং লম্বা পাঞ্জাবী, সঙ্গে তাঁর দলবল এবং প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র। বলা বাহুল্য ইনিই সত্যজিৎ রায়। ঘণ্টাখানেক কি তার কিছু বেশি সময় লেগেছিল ছবিটা দেখাতে। দেখানোর সময় প্রচার বিভাগের কয়েকজন আধিকারিকও উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে নাট্যকার মন্মথ রায়ের নামটা মনে পড়ছে। ফিল্মে ছিল গ্রাম বাংলার জীবন বিধৃত, তেমন কোনো পেশাদার শিল্পী এতে অংশ নেন নি, অথচ ভাবে ও পরিবেশ সৃষ্টিতে একেবারে অভিনব। ডাঃ রায়ের দূরদৃষ্টি ছিল। তিনি ফিল্মটির ভবিষ্যৎ দেখতে পেলেন তাঁর মানস চক্ষে, আর যিনি এটি তৈরি করেছেন তাঁর যে প্রতিভা আছে এটা বুঝতেও তাঁর সেদিন ভুল হয় নি। তিনি সত্যজিৎবাবুকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। পরের দিন তিনি প্রচার অধিকর্তা শ্রীমাথুরকে ডেকে পাঠালেন, আলোচনাও করলেন কিন্তু তা সত্ত্বেও বিভাগটি থেকে আপত্তি এলো। এই আপত্তি খণ্ডন করেই ডাঃ রায় ঐ অসম্পূর্ণ ছবিটি রাজ্যসরকারের পক্ষ থেকে নিয়ে নিয়েছিলেন এবং একেই বলে সত্যিকার গুণগ্রাহিতা ও দূরদৃষ্টি। পরবর্তীকালে বহু দেশে ছবিটি দেখিয়ে সরকার অর্থ ও ডলার পেয়েছিলেন প্রচুর। আর এই ছবিটির জন্য পরিচালক সত্যজিৎ রায় বিশ্ববিখ্যাত হতে পারতেন না যদি না ডাঃ রায় প্রাথমিক সাহায্যের জন্য তাঁর দক্ষিণ হস্ত বাড়িয়ে দিতেন। ২৭শে জানুয়ারি রবীন্দ্রনাথের বাড়ির মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী পথের পাঁচালীর পরিচালক ও শিল্পীদের নিজের হাতে মেডেল প্রভৃতি পুরস্কার দিলেন। এতে যে তিনি কী খুশি হয়েছিলেন তা বলার নয়।

পরের দিন যুক্ত বিধানসভায় ভাষণ দিলেন রাজ্যপাল নির্বাচনের আগে। যুক্ত বিধানসভার এই-ই ছিল শেষ অধিবেশন। বিহার থেকে যে এলাকা পশ্চিমবঙ্গে এসেছিল, সেই এলাকা থেকে আটটি নতুন মুখ দেখা গেল বিধান সভায়। তিনজন বসেছিলেন কংগ্রেস পক্ষে, চারজন বিরোধী পক্ষে, আর এক জন নির্দল।

এর পরের দিন দমদম বিমানবন্দরে এসে নামলেন চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই। তাঁকে স্বাগত জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। চৌ বিশ্বভারতী যাচ্ছিলেন দেশিকোত্তম উপাধি গ্রহণ করতে। শান্তিনিকেতনে এই উপাধি গ্রহণ করার সময় চৌ বলেছিলেন, তাঁর কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা নেই, আর জনগণের প্রতি তাঁর সেবা তখন পর্যন্ত খুবই নগণ্য, সে জন্য এই যে সম্মান তাঁকে দেওয়া হচ্ছে, এর তিনি উপযুক্ত নন। যাই হোক, কলকাতায় ফিরে চৌ মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তাঁর বন্যাত্রাণ তহবিলের জন্য সত্তর হাজার টাকা দান করলেন।

১৯৫৭-র সাধারণ নির্বাচন

ভোট গ্রহণের ৩০ দিন আগেই কলকাতা আর পশ্চিমবঙ্গের জেলা অঞ্চলগুলি উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল। এই উদ্দীপনার উত্তাপ কিছুটা অনুভব করলাম যখন মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচনী অফিসে ও বাড়িতে কংগ্রেস কর্মীরা দলে দলে এসে ভিড় করতে লাগলেন। ১৯৫২-র নির্বাচনের সময়ের মতো এবারেও তাঁর নির্বাচনী অফিস তাঁর বাড়ির প্রাঙ্গণ সংলগ্ন তাঁরই পরিবারস্থ এক অফিস ভবনে স্থাপিত হয়েছিল। একদিন সন্ধ্যাবেলা চারটি ছেলে এসে আমারই অফিস ঘরে ঢুকে পড়ে বললো, ডাঃ রায়ের নির্বাচনী অফিস ঘরটা কোথায় বলতে পারেন?

তারা জানালো তারা কংগ্রেসের নবগঠিত ছাত্রপরিষদের ছেলে। তাদের একটা অংশ মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচনী এলাকায় কাজ করবে।

তাঁর পূর্বসূরীদের মতো ডাঃ রায়ের কোনো রাজনৈতিক সচিব বা একান্ত সচিব ছিল না, যাঁরা তাঁর অফিস দেখবেন এবং বাড়িতে যাঁরা আসবেন তাঁদের দেখাশোনা করবেন। তার কারণ রাজনৈতিক ব্যাপারে কোনো সচিবের কোনো উপদেশ বা সাহায্যের তাঁর দরকার ছিল না। সেজন্য তাঁর ঘরে যাবার অনুমতি পাবার আগে সব অভ্যাগতরাই আমার অফিসঘরে এসে ভিড় করতেন। এই চারটে ছেলের সঙ্গে কথা বলে আমার খুব ভালো লেগেছিল। আমি ডাঃ রায়ের প্রধান নির্বাচনী ম্যানেজারকে এদের সম্বন্ধে বলেওছিলাম। এরাই ছিল ছাত্রপরিষদ-এর প্রথম দলের প্রতিষ্ঠাতা-সভ্য। এরাই এদের দলবল নিয়ে ১৯৫৭ সালে সেই প্রথম রাস্তার মোড়ে মোড়ে পথসভা করে বেড়াতে লাগলো যা নাকি ছিল এতকাল বামপন্থীদেরই একচেটিয়া। এদের

কাজকর্ম শীগ্‌গিরই সংবাদপত্র ও জনসাধারণের চোখে পড়ে গেল। আর এদেরই ওপর ভার দেওয়া হলো বৌবাজারের মতো কঠিন নির্বাচনী এলাকার, যেখানে কম্যুনিস্টদেরই প্রভাব ছিল সর্বাধিক। জনসাধারণের সঙ্গে দেখা করা, সারাদিন তাদের সঙ্গে মিলেমিশে থেকে তাদের দুঃখকষ্টের ভার যতটা সম্ভব লাঘব করার চেষ্টা করা, এসবই ছিল তাদের কাজ। আর এ কাজ তারা করেছিল খুবই কৃতিত্বের সঙ্গে, যে কথা পরেও আমাকে বলতে হবে।

মহানগরীর কেন্দ্রে অবস্থিত এই বৌবাজার অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচনী এলাকার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এখানে নানাজাতির লোকের বাস। ৬৩,২২৯ ভোটের মধ্যে প্রায় ২৯,০০০ই হচ্ছে মুসলিম ভোট। এই এলাকায় আছে ইংরেজ, ফরাসী, বেশ কিছু সংখ্যায় চীনেরা, পৃথিবীর আরও অনেক দেশের লোকও রয়েছে। এইসব মিশ্রিত জাতির ভোটদাতাদের মধ্যে কাজ করতে হলে দক্ষ কর্মীর দরকার, যারা এদের ভাষা জানে, এদের সঙ্গে মিশতে পারে।

২রা ফেব্রুয়ারি তারিখে সারা কলকাতার নির্বাচনী এলাকার জন্য মনোনয়ন পত্র দাখিল হয়ে গেল। বৌবাজার এলাকার জন্য ডাঃ রায় ছাড়া আরও চারজন মনোনয়ন পত্র দাখিল করলেন, তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন মুসলমান প্রার্থী মহম্মদ ইসমাইল, একজন দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর নেতা যাঁর কাজকর্মের প্রধান গণ্ডী ছিল ট্রেড ইউনিয়ন ক্ষেত্রে, যেখানে প্রচারের কোনো আধিক্য ছিল না। ইনি ছাড়া ছিলেন একজন হিন্দুমহাসভা ও দুজন নির্দল প্রার্থী। পরদিন মুখ্যমন্ত্রী যখন তাঁর গাড়িতে উঠতে যাচ্ছিলেন তখন একতলার হলঘরখানা ভরে গিয়েছিল দলীয় কর্মীতে। এদের অনেকেই তার জন্য কাজ করেছিল ১৯৫২-এর নির্বাচনে। তাদের খুশির অন্ত ছিল না, কারণ মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে যে প্রার্থীকে দাঁড় করানো হয়েছে, তাকে চেনে কে? একেবারে অজ্ঞাত বললেই হয়, বোধহয় ইচ্ছা করেই এটা করা হয়েছে। বিরোধী পক্ষরা ভেবেছে বৌবাজারে আমরা হেরে যাবোই, সুতরাং যাকে হোক একজনকে ধরে ওখানে দাঁড় করিয়ে দাও।

কর্মীদের মধ্যে উৎসাহী এক যুবক মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গিয়ে বললে, স্যার এই ইসমাইল লোকটি কে? আমরা ত কখনো এর নাম শুনি নি? আপনার কি মনে হচ্ছে না, আমাদের কাজ এবার খুব সহজ হবে?

ডাঃ রায় উত্তর দিলেন, আমিও খুব একটা শুনিনি লোকটির বিষয়ে। দেখা যাক।

নির্বাচন-তদারককারীদের এই আত্মতুষ্টির মনোভাব যে প্রায় সর্বনাশ ডেকে এনেছিল, এটা পরের ঘটনাগুলি থেকেই বোঝা যাবে। তাঁর নির্বাচনী কাজকর্ম কংগ্রেস সংগঠন থেকে করা হতো না। যারা করতো তাদের মধ্যে কংগ্রেসীও ছিল, নির্দল লোকও ছিল। তাদের অনেকে তাঁকে ভালবাসতো ও শ্রদ্ধা করতো বলে কংগ্রেসের আওতার বাইরে থেকে ওঁর জন্য আন্তরিক-ভাবে কাজ করে যেতো।

প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করার সময় থেকেই নির্বাচনী গতিবেগ বেড়ে গেল। নির্দিষ্ট তারিখের মাসখানেক আগে থেকেই স্বেচ্ছাসেবকরা দেওয়ালে দেওয়ালে পোস্টার এঁটে প্রার্থীর নাম আর প্রতীকচিহ্ন প্রচার করতে লাগলো। এবার পরিস্থিতি ১৯৫২-র মতো নয়। ১৯৫৭-তে ঐক্য স্থাপিত হয়েছে সি পি আই, পি এস পি, ফরোয়ার্ড ব্লক এবং ফরোয়ার্ড ব্লক (মার্ক্সিস্ট)-এর মধ্যে। এই গোষ্ঠী কলকাতার সমস্ত নির্বাচনী এলাকাতেই প্রার্থী দাঁড় করিয়েছে, লোকসভা এবং বিধানসভা উভয়ের জন্যই। গোড়ার দিকে ডাঃ রায় নিজের নির্বাচনী এলাকা নিয়ে একদম মাথা ঘামান নি। ৮ই ফেব্রুয়ারি অতুল্য ঘোষকে নিয়ে বিশেষ বিমানে উত্তরবঙ্গে রওনা হয়ে গেলেন। এইসব ক্ষেত্রে তিনি ছোট একটি স্যুট্‌কেশে টাকা ভর্তি করে নিয়ে যেতেন। কংগ্রেস প্রার্থীরা প্রচার পুস্তিকা, জীপ গাড়ি আর টাকা কংগ্রেস অফিস থেকেই পেতো, তার উপরে এটা ছিল কংগ্রেস নেতা হিসাবে তাঁর বিশেষ ব্যবস্থা। ঘুরে ঘুরে সব দেখেশুনে কোনো প্রার্থীর দরকার বুঝলে তাকে ঐখানেই সঙ্গে সঙ্গে স্যুট্‌কেশ থেকে টাকা বার করে দিয়ে দিতেন তিনি। তাদের এলাকায় মুখ্যমন্ত্রীর জনসভা ও অর্থসাহায্য প্রার্থীকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করে ফেলতো। তাঁর প্রতি তাদের আনুগত্য কেন যে শিথিল হয় নি, এটাই তার সব থেকে বড়ো কারণ।

তিনটি সাধারণ নির্বাচনী প্রচার পরিচালনার সময় আমরা দেখেছি, ডাঃ রায় নিষ্ঠার সঙ্গেই রাজ্য সরকার ও নির্বাচনী কমিশনের নির্দেশ পালন করে গেছেন, যাতে ছিল মফঃস্বলে গেলে সরকারী গাড়ি ব্যবহার করা চলবে না। ১২ই ফেব্রুয়ারি মন্ত্রিসভার বৈঠকে তিনি তাঁর সহযোগী মন্ত্রীদেরও নির্দেশ

দিয়েছিলেন, যখন নির্বাচনী প্রচারে বেরুবেন তখন যেন নিজেদেরকে তাঁরা সাধারণ নাগরিক হিসাবেই মনে করেন। মুখ্যসচিবও সরকারী কর্মচারীদের প্রতি বার বার নির্দেশ জারি করেছিলেন, প্রার্থীদের ব্যাপারে তাঁরা যেন কঠোরভাবে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করেন। আমরা আরও দেখেছি, তিনি এবং অতুল্য ঘোষ দুজনে মিলে যেখানেই নির্বাচনী সভা করেছেন, সেখানেই বিরাট ভিড় হয়েছে। সব জায়গাতেই ডাঃ রায়ের ভাষণের মুল বিষয় ছিল প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে যে সব কৃতিত্বপুর্ণ কাজকর্ম হয়েছে তার বিবরণ।

এই প্রসঙ্গে খুবই চিত্তাকর্ষক হবে যদি সেই সময়কার দ্রব্যমূল্যের কথা তুলে দুটি অতিপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কী ছিল সে কথা বলি। রেশন দোকান থেকে আটা বিক্রি হতো সাড়ে ছয় আনা করে সেরে। আর সরষের তেলের দর ছিল আড়াই টাকা করে। আর এখন নিজেরাই তুলনা করে দেখুন।

সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের আবির্ভাব

আমি একটা কথা বলতে বেমালুম ভুলে গিয়েছিলাম। কোনো এক রবিবারের বিকেলবেলা মুখ্যমন্ত্রী তাঁর একতলার অফিসঘরে বসে কাজ করছিলেন, আর আমরা কয়েকজন ছিলাম পাশের ঘরে। এমন সময় দেখলাম অপূর্ব সুন্দর এক দীর্ঘদেহী যুবাপুরুষ, পরনে খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবী আর পায়ে কালো চপ্পল, মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির পুবদিকের ফটক পেরিয়ে স্প্রিং দরজা ঠেলে হলঘরে ঢুকছেন। আমি আসন ছেড়ে উঠতে না উঠতেই দেখি তিনি হলঘরের মাঝামাঝি এসে দাঁড়িয়েছেন। আমার চিনতে কষ্ট হলো না। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, যিনি ডাঃ রায়কে রাজনীতিতে নিয়ে এসেছিলেন, ইনি তাঁরই দৌহিত্র সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। তাঁকে দেখেই বুঝলাম তাঁর এই আসার কারণ কী হতে পারে। তাঁকে তাড়াতাড়ি বসতে বললাম। তাঁর মুখে তাঁর অভ্যস্ত মধুর হাসিটুকু ফুটে উঠলো, তিনি বসে পড়লেন। আমি টুকরো কাগজে তাঁর নাম লিখে মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে গিয়ে তাঁকে দিলাম। মুখ্যমন্ত্রী সেটা দেখে মাথা নাড়লেন, আর সঙ্গে সঙ্গেই আমি বেরিয়ে এসে ওঁকে ভিতরে যেতে বললাম। গত দশবছরে সিদ্ধার্থবাবুকে একবারও এ বাড়িতে আসতে দেখেছি বলে স্মরণ করতে পারলাম না। বেশ খানিকক্ষণ সময় কাটাবার পর সিদ্ধার্থবাবু বেরিয়ে এলেন খুব চিন্তিত মুখে। আমি তাঁকে ফটক পর্যন্ত

এগিয়ে দিলাম, কিন্তু ভুলেও জিজ্ঞাসা করলাম না যে, তিনি নির্বাচনে দক্ষিণ কলকাতা থেকে কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে দাঁড়াতে রাজী হয়েছেন কিনা।

হ্যাঁ, ডাঃ রায়েরই জয় হয়েছিল, সিদ্ধার্থবাবু রাজী হয়েছেন কংগ্রেস-মনোনয়ন নিয়ে প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে। ১৯৫২ সালের নির্বাচনের সময় ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁকে জনসংঘের প্রার্থী হিসাবে দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তাতে রাজী হন নি। ব্যস্ত তরুণ ব্যবহারজীবীকে রাজনীতির কঠিন পথে টেনে আনা সহজ ছিল না।

ওদিকে প্রজা সোশ্যালিস্ট পার্টির সভাপতি ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, ১৯৪৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এবং কংগ্রেস সংসদীয় পরিষদের নেতা হিসাবে মনোনীত হবার আগে গান্ধীজী তাঁকে হিন্দীতে যে চাঞ্চল্যকর চিঠিখানা লিখেছিলেন, সেটি কাগজে বার করে দিয়েছিলেন। চিঠিখানা ছিল এই :

সর্দার একটা বক্তব্য লিখে পাঠিয়েছেন যে, আপনার মন্ত্রিসভায় একজন মারোয়াড়ী থাকা উচিত, বদ্রিদাস গোয়েঙ্কা অথবা দেবীপ্রসাদ খৈতান। আমার যা মনে হয়, এটা করা যুক্তিযুক্ত হবে, না করা হবে অযৌক্তিক।

কংগ্রেস-প্রচারে প্ররোচিত হয়েই সম্ভবতঃ ডঃ ঘোষ চিঠিখানা ছাপতে দিয়েছিলেন, উদ্দেশ্য ছিল দেখানো যে তাঁকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল বৃহৎ বণিকরা তাঁর প্রতি খাপ্পা হয়েছিলেন বলে। পরের দিন অতুল্য ঘোষ ডঃ ঘোষের তীব্র সমালোচনা করলেন এই চিঠি প্রকাশ করার জন্য। বিশেষ করে গান্ধীজী যে চিঠি প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন, সে চিঠি বার করা তাঁর মোটেই উচিত হয়নি, এই ছিল অতুল্যবাবুর অভিমত।

পয়লা মার্চ পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে শুরু হলো নির্বাচন। নির্বাচিত হবেন ২৫১ জন বিধানসভা সদস্য এবং ৩৬ জন লোকসভা সদস্য! ভোটদাতাদের সংখ্যা আনুমানিক ১৫.২ মিলিয়ন। বিধানসভার জন্য প্রার্থী ছিলেন ৯৪৩ জন, লোকসভার জন্য ৯৯ জন।

কলকাতায় কম্যুনিস্টরাই ছিলেন কংগ্রেসের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁরা পার্ক-গুলিতে নির্বাচনী সভা করার ব্যাপারটা একেবারে একচেটিয়া করে ফেলেছিলেন। এবার তাঁদের শ্লোগান ছিল, বিকল্প সরকার। নির্বাচনী প্রচারে কংগ্রেস তাঁদের সর্বভারতীয় নেতাদের প্রভাব পূর্ণভাবে কাজে লাগিয়েছিল বলা যেতে পারে। নেহেরুকে দিয়ে তা শুরু। তারপরে ছিলেন কংগ্রেস সভাপতি ধেবর, গোবিন্দ-

বল্লভ পন্থ, মোরারজী দেশাই, বক্সী গোলাম মহম্মদ, জগজীবন রাম এবং শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। প্রথম দিনের ভোটগ্রহণের পরে কম্যুনিস্ট দল দাবি তুললেন, পশ্চিমবঙ্গে আবার নির্বাচন করতে হবে, কারণ ভোটের বাক্সগুলো নাকি সিল না ভেঙেও খোলা যাচ্ছে। তাদের এ দাবি অবশ্য নির্বাচনী কমিশন নাকচ করে দিয়েছিলেন।

জেলাগুলির নির্বাচনী ফলাফল যতই আসতে লাগলো, ততই বোঝা যেতে লাগলো, কংগ্রেস তার সংখ্যাধিক্য ঠিক বজায় রেখেছে, আর তার প্রভাব অবশ্যই পড়বে কলকাতার ভোটদাতাদের ওপর। ১০ই মার্চ জানা গেল, যে প্রফুল্লচন্দ্র সেন (রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী), আগের নির্বাচনে নির্দল প্রার্থী হুগলির আরামবাগের ডঃ রাধাকৃষ্ণ পালের কাছে হেরে গিয়েছিলেন (ডঃ পাল পরে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন), সেই তিনি এবার জিতে গেছেন ৩২,৮৫৪ ভোটের সংখ্যাধিক্যে।

ইতিমধ্যে ডাঃ রায়ের নির্বাচনী এলাকায় যারা তাঁর প্রতিনিধি, তারা তাঁর নিজের এলাকার জন্য কিছু সময় দেবার কথা বারবার বলছিল। তারা বলছিল তারা খুবই বিরোধিতার সম্মুখীন হচ্ছে। আমি তিনটি সাধারণ নির্বাচনেই দেখেছি এক শ্রেণীর লোক আছে যারা নিজেদেরকে স্থানীয় নেতা বলে প্রচার করে, আর দাবি করে যে, তাদের এলাকা থেকে বহু স্ত্রী-পুরুষ ভোটদাতাদের দলে টানতে পারবে। এই ধরনের লোকেরাই ডাঃ রায়ের চারপাশে ভিড় করতো সকাল সন্ধ্যা, আর বলতো, কিচ্ছু ভাববেন না সব ঠিক আছে, আপনার এলাকার জন্য কোনো চিন্তা নেই। অথচ ছাত্রপরিষদের নিষ্ঠাবান তরুণ কর্মীরা সন্ধ্যাবেলা আমার ঘরে এসে বলতো অন্যরকম কথা। তারা বলতো, এখনো সময় আছে ডাঃ রায়ের উচিত তাঁর নির্বাচনী এলাকায় একটু ঘোরা। নইলে পরে অনেক দেরি হয়ে যাবে। তাঁর উপস্থিতি কর্মীদের উৎসাহ দেবে, ভোটদাতাদের খুশি করবে।

ডাঃ রায় তাঁর নির্বাচনী এলাকায় পায়ে হেঁটে ঘুরতে লাগলেন। প্রত্যেক বস্তিতে তিনি গেছেন, ছোট ছোট ব্যবসায়ী আর দোকানদারদের সঙ্গে দেখা করেছেন, বিশেষ করে মুসলমানদের সঙ্গে, যারা সংখ্যার দিক থেকে ভারসাম্য রক্ষা করছিল। ভোটের দু দিন আগে তিনি মুসলমান-প্রধান এলাকায় অবস্থিত নাখোদা মসজিদে গিয়েছিলেন। ইমাম তাঁকে অভ্যর্থনা করে ওপরে

নিয়ে গেলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁর সঙ্গে তখন যারা গিয়েছিল তাদের মধ্যে এমন লোক ছিল যারা গত কলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় অশেষ কুখ্যাতি অর্জন করেছিল। এই লোকটির মসজিদ প্রবেশ কৌশলগত ভুল ছাড়া আর কিছুই নয়। এর ফলে তাঁর পক্ষে মুসলিম ভোট কমে গিয়েছিল, আর তা স্পষ্ট দেখা গিয়েছিল ভোট গণনার সময়। যাইহোক, মুখ্যমন্ত্রীর এই সব পায়ে-হাঁটা সফরের সময় তাঁর কাছাকাছি থাকবার আগ্রহে আমার একটা ব্যক্তিগত ক্ষতি হয়েছিল। আমার মনিব্যাগটি চুরি গিয়েছিল। তাতে এমন বেশি কিছু ছিল না, ছিল কয়েক আনা পয়সা মাত্র। কিন্তু এ কথাটা কে ডাঃ রায়ের কানে তুলেছিল জানি না, তিনি ঐ রাত্রেই আমাকে একটি নতুন মনিব্যাগ কিনে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

১৪ই মার্চ শান্তিপূর্ণভাবেই কলকাতার ভোটপর্ব শুরু হলো। এর আগের রাত্রে সমস্তক্ষণই আমাদের থাকতে হয়েছিল, অফিসে বহু লোক আসছিল, শেষ মুহূর্তে তাদের কী করণীয় তা জানতে। নির্বাচনী প্রচারকদের মধ্যে আমার বেশ কিছু বন্ধু ছিল যারা কখনো সখনো মুখ্যমন্ত্রীকে মুখ দেখাতো, কিন্তু তাদের কাজ তারা করে যেতো নীরবে এবং একনিষ্ঠভাবে। এরা আমাকে অফিস ছেড়ে যেতে দেয় নি। ভোটদান পর্ব শুরু হলো সকাল আটটায়। সারা দিন ধরে টেলিফোন আসছিল নির্বাচন কেন্দ্র থেকে, ভোটদাতাদের কাছ থেকে, জনসাধারণের কাছ থেকে। কেউ চাইছিলেন গাড়ি, কেউ খাবার প্যাকেট পাঠাতে বলছিলেন, কেউ অভিযোগ করছিলেন ওপক্ষে জাল ভোটাররা ভোট দিচ্ছে। কলকাতা পুলিশের একজন সার্জেণ্টের কথা শোনা গেল সে নাকি কর্তব্যরত অবস্থায় প্রকাশ্যে ভোটদাতাদের প্ররোচিত করছিল কম্যুনিস্ট পার্টির স্বপক্ষে ভোট দিতে। সঙ্গে সঙ্গে খবরটা পুলিশ কমিশনারের গোচরে আনা হলো। ঐ সার্জেণ্টকে ধরে তার ইউনিফর্ম কেড়ে নিয়ে তাকে আটক করে রাখা হলো জিজ্ঞাসাবাদের জন্য।

দুপুরের খাওয়াদাওয়া চুকলে পর ডাঃ রায় কংগ্রেস অফিসে ফোন করে কয়েকজন শক্তসমর্থ স্বেচ্ছাসেবক চাইলেন তাঁর সঙ্গে বেরোবার জন্য। তিনি তাদের নিয়ে কয়েকটি জায়গায় ঘুরবেন। যথারীতি তারা এলো আর উনিও বেরোলেন। ফিরে এলেন ঘণ্টাখানেক পরে। শোনা গেল তাঁকে টিটকারি দেওয়া হয়েছে, গালাগালি দেওয়া হয়েছে এবং মারমুখী বিক্ষোভের সামনেও

তাঁকে পড়তে হয়েছিল। চেহারা দেখেই বুঝতে পারলাম তিনি খুব ধাক্কা খেয়েছেন। তিনি বুঝতে পেরেছেন তাঁর নির্বাচনী কর্মীদল ঠিকমতো সংগঠিত হয় নি, কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত তাঁর কিছু কর্মী তাঁর প্রতি বিলক্ষণ বিশ্বাসঘাতকতাও করেছে।

ভোটগ্রহণের কাজ শেষ হয়ে যাবার পর আমরা বাইরে কানে তালা লাগবার মতো আওয়াজ হচ্ছে শুনতে পেলাম। বাইরে এসে দেখি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে নিয়ে বিরাট এক বিজয়-মিছিল চলেছে তাঁর বাড়ির সামনে দিয়ে। আমি ত হতভম্ব। ভোট গোণা হলো না, এর মধ্যে বিজয়-মিছিল বার হয়ে গেল!

কিছুক্ষণের মধ্যেই মুখ্যসচিব এস এন রায় এলেন। তাঁর সঙ্গে এলেন পুলিশ কমিশনার হরিসাধন ঘোষ চৌধুরী। মুখ্যসচিব তাঁকে বললেন, ওখানে যে মিছিলকারীরাই থাকুক না কেন, সরিয়ে দেবেন।

তাই করা হলো। কিছুক্ষণের মধ্যে ডাঃ রায় আবার যেখানে গিয়েছিলেন সেখান থেকে ফিরে এলেন। ততক্ষণে তাঁর বাড়ির উঠোনে তাঁর কর্মী যারা বিভিন্ন নির্বাচনী কেন্দ্রে কাজ করছিল তারা ফিরে এসেছে। ওদের অনেককেই খুব উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল। তাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে ডাঃ রায় বললেন, নিরাশ হয়ো না। আমি যদি হেরেও যাই, কংগ্রেস জীবিত থাকবে।

এরপরে এলো সেই সংকটময় দিন, ১৭ই মার্চ রবিবার। রোজকার মতো রোগী দেখে কয়েকজন অভ্যাগত ও কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে তিনি সাড়ে আটটা নাগাৎ মহাকরণে চলে গেলেন। মহাকরণের বারান্দায় দেখতে দেখতে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। তিনি রোজকার ফাইল দেখলেন, কিছু চিঠির ডিকটেশন দিলেন। প্রায় বারোটার সময় তাঁর ভাইপোর স্ত্রী শ্রীমতী অর্চনা রায় ও তাঁর ছোট ছেলেমেয়েরা এলেন তাঁর দুপুরের খাবারটা সঙ্গে নিয়ে। তখন কোনো সাক্ষাৎকারী ছিলেন না। ঠিক বারোটার সময় ১৮টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভোট গোণা হয়ে গেছে বলে সে সবগুলির ফলাফলের খবর এসে পড়লো। ডাঃ রায়ের থেকে ইসমাইল এগিয়ে আছে ১২০০ ভোটে।

তাই নাকি? খবরটা শুনে তিনি অল্প একটু হাসলেন, বললেন, এতোটা তফাৎ? বলে তিনি আসন ছেড়ে লাউঞ্জে গেলেন খেতে। সেখানে তাঁর আত্মীয়েরা অপেক্ষা করছিলেন। সাধারণতঃ তাঁর খাওয়ার সময় তাঁর পরি-

বারের লোকজন তাঁর অফিসে উপস্থিত থাকতেন না। কিন্তু এবার হয়েছিল ব্যতিক্রম। দিনটির গুরুত্ব বুঝে তাঁরা তাঁর কাছে থাকতে চেয়েছিলেন।

এইখানে একটা কথা বলে রাখি। অমন কর্মব্যস্ত জীবনেও তিনি সময় করে মাঝে মাঝে তাস নিয়ে বসতেন মাথা ঠাণ্ডা করবার জন্য। সারা দিনের কর্মব্যস্ততার পর অথবা যখন কলকাতা কোনো কারণে বিশেষভাবে তোলপাড় তখন তিনি অল্প কিছুক্ষণের জন্য হলেও বিছানায় বসে তাস নিয়ে একটু পেসেন্স খেলে নিতেন।

যাই হোক, খাবার পর শুনলাম বেশ ভালো একটু ঘুমিয়েও নিয়েছেন। তিনি প্রায় আড়াইটার সময় লাউঞ্জ থেকে উঠে তাঁর অফিসঘরে এলেন। আরও ৩২টি কেন্দ্রের ফল ইসমাইলের অগ্রগতির সংখ্যা কমিয়ে ৫০০তে এনে দাঁড় করিয়েছে। উত্তেজনা আরও বাড়তে থাকলো। পরের ১০টি কেন্দ্রের ফলাফল ডাঃ রায়কে এগিয়ে দিলো ১০০ ভোটে। তাঁর এই অগ্রগামিতা আস্তে আস্তে বেড়ে দাঁড়ালো ৩১৪ ভোটে। তখন বিকেল হয়ে গেছে। সময় মতো চূড়ান্ত ফলাফল যতো এগোচ্ছিল ঘোষণার দিকে, পরিস্থিতি হয়ে উঠেছিল ততই ঘোরালো। টেবিলের চারটি ফোন ক্রমাগত বেজে চলেছিল। একই প্রশ্ন, খবর কী? উনি এগিয়ে আছেন ত?

যাই হোক, শেষের কয়েকটি বাক্স ডাঃ রায়কে এগিয়ে দিলো ৪৩০ ভোটে। ডাকযোগে আসা ভোটগুলি (পোস্টাল ব্যালট) গোণবার পর এই সংখ্যা আরও বেড়ে দাঁড়ালো ৫৪০ ভোট। সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত আমরা রুদ্ধ-শ্বাসে অপেক্ষা করছিলাম। ঐ সময়ই চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করা হলো। কিন্তু সাড়ে চারটা থেকেই মহাকরণে লোক আসছিল মালা নিয়ে, ফুল নিয়ে, কেউ বা শুধু হাতে।

এই সময় খুব সুন্দর চেহারার একটি শিখ যুবক সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কোনো একটি ইংরেজী ভাষাভাষী ইউনিয়নের সেক্রেটারি বলে নিজের পরিচয় দিয়েছিল সে। সেই সময় মুখ্যমন্ত্রীর ঘরের দরজা একেবারে খুলে দেওয়া হলো, পাহারাদারীর কাজটাও অনেক শিথিল করে দেওয়া হলো। এমন সময় ওঁর বাড়ি থেকে এলো টেলিফোন। জানা গেল ওঁর বাড়ির সামনে লোকে লোকারণ্য এবং তার ওপর আসছে ক্রমাগত আরও লোক। খবরটা ডাঃ রায়কে জানাতেই তিনি উঠে পড়লেন—নিচে নেমে একেবারে গাড়ির

ভিতরে ঢুকে গেলেন। আমরা অবাক হয়ে দেখলাম, সেই শিখ যুবকটি তাঁর পাশে গিয়ে বসেছে। তাঁর গাড়ি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, আর যতই বাড়ির কাছাকাছি হচ্ছে, ততই জনতা যেন উল্লাসে ফেটে পড়ছে। প্রবল জয়ধ্বনি উঠতে লাগলো জনতার মধ্য থেকে, ডাঃ রায় কি জয়! ওড়িষ্যাবাসীদের দল শাঁখ বাজাতে লাগলো, তার সঙ্গে আবার খোল।

ডাঃ রায় সোজা ওপরে উঠে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন, যাতে লোকে তাঁকে পরিষ্কার দেখতে পায়। এই রকম বার কয়েক তাঁকে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াতে হলো জনতার আহ্বানে। তাঁর এই জয় কিন্তু কমিউনিষ্ট দলকে বেশ ঘা দিয়েছিল। যেখানে ভোটগণনা হচ্ছিল, সেটা হচ্ছে চৌরঙ্গী। এখন যেখানে জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার অফিস, তারা সেখানে একটি ব্যাণ্ড পার্টি তৈরি করে রেখেছিল। কিন্তু বাজানো আর হলো না, শুকনো মুখে ব্যাণ্ড পার্টি ফিরে গেল। সেদিন কংগ্রেস আর বিরোধীদের মধ্যে সংঘর্ষে ৪৩ জন লোক আহত হয়েছিল। ডাঃ রায়ের জয় সর্বত্রই বিশেষ আদৃত হলো। এমন কি ঝানু বামপন্থীদের মধ্যে একজন নাম করা বামপন্থী তাঁকে টেলিফোনে অভিনন্দন জানালেন—বললেন, ডাঃ রায়, এটা বোঝা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস জিতে যাবে, আর এ রাজ্যে আপনি ছাড়া কংগ্রেস প্রশাসনকে নেতৃত্ব দেবে কে!

এই ঘটনার দুদিন পরে ছাত্র পরিষদের একজন নেতা আমাকে গোপনে জানালেন, নির্বাচন দারুণ সাম্প্রদায়িক গোলমালের দিকে মোড় নিচ্ছিল, তা জানেন! মহম্মদ ইসমাইল যদি নির্বাচিত হতেন, তাহলে তিনি হতেন মুখ্যমন্ত্রী আর তিনি যদি মুখ্যমন্ত্রী হতেন, তাহলে কলকাতা চলে যেতো পাকিস্তানে, যেমন চলে গেছে কাশ্মীরের অর্ধেকাংশ—এই ছিল রটনা। গোপন পুলিশ রিপোর্টে জানা গেল, মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচনী এলাকায় পাকিস্তানী দালালরা সক্রিয় ছিল, বিদেশী টাকার খুবই ছড়াছড়ি হয়েছিল তাঁকে হারিয়ে দেবার জন্য। এই তথ্য মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায়ও দিয়েছিলেন মার্চের ১৮ তারিখে।

যাই হোক, ১৯৫৭ সালের সাধারণ নির্বাচন পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসকেই ক্ষমতায় বসালো। বিধানসভার ২৫২টি নির্বাচনযোগ্য আসনের মধ্যে পুরুলিয়ার ১১টি আসনসহ কংগ্রেস দখল করেছিল ১৫২টি আসন, সংখ্যাধিক্য ছিল ৫৪, ১৯৫২-এর নির্বাচনের যে সংখ্যা ছিল ৬০; বিরোধীদের সংখ্যা ৫৭ থেকে বেড়ে এবার হয়েছিল ৮০।

দিল্লী খুব অবাক হয়েছিল, যখন আকাশবাণীর মারফৎ তাঁরা শুনলেন, ডাঃ রায় মাত্র ৫৪০ ভোটে জিতেছেন। প্রধানমন্ত্রী ও অন্য কয়েকজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তাঁকে ফোনে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন অবশ্য। ১১ই মার্চ যখন জেলার ফলাফল কিছু কিছু আসতে লাগলো, তখন ডাঃ রায় নেহেরুকে একখানি খুব চিত্তাকর্ষক চিঠি লিখেছিলেন। চিঠির বয়ান হলো এই :

প্রিয় জওহর,

তিনটির ফলাফল এখন বেরিয়েছে আর এগুলি এত দরকারী যে তোমাকে জানানো কর্তব্য বলে আমি মনে করি। প্রথমটি হচ্ছে প্রফুল্লচন্দ্র সেনের। ইনি একজন ফরোয়ার্ড ব্লক প্রার্থীর আসন ছিনিয়ে নিয়েছেন ; ৩২০০০ ভোটে তাঁকে পরাজিত করেছেন। তাঁর প্রতিযোগী দিকপতি, একজন উকিলের মুহুরী মাত্র। একটি সংরক্ষিত আসনে একজন সি পি আই প্রার্থীর আসনও কেড়ে নিয়েছেন শ্রীসেন ৫৫০০০ ভোট পেয়ে, আর ঐ সি পি আই প্রার্থীটি পেয়েছেন মাত্র ২৭০০০ ভোট।

অন্য সব ফলাফল কম চিত্তাকর্ষক নয়। একটি হিন্দুপ্রধান অঞ্চল, সেখানে মুসলমানের সংখ্যা মাত্র ২৮ শতাংশ, আর গতবারে যেখানে একজন হিন্দু মহাসভা প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছিলেন, সেখানে আমরা একজন মুসলমান প্রার্থী আবদুস সাত্তারকে দাঁড় করিয়েছিলাম। আবদুস সাত্তার পেয়েছেন প্রায় ৩২০০০ ভোট আর হিন্দু মহাসভার প্রার্থী তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় পেয়েছেন ১০০০০, এবং সি পি আই প্রার্থী পেয়েছেন ১৩০০০ ভোট। কোচবিহার নির্বাচনী এলাকায় যেখানে মুসলমানের সংখ্যা ৩৩ শতাংশ, সেখানে একটি সাধারণ আসনে একজন মুসলমান প্রার্থী ৬০০০ বেশি ভোট পেয়েছেন একজন ফরোয়ার্ড ব্লক প্রার্থীর থেকে। ফলাফলগুলো চিত্তাকর্ষক নয় কী !

তোমার স্নেহের

বিধান

কংগ্রেসের সংসদীয় দলের নেতা হিসাবে ডাঃ রায়ের পুনর্নির্বাচন

২রা এপ্রিল নব নির্বাচিত কংগ্রেস সংসদীয় দল কলকাতায় এক বৈঠকে বসলেন তাঁদের নেতা এবং কার্যকরী সমিতির সভ্য নির্বাচিত করবার জন্য। প্রফুল্ল সেন নেতা হিসাবে ডাঃ রায়ের নাম প্রস্তাব করলেন। বলা বাহুল্য

তিনি পুনর্নির্বাচিত হলেন সর্বসম্মতিক্রমে। আর নেতা হিসাবে তাঁর ওপর ক্ষমতা বর্তালো অন্য সদস্যদের বেছে নেবার। এখানে আর যে সব আলোচনা হয়েছিল তার মধ্যে সংগঠনের কিছু কিছু দুর্বলতার কথাই প্রাধান্য পেয়েছিল বেশি। তিনি বলেছিলেন, কর্মীর সংখ্যা বাড়াতে হবে, তাদের জন্য শিক্ষা শিবির খুলতে হবে, পূর্ণ সময়ের কর্মীদের কিছু কিছু করে নিয়মিত টাকাও দিতে হবে, কোনো কোনো বামপন্থী দল যেমন দেয়।

এর কিছু দিন পরে একদিন সকালবেলা ডাঃ রায় তাঁর বাড়িতে তাঁর ঘরে আমাকে ডেকে পাঠালেন। তাঁর হাতে দু একখানা সাদা কাগজ, তাতে কয়েকটি নাম তিনি লিখে রেখেছেন দেখলাম। ১৯৫২র নির্বাচনেও ঠিক এই রকম হয়েছিল। ঐ কাগজে মন্ত্রিসভায় যাঁদের তিনি নিচ্ছেন তাঁদের নাম ছিল। এই নামগুলি তিনি সুপারিশ করে পাঠাচ্ছেন কংগ্রেস সভাপতির কাছে তাঁর অনুমোদনের জন্য। আমাকে ডিকটেশন দিয়ে চিঠির আকারে তিনি নামের তালিকাটি তৈরি করলেন, বললেন, খবরদার এটা যেন গোপন থাকে।

বলাবাহুল্য আমি সচেতন ছিলাম। আমি জানতাম, একটু খবর যদি কোন রকমে ফাঁস হয় তাহলে ওঁর পক্ষে সেটা হবে খুবই অস্বস্তিকর, আর দলের মনেও দেখা দেবে অসন্তোষ। আগের এবং পরের নির্বাচনকালে যা হয়েছিল। ১৯৫২ এবং ১৯৬২-এর নির্বাচনের কথা বলেছি। এই সময়টা ছিল আমার পক্ষে বিরাট পরীক্ষার কাল। মন্ত্রিসভায় কে কে আসছেন এই নিয়ে কাগজগুলোতে জল্পনা-কল্পনার অন্ত থাকে না। আর কতগুলো নাম তাদের আন্দাজমতো সত্যিও হয়ে যায়। কিন্তু কোন কাগজই পুরোপুরি সত্যি নামগুলোর তালিকা বার করতে পারে নি। দেখে আমিও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলাম। কোন কোনো সম্ভাব্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী আমার কাছে থেকে খবর জানতে চেষ্টা করতেন, আমিও কোন রকমে তাঁদের এড়িয়ে যেতাম।

রাজ্যপাল এবং মন্ত্রীদের আচরণবিধি সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী

এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহে মুখ্যমন্ত্রী একটি চিঠি পেলেন প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে। এটি সমস্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের কাছে পাঠানো হয়েছিল। এতে নেহেরু লিখেছেন : আমি দেখছি, কী রাজ্যে কী কেন্দ্রে মন্ত্রীরা ক্রমশঃই এমন দিকে যাচ্ছেন যা তাঁদের বাস্তবিকতার দিক দিয়ে ও মনস্তাত্ত্বিক

দিক দিয়ে জনসাধারণের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। গণতান্ত্রিক সরকারের জনসংযোগের বিশেষ প্রয়োজন আছে। এ দিক দিয়ে যদি কোনো বাধা আসে তাহলে তা বিশেষ ক্ষতিকর হবে। অবশ্য তাদের কাজে খুব বেশি ব্যস্ত থাকতে হয় বলে স্বাভাবিকভাবেই মন্ত্রীদের পক্ষে জনসংযোগের ব্যাপারে বেশি সময় বা সুযোগ পাওয়া কঠিন হয়ে ওঠে। কিন্তু তবু আমার মনে হয় অফিসে যারা সর্বক্ষণ কাজ করে তাদের মধ্যে এক ধরনের বিচ্ছিন্নতাবোধ গড়ে উঠতে পারে, কিন্তু সেটা যাতে না হয় সে বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। আমি বলতে চাই না যে আমাদের মন্ত্রীরা জনগণের কাছ থেকে তাঁদের বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছেন, কিন্তু সেদিকে যে একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছে সেটা অস্বীকার করা যায় না, আর সেজন্য সে ভাবটাকে রোধ করাও দরকার।

যার ওপর জোর দিতে চাই সেটা হচ্ছে কাজের জায়গায় জাঁকজমক আর আনুষ্ঠানিক ব্যাপারগুলোকে আমাদের সযত্নে পরিহার করা উচিত। কাজের ব্যাপারে আমাদের সাধারণ নাগরিকদের মতো চলতে হবে। আর সফর করতে যখন যাবো, তখন যতদূর সম্ভব ঐ সব জাঁকজমক পরিহার করবো। অনাবশ্যক সাজসরঞ্জামও বাদ দিতে হবে। ব্রিটিশ আমলে উঁচু মহলে যে সব কেতাদুরস্ত ভাবের আতিশয্য ছিল তা আমরা বহুলাংশে বাদ দিয়েছি, কিন্তু তবু এখনো কিছু রয়ে গেছে।

সফরের সময় মন্ত্রীদের অনেক সময় খুব জরুরী কাজ করতে হয়, বৈঠক করতে হয়। এ সব করার জন্য তাঁদের সুযোগ সুবিধা থাকা দরকার এবং প্রয়োজন মতো তাঁরা সেলুনও ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু প্রয়োজন না হলে সেলুন ব্যবহার যথাসম্ভব না করাই ভালো। আমি বিশেষ করে বলবো, মন্ত্রীদের সঙ্গে যে সব চাপরাশী যায় তাদের কথা। প্রয়োজন হলে তাদের নিয়ে যাওয়া হোক, কিন্তু তা না হলে এদের পরিহার করাই ভালো। এই লালকোট পরা চাপরাশীর দল মন্ত্রীরা যেখানে যাবেন তাঁদের সঙ্গে যাবে, এটা হচ্ছে পুরানো কেতার একটা অঙ্গবিশেষ, যতটা শোভার জন্য, ততটা আর কিছুর জন্য নয়।

আমার পরামর্শ হচ্ছে, রাজ্যপালদের পর্যন্ত এই ব্যাপারটা ভেবে দেখা উচিত এবং তাঁদের উচিত যতোটা সম্ভব কেতাদুরস্ত ভাব ও জাঁকজমক

কমিয়ে দেওয়া। রাজ্যের প্রধানের পক্ষে একটা সম্ভ্রম ও আনুষ্ঠানিক ভাব থাকা উচিত, কিন্তু এ সব দিক বাড়িয়ে চলবারও একটা প্রবণতা আমি লক্ষ্য করছি—যা ব্রিটিশ আমলে শোভা পেতো, কিন্তু এখন পায় না।

জে নেহেরু

১৯. ৪. ৫৭

২৫শে এপ্রিল সকালবেলা ২৮ আসনের একটি ডাকোটা বিমান দমদম বিমান বন্দর থেকে আকাশে উড়লো ডাঃ রায় এবং ২০ জন কংগ্রেস এম এল এ-কে নিয়ে। অন্য ছজন আগেই রওনা হয়ে গিয়েছিলেন। গন্তব্যস্থল দার্জিলিং। তখনো কিন্তু কাউকেই তিনি আশ্বাস দিতে পারলেন না যে তাঁকে মন্ত্রিসভায় নেওয়া হবে, কারণ দিল্লীর অনুমোদন তখনো এসে পৌছয় নি। সুতরাং সবাই ছিলেন একটা অনিশ্চিত অবস্থায়। যাই হোক, দিল্লীর অনুমোদন এসে গেল, যখন দলটি গিয়ে দার্জিলিং পৌছলো। ২৬শে এপ্রিল সকালবেলা ডাঃ রায়ের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গের তৃতীয় মন্ত্রিসভা গঠিত হলো দার্জিলিঙে। মন্ত্রিসভায় ছিলেন মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে ১৩ জন পূর্ণমন্ত্রী—প্রফুল্ল সেন, অজয় মুখোপাধ্যায়, ঈশ্বরদাস জালান, খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ডাঃ আর আমেদ, হেমচন্দ্র নস্কর, শ্যামাপ্রসাদ বর্মন, ভূপতি মজুমদার, বিমলচন্দ্র সিংহ, সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, এবং আবদুস সাত্তার। প্রতিমন্ত্রী ছিলেন তিনজন—পুরবী মুখোপাধ্যায়, তরুণকান্তি ঘোষ, ও ডাঃ অনাথবন্ধু রায়। ১২ জন উপমন্ত্রীর মধ্যে একজন ছিলেন তরুণী—মায়া বন্দ্যোপাধ্যায়।

নির্বাচনের পরে যে দুটি জিনিস ডাঃ রায়ের মনোযোগ বিশেষভাবে আকর্ষণ করছিল, তার মধ্যে একটি হচ্ছে কলকাতার বস্তিগুলি। এইসব বস্তিতে শোচনীয় ভাবে বাস করে পাঁচ লক্ষ লোক, আর এই সব লোকরাই নির্বাচনের সময় কংগ্রেস-বিরোধীদের সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়েছিল। বিরোধীদের [illegible]র থেকে এদের সরিয়ে আনবার জন্য শহরের কলঙ্কস্বরূপ এই সব বস্তির সংস্কার করা দরকার বলে তিনি মনে করেছিলেন। অন্য জিনিসটি হলো তাঁর প্রিয় আদর্শ, গ্রাম পরিকল্প অনুসারে পল্লী পুনর্গঠন।

মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী টি টি কৃষ্ণমাচারীকে কলকাতায় আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, আর সেই মতো তিনি কলকাতায় এলেন ১৯শে মে। বস্তি

সংস্কার নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা হলো কৃষ্ণমাচারীর সঙ্গে, আলোচনা হলো এ-কাজের জন্য কেন্দ্রীয় আর্থিক সহায়তা কতটা পাওয়া যাবে তাই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী কৃষ্ণমাচারীকে সকালবেলা গাড়িতে করে বর্ধমান জেলার একটি গ্রামে নিয়ে গিয়েছিলেন। ১৯৫৬র বন্যার পরে তিনি যে নিজের বাড়ি নিজে করো পরিকল্পের প্রবর্তন করেছিলেন, সেইমতো ঐ গ্রামটি একটি আদর্শ গ্রাম হিসাবে তৈরি করা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী একটি সমাজকেন্দ্রের ভিত্তি স্থাপন করলেন, আর ঘুরে ঘুরে দেখলেন, আরও অনেক বাড়ি তৈরি হয়ে গেছে এর মধ্যেই। লক্ষ্য করবার মতো, গ্রামের লোক নিজেরাই নিজেদের বাড়ি করবার জন্য প্রায় ৪.৭ মিলিয়ন ইঁট তৈরি করেছিল। এই সূত্রে প্রধানমন্ত্রীকে ডাঃ রায় একখানা চিঠি লিখেছিলেন ২০শে মে তারিখে। সেই চিঠিতে কৃষ্ণমাচারীকে নিয়ে তিনি যে কালনা গিয়েছিলেন সে কথা লিখে প্রসঙ্গত বলেছিলেন :

তুমি জানো, গত বন্যায় প্রায় দুলক্ষ ঘর ওখানে ভেঙে পড়েছিল। তাদের বলা হয়েছিল যদি কোনো লোক তার নিজের বাড়ি করার জন্য ইঁট পুড়িয়ে তৈরি করতে চায়, তাহলে তাকে কয়লা দেওয়া হবে। আবার যেই বাড়ি হয়ে যাবে তখন ছাদ তৈরি করার জন্য তাকে করোগেটেড টিন দেওয়া হবে। আমরা কৃষ্ণমাচারীকে নিয়ে গিয়েছিলাম সেই জায়গায়—যেখানে লোকেরা নিজেরা ৩৫টি ঘর ঐ ভাবে তৈরি করা শেষ করেছে অথবা করতে যাচ্ছে। নিজেদের কাজ নিজেরা যে করতে পেরেছে এতে লোকেরা কম আত্মপ্রসাদ অনুভব করে নি। বাংলায় লোকেরা নিজেদের চেষ্টায় তিন মাসের মধ্যে ১০ কোটি ইঁট তৈরি করে পুড়িয়ে নিয়েছে। এতে আমাদের অনেকেরই চোখ খুলে গেছে। বাংলায় আমরা মোট ইঁট তৈরি করে থাকি ১০০ কোটি আর তার বেশির ভাগটাই করে থাকে পেশাদার ইঁট বানিয়েরা। ইঁটের ১০ শতাংশ তৈরি করে লোকেরা নিজেরাই। বারান্দা নিয়ে একখানা ঘরের দাম পড়ে প্রায় ৩০০ টাকা। এই পথে লোকেরা যে কী ভাবে স্বাবলম্বী হয়েছে তা দেখে সত্যিই আনন্দ হয়।

আমি কৃষ্ণমাচারীকে এ বিষয়ে সাহায্য করতে বলেছি।

বিকেলবেলা দুটি জরুরী সমস্যা নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম। এক হচ্ছে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন, অন্যটি হচ্ছে কলকাতা শহরের বস্তি-সংস্কার। তুমি

জানো, গত নির্বাচনে শহর এবং শিল্প এলাকায় আমরা ভীষণভাবে হেরে গিয়েছিলাম প্রধানতঃ দুটি কারণে—একটি হচ্ছে, যেখানে উদ্বাস্তুরা জড়ো হয়েছে তাদের অস্থায়ী শিবিরগুলোতে, সেখানে তাদের অবস্থায় তারা যে খুশি নয় সেটা দেখাতে সরকারের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, যেখানে গ্রামে আমরা বেশ খানিকটা কাজ করেছি, সেখানে শহরগুলোতে আমরা কিছুই করি নি। কলকাতা পুরানো যুগের সেই নোংরা কলকাতাই রয়ে গেছে। তার ওপর বেড়েছে আরও লোকসংখ্যা, বেড়েছে আরও অপরিচ্ছন্নতা।

আমি, কৃষ্ণমাচারী ও ডাঃ জে সি ঘোষ ২৬শে রবিবার ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকের পর তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই, ধরো,—সাড়ে ছটা নাগাৎ, যদি তোমার সুবিধা হয় তো আমাকে জানিও।

তোমার স্নেহের
বিধান

বিধানসভায় বাজেট অধিবেশন

৪ঠা জুন যখন রাজ্যপাল নতুন বিধানসভার অধিবেশন শুরু করলেন অথচ অর্থমন্ত্রী পূর্বঘোষিত কর্মসূচি মতো ১৯৫৭-৫৮ সালের বাজেট পেশ করতে পারলেন না, তখন একটা নজিরই সৃষ্টি হলো বটে। ঐ দিন বিধানসভার অধ্যক্ষ পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কংগ্রেস মনোনীত শঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে হেরে গিয়েছিলেন শিশিরকুমার দাস। তিনি একটি বৈধতার প্রশ্ন তুলে বললেন, রাজ্যপালের ভাষণের পর ধন্যবাদ জ্ঞাপনের প্রসঙ্গ উত্থাপন হয়ে থাকে। নিয়ম অনুসারে এর পরে আর কোনো কাজ করা চলে না। এর উত্তরে আইনমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় তাঁর প্রথম ভাষণ দিতে উঠলেন। সরকার পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে তিনি সংবিধানের ১৯৫৭-এর সংশোধনী-প্রসঙ্গ তুলে দেখিয়ে দিলেন যে রাজ্যপালের ভাষণের ওপরে বিতর্ক শুরু হবার আগে অন্য বিষয় নিয়ে আলোচনা চলতে পারে। সিদ্ধার্থবাবু পরে বিধানসভায় একজন বিশিষ্ট বক্তা হিসাবে এবং সংসদীয় বিষয়ে সুদক্ষ ব্যক্তি হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, প্রথমে বিরোধীপক্ষের একজন সভ্য হিসাবে, পরে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে।

যাই হোক, আপার হাউস বা বিধান-পরিষদের হাতে সময় ছিল মাত্র ১০ মিনিট। এতে আর কতটুকু কাজ করা যাবে? রাজ্যপালের ভাষণে ছিল খাদ্যমূল্য বৃদ্ধির কথা, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কথা, তিনটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় যথা উত্তরবঙ্গ, কল্যাণী এবং বর্ধমানের কথা। আর ছিল বস্তি সংস্কারের কথা।

পরের দিন বিধানসভায় অর্থমন্ত্রী হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী ১৯৫৭-৫৮-র বাজেট পেশ করলেন। রাজস্ব খাতে ৬১,৮৮,৮৭,০০০ টাকা আর ব্যয়বরাদ্দ হিসাবে দেখানো হয়েছিল ৭২,১৭,৫২,০০০ টাকা। ঘাটতি ১৩ কোটি টাকারও বেশি। কিন্তু তবু নতুন ট্যাক্স বসানোর প্রস্তাব ছিল না। কয়েকটি মূল সমস্যার কথা বলতে গিয়ে তিনি বললেন, রাজ্যের ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়েছে নিদারুণ ঘনবসতিপূর্ণ লোকসংখ্যার। প্রচুর সংখ্যায় রয়েছে উদ্বাস্তুরা, তার ওপর পূর্ব পাকিস্তান থেকে ক্রমাগত আরও লোক এসে প্রশাসন ব্যবস্থাকে আরও জটিলতার সম্মুখীন করে তুলছে। পৃথিবীর সব থেকে ঘনবসতিপূর্ণ জায়গা হচ্ছে কলকাতা। আর গ্রামাঞ্চলে কৃষি পরিবারগুলির ৭০ শতাংশেরও বেশি পরিবার তাদের সম্বৎসরের খোরাকি উৎপন্ন করতে পারে না। শিল্প এলাকায় রাজ্যের লোকেরা দক্ষ অথবা অদক্ষ শ্রমিক হিসাবেও কাজ পায় না, সেখানে বাইরের লোকের ভিড় এবং প্রতিপত্তিই বেশি।

তাঁর বাজেট বক্তৃতায় মুখ্যমন্ত্রী (তথা অর্থমন্ত্রী) কেন্দ্রীয় সরকার যে রাজ্যকে তার দাবির বিষয়ে উপেক্ষা করছেন সে প্রসঙ্গও তুলতে দ্বিধা করেন নি। ট্যাক্স বসানোর ক্ষমতার তারতম্যের কথাও তিনি উল্লেখ করলেন। কৃষিজাত সম্পদের ওপর রাজ্য সরকারকে ট্যাক্স বসানোর ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে কিন্তু শিল্পক্ষেত্রে ট্যাক্স বসানোর অধিকার একমাত্র কেন্দ্রের, সেখানে রাজ্য সরকারের কিছু করবার নেই।

১লা জুলাই-এর অনুষ্ঠান

ডাঃ রায়ের জন্মদিন জাতীয় উৎসবে পরিণত হচ্ছিল বলা চলে। সকাল থেকে দলে দলে লোক আসতো তাঁর বাড়ি ফুল, ফল, মিষ্টি নিয়ে। আর এই ফুল, ফল, মিষ্টি যে হাসপাতালে রোগীদের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হতো সে কথা আগেই লিখেছি। যারা আসতো তাদের মধ্যে অকম্যুনিস্ট ট্রেড ইউনিয়ন

সংগঠনের লোকেরাই ছিল বেশি। যে কেউ আসতো একেবারে ওপরে চলে যেতো তাদের নেতার কাছে। তবে এই সব ভিড়ের মধ্যে একটা জিনিস দেখে খুব মজা লাগতো। সেটা হচ্ছে, জনা-কয়েক সরকারী কর্মচারীর মধ্যে প্রতিযোগিতা। তার মধ্যে একজন ডেপুটি সেক্রেটারি আর একজন বিভাগীয় অধিকর্তা। প্রতিযোগিতা ছিল কে আগে ওঁর বাড়ি পৌছে ফুলের স্তবক ওঁর পায়ের কাছে রাখতে পারে।

মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত কর্মচারী মহলের ডেপুটি সেক্রেটারি এসে জিজ্ঞাসা করলেন, কেউ এসেছিল আমার আগে ?

—না।

কথাটা শুনে কী খুশি ! সবার আগে তিনিই এসে যে মুখ্যমন্ত্রীকে জন্মদিনের অভিনন্দন জানাতে পারছেন, এতে তাঁর খুশির আর অবধি রইলো না।

কিন্তু ডাঃ রায়ের সারা দিন খুব ধকল যেতো। কী বাড়ি কী অফিস কী কংগ্রেস ভবন, যেখানেই তিনি যান লোকের আর অন্ত নেই। বিকেলে কংগ্রেস ভবনের অনুষ্ঠানে দুজন সর্বভারতীয় নেতা অংশ গ্রহণ করলেন, একজন কেন্দ্রীয় সেচমন্ত্রী এস কে পাতিল, অন্যজন পরিকল্পনা মন্ত্রী গুলজারিলাল নন্দা। এই বছর রাজ্য কংগ্রেস থেকে তাঁর হাতে এক লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। তিনি সেটা সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়ে দিয়ে বলেন, এর অর্ধেক খরচ হোক কংগ্রেস ভবন পুনর্নির্মাণে, আর অর্ধেক খরচ হোক উন্নয়নমূলক কাজে।

তাঁর ব্যক্তিগত কর্মচারীদের ওপরও ঐদিন খুব কাজের চাপ পড়তো বলে তাদেরও দেওয়া হতো উপহার—হাতে বোনা ধুতি কিংবা অন্য সব জিনিস যা সেদিন লোকেরা এসে দিয়ে যেতো। টাকা-কড়ি উপহার হিসাবে যা পেতেন কম হতো না। কয়েক হাজার টাকা তাঁর দাতব্য ভাণ্ডারে জমা হতো গরীব ছাত্র এবং অভাবী মানুষদের জন্য, যার মধ্যে বেশির ভাগ থাকতো উদ্বাস্তু।

বিধানসভার বৈঠক ও অন্যান্য

তাঁর জন্মদিনের চারদিন পরে বিধানসভার অধিবেশনে নবগঠিত বিধান-সভায় এই প্রথম বিরোধীপক্ষের নেতা জ্যোতি বসু এবং প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টির ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ সরকারের সঙ্গে হাত মেলালেন একটি ব্যাপারে। সেটি হচ্ছে দামোদর ভ্যালী করপোরেশন অ্যাক্ট-এর কতগুলি অসঙ্গতি দূর করার প্রসঙ্গ।

যাই হোক, আরও দুটো সমস্যার পর পর সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাঁকে। একটি হচ্ছে খাদ্য পরিস্থিতির অবনতি, অপরটি হচ্ছে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসের ব্যাঙ্ক ধর্মঘট। মিল মালিকরা প্রচুর পরিমাণে চাল তাদের কলে মজুত করে রাখলো কিন্তু সরকারের আইনগত কোনো শক্তি ছিল না সেগুলি নিয়ে নেবার। কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী অজিতপ্রসাদ জৈন ৭ই ও ৮ই সেপ্টেম্বর মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করলেন এ নিয়ে। অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মজুত আইন অনুসারে রোধ করার জন্য চাল-কলগুলি থেকে চাল নিয়ে নিতে পারবেন এই ক্ষমতা রাজ্য-সরকারকে দ্রুত দেওয়া হলো। এই বৈঠকে ডাঃ রায়কে দক্ষতার সঙ্গে সহায়তা করলেন আইনমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, রাজ্যসরকার কলকাতায় সংশোধিত রেশন ব্যবস্থা চালু করলেন—যেখানে চাল বিক্রি হতো সাড়ে সতেরো টাকা মণ দরে। খোলাবাজারে চালের দর তখন ছিল চল্লিশ টাকা মণ। শ্রীজৈন মুখ্যমন্ত্রী ও খাদ্যমন্ত্রীকে নিয়ে একটি সাংবাদিক বৈঠক ডাকলেন। সেখানে শ্রীজৈন ঘোষণা করলেন যে কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গকে দেবে ৬০০০০ টন গম এবং ২০০০০ টন চাল। ময়দার বাঁধা দর তখন ছিল ৯ আনা সের, আর আটা ৬ আনা। প্রসঙ্গত বলে রাখি, ১৯৭৩ সালে চালের কালোবাজারী দর ছিল চার টাকা কিলো ও আটার দর দু টাকার বেশি।

খাদ্য পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে না পারায় সরকারকে এক হাত নেবার সুযোগটা বামপন্থী দলগুলি ছাড়লো না। তারা শুরু করলো আন্দোলন। ১৮ই সেপ্টেম্বর কলকাতার আশপাশ থেকে আসা অধিকাংশই চাষী শ্রেণীর লোকদের মধ্যে ৭২৬ জন লোককে গ্রেপ্তার করা হয় ১৪৪ ধারা অমান্য করার জন্য। এই মিছিলের ডাক দিয়েছিলেন ১১টি বামপন্থী দলের সমন্বয়ে গঠিত দুর্ভিক্ষ ও মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ কমিটি। মিছিল পরিচালনার জন্য গ্রেপ্তার বরণ করেন ডঃ সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেন সেন, জ্যোতি বসু ও হেমন্ত বসু। এঁদের সঙ্গে আরও কয়েকজনও ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী তখন ছিলেন অফিসে। তিনি আন্দোলনের নেতারা দেখা করতে চাইলে দেখা করলেন না বলে মিছিলের যাত্রীরা রেগে গিয়ে গ্রেপ্তার বরণ করেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করলেন অন্যভাবে। মজুতদার (ধানকলমালিক)দের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে এবং কেন্দ্রের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য এনে সংশোধিত রেশন প্রবর্তন করে তিনি বিরোধীদের আক্রমণের ধার ভোঁতা করে দিলেন বলা চলে।

এইভাবে খাদ্যসংকট মোচন করে মুখ্যমন্ত্রী অক্টোবর মাসে দুর্গাপূজার সময়ে কোথাও গিয়ে শান্তিতে একটু ছুটি কাটাবেন মনস্থ করেছিলেন। কিন্তু ভাগ্যের লীলা ছিল অন্য রকম! ব্যাঙ্কের লোকেরা তাদের দ্বিতীয় বৃহৎ ধর্মঘটের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য ক্ষতিপূরণ-ভাতা চাই মাসিক বেতনের ২৫ শতাংশের সমান, ন্যূনতম ক্ষেত্রে মাসিক ২০ টাকা। আগেকার ধর্মঘটে সফল হওয়ার দরুন তারা এবারও সেই একই—প্রভাত কর, তুষার চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্যদের নেতৃত্বে তাদের দাবি আদায় করতে পারবেন বলে ভেবে রেখেছিলেন। প্রথম ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের সময় কেন্দ্রীয় সরকার সন্ধি করতে বাধ্য হয়েছিলেন এ কথাও আগেই বলেছি; ফলে একটু তিক্ততা থেকেই গিয়েছিল। এবার তাই তাঁরা রুখে দাঁড়ালেন। ধর্মঘটকে বেআইনী ঘোষণা করা হলো এবং বিষয়টা একটা ট্রাইবুনালের সামনে রাখা হলো। সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে ডাঃ রায় দিল্লী গেলেন আপোসে কোন মিটমাট করা যায় কি না দেখবার জন্য, কিন্তু তাঁর চেষ্টা ব্যর্থ হলো।

ইতিমধ্যে এসে পড়লো বাঙালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজা। একটা অচল অবস্থা চলতে লাগলো, দুপক্ষই ক্লান্ত। ডাঃ রায় এই সুযোগটা নিলেন। ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের নেতা প্রভাত কর এই অচলাবস্থার অবসান করার জন্য ডাঃ রায়ের সহায়তা চাইলেন। ফলে পর পর বেশ কয়েকটি বৈঠক চললো মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কর্মচারী প্রতিনিধি এবং ব্যাঙ্ক মালিকদের আলাদা আলাদা ভাবে এবং তাঁর সহৃদয়তায় ও চেষ্টায় শেষপর্যন্ত একটা চুক্তিতে আসা গেল। কোনো কর্মচারী ধর্মঘট করার দরুন কোনো শাস্তি পাবেন না, সরকারও তাদের বিরুদ্ধে বে-আইনী ধর্মঘট করার অভিযোগ তুলে নেবেন। ব্যাঙ্ক মালিকপক্ষ কর্মচারীদের একমাস বেতনের সমান অগ্রিম টাকা দিতে রাজী হলেন। নেতারা মোটামুটি রাজী, কিন্তু সময় চাইলেন এক ঘণ্টা, কারণ মহাকরণের কাছে রাস্তার ওপর ধর্মঘটীরা ভীড় করে অপেক্ষা করে আছেন, তাঁদের সম্মতি নিতে হবে। বলাবাহুল্য এই সম্মতি দিতে তাঁরা দেরি করেন নি। তখন চার পাঁচজন নেতা একটা গাড়ি করে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে এসে হাজির। মুখ্যমন্ত্রী তখন তাঁর বিছানায় শুয়ে একটু বিশ্রাম করছিলেন। আমি নেতাদের আসার কথা তাঁকে জানাতেই তিনি মুখ্যসচিবকে খবর দিতে বললেন। তাঁর সঙ্গে যেন সংশ্লিষ্ট অফিসাররাও আসেন এ কথাও বললেন। সেইমতো খবর গেল,

তাঁরা এলে পরে মুখ্যমন্ত্রী নিচে নেমে নেতাদের সঙ্গে কথা বললেন। তাঁরা রাজী হয়েছেন শুনে একটি বিবৃতির ডিক্‌টেশন দিতে লাগলেন—যাতে বলা হলো, ধর্মঘট শেষ হয়ে গেছে। এটা রেডিও থেকে যেন প্রচার করা হয়।

বিস্তারিত বলে লাভ নেই। এইভাবে ব্যাঙ্কের সর্ববৃহৎ দ্বিতীয় ধর্মঘটের মীমাংসা হয়ে গেল। দিল্লী যা পারে নি, ডাঃ রায় তা পেরেছিলেন, কারণ উভয় পক্ষেই তাঁর প্রভাব ছিল গভীর।

বৈদ্যুতিক রেলপথের উদ্বোধন

পূর্ব-রেলওয়ে রেলপথ প্রকল্পের প্রথম অংশের কাজ শেষ করে ফেলেছিল, হাওড়া থেকে শেওড়াফুলি ২৩ কিলোমিটার পথ। এর উদ্বোধনের জন্য কাকে আমন্ত্রণ জানানো যায়, পণ্ডিত নেহেরু ছাড়া? ১৪ই নভেম্বর দিল্লী থেকে বিমানে এলেন তিনি, সঙ্গে রেলমন্ত্রী জগজীবন রাম, আমাদের রাজ্যপাল এবং মুখ্যমন্ত্রী ছাড়া আরও একজন মাননীয় ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন প্রধান মন্ত্রীকে সম্ভাষণ জানাতে। তিনি হলেন ব্রহ্মদেশের প্রধানমন্ত্রী। দুই প্রধান মন্ত্রীকে বিমান বন্দর থেকে রাজভবনে নিয়ে যাবার জন্য একটি বিশেষ খোলা গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

সকালবেলা মুখ্যমন্ত্রী রাজভবনে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী ও রেলমন্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে হাওড়া স্টেশনে গেলেন। আমিও আলাদাভাবে ওখানে গিয়েছিলাম অনুষ্ঠান দেখতে এবং নতুন ট্রেনটিতে একটু চড়তে। ট্রেনটা সভাস্থলের অল্প একটু দূরেই দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু কী দেখবো! কাতারে কাতারে লোক, যেন জনসমুদ্র। বেষ্টনী রক্ষা করবার জন্য রেলওয়ে কর্মচারী আর পুলিশ একেবারে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছিল। তার ওপর নেতারা যখন এসে উপস্থিত হলেন, তখন অবস্থা উঠলো চরমে। পাগলের মতো লোকগুলো রেলিং বেয়ে উঠে এলো, হাজারে হাজারে লোক এসে বেষ্টনী ভেঙে ফেললো। ট্রেনে যে যেখানে যেটুকু জায়গা পেলো সেটুকুই দখল করে বসলো। প্ল্যাটফর্ম-গেটের কাছে এমন ঠেসাঠেসি ঠেলাঠেলি হলো যে নিমন্ত্রিত—যাঁরা বিশেষ করে বিদেশী কূটনৈতিক অতিথিবর্গ, ট্রেন চলতে শুরু করার আগে তাঁরা এসে পৌঁছতেই পারলেন না। পায়ের তলায় পিষে মারা গেল তিনটি অমূল্য জীবন, ২৫ জন হলো আহত। নেহেরু যখন উদ্বোধন অনুষ্ঠান করছিলেন, তখন বেদনাদায়ক

ঘটনার কথা জানতে পারেন নি। তাঁর ছোট্ট ভাষণে নেহেরু বললেন, রেলের বিদ্যুতীকরণ নতুন নয়, তবে ভারতের এই অংশে নতুন। পৃথিবী এগিয়ে গেছে আধুনিক যুগে, কিন্তু তাকে যেতে হচ্ছে বৈদ্যুতিক যুগের মধ্য দিয়ে।

প্রধানমন্ত্রী এর পর মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে এ্যাসোসিয়েটেড চেম্বার্স অব কমার্স নামক বণিক সভার বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে ভাষণ দিতে গেলেন। তাঁর ভাষণে কলকাতার সাম্প্রতিক আন্দোলনের পটভূমিকায় খাদ্যের বিষয়টাই প্রাধান্য পেলো সবার আগে। কী কেন্দ্র কী রাজ্য দুই সরকারই কৃষি উন্নয়ন ও বিশেষ খাদ্য উৎপাদনের দিকে গুরুত্ব দিচ্ছেন সব থেকে বেশি।

তিনি আরও বললেন, বেশ কয়েক বছর ধরে বছরে ২০ লক্ষ টন খাদ্য আমদানী করতে হয় এ দেশে, এটা অবাক কাণ্ড নয় কী! খাদ্যকে ঘিরে একটা দুষ্ট চক্র গড়ে উঠেছে। জনগণ পাচ্ছেন খাদ্য রাজ্য সরকারের কাছে, রাজ্য সরকার চাইছেন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে, আর কেন্দ্রীয় সরকার তাকাচ্ছেন বিদেশের দিকে আমদানী করার জন্য। এ ব্যাপারটা বদলাতেই হবে।

সমাজতন্ত্রবাদ সম্পর্কে বলতে গিয়ে নেহেরু বললেন, খুব ভালো করে এর ব্যাখ্যা করা হয় নি। সমাজতন্ত্রবাদের নানা রকম আকার বা গঠন আছে। আমি চাই ভারতের প্রত্যেকটি মানুষ উন্নতির জন্য সমান সুযোগ পাক, পেয়ে তারপরে উন্নতির স্তর চড়িয়ে দিক। শেষ পর্যন্ত উৎপাদন বাড়াতেই হবে। আর তার বণ্টন হবে সমান সমান। খাঁটি অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমস্যাটিকে সবার দেখা উচিত।

চেম্বারের সভাপতি মাইকেল মোর সাহেবকে তিনি এই বলে ধন্যবাদ দিলেন যে, তাঁর আগের সভাপতিদের মতো ব্যবসায়ীদের অসুবিধার কথা না বলে সরকার যে সব প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, তিনি তার প্রশংসা করেছেন।

১৪ই নভেম্বর রবিবার নেহেরু বর্মার প্রধানমন্ত্রীকে রাউরকেল্লার ইস্পাত কারখানা দেখাবার জন্য তাঁকে সঙ্গে নিয়ে চললেন। বিমানে ওঠবার ঠিক আগে ডাঃ রায়ের কাছে সরে এলেন নেহেরু, বললেন, সামনের সপ্তাহেই ফিরে আসছি কলকাতা।

ডাঃ রায় বললেন, অবশ্যই এসো, কিন্তু অমন দৌড়ঝাঁপ করে নয়। তোমার সঙ্গে পা মিলিয়ে চলা আমার মতো বুড়ো লোকের কর্ম নয়।

সঙ্গে সঙ্গে হাসির একটা লহর উঠলো।

বিধান সভার অধিবেশন

বিধান সভার শীতকালীন অধিবেশনে সরকার থেকে যে সব বিল আনা হয় তার মধ্যে একটি বিল বিশেষ কৌতূহলের উদ্রেক করে, সেটি হচ্ছে বিধান সভা সদস্য বেতন সংশোধনী বিল। এতে ব্যবস্থা ছিল বিরোধিপক্ষের নেতাকে মাসিক বেতন ও ভাতা দেবার ব্যবস্থা—সবশুদ্ধ ১২০০ টাকা। সব থেকে বড়ো বিরোধী দল সি পি আই-এর নেতা জ্যোতি বসুকেই বিরোধিপক্ষের নেতা হিসাবে গণ্য করা হতো। ১৯৫৭ থেকে ১৯৬৭ এই দীর্ঘ দশ বছর ধরে বিরোধিপক্ষের নেতা হিসাবে তাঁর ভূমিকার পরিচয় বিধান সভা বিতর্কের নথিপত্রে ভর্তি হয়ে আছে এবং একক ব্যক্তি হিসাবে সংসদীয় বিতর্কে তাঁর অবদান সম্ভবতঃ রাজ্য বিধান সভাগুলিতে অতুলনীয় বলে আখ্যাত হয়ে আছে। দর্শকদের গ্যালারী উপচে পড়তো—ডাঃ বি সি রায়ের সরকারকে যে ভাবে তিনি আক্রমণ করতেন তা শোনবার জন্য এবং ডাঃ বি সি রায়ও আবার যে ভাবে তাঁকে চোখা চোখা কথায় উত্তর দিতেন, তাও শুনতে লোকের সমান আগ্রহ হতো। তবু এই দুই নেতাকে কাছে থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে বলে একটা বিষয়ে আমি সব সময় স্থির-নিশ্চয় ছিলাম। আমি জানতাম, এঁদের দুজনের মধ্যে অন্তরালে প্রবাহিত পারস্পরিক একটা প্রীতি ও শ্রদ্ধার ভাব ছিল। ১৯৬২-র নির্বাচনের সময় আমি স্বয়ং ডাঃ রায়ের কাছ থেকে শুনেছি, দুজনের মধ্যে এই সমঝোতা ছিল যে কেউই একে অপরের নির্বাচনী এলাকায় গিয়ে জনসভা করবেন না বা প্রকাশ্যে ভোটের তদারকী করবেন না। ১৯৫২-র প্রথম সাধারণ নির্বাচনের সময় ছাড়া আর কখনো কেউ এই অলিখিত চুক্তি ভাঙেন নি। ডাঃ রায়ের বাড়িতে বিরোধী পক্ষের নেতা যখন কফি খেতে খেতে ওঁর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনা করতেন, তখন দুজনে একেবারে অন্য মানুষ। আমি এই ঘটনা বহু বার দেখেছি। দেখেছি, কী খুশি মনে না দুজনে কথাবার্তা বলেছেন। অথচ ঐ দুজনেরই আবার বিধান সভায় বা জনসভায় দেখেছি অন্য মূর্তি। রাজনীতিকদের লীলা কি দুর্জ্ঞেয়! বিরোধিপক্ষের নেতাকে কিন্তু আমি কখনো দেখি নি মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে কোনো সুবিধা চাইতে কিম্বা এমন কাজ করতে যাতে তাঁর অথবা তাঁর দলের পক্ষে একটা আপসের মনোভাব প্রকাশ পায়। বিরোধিপক্ষের সদস্যদের সঙ্গে ব্যবহারে ডাঃ রায় অত্যন্ত সুবিবেচক ছিলেন এবং তাঁর পরবর্তী একজনের মতো কখনো দলীয় রাজনীতির সংকীর্ণ পথে পা

ফেলেন নি। একবার কংগ্রেস দলের একজন সদস্য ডাঃ রায়ের পাশে বসে আছেন বিধানসভায়, এমন সময় বিরোধিপক্ষের একজন মহিলা এম এল এ এসে উত্তর-পূর্ব কলকাতার একটি সরকারী ফ্ল্যাট পাবার জন্য অনুরোধ জানালেন তাঁর কাছে। ডাঃ রায় তাঁর কাছ থেকে দরখাস্ত নিলেন। তিনি চলে যেতেই সেই কংগ্রেস এম এল এ বললেন, আপনি স্যার একে ফ্ল্যাট দেবেন না। আমাদের দলের অনেক লোক এই ধরনের ফ্ল্যাট পাবার জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছে।

ডাঃ রায় উত্তর দিলেন, মনে রেখো, আমি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, শুধু একজন দলীয় নেতা নই। এই ধরনের ব্যাপারে আমি দলীয় লোক আর বিরোধি-পক্ষের লোকের মধ্যে কখনো পার্থক্য করি না। আমার কাছে ওরা আসে, কারণ আমি মুখ্যমন্ত্রী। আর এতে ওদের অধিকারও আছে।

বিল সম্পর্কে বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এই ধারণাকে নাকচ করে দেন যে বিরোধী পক্ষের নেতাকে বেতন দিলেই তিনি সরকারী কর্মচারী হয়ে যাবেন। তাঁর অফিস সরকারী অফিস হিসাবে কখনই গণ্য হবে না। বিরোধী পক্ষের নেতার কাজকর্মের ব্যাখ্যা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তিনি শুধু তাঁর দলেরই নেতা নন, তিনি প্রকৃতপক্ষে বিধানসভার সমগ্র বিরোধী পক্ষেরই প্রতিনিধিত্ব করছেন আর সেজন্যই তাঁকে কিছু বাড়তি বেতন ও ভাতা দেওয়া দরকার।

এইখানে বলে রাখা ভালো, এই ১২০০ টাকার বেতন জ্যোতি বসু এবং সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় বিরোধী পক্ষের নেতা থাকাকালে কখনও নেন নি।

বিধান সভা মুলতুবী থাকার এক সপ্তাহের মধ্যে ডাঃ রায় প্রধানমন্ত্রীর সফরসূচি তৈরি করে ফেললেন। প্রধানমন্ত্রী বিশ্বভারতীর বাৎসরিক সমাবর্তন উৎসবে ভাষণ দিতে শান্তিনিকেতনে গেছেন। সেখান থেকে কলকাতায় আসবেন। ডাঃ রায় বন্ধুকে বিমান বন্দরে স্বাগত জানাবেন, তাঁর সঙ্গে অনুষ্ঠানগুলিতে যোগ দেবেন, এই ছিল ইচ্ছা। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা ছিল অন্যরকম। অসুস্থ হয়ে পড়লেন তিনি। জ্বর হলো, দুর্বল হতে লাগলেন। তাঁর মতো নাম করা ডাক্তার অসুস্থ হয়ে পড়লে চিকিৎসা করবে কে? মনে পড়লো পুরাণো দিনের একটা কথা। ১৯৪৮ সালে তাঁর এ রকম জ্বর হয়ে পড়লো, তাঁর অর্থমন্ত্রী নলিনীরঞ্জন সরকার তাঁকে বলেছিলেন, আপনার অসুখ হলে কে আপনার চিকিৎসা করে?

—ডাঃ রায়—উত্তর দিয়েছিলেন বিধান রায়,—আয়নার দিকে তাকাই, আর অমনি সেই প্রতিচ্ছবি বি সি রায় আমার চিকিৎসা করে, আমিও ভালো হয়ে যাই।

হাসির ধুম পড়ে গিয়েছিল। সময় সময় অদ্ভুত অদ্ভুত কৌতুকরসের অবতারণা করতে পারতেন তিনি। একবার এক ইন্সিওর কোম্পানীর বোর্ডের সভায় তিনি কৌতুক করে হোমিওপ্যাথি ওষুধের ক্ষমতার কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন এক রোগী একবার একটা ছুরি গিলে ফেলেছিল। কিন্তু অপারেশনের ভয়ে সার্জেনের কাছে না গিয়ে এক বিখ্যাত হোমিওপ্যাথের কাছে গেল। ডাক্তারটি তাকে তার ওষুধের প্রথম ডোজ দিলো আর অমনি পেটের মধ্যে ছুরির ফলার ধারটা ভোঁতা হয়ে গেল। দ্বিতীয় ডোজে কী হলো জানেন? দ্বিতীয় ডোজে ছুরির ফলা কাঠের হাতলের ভাঁজে ঢুকে গেল। তার ওপর তৃতীয় ডোজটি যখন পড়লো তখন আর কথা নেই। ছুরিটি সরসর করে পেট থেকে বেরিয়ে এলো রোগীর কোনো ক্ষতি টতি না করে।

যাই হোক, কলকাতায় এসে প্রধানমন্ত্রী দু দুবার ডাঃ রায়ের বাড়িতে এলেন তাঁকে দেখতে। ২৮শে ডিসেম্বরে একটু ভালো হয়ে উঠতেই তিনি বায়ু পরিবর্তনের জন্য দীঘা রওনা হলেন একটি বিশেষ সেলুনে করে। তাঁর শরীর এবারে ভেঙে পড়া দেখাচ্ছিল। আমরা যারা তাঁর সঙ্গে যাচ্ছিলাম তাদের মনে আশঙ্কা হচ্ছিল তিনি আবার তাঁর আগেকার স্বাস্থ্য ও শক্তি ফিরে পাবেন কি না।

(১৫)

১৯৫৮ সাল

দীঘায় ডাঃ রায় ছিলেন নাড়াজোল রাজার প্রাসাদে। সমুদ্রের জল হাওয়া একদিকে, অন্যদিকে গৃহকর্তার সহধর্মিনী অর্থাৎ নাড়াজোল রাজার স্ত্রী অঞ্জলি খানের সযত্ন নির্বাচিত খাদ্যবস্তুর গুণে ডাঃ রায় শীগগিরই তাঁর স্বাস্থ্য ফিরে পেলেন। আমার স্ত্রী ছিলেন সঙ্গে। তাঁকে নিয়ে সমুদ্র সৈকতের কাছে একটি একতলা বাড়িতে আমি থাকতাম, আশা ছিল পক্ষ কালের বিশ্রাম নিতে পারবো। দীঘার সৈকত সমুদ্রের ঢেউ এসে প্রতিনিয়ত আছড়ে পড়ছে, আর বালুবেলার উপর দিয়ে মোটর গাড়ি চালিয়ে অনেকে সুখ অনুভব করছেন। কেউ কেউ মাঝে মাঝে ক্ষুদে বিমান অথবা হেলিকপটার করে এসে নামছে। সৈকতাবাসের উপযুক্ত জায়গা হিসাবে এই দীঘার আবিষ্কারও ডাঃ রায়ের। একে সৈকতাবাস হিসাবে গড়ে তুলেছেনও তিনি। দীঘা কলকাতার কাছে বলে খুব তাড়াতাড়ি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। তাছাড়া এর দীর্ঘ সৈকতও অন্যতম আকর্ষণ। কয়েক মাইল ধরে চলে গেছে এই সৈকতভূমি, সুবর্ণরেখা নদী পেরিয়ে তারপরে উড়িষ্যায় ঢুকে গেছে।

জানুয়ারি মাসে শীতের দিনে জেলেদের দেশী ডিঙি সমুদ্রের বিপুল জলরাশি পেরিয়ে চোখের সামনে অদৃশ্য হয়ে যেতো, মাছটাছ ধরে ফিরে আসতো কখনো কখনো সপ্তাহখানেক পরে। এই সব গ্রাম্য জেলেদের সাহস দেখে আমরা অবাক হয়ে যেতাম!

বোধহয় সপ্তাহখানেক কাটিয়েছি আমরা দীঘায়, এমন সময় এমন একটা ঘটনা ঘটলো যে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে দীঘা ছেড়ে চলে আসতে হলো। একদিন সকালবেলা আমাকে ডেকে পাঠালেন ডাঃ রায়, বললেন, ওহে তুমি প্রথম যে ট্রেন পাও সেই ট্রেনেই কলকাতা চলে যাও এ বাড়ির ঐ ঝিটাকে নিয়ে। ওকে রাত্তিরবেলা একটা রাস্তার কুকুরে কামড়েছে, বোধহয় পাগলা কুকুর। এখানে ত চিকিৎসা হবে না, ওকে নিয়ে গিয়ে কলকাতার ট্রপিক্যাল স্কুলে দেখাতে হবে।

অতএব হে মনোরম সৈকতময়ী দীঘা, বিদায়! তারপরে জানুয়ারির মাঝামাঝি মুখ্যমন্ত্রী ফিরে এলেন। এসে পরের মাসের বাজেট অধিবেশনের জন্য

প্রস্তুতি পর্ব শুরু করলেন। ১৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫৮-৫৯এর জন্য বাজেট পেশ করলেন অর্থমন্ত্রী হিসাবে। রাজস্ব আদায় ধরা হলো ৬৮.৮৭ কোটি, আর ব্যয়বরাদ্দ ৭২.৬৯ কোটি, অর্থাৎ ঘাটতি ৩.৮২ কোটি টাকা। পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সম্পর্কে ডাঃ রায় বললেন, অর্থবরাদ্দ ছিল ১৫৩.৭ কোটি টাকা; এর মধ্যে দামোদর উপত্যকা করপোরেশনের জন্য বরাদ্দ ১৫.৬ কোটি টাকাও ছিল। কিন্তু বিহারের কিছু অংশ ও তার সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন কর্মসূচি পশ্চিমবঙ্গে আসায় পরিকল্পনার মোট আর্থিক আয়তন দাঁড়িয়েছে ১৫৭.৭ কোটি টাকা।

পরের দিন দিল্লী থেকে টেলিফোন এলো, ঐ দিন সকালে তাঁর বন্ধু মৌলানা আবুল কালাম আজাদের পক্ষাঘাতসূচক স্ট্রোক হয়েছে, আর তাঁর অবস্থাও আশঙ্কাজনক ; অতএব তিনি যেন পরের বিমানেই দিল্লী চলে আসেন। ডাঃ রায় তাই করলেন। বিকেল বেলার বিমান ধরে তিনি দিল্লী নেমে সোজা মৌলানার বাড়ি চলে গেলেন। সেখানে পণ্ডিত নেহেরু ও অন্যান্যরা সাগ্রহে তাঁর অপেক্ষা করছিলেন। ডাঃ রায়, চিকিৎসকদের যে দল দেখছিলেন, তাঁদের সঙ্গে বসলেন। রোগীর অবস্থা পরীক্ষা করে তাঁর শ্বাসকষ্ট লাঘব করার জন্য একটি অক্সিজেন তাঁর ঘরের মধ্যে রাখা হলো। নতুন করে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করে দিলেন তিনি। পরের দিন দ্বিতীয় বার তাঁকে পরীক্ষা করে যখন বুঝলেন যে অবনতির ভাব খানিকটা রোধ করা গেছে, তখন আর দেরি না করে কলকাতা চলে এলেন, কারণ বিধান সভায় রাজ্যপালের ভাষণের ওপর বিতর্ক চলছে, এ সময়ে অর্থমন্ত্রী হিসাবে তাঁর গরহাজির থাকা চলে না।

২২শে ফেব্রুয়ারি সকালবেলা দিল্লী থেকে আবার জরুরী ফোন। ঐ সময় ফোন করেছিলেন স্বয়ং নেহেরু। তাঁকে এখখুনি আবার দিল্লী যেতে হবে, রোগীর অবস্থা আবার খারাপের দিকে গেছে।

একটা হতাশার স্বর শোনা গেল ডঃ রায়ের গলায়। ফোনটা রেখে দিয়ে বললেন, এরা ভুলে যায় যে আমার বয়স ৭৫।

তবু তিনি দ্বিধা করলেন না, সকালের একটা বিমানেই দিল্লী রওনা হয়ে গেলেন তক্ষুনি। রোগীকে পরীক্ষা করে তাঁর স্বাক্ষরিত একটি বুলেটিন বার করলেন, আজ সকালে অবস্থার যে সামান্য উন্নতি লক্ষ্য করা গিয়েছিল তা অব্যাহত ছিল বেলা ১টা পর্যন্ত, কিন্তু তারপর থেকে অবস্থার অবনতি হয়েছে, আর তা খুবই আশঙ্কাজনক।

ভারতের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকের স্বাক্ষরিত বুলেটিন বার হবার পর সারা দেশ চরম ঘটনার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলো। মৌলানা মারা গেলেন ঐ দিন রাত্রে দুটো দশ মিনিটের সময়। গান্ধীজীর মৃত্যুর ঠিক দশ বছর পরে।

দিল্লী থেকে ডাঃ রায়ের ফেরার দুটি দিন পরে অর্থাৎ ২৫শে ফেব্রুয়ারি রাজ্যপালের ভাষণের ওপর বিতর্কের শেষের দিকে বিরোধী পক্ষের উৎসাহী সদস্য যতীন চক্রবর্তী মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনলেন। দক্ষিণ কলকাতার অভিজাত পল্লী রোল্যাণ্ড রোডের ওপর তিনি নাকি এক একর জমি কিনেছেন বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের কাছ থেকে। অভিযোগ ছিল এই যে, সরকার বর্ধমানে মহারাজার প্রাসাদ কিনেছেন মুখ্যমন্ত্রীর যোগসাজসে বেশি দাম দিয়ে, যার ফলে ঐ রোল্যাণ্ড রোডের জমির জন্য তাঁকে বেশি দাম দিতে হয়নি। ঐ জমিতে তিনি বাস করবেন বলে বাড়ি তৈরি করবেন।

অধ্যক্ষ এই অভিযোগের উত্তর দেবার দিন ধার্য করে দিলেন ২৫শে ফেব্রুয়ারি। মুখ্যমন্ত্রী একরাশ দলিল ও কাগজপত্রের সাহায্যে প্রমাণ করে দিলেন যে জমির জন্য মহারাজকে তিনি কম দাম দেন নি। বর্ধমানের প্রাসাদ কেনার ব্যাপারে সরকার পক্ষও বেশি দাম দেন নি। বর্ধমানের বিরাট রাজপ্রাসাদের যে উচিত মূল্য ধার্য করা হয়েছিল সরকার বরং তার থেকে কম দামেই কিনেছিলেন, মাত্র দুই লক্ষ টাকায়। এবং কলকাতায় তাঁর জমি তিনি কিনেছিলেন ১ লক্ষ ৪২ হাজার টাকায়। এই টাকা তিনি দিয়েছিলেন চেক-এ, নগদে নয়। এই টাকা তিনি পেয়েছিলেন তাঁর ৩৬ নম্বর ওয়েলিংটন স্ট্রিটের বাড়ি বাঁধা রেখে। প্রসঙ্গক্রমে বলি, তিন বছর পরে ঐ জমিতে তিনি দুতলা বাড়ি তুলেছিলেন জীবনের বাকি কটা দিন কাটাবেন বলে, কিন্তু ১৯৬২তে পরিকল্পিত গৃহপ্রবেশের একমাস আগেই মৃত্যু এসে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। যাই হোক, অভিযোগের যা প্রমাণপত্র ছিল তা দিয়ে তিনি বিধানসভাকে বিশ্বাস করাতে পেরেছিলেন যে, কোন অন্যায় পথ তিনি অবলম্বন করেননি। মহারাজার সঙ্গে লেনদেনে তিনি তাঁর সরকারী পদের সুযোগও নেন নি।

ঐ দিন কংগ্রেস পক্ষ থেকে একদল সভ্য বিরাট টাকার তছরুপের অভিযোগ আনলেন বিধানসভার প্রাক্তন কম্যুনিস্ট সদস্য চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনখ্যাত

অম্বিকা চক্রবর্তীর নামে। কলকাতার কাছে উত্তর ২৪ পরগণায় উদ্বাস্তুদের বাড়িঘর তৈরি করার জন্য ঐ টাকা নাকি উদ্বাস্তু পুনর্বাসন বিভাগ থেকে তাঁকে অগ্রিম দেওয়া হয়েছিল। হৈ হৈ পড়ে গেল বিধানসভায়। কম্যুনিস্ট সদস্যরা আদালতে গিয়ে এ অভিযোগ প্রমাণ করতে বললেন।

রায়ে রায়ে ভাঙন

১৯৫৮-এর বাজেট অধিবেশনে সব থেকে চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটলো ৯ই মার্চ তারিখে যখন ডাঃ রায়ের মন্ত্রিসভার ব্যবহারজীবী মন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায় আইন মন্ত্রী হিসাবে পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে দিলেন। মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করার কারণ হিসাবে মুখ্যমন্ত্রীকে তিনি লিখেছিলেন, জাতির জীবনে যে বহুবিধ বিষয় আসলে প্রভাব বিস্তার করে, সেসব ব্যাপারে যুগপৎ কংগ্রেস এবং সরকার যে নীতি নিয়েছেন, তার অনেক দিকেরই আমি সম্পূর্ণ এবং মূলতঃ বিরোধী। বাস্তবিকপক্ষে আমাদের মতপার্থক্য এতো বেড়ে গেছে যে এর মধ্যে সেতু-বন্ধনের সম্ভাবনা নির্দ্বিধায় অসম্ভব বলে একবাক্যে ফতোয়া দেওয়া চলে। আমি আপনাকে ছেড়ে যাচ্ছি তার মানে এই নয় যে, আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা কমে গেছে। কিন্তু মানুষের জীবনে এমন একটা সময় আসে, যখন ব্যক্তিগত আনুগত্যেরও ওপরে স্থান পায় তার আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা।

সিদ্ধার্থবাবুর পদত্যাগ পত্রের কথা ডাঃ রায় গোপন রেখেছিলেন। ঐ দিন সন্ধ্যার সময় তিনি নিজে গেলেন সিদ্ধার্থবাবুর বাড়িতে তাঁর পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করিয়ে নিতে। কিন্তু তাঁকে তাঁর সিদ্ধান্ত থেকে টলান গেল না। ডাঃ রায় বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে এলেন। কিন্তু খুবই ধাক্কা পেয়েছিলেন তিনি এ ব্যাপারে। তাঁর মন্ত্রিসভা থেকে কেউ কখনো বেরিয়ে আসেন নি বা তাঁকেও কাউকে ছাড়িয়ে দিতে হয় নি, একমাত্র ১৯৪৮-এ ভূপতি মজুমদার ও হেম নস্কর ছাড়া। তাঁরা সে সময় ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাঁকেই নেতৃপদ থেকে সরাতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু এখানেও দেখি, কয়েকমাস পরে আবার তিনি ঐ দুজনকেই তাঁর মন্ত্রিসভায় ফিরিয়ে এনেছেন। সেইজন্যই সিদ্ধার্থবাবুর ব্যাপারে তাঁর হলো নতুন এক অভিজ্ঞতা।

এই ঘটনার দুদিন পরে বিধানসভায় প্রশ্নোত্তর কালে বিরোধীপক্ষের নেতা অধ্যক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, আইনমন্ত্রী কোথায়? তিনি আসছেন না

কেন? তাঁর নাম করে যেসব প্রশ্ন জমা হয়েছে তার উত্তরের তারিখ ক্রমশঃই দেখছি পিছিয়ে যাচ্ছে। ব্যাপারখানা কী?

কম্যুনিষ্ট নেতা জ্যোতি বসু সরকারের কাছ থেকে আরও জানতে চাইলেন যে, আইনমন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন কিনা, আর করে থাকলে সেই কথা সরকার কবুল করবেন কিনা?

এর পরে সিদ্ধার্থবাবুর পদত্যাগের কথা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়লো। শঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪শে মার্চ তারিখটি ঠিক করে দিলেন, আইনমন্ত্রী ঐদিন তাঁর পদত্যাগ সম্পর্কে বিবৃতি দেবেন বেলা ৩টের সময়। সভাকক্ষ সেদিন কানায় কানায় পূর্ণ। সিদ্ধার্থবাবু প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা সময় নিয়েছিলেন তাঁর বিবৃতি দেবার জন্য। এই বিবৃতি বিধানসভার নথিতে ছাপা হয়েছিল ৩৩ পৃষ্ঠা। তাঁর ভাষণ লোকে শুনেছিল একাগ্র মনে, যদিও সামান্য ও ক্ষীণ বাধা এসেছিল কখনো কখনো কংগ্রেস পক্ষ থেকে। বিরোধী আসনের (কম্যুনিষ্ট নয়) এক কোণে গিয়ে বসেছিলেন সিদ্ধার্থবাবু। উঠে দাঁড়িয়ে মাইকটা শক্ত করে ধরে টাইপ করা বিবৃতি পাঠ করতে শুরু করলেন। পদত্যাগের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি পুরনো একখানা চিঠির কথা উল্লেখ করলেন। চিঠিখানা তিনি লিখেছিলেন মুখ্যমন্ত্রীকে ১৯৫৭র ২৬শে অক্টোবর তারিখে মন্ত্রীপদে বসবার ছমাস পরে। এতে তিনি ছটি প্রস্তাব দিয়েছিলেন। প্রশাসন চালাতে গেলে জনগণের আস্থা অর্জন যদি একান্ত দরকারী বলে মনে হয়, তাহলে এই ছটি প্রস্তাব তাঁর কাছে মনে হয়েছে অপরিহার্য এবং একে কার্যকরী করতেই হবে। প্রস্তাবগুলি তাঁর নিজেরই ভাষায় হলো ঃ-

(১) একজন দপ্তরবিহীন মন্ত্রী নিয়োগ। তিনি সবসময় জেলাগুলিতে ঘুরবেন আর দেখে বেড়াবেন আমাদের প্রকল্পগুলি ঠিকমতো রূপায়িত হচ্ছে কিনা। বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় সাধন করার দায়িত্বও থাকবে তাঁর। (আমার প্রথম প্রস্তাব ছিল প্রতি জেলায় একজন করে মন্ত্রী থাকবেন। কিন্তু সেটা গৃহীত না হওয়ায় এ প্রস্তাব দিয়েছিলাম।)

(২) কেবল ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্যই একজন মন্ত্রী নিযুক্ত হবেন। আমি বেশ দেখছিলাম প্রফুল্লচন্দ্র সেন এই দপ্তরের দিকে সম্ভবত তেমন মনোযোগ দিতে পারছেন না। প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা তাঁর কাছে কেবলি লোক আসছে আর যাচ্ছে। এই অবস্থায় সম্ভবত তিনি কাজ করতে পারছেন না। এই

বিরাট সমস্যার দিকে সম্ভবত তিনি মনও দিতে পারছেন না। সমস্যাটা এত বিপুল যে এর জন্য দেশের শ্রেষ্ঠ মানুষগুলিরই বোধ হয় মাথা ঘামানোর দরকার।

(৩) খাদ্য ও কৃষি বিভাগদুটিকে এক বিভাগে পরিণত করে একজন মন্ত্রীকে এই সংযুক্ত বিভাগের পুরোপুরি দায়িত্ব দিতে হবে।

(৪) অর্থ বিভাগের জন্য একজন আলাদা অর্থমন্ত্রীর নিয়োগ। ইনি শুধু অর্থবিভাগই দেখবেন, আর কিছু নয়।

(৫) সংগঠন বা কনস্ট্রাকশন বোর্ডের পুনর্গঠন অথবা আদপেই এর বিলোপ ঘটানো।

(৬) আমাদের অধীনস্থ কর্মচারীদের চাকরির নিয়মকানুনের অবিলম্বে অদলবদল করা।

কিন্তু দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি আমার প্রস্তাব সবই নাকচ করা হয়েছিল।

সিদ্ধার্থবাবু তাঁর ভাষণের শেষের দিকে প্রফুল্লচন্দ্র সেন ও কালীপদ মুখোপাধ্যায়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে প্রশ্ন করলেন, কংগ্রেস কর্মীরাই আমাকে বলেছে, এটা কীরকম যে, কী কলকাতায় কী জেলাগুলিতে, যেখানেই আপনি যান না কেন, অমনি লোকেরা এসে বদনাম করবে, বিমলচন্দ্র সিংহ বা অন্য কোন মন্ত্রীর নামে নয়, ঐ দুজন মন্ত্রীর নামে--প্রফুল্লচন্দ্র সেন আর কালীপদ মুখোপাধ্যায়। (এইসময় কংগ্রেস পক্ষ থেকে হৈ চৈ চিৎকার করে তাঁর ভাষণে বাধা দেওয়া হয়।)

সিদ্ধার্থবাবুর ভাষণে প্রশাসনের ব্যাপক দুর্নীতির বিষয়ই স্থান পায় বেশি। মন্ত্রিসভায় যোগ দেবার দুমাসের মধ্যেই (অর্থাৎ মে জুন মাসে) তিনি মন্ত্রিসভার বৈঠকে কথাটা তুলেছিলেন এবং মুখ্যমন্ত্রীর প্রচেষ্টায় একটি সাব কমিটিও এজন্য গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু যে দুজন মন্ত্রীর দপ্তরে দুর্নীতি সব থেকে বেশি সেই দুজনকে অর্থাৎ প্রফুল্লচন্দ্র সেন ও কালীপদ মুখোপাধ্যায়-কেই রাখা হয়েছিল ঐ সাব কমিটিতে। পরে ৯ই জুলাই তারিখের মন্ত্রিসভার বৈঠকে ১২টি সরকারী বিভাগ সম্পর্কে তদন্ত এবং দুর্নীতি উচ্ছেদের ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিভাগগুলির কিছু ছিল একজন মন্ত্রীর অধীনে, আর কিছু ছিল দুজন বা তিনজন মন্ত্রীর অধীনে।

সিদ্ধার্থবাবু তাঁর রাজনৈতিক জীবনে চিরকালই দুর্নীতি এবং ক্ষমতা-লোলুপতার বিরোধী। দুর্নীতি উচ্ছেদ কমিটির কার্যকলাপ সম্পর্কে আস্থা

হারিয়ে তিনি দুর্নীতি সম্পর্কে একটি আইন করার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। ২৫শে অক্টোবর (১৯৫৭) মুখ্যমন্ত্রীকে লিখিত চিঠির সঙ্গে ঐ আইনের খসড়ার একটি কপিও তিনি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের চারটি অনিষ্টকর বিষয় সম্পর্কে ব্যবস্থা ছিল এই আইনে। এগুলি হচ্ছে (১) সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি (২) ভেজাল খাদ্য বিক্রি (৩) খাদ্য ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র মজুত করে রাখা এবং (৪) নকল ওষুধ বিক্রি। ঘুষ নেওয়ার ব্যাপারটা আইনমতো প্রমাণ করা কঠিন বলে তিনি সুদক্ষ আইন ব্যবসায়ী হিসাবে এই আইনের খসড়ায় কতগুলি ব্যবস্থা রেখেছিলেন, যার মধ্যে ছিল কোনো কোনো ইয়োরোপীয় দেশের মতো, দোষীকেই প্রমাণ করতে হবে যে সে নির্দোষ। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন, বলেছিলেন, প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে দেখবো।

কিন্তু পরে জানা গেল, প্রস্তাবিত আইনটির যে অংশ দোষীকে নিজেকেই নির্দোষ বলে প্রমাণ করতে হবে বলা হয়েছে, সে সম্পর্কে কেন্দ্রের আপত্তি রয়েছে।

সিদ্ধার্থবাবু অভিযোগ করলেন, সত্যিকার সমাজতান্ত্রিক রাজ্য গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে প্রশাসনিক যন্ত্রকে তিনি যে ভাবে পুনর্গঠিত করতে চাইছিলেন, কংগ্রেসের পাণ্ডা এবং মন্ত্রিসভার ক্ষমতালোভীরা তাঁর সে চেষ্টাকে বানচাল করে দিয়েছে।

আবেগমথিত কণ্ঠে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন, যে পথ আমি নিয়েছি তা যে ভুল পথ নয় সত্য পথ, সে কথা ভবিষ্যৎই একদিন বলে দেবে। আমার ঈপ্সিত আদর্শে যতক্ষণ পর্যন্ত না পৌঁছতে পারছি, ততক্ষণ পর্যন্ত এই পথেই আমি হাঁটতে থাকবো এবং এই আদর্শের জন্য আমি যে কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত।

কথাগুলো দৈববাণীর মতো, কারণ পরে ১৯৭২ সালে তিনিই পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের সমাজতান্ত্রিক মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন।

ওদিকে বিরোধী পক্ষ এনেছিলেন মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব। অধ্যক্ষ এর আলোচনার জন্য দিন স্থির করে দিলেন ২৭শে মার্চ। ২৪শে মার্চ সিদ্ধার্থবাবু ভাষণ দিলেন, ২৭শে মার্চ অনাস্থা বিষয়ে আলোচনা, সুতরাং মাঝখানে মাত্র দুটো দিন, যার মধ্যে ডাঃ রায়কে মাল মশলা জোগাড় করতে হবে মন্ত্রিসভার সপক্ষে।

সিদ্ধার্থবাবুর ভাষণের পরের দিন, অর্থাৎ ২৫শে মার্চ ডাঃ রায় ৮৯ পৃষ্ঠা ব্যাপী টাইপ করা ভাষণের কপি চেয়ে নিলেন। যে সব দপ্তরের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তাদের বলে দিলেন উত্তর পাঠাতে। উত্তর অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে এসে গেল। তিনি কয়েকটি নোটশীট কাগজ চেয়ে নিয়ে তাতে নিজের হাতে অভিযোগের উত্তরের খসড়া করতে লাগলেন। প্রথম দিন তিনি লিখলেন ১০ পৃষ্ঠা, আর পরের দিন অর্থাৎ ২৬শে মার্চ লিখলেন ৬ পৃষ্ঠা। কিন্তু এই পর্যন্ত; তার পরের অংশ আর লেখাই হয়নি। ফাইলে যে সব কাগজপত্র ছিল তার মধ্যে লক্ষণীয় ছিল দুর্নীতি উচ্ছেদ বিভাগের সচিব নবগোপাল দাস আই. সি. এস.-প্রচারিত একটি কার্যবিবরণীর যথাযথ প্রতিলিপি, ফটোস্টাট কপি। এই বিবরণীটির সঙ্গে মিঃ দাস ভূমি ও ভূমি রাজস্ব বিভাগের দুর্নীতি সম্পর্কে মন্ত্রিসভার সাব কমিটিতে বিবেচিত একটি খসড়া-প্রতিবেদন বা রিপোর্টও পাঠিয়েছিলেন সভাপতির অনুমোদনের জন্য। এতে তাঁর সই ছিল ৩০।১।৫৮ তারিখের। কার্যবিবরণীতে প্রফুল্লচন্দ্র সেন সই করেছিলেন ১।২।৫৮ তারিখে, তারপর সই ছিল কালীপদ মুখোপাধ্যায়ের ৫।২।৫৮ তারিখে। কিন্তু তারপরে অদ্ভুত কাণ্ড, এই ফাইল তাঁর ঘর থেকে বেরোতে সময় নিয়েছিল এক মাস। তখন তাঁর সই হয়েছিল ৪।৩।৫৮ তারিখে। এখান থেকে ফাইল গিয়েছিল ভূমি রাজস্ব মন্ত্রীর কাছে। তাঁর সইয়ের তারিখ ৬।৩।৫৮! এখান থেকে ফাইল দ্রুত গেল বিচার বিভাগীয় মন্ত্রীর কাছে, তিনি ঐ দিনই সই করলেন। ফাইলের এই চলাচলের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর কোনো সংস্রব ছিল না, তাতে তাঁর কোনো সইও নেই।

পাঠকরা নিশ্চয়ই জানতে চাইবেন, সিদ্ধার্থবাবু যে 'পশ্চিমবঙ্গ সমাজবিরোধী কার্যকলাপ নিরোধ বিল ১৯৫৭' নামে আইনের খসড়াটি ডাঃ রায়ের কাছে পাঠিয়েছিলেন ১৯৫৭র ২৫শে অক্টোবর, সে সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী কী কী ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। তিনি বিলটি পাঠিয়েছিলেন তাঁর দুই প্রধান অফিসারের কাছে। একজন অর্থ সচিব বিনয় দাশগুপ্ত, অন্যজন স্বরাষ্ট্র সচিব রঞ্জিত গুপ্ত। দাশগুপ্ত আবার বিলটি পাঠালেন তাঁর ডেপুটি হিমাদ্রী রায়ের কাছে, খুঁটিয়ে দেখা ও মন্তব্য করার জন্য। হিমাদ্রী রায় ১৩।৩।৫৮ তারিখে ৯ পৃষ্ঠা ব্যাপী নোট দিলেন। সেই নোটের ১৭শ অনুচ্ছেদে তাঁর মন্তব্যের সারাংশ তিনি লিখলেন, বিলে আলোচিত বিভিন্ন ধরনের সমাজবিরোধী কার্যকলাপ সম্পর্কিত যে সব

ব্যবস্থা আছে, সেগুলির উন্নতি যদি করতে হয়, তাহলে সব থেকে ভালো কাজ হবে চলতি আইন যা আছে তা যথাযথ প্রয়োগ করা।

স্বরাষ্ট্র সচিব ৪।১১।৫৭ তারিখে ৪ পৃষ্ঠা ব্যাপী নোট লিখেছিলেন—বিলে প্রস্তাবিত তিনজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি নিয়ে গঠিত অভিযোগের তদন্ত কমিটি যদি তৈরি হয়, তাহলে তদন্তের দিক দিয়ে উন্নতি হবে কিনা সন্দেহ আছে।

মোটকথা বিলটি পরীক্ষা করেছিলেন ২ জন অফিসার, আইন বিশেষজ্ঞ কেউ নয়। মনে হয় ডাঃ রায় এই পরীক্ষাতেই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। এ সম্পর্কে দিল্লীর অভিমত কী ছিল তা দেখবার মতো কোনো রেকর্ড বা নথিপত্র নেই।

২৭শে মার্চ বিধান সভা বসলো বেলা আড়াইটার সময় সাড়ে আট ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে অনাস্থা প্রস্তাব আলোচনা করবে বলে। সারা সভা লোকে গিজ গিজ করছে। ডাঃ রায়, সিদ্ধার্থবাবু, জ্যোতি বসু এঁদের বক্তৃতা শোনবার জন্য লোকে উন্মুখ হয়ে আছে। তবে তাঁর মন্ত্রিসভার সপক্ষে তিনি কী বলেন, সেই বিষয়েই সবার কৌতূহল ছিল সব থেকে বেশি। ডাঃ রায় তাঁর ভাষণের কোনো ডিকটেশন দেন নি। বিরোধী পক্ষ প্রধান কী কী বিষয় সভায় তুলবে ডাঃ রায়ের তা জানা নেই, সেই জন্য উত্তর তাঁকে দিতে হবে মুখে মুখে, লিখিত ভাবে নয়। কিন্তু সিদ্ধার্থবাবুর বিবৃতির জবাব তাঁর লেখা আছে। সে কথা আগেই বলেছি। লেখা কাগজগুলো নিয়ে তিনি সরকার পক্ষীয় অংশের সব থেকে পিছনের আসনে বসে ছিলেন। তাঁর পিছনেই ছিলেন তাঁর প্রধান অফিসাররা আর তাঁর ব্যক্তিগত কর্মচারীর দু তিন জন অর্থাৎ আমরা। বিতর্কে কোন বিষয় উঠলেই তিনি আমাদের দিকে মুখ ফেরাতেন বা চিরকুট লিখতেন, আর সঙ্গে সঙ্গে অফিসারদের দৌড়াতে হতো সংশ্লিষ্ট তথ্য আনবার জন্য। কিন্তু বর্ণনায় বাহুল্য না এনে সংক্ষেপে বলি, সরকার পক্ষ থেকে কেউ বেরিয়ে গেলেন না। কংগ্রেস সদস্যরা সবাই তাঁদের নেতার পিছনে থেকে গেলেন। বিরোধী পক্ষের নেতা জ্যোতি বসু অনাস্থা প্রস্তাব আনতে গিয়ে কঠোর সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠলেন। ভাষণ শেষ করতে তাঁর সময় লেগেছিল এক ঘণ্টার বেশি। তাঁর ভাষণের প্রথম ১৫ মিনিট কাল বাধা এসেছিল কংগ্রেস আসন থেকে। তাঁর পরে বিরোধী পক্ষের সদস্যরা, অধিকাংশই কমিউনিস্ট, একে একে বলতে শুরু করলেন। সরকার পক্ষ থেকে বললেন মাত্র দুজন, প্রদেশ কংগ্রেস সেক্রেটারি বিজয় সিং নাহার আর মুখ্যমন্ত্রী নিজে। কিন্তু বিজয়বাবুর ভাষণে বিচার

বিভাগে দুর্নীতি রয়েছে বলে মন্তব্য করা মাত্র সিদ্ধার্থবাবু সঙ্গে সঙ্গে তার জবাব দিলেন। বস্তুতঃ তাঁর বিবৃতিতে এর কোন উল্লেখও ছিল না। তাঁর আধ ঘণ্টা ব্যাপী ভাষণে সিদ্ধার্থবাবু সরকারের প্রতি যে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন, এখানে আমি তার কয়েকটি কথা তুলে দিচ্ছি :

শেষের দিকে বিধানচন্দ্র রায় আমাকে বলেছিলেন, বিচার বিভাগীয় মন্ত্রীর জানা উচিত যে, বাংলার ৪৬ শতাংশ লোক কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছে। হয়ত তাই। কিন্তু গত নির্বাচনে ভবানীপুরে ১৩,০০০ লোক ভোট দিয়েছিল আমাকে। আমার ভোটের সংখ্যাধিক্যের পরিমাণ ছিল সাত হাজার। বিধান সভা থেকে পদত্যাগ করেই আমি ভবানীপুর থেকে আবার দাঁড়াবো প্রার্থী হয়ে। সেই উপ-নির্বাচনে ভবানীপুর থেকে আমার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে বলবেন আপনারা, খাদ্যমন্ত্রীকে। আমি মাত্র একটি বিষয় নিয়েই ভোটে নামতে চাই সেটি হচ্ছে সরকারের খাদ্য নীতি। দেখাই যাক না, কী হয়।

বলা বাহুল্য বামপন্থী দলগুলির সম্মিলিত সমর্থনে তিনি বিপুল ভোটে আবার জিতে গিয়েছিলেন।

যাই হোক সিদ্ধার্থবাবুর সেদিনকার চ্যালেঞ্জের সময় সবার চোখ গিয়ে পড়েছিল প্রফুল্লচন্দ্র সেনের ওপরে। লোকে ভাবলো এইবার প্রফুল্লবাবু উঠবেন, তাঁর ঐ চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে। কিন্তু মুখে শুকনো একটু হাসি ফুটিয়ে তিনি বসে রইলেন, উঠলেন না।

রাত নটা দশ মিনিটে মুখ্যমন্ত্রী উঠলেন সমালোচনার উত্তর দিতে। বিরোধী পক্ষ এবং সিদ্ধার্থবাবু যে সব অভিযোগ এনেছিলেন, তার প্রত্যেকটি বিষয় নিয়েই তিনি তাঁর বক্তব্য পেশ করলেন, বললেন, যেসব মন্ত্রীর বিরুদ্ধে তাঁরা অভিযোগ এনেছেন আমি পুরোপুরি দায়িত্ব নিচ্ছি তাঁদের হয়ে।

প্রফুল্লচন্দ্র সেন আর কালীপদ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে তিনি বললেন, বিপুল বোঝার ভার যাঁরা বহন করেন, লোকে তাঁদের সমালোচনা করবেই।

কংগ্রেস-প্রশাসন শিল্পপতিদের সঙ্গে যুক্ত, এই অভিযোগের ওপর ডাঃ রায় বললেন, এই দেশে আমরা চেষ্টা করছি প্রতিষ্ঠা করতে এক ধরনের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য, একটি সমাজতান্ত্রিক ধাঁচ।

বিরোধী পক্ষ হেসে উঠেছিল শেষ দুটি কথায়।

কিন্তু তিনি তাতে বিচলিত না হয়ে বলতে লাগলেন, সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠনে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের ভিত্তি হচ্ছে চাপ নয়, বলপ্রয়োগ নয়, ভিত্তি হচ্ছে এদেশে গণতন্ত্র বলতে যা বোঝায় সেই ধারণাটি, যা আসে বিভিন্ন মতাবলম্বীদের মধ্যে আলোচনা থেকে, সমঝোতা থেকে, সমন্বয় থেকে। এরপরে তিনি কম্যুনিস্টদের লক্ষ্য করে বললেন, কেরালা সরকার বিড়লাদের আমন্ত্রণ জানায়নি সেখানে গিয়ে শিল্প গড়ে তুলতে? এটা তারা কেন করেছে? কারণ তারা জানে শিল্পপতিদের কাছ থেকে ঐ ধরণের সাহায্য না পেলে অনুন্নত দেশ ঠিক মতো উন্নয়ন লাভ করতে পারে না।

এই দেশ এবং এক দলীয় শাসন সম্বলিত দেশের অর্থনৈতিক ধারণা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বললেন, সেদিন রাশিয়া থেকে আসা জন কয়েক কৃষিজীবীর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা কে কী করেন। একজন বললেন তিনি দলের নেতা, দেশের একটি খামার পরিচালনা করেন। খামার অর্থে, যৌথ খামার, তার এলাকা ৪০,০০০ একর। জিজ্ঞাসা করলাম, কত মাইনে পান? তিনি জানালেন ৩৫০০ রুবল পান। আমার জিজ্ঞাসার শেষ সেখানেই ছিল না, বললাম, আপনি আদৌ কোন কৃষি কাজ করেন কী? তিনি বললেন, না, আমি শুধু খামার পরিচালনা করি। প্রশ্ন করলাম, যারা নিজের হাতে চাষবাস করে তারা কতো পায়? তিনি উত্তর দিলেন, ৩৫০ রুবল। এইতো শ্রমজীবী সমাজের নমুনা। যে ফসল ফলায় সে পায় ৩৫০ রুবল, আর ম্যানেজার পায় ৩৫০০ রুবল।

কম্যুনিস্ট পার্টির ওপরে এই কটাক্ষ যে গোলমাল আর চিৎকার-চেঁচামেচির উদ্রেক করেছিল, তার কথা বলাই বাহুল্য।

কথা প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী দুর্নীতির বিষয় খোলাখুলি স্বীকার করে নিলেন। তিনি বললেন, আমি স্বীকার করি যে সরকারের বিভিন্ন বিভাগে দুর্নীতি রয়েছে। ১৯৫৭র ৪ঠা জুলাই আমরা ক্যাবিনেট সাব কমিটি বলে একটি কমিটি তৈরি করলাম, তার মধ্যে পাঁচ জন সভ্য বিভিন্ন দপ্তরে গিয়ে খোঁজ খবর নেবেন। আর দেখবেন কী ভাবে দুর্নীতির মুলোচ্ছেদ করা যায়। আমাকে বলা হয়েছিল কিছুই হয় নি। কিন্তু কাগজপত্রে দেখছি নয়টি বৈঠক হয়েছিল।

জ্যোতি বসু: কিসের কাগজপত্র?

—আমাকে বাধা দেবেন না। ক্যাবিনেট সাব কমিটির ন'টি বৈঠক হয়েছিল। এর একটি বৈঠকে তাঁরা দুর্নীতির বিস্তার এবং খাদ্য, ত্রাণ, সরবরাহ এবং ভূমি ও ভূমি রাজস্ব বিভাগ সম্পর্কে পর্যালোচনা ক'রে অবস্থার উন্নতির জন্য কী কী ব্যবস্থা নেওয়া উচিত সে সম্পর্কে সিদ্ধান্তও নিয়েছিলেন। ১৯শে সেপ্টেম্বর সিদ্ধান্তগুলি মন্ত্রিসভায় পাঠানোও হয়েছিল। আমার মনে হয় সে বৈঠকে সিদ্ধার্থ রায়ও ছিলেন।

এখানে ডাঃ রায়, সিদ্ধার্থবাবু এবং কয়েকজন বিরোধী সদস্য যে জালিয়াতির অভিযোগ এনেছিলেন, সে সম্পর্কে উত্তর দিচ্ছিলেন।

এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই সিদ্ধার্থবাবু উঠে দাঁড়ালেন, বললেন--ক্যাবিনেট সাব কমিটির রিপোর্টে আমার সই ছিল কিনা বলুন।

এ কথার উত্তর না দিয়ে ডাঃ রায় তাঁর ভাষণ শেষ করতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সিদ্ধার্থবাবুও ছাড়বেন না, বললেন, সোজা বলুন হ্যাঁ কিম্বা না?

হৈ চৈ চিৎকার ও প্রশ্নাবলির মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী বলে চললেন—আজ বিকেলেই আমাদের বলা হয়েছে আমরা জালিয়াতির দোষে দোষী। আমার কাছে আসল কাগজপত্র নেই, আমি বলতে পারবো না।

স্বরাষ্ট্র ও দুর্নীতিবিরোধী বিভাগের সচিব যে টাইপ করা কাগজপত্র দিয়েছিলেন সেটা দেখে দেখে বলছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

ক্রমাগত চিৎকার আর টেবিল চাপড়ানোর মধ্যে কণ্ঠস্বর তুলে মুখ্যমন্ত্রী বললেন, আমি বুঝতে পারছি আমাকে কথা বলতে না দেওয়াই হচ্ছে মতলব। ঠিক আছে আমি বলবো না।

ক্লান্ত হয়ে তিনি বসে পড়লেন।

অধ্যক্ষ সভা মুলতুবী রাখলেন দশ মিনিটের জন্য। যদি আবহাওয়াটা একটু শান্ত হয়ে আসে। এই দশমিনিটের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী আসল কাগজপত্র জোগাড় করতে পারলেন না। বিরোধী পক্ষরাও সভা চলতে দিতে গররাজী। রাত তখন অনেক, এগারোটা বাজতে দশ মিনিট বাকি। এর পরের পনেরো মিনিট ধরে শুধু চললো টেবিল চাপড়ানো, চিৎকার আর গণ্ডগোল। সরকারের মুখ্য সচেতকের একটি প্রস্তাব সভায় আনতে দিলেন অধ্যক্ষ, ধ্বনি ভোটে তা গৃহীতও হয়ে গেল। এরপরে মূল অনাস্থা প্রস্তাবটি এলো। জ্যোতি বসু ডিভিসন চাইলেন, কিন্তু অধ্যক্ষ ঘোষণা করলেন, প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে

নাকচ হয়ে গেল। এইভাবে রাত ১১টা ৫ মিনিটে ঝটিকাসংকুল অধিবেশনটি শেষ হয়ে গেল। মুখ্যমন্ত্রীর পিছনে পিছনে যেতে যেতে দেখলাম পাশের ঘরে প্রফুল্ল সেন চুপচাপ বসে আছেন একা। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, প্রফুল্ল, ঘটনার গতি এ ভাবে মোড় নেওয়ায় আমি দুঃখিত। এ যে হবে আমি কখনোই ভাবতে পারিনি।

উত্তরের অপেক্ষা না করে ডাঃ রায় বেরিয়ে এলেন। প্রফুল্লবাবুর মুখে সেই শুকনো হাসি।

এই নাটকের ওপর যবনিকাপাত হলো ডাঃ রায়কে লেখা (১৬ই মে তারিখে) প্রধানমন্ত্রীর একটি চিঠিতে :

প্রিয় বিধান,

'আজ সন্ধ্যাবেলা সিদ্ধার্থ রায় এসেছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে। কয়েক সপ্তাহ ধরেই সে দেখা করতে চাইছিল। শেষ পর্যন্ত আমি আজ তাকে কিছুটা সময় দিয়েছি। সে বলছে কয়েকটা বিষয় সে আমার গোচরে আনতে চেয়েছিল কিন্তু এতকাল ইতস্ততঃ করেছিল আসতে। কথা যা বলবার সেই বলছিল বেশি, আমি শুধু দু একটা প্রশ্ন ট্রশ্ন করছিলাম আর কী।

সবার আগে সে তুললো খাদ্য ও কৃষি সংক্রান্ত বিষয়। দুটি বিষয়ই সরকারের সঙ্গে বিশেষ ভাবে যুক্ত, কিন্তু পঃ বঙ্গ সরকারের এ জন্য রয়েছে দুটি ভিন্ন মন্ত্রক বা দপ্তর। দুটির ভিতরে কোনো সমন্বয় নেই, যার ফলে ব্যাপারটা হয়েছে ক্ষতিকারক এবং ভয়ানক বিলম্বের উৎস। কেন্দ্রীয় সরকারে এ দুটি একই মন্ত্রকের অধীনে আছে, অন্যান্য দেশেও সাধারণতঃ তাই থাকে। আমি তাকে বলেছি যে, অবশ্যই দুটি বিষয় পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, আর সেজন্য দুটি আলাদা মন্ত্রক হলেও পরস্পরের মধ্যে গভীর সমন্বয় থাকা দরকার।

সে বললে এই সমন্বয়ের অভাব পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নানান দপ্তর সম্পর্কেই প্রযোজ্য হতে পারে। এই বলে কতগুলি উদাহরণ সে দিলো। তার মধ্যে একটা হচ্ছে জলপাইগুড়ির কাছে একটা সেতু তৈরি হয়েছে, কিন্তু তার সঙ্গে সংলগ্ন রাস্তা তৈরি হয় নি। আরও যা সে বললো তা হচ্ছে কেন্দ্র থেকে প্রচুর টাকা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু অল্প ক্ষেত্রেই তা ফলপ্রসূ হয়েছে। তরুণ জেলা শাসকরা উৎসাহ নিয়ে কাজ আরম্ভ করেন, কিন্তু পরে

আস্তে আস্তে হতাশ হয়ে পড়েন। মজুরী পেতে তাঁদের দেরি হয়, ইত্যাদি। তাছাড়া তাঁদের কাজে হস্তক্ষেপ করেন মণ্ডল কংগ্রেসের সভাপতিরা এবং আরও অনেক ব্যক্তি। এর পরে সে তুললো জাতীয় কর্মসংস্থান এবং সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের কথা। তার মতে সবটাই জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে, ওপর থেকে পরিচালিত হয়। ফলে জনগণের কোনো সহযোগিতা এবং উৎসাহ এতে নেই।

সে আরও বললে কয়েকটি স্কুলে গিয়ে আধ পেটা খাওয়া ছেলেদের দেখেছে সে। এক জায়গায় একজন শিক্ষক তাকে বলেছিলেন বেশ কয়েকটি ছেলে ক্ষিদের জ্বালায় সত্যি সত্যি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। দেখা যাচ্ছে টাকা যথাযথ খরচ হচ্ছে না, এমন কি ভারত সরকার থেকে আসা টাকাও না। কৃষিসার যে অদ্ভুত ভাবে বিলি করা হয় সে সম্পর্কেও সে বললো। এগুলি চলে যায় কালোবাজারে, কখনো মাদ্রাজ পর্যন্ত চলে যায়, কারণ ওখানে ওর প্রচুর চাহিদা বলে চড়া দাম পাওয়া যায়। ত্রাণের টাকা তথাকথিত অর্থপ্রদানকারীদের মাধ্যমে দেওয়া হয়, কখনোই ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ তা পায় না। সব জিনিসটাই দুর্নীতিতে ভরপুর। তার মতে, দুর্নীতি পশ্চিমবঙ্গে এমন ভীষণ ব্যাপকতায় পৌঁছেছে যে তা চট করে বিশ্বাস করা যায় না। কোনো মর্যাদাসম্পন্ন মানুষই এর সংস্রবে থাকতে পারে না। একথা যখনই সে বলতে গেছে তখনি তাকে হাস্যাস্পদ করা হয়েছে। সবার শেষে সে বললো লাইসেন্স দেওয়ার রীতি খুবই খারাপ এবং এদিকেও দুর্নীতি ক্রমশঃ বাড়ছে। বিলেতের মতো এখানেও কেন লাইসেন্স ও পারমিটের জন্য লাইসেন্স প্রদানকারী নিরপেক্ষ বিচারক থাকবে না।

আমি এ সব বিষয় নিয়ে তার সঙ্গে কোনো আলোচনা করি নি, শুধু শুনে গেছি। সরকারী কার্যক্রমে সমন্বয় সাধন সম্পর্কে কিছু বলেছি, আর বলেছি ভারত সরকারের অসংখ্য দপ্তর ও কাজকর্মে সমন্বয় সাধন করবার জন্য আমরা কী ভাবে চেষ্টা করেছি।

সিদ্ধার্থ রায় আমাকে একটা আইন বা বিলের খসড়া দিয়েছে, যেটা নাকি তার নিজের তৈরি। এর নাম পশ্চিমবঙ্গ সমাজবিরোধী কার্যকলাপ প্রতিরোধ বিল ১৯৫৭। এর মূলকথা হলো এই যে, সারা রাজ্য জুড়ে অভিযোগ কমিটি থাকবে, তাদের হাতে কিছু ক্ষমতাও থাকবে। আমি জানিনা এই ধরণের

কোনো কিছু করলে তাতে কোনো কাজ হবে কি না, তবে দুর্নীতি সম্পর্কে আমি চিন্তান্বিত, আর এর মোকাবিলা করার জন্য আমাদের যে সামর্থ্য আছে তাও খুব পর্যাপ্ত নয়। আমি এটা লিখলাম তোমাকে শুধু জানাতে যে সে আমাকে কী কী বলেছে।

তোমার স্নেহের

জওহর

মার্চ থেকে জুন এই তিন মাসে ডাঃ রায়কে তিনটি আক্রমণ ঠেকাতে হয়েছিল। অনাস্থা প্রস্তাব ছিল তার মধ্যে একটা। এর পরে এলো উদ্বাস্তুদের বিরাট আন্দোলন আর খাদ্য আন্দোলন। যে মানসিক শক্তি দিয়ে এসব তিনি ঠেকিয়েছিলেন সে সম্পর্কে তিনি নিজেই একবার বিধানসভায় বলেছিলেন—রাজনীতিকের কাছে জয় বা পরাজয় বড়ো কথা নয়। সব থেকে বড়ো যে গুণ তার থাকা দরকার, সে হচ্ছে স্বচ্ছ দৃষ্টি আর ধৈর্য। দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্থা, একটি ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রজা সোসালিষ্ট পার্টি, আর একটি হচ্ছে কম্যুনিস্ট নিয়ন্ত্রিত ইউ. সি. আর. সি. এরা পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের নিয়ে আন্দোলনে নামবার জন্য পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা করছিল।

১০ই এপ্রিল উদ্বাস্তু দমন প্রতিবাদ দিবস বলে ঘোষিত হয়েছিল। শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদের বেশ বড়ো একটা অংশ রাজ্য সরকারের সাহায্য নিয়েছিল অন্য রাজ্যে পুনর্বাসন পাবে বলে। অন্যান্য রাজ্যে এদের পুনর্বাসনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে নানা রকম পরিকল্প হয়েছিল। কিন্তু পরে দেখা গেল তারা বাইরে যেতে এখন নারাজ এবং শিবির ছেড়ে দিতেই ইচ্ছুক নয়। শিবিরবাসী উদ্বাস্তুরা জীবনধারণের জন্য ডোল, অর্থসাহায্য ও অন্যান্য সুবিধা পাচ্ছিল, আর এটা তাদের পাবার কথা যতদিন না তারা কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সম্মিলিত বিবিধ ধরণের পরিকল্প অনুসারে কৃষিজমি পাচ্ছে, কিংবা অন্য কোন কাজকর্মে নিযুক্ত হচ্ছে। ৮ই এপ্রিল উদ্বাস্তু পুনর্বাসন উপদেষ্টা পর্ষদ-এর সভ্যদের কাছে (এঁদের মধ্যে বিরোধী দলের প্রতিনিধিরাও ছিলেন) ডাঃ রায় খোলাখুলি বলেছিলেন, যে সব উদ্বাস্তুরা বাইরে যেতে রাজী হয়েছে বলে সরকারী সুযোগ সুবিধা নিয়েছে, তাদের বিষয়ে সরকার পুনর্বিবেচনা করবেন না। এই সঙ্গে তিনি অবশ্য এ আশ্বাসও দিলেন যে, যাদের ডোল বন্ধ হয়েছে

তাদের ব্যবস্থা তিনি করবেন। আর জোর করে কাউকে বাইরে পাঠানোও হবে না। আন্দোলনের সংগঠকরা দাবি করলেন যে, প্রায় আড়াই হাজার উদ্বাস্তুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, যদিও পরে সবাইকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, নেতাদের ছাড়া। অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্য এম. এল. সি. এবং অন্যান্য উদ্বাস্তু নেতাদের তিনি লিখেছিলেন—ঐ শিবিরগুলো চিরকাল চলতে পারে না।

আন্দোলনটা চলছিল পঞ্চাশ হাজার উদ্বাস্তু শিবিরবাসীদের মধ্যে, যাদের জন্য সরকার খরচ করেছিলেন বছরে দশ কোটি টাকা। এই আন্দোলন সম্পর্কে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী মেহেরচাঁদ খান্না রাজ্যসভায় বললেন যে, প্রায় ২'৯ মিলিয়ন বা ২৯ লক্ষ লোককে আংশিক পুনর্বাসিত করা হয়েছে। কিন্তু তাঁর মতে, পুনর্বাসনের এই সব সুবিধা অনির্দিষ্টকালের জন্য চলতে পারে না।

যাইহোক মুখ্যমন্ত্রী যখন বললেন অনিচ্ছুক উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য জোর করে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে পাঠানো হবে না এবং রাজ্যের বাইরে যেতে অরাজী হওয়ায় যে ডোল তাদের বন্ধ হয়ে গেছে তা দেওয়া হবে, আর সঙ্গে সঙ্গে যাদের আটক করা হয়েছিল তাদেরও ছেড়ে দেওয়া হবে—তখন ১৯শে এপ্রিল নেতারা আন্দোলন উঠিয়ে নিলেন।

পরের মাসে মুখ্যমন্ত্রীকে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম'এর মুখোমুখি হতে হলো। এই আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন 'দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি'। এরও পুরোভাগে ছিলেন সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমন্তকুমার বসু ও বিরোধীদলের কম্যুনিস্ট নেতারা। এঁদের প্রতিনিধিরা ৮ই জুন রবিবার বেলা সাড়ে পাঁচটায় ডাঃ রায়ের বাড়িতে এসে তাঁর হাতে স্মারকলিপি তুলে দিলেন। খাদ্যমন্ত্রীকেও এই সময় হাজির থেকে মুখ্যমন্ত্রীর সহকারিতা করতে বলা হয়েছিল। সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এলেন অন্য বারো জনকে সঙ্গে নিয়ে। তাঁদের দাবি ছিল, সাড়ে সতেরো টাকা মণ দরে সংশোধিত রেশনের দোকান থেকে ভালো চাল দিতে হবে। আটা অথবা গম দিতে হবে পনেরো টাকা দরে, সংশোধিত রেশন এলাকাকে বাড়িয়ে সব পরিবারগুলিকেই এর আওতায় আনতে হবে, সেই সব পরিবারের যাই আয় থাকুক না কেন। এ দাবি পুরণ না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন ১৩ই জুন থেকে। ১০ই জুন নেতাদের সঙ্গে আর একটা বৈঠক হবে ঠিক হলো। আর ঐ বৈঠকের পরেই নেতারা তাঁদের

প্রত্যক্ষ সংগ্রাম স্থগিত রাখলেন, সরকার কতকগুলো ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। এগুলি হলো টেস্ট রিলিফ ও অন্যান্য ত্রাণ ব্যবস্থা, কৃষি ও ফসল সংক্রান্ত ঋণ দান, সংশোধিত রেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ। তিন হাজার কৃষক লাল ঝাণ্ডা নিয়ে হেঁটে এসে জড়ো হয়েছিল ডাঃ রায়ের বাড়ির সামনেকার ওয়েলিংটন বা বর্তমান সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় এই পার্কে একদিন কতো ঐতিহাসিক জনসভাই না হয়ে গেছে। আশ্চর্য কাণ্ড, এখানকার মাইকের আওয়াজে আমাদের অফিসের কাজকর্মে ব্যাঘাত হয়েছে, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী তাঁর শোবার ঘরে দিব্যি অকাতরে নিদ্রা গেছেন, তাঁর কোন অসুবিধা হয় নি। যাই হোক, ঐ কৃষকরা তাদের নেতা হরেকৃষ্ণ কোঙারের ভাষণে শুনলেন যে, সত্যাগ্রহ হবে না, আন্দোলন উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে, কেননা সরকার তাদের দাবির অনেকটাই মোটামুটি মেনে নিয়েছেন।

টাইম্‌স পত্রিকায় কলকাতার কুৎসা

উক্ত ওয়েলিংটন স্কোয়ারে কংগ্রেস দলের এক অধিবেশনে ডাঃ রায় টাইম্‌স পত্রিকার একটি সংখ্যা হাতে নিয়ে প্রবেশ করলেন। তারিখটা হচ্ছে ৩০শে জুন। টাইম্‌স-এ একটি নিবন্ধ বেরিয়েছে, তাতে কলকাতাকে দুর্গন্ধযুক্ত নগর বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে হাজার হাজার লোক এখানে মরছে, আমেরিকার পর্যটকদের বলা হয়েছে, আপনারা আপনাদের সফর তালিকা থেকে কলকাতাকে বাদ দেবেন। কলকাতার এই কুৎসার বিরুদ্ধে ডাঃ রায় সেদিনকার সভায় গর্জে উঠলেন বলা চলে। তিনি বলেছিলেন, কলকাতা হচ্ছে নতুন ও পুরাতনের এক আশ্চর্য সহাবস্থানের উদাহরণ। এরকম প্রাণচঞ্চল শহর আর কোথায় আছে? শহরের মধ্যে আর বাইরে বিপুল সংখ্যায় উদ্বাস্তুরা বাস করছে অবশ্যই খুব ভাল অবস্থায় নয়, তবু ভারতের যে কোনো শহরের তুলনায় এখানে মৃত্যুর হার সব থেকে কম। ১৯৪০ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত কলকাতায় কী হয়েছিল সে কথা আমেরিকানদের মনে রাখা উচিত। কলকাতাকে তারা যুদ্ধের ঘাঁটি করে তুলেছিল, আর সেজন্য এখানে হয়েছিল জাপানী বোমার আক্রমণ। তছনছ হয়ে গিয়েছিল বাংলার অর্থনৈতিক ভিত্তি। এরপরেই তাঁর প্রশ্ন হলো, এর জন্য দায়ী কে? বাঙালীরা না আমেরিকানরা? কংগ্রেসের বিরুদ্ধবাদীরা কলকাতার কুৎসা গেয়ে বেড়ায়,

কিন্তু এই কলকাতা হচ্ছে এই রাজ্যের হৃৎপিণ্ড। কলকাতা মরলে পশ্চিমবঙ্গ বাঁচবে না, আর পশ্চিমবঙ্গ যদি মরে, তাহলে কংগ্রেসও বাঁচবে না। এই সেই শহর যেখানে নেহেরুর বক্তৃতা শুনতে আসে কুড়ি লক্ষ লোক, আর ৩০ লক্ষ লোক আসে বুলগানিন ও ক্রুশ্চেভকে সম্বর্ধনা জানাতে।

তুমুল করতালি উঠল, যখন তিনি তাঁর ভাষণ শেষ করলেন।

ডাঃ রায়ের ৭৬তম জন্মদিন

ওয়েলিংটনের ঐ সভামঞ্চে আবার তিনি উঠলেন তার পরের দিন। এদিনটি ছিল ১লা জুলাই, তাঁর জন্মদিন। মেয়র ত্রিগুণা সেন ও অন্যান্য বহু সংস্থা তাঁকে সম্বর্ধনা জানালেন। তিনি বললেন, মা বাপের কাছ থেকে তিনটি জিনিস শিখেছিলাম জীবনে—স্বার্থহীন সেবা, সাম্যের ভাব, আর পরাজয় কখনো না মেনে নেওয়া।

এর পরে হাসি ও তামাসার সুরে তিনি তুললেন তাঁর সম্বর্ধনার বিরুদ্ধে কোনো কোনো দিক থেকে যে আপত্তি উঠেছিল, তার কথা। বললেন, আমি এই বিরুদ্ধতার মানে বুঝি না, আমি তো কোনো অন্যায় করি নি। আমি যখন মরবো তখন ঐ লোকগুলোই বলবে, লোকটা ভালো ছিল গো, আরও কিছুদিন বাঁচলে পারতো।

যাই হোক, কংগ্রেসের কর্তা অতুল্য ঘোষ এবারও এক লক্ষ টাকা তুলে দিলেন তাঁর হাতে। আর ডাঃ রায়ও যথারীতি টাকাটা কংগ্রেসকেই দিয়ে দিলেন। সকালে যে তাঁর নামে নামাঙ্কিত ছাত্র-ভবনটির তিনি দ্বারোদ্ঘাটন করে এলেন, তার জন্য এই টাকার কিছু অংশ আলাদা করে রাখা হলো।

বাংলার কংগ্রেস দল সম্পর্কে নেহেরু

দক্ষিণ কলকাতার উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী কলকাতা করপোরেশনের অন্যতম কাউন্সিলার বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ছিলেন বামপন্থী দলগুলির সমর্থনে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। কলকাতায় কংগ্রেসের প্রভাব কমছে দেখে হতাশ হয়ে নেহেরু একটি চিঠি লিখলেন অতুল্য ঘোষকে, তার একটা কপি পাঠিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রীকে। বাহুল্যবোধে চিঠিখানি উদ্ধৃত করার দরকার নেই, এতে তাঁর প্রধান অভিযোগ ছিল একটাই, জনসংস্রব থেকে কংগ্রেস দূরে সরে

যাচ্ছে। চিঠির এক জায়গায় তিনি মন্তব্য করেছিলেন, সিদ্ধার্থ রায়ের নির্বাচনী এলাকায় আমাদের বিরোধীরা প্রচণ্ড খাটছে, সেখানে কংগ্রেস কী করছে জানি না। মনে হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কলকাতার আশা প্রায় ছেড়েই দিয়ে গ্রামাঞ্চল নিয়ে বেশি ভাবতে আরম্ভ করেছে। গ্রামাঞ্চল অবশ্যই উপেক্ষার বস্তু নয়, কিন্তু কলকাতা যদি আমাদের হাত থেকে চলে যায়, তাহলে গ্রামাঞ্চলেও তার প্রভাব পড়বে প্রচণ্ড ভাবে। এমন কি সারা ভারতও বাদ যাবে না। কলকাতায় সম্ভবতঃ কংগ্রেসের শক্তি বেশি নিহিত রয়েছে অবাঙালীদের মধ্যে। সেটা ভালো, কিন্তু শহরের হৃদয় বলতে যাদের বোঝায়, সেই বাঙালীদের সমর্থন না পাওয়া একটা প্রচণ্ড দুর্বলতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই সব কারণেই আমাদের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দরকার। দরকার, যে পুরানো গণ্ডীর মধ্যে আমরা আবদ্ধ আছি, তা থেকে বেরিয়ে আসা।

জুলাই মাসে বাংলা ও আসামের সীমান্তরেখায় উত্তেজনার সৃষ্টি হতে লাগলো। পূর্ব পাকিস্তানের সৈন্যরা ভারতীয় নাগরিকদের ওপর গুলি চালাচ্ছে বলে শোনা গেল। বিশেষ করে হামলা হচ্ছিল ২৪ পরগণা, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়া জেলার সীমান্তে। সীমান্তের পরপারে ট্রেঞ্চ-খনন, সৈন্য-চলাচল প্রভৃতির জন্য এপারের সীমান্ত-এলাকার লোকেরা আতঙ্কিত হয়ে পড়তে লাগলো। অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে বিধান সভার বিরোধীপক্ষগুলির ৭ জন সদস্য ১৮ই জুলাই মুখ্যমন্ত্রীকে একখানা চিঠি লিখলেন। তাঁদের মতে পরিস্থিতি খুবই উদ্বেগজনক। এই সাতজন সদস্য হচ্ছেন কম্যুনিস্ট দলের উপনেতা বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়, দেবেন সেন, হেমন্তকুমার বসু, যতীন চক্রবর্তী, সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফকিরচন্দ্র রায় এবং লাবণ্যপ্রভা ঘোষ। সরকার পক্ষ থেকেও মুখ্যমন্ত্রী অনুরূপ একটি চিঠি পেয়েছিলেন। ১৮।১৯শে জুলাই সদস্যদের চিঠি ও সীমান্ত-পরিস্থিতির কথা জানিয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রীকে একটি চিঠি দিলেন, এতে মধ্যপ্রাচ্যে যে বিপদ ঘনিয়ে আসছে, সে সম্পর্কে বিধানসভায় কিছু বলা দরকার বলেও মন্তব্য ছিল।

দক্ষিণ কলকাতার উপনির্বাচন উপলক্ষে নেহেরুর কলকাতা আসবার কথা শুনে তাঁর সঙ্গে যাতে সাক্ষাৎ করা যায় তার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ জানিয়েও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠি পাঠিয়েছিলেন বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসী ৪৯ জন, তার মধ্যে বিধানসভা ও পরিষদেরও কয়েকজন সভ্য ছিলেন। এ ছাড়া সীমান্ত অঞ্চলে পাকিস্তানী হামলা সম্পর্কে মুর্শিদাবাদ, নদিয়া ও ২৪ পরগণার অধিবাসীদের হয়ে

শঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য কয়েকজন কংগ্রেস সদস্যও তাঁকে চিঠি লিখেছিলেন। সব চিঠিই তিনি নেহেরুকে পাঠিয়ে দিয়ে সঙ্গে তাঁকে নিজেও চিঠি দিয়েছিলেন ১৯শে জুলাই। তার শেষাংশ এখানে তুলে দিচ্ছি :

"তুমি যখন এখানে আসবে, তখন তোমার সঙ্গে দেখা করবার সুযোগ চেয়ে আমার কাছে চিঠি দিয়েছেন ৪৯ জন কংগ্রেস সদস্য, তার মধ্যে কয়েকজন বিধানসভার সদস্যও আছেন। তাঁদের স্বাক্ষরিত সেই চিঠিখানাও এই সঙ্গে পাঠালাম। আমার দৃঢ় ধারণা, দক্ষিণ কলকাতার নির্বাচনের স্বার্থে এ ধরনের বৈঠক ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াবে। প্রকৃত পক্ষে আমি অবাক হবো না যদি স্বাক্ষরকারীদের কারুর কারুর মনের মধ্যে এই অভিসন্ধি থেকে থাকে যে সিদ্ধার্থ যদি জেতে, তাহলে অতুল্যবাবুকে যেতে হবে, আর সে যদি হারে, তাহলে অতুল্যবাবু থেকে যান : সুতরাং সিদ্ধার্থ জিতুক। অবশ্য স্বাক্ষরকারীদের ভিতরকার উদ্দেশ্য কী, তা বোঝা শক্ত। কিন্তু এটুকু বলতে পারি যদি তুমি এখানে আসো, তাহলে এই লোকগুলোকে সুযোগ দিও না, যাতে তারা আমাদের দক্ষিণ কলকাতার নির্বাচনী ব্যবস্থায় কোনো বাধা সৃষ্টি করতে পারে। কংগ্রেসীদের মধ্যে যদি বিভেদ দেখা দেয়, তাহলে দক্ষিণ কলকাতায় আমাদের সাফল্যের আশা ছেড়ে দিতে হবে। অমনিতে দক্ষিণ কলকাতায় আমাদের জেতার সুযোগ ভালোই আছে বলতে হবে।"

ওদিকে পশ্চিম এশিয়ায় অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটছিল। আমেরিকা হামলা করেছে লেবাননে, ইংরাজরা সৈন্য নামিয়েছে জর্ডানে। ক্রুশ্চেভ এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির কথা জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন নেহেরুকে এবং যুদ্ধ ঠেকাতে তাঁর হস্তক্ষেপ চেয়েছিলেন। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নেহেরুর কলকাতা আসার সম্ভাবনাকে অনিশ্চিত করে তুলেছিল সন্দেহ নেই। সে কথা জানিয়ে তিনি পর পর দুখানি চিঠি লিখেছিলেন ডাঃ রায়কে। পাকিস্তানী হামলা সম্পর্কেও তিনি লিখেছিলেন ২৩শে জুলাই তারিখে। তাতে তিনি লিখেছিলেন, ও বিষয়ে তাঁরা সচেতন ও সতর্ক রয়েছেন এবং গুরুতর কিছু ঘটলে তার মোকাবিলা করতে বিন্দুমাত্র দেরি হবে না।

জুলাই মাসের চতুর্থ সপ্তাহে পশ্চিম এশিয়ায় আশু যুদ্ধের সম্ভাবনা তিরোহিত হওয়ায় নেহেরু তাঁর প্রতিশ্রুতি মতো কলকাতায় আসতে পারলেন। ২৭শে জুলাই রাজভবনে পৌঁছবার কিছু পরেই জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে

তিনি বললেন, দেশের সমস্যা আলোচনা করতে সে সব পুরানো দিনে যেমন আমি আসতাম, তেমনি এসেছি জওহরলাল নেহেরু হিসাবে, প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নয়। এর পরে তিন হাজার মণ্ডল কংগ্রেস সভাপতি ও সম্পাদকদের সামনে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বললেন, পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস সংগঠনকে আমি ঢেলে সাজাতে কলকাতায় এসেছি বলে যে গুজব রটেছে, তা একেবারে মিথ্যে।

তাঁর ভাষণে তিনি অতুল্যবাবুরও প্রশংসা করলেন, বললেন, বহুবছর ধরে তিনি কংগ্রেসের স্তম্ভ স্বরূপ দাঁড়িয়ে আছেন। তবে এটা খুবই ভালো হবে, যদি নিচে থেকে ওপর পর্যন্ত সবাইকে নিয়ে মাঝে মাঝে পালা করে কার্যকরী সমিতির সদস্য, সভাপতি, সম্পাদক ইত্যাদি নিয়োগ করা যায়।

ওদিকে ভবানীপুরের নির্বাচন আসন্ন হয়ে উঠতে লাগলো। তারিখ ঠিক হয়ে গেল ২৪শে আগস্ট। অস্থায়ী মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার কে. ভি. কে. সুন্দরম কলকাতায় এলেন অভিযোগের তদন্ত করতে। সিদ্ধার্থবাবু ও জ্যোতিবাবু অভিযোগ করেছিলেন যে, ভোটদাতাদের তালিকা থেকে ১১৭১টি নাম বিগত সংশোধনের সময় বাদ পড়ে গেছে। ভোটদাতারা ভোটের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে কেন? নির্বাচনী কমিশনার নিজে ভবানীপুর এলাকার সংশ্লিষ্ট বাড়িগুলিতে গিয়ে তদন্ত করে দেখলেন, অভিযোগ মিথ্যা নয়। সঙ্গে সঙ্গে তালিকা সংশোধনের আদেশ দিলেন তিনি।

যাইহোক, নির্বাচনের উত্তেজনা ক্রমশ বাড়তে লাগলো। এ হলো মর্যাদার লড়াই। দু পক্ষই বাছা বাছা নেতা ও কর্মীদের কাজে লাগিয়ে দিয়েছিল। ভোটদাতাদের হারও কম নয়। ৫০ থেকে ৭০ শতাংশ। ভোটের দিনটাও মোটামুটি কেটেছিল শান্তিপূর্ণভাবে। শুধু একটা ঘটনা ছাড়া। বেলা তখন ১০টা। মুখ্যমন্ত্রী টেলিফোনে খবর পেলেন যে মধ্য কলকাতার সত্য বিশ্বাস বলে একজন কংগ্রেস কর্মীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়েছে। চোখে আগুনে পোড়ার ঘা, বিরোধীদলের কর্মীরা তার চোখে অ্যাসিড ছুঁড়ে মেরেছিল। সেদিন জাল ভোট দেওয়ার জন্য ২২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

পরের দিন ভোটের ফলাফল বার হলো। ভোট পড়েছিল ৩৬,১৯৫টি। সিদ্ধার্থবাবু পেয়েছেন ২৩,২২২টি ভোট, তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস প্রার্থী বিজয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পেয়েছেন ১২,৬৮৪টি ভোট। ১৯৫৭ সালেও সিদ্ধার্থবাবু

জিতেছিলেন প্রায় সাত হাজার বেশি ভোট পেয়ে, কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে, ঐ ভবানীপুর কেন্দ্র থেকেই। তাঁর এবারকার জয় তাঁর পক্ষেই শুধু নৈতিক প্রেরণার দ্যোতক নয়, সমস্ত বিরোধীদল, যারা তাঁকে সমর্থন করছিল, তাঁদের পক্ষেও।

ট্রাম ধর্মঘট

অনেক ধর্মঘট হয়েছে কলকাতায়, কিন্তু সেবার আগস্ট-সেপ্টেম্বরে যে রকম ধর্মঘট হয়েছিল, সে রকম আর কখনো দেখা যায় নি। এবারের মতো এমন সংহতিও দেখা যায় নি কর্মীদের মধ্যে। কী কংগ্রেস কী কম্যুনিষ্ট কী হিন্দ মজদুর সভা,—সব ইউনিয়ন বা সমিতিগুলিই এক হয়ে দাবি করছিল, বেতন বাড়াতে হবে বেতন-কাঠামোর পরিবর্তন ঘটিয়ে, গ্রাচুয়িটি দিতে হবে, ছুটি-ছাটার সুযোগ-সুবিধাও দিতে হবে। তিনটি ইউনিয়ন মিলে একটি যুগ্ম কমিটিও করা হয়েছিল এই দাবি আদায়ের জন্য। মীমাংসা করা এবং কর্মী ও সরকারের সঙ্গে দেখা করবার জন্য বিলেত থেকে ছুটে এলেন কোম্পানীর চেয়ারম্যান ওয়েব সাহেব, তাঁর সঙ্গে অন্য একজন ডিরেক্টর স্যর পার্সিভ্যাল গ্রিফিথ্‌স। তাঁদের স্থানীয় একজন ডিরেক্টর বদ্রীপ্রসাদ পোদ্দারকে সঙ্গে নিয়ে তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল, কর্মীদের দাবি মেটানোর মতো সংস্থান তাঁদের নেই। প্রতি স্তরে এক পয়সা, এই হিসাবে ভাড়া বাড়াতে দিলে তাঁরা দাবি মেটাতে সক্ষম হবেন। এক সময় কোম্পানীর পরিচালকরা তাঁদের ভাড়া বাড়াবার একপক্ষীয় সিদ্ধান্ত ঘোষণাই করে ফেলেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে কড়া চিঠি দিয়েছিলেন তাঁদের। এর ফল মোটেই ভালো হবে না, বলে তাঁদের সাবধান করতেও দ্বিধা করেন নি তিনি।

এর পরে শুরু হলো প্রস্তাব চালাচালি, কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিকদের সঙ্গে, যুগ্ম কমিটি ও সরকারের সঙ্গে এবং কর্তৃপক্ষ ও সরকারের সঙ্গে। একদল যদি মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে ঢোকে একটি প্রস্তাব নিয়ে, ত অন্যদল ঢোকে তার পাল্‌টা প্রস্তাব নিয়ে। কিন্তু দুর্ভোগ ভুগতে হচ্ছিল জনসাধারণকে। ১২ই আগস্ট থেকে শুরু হয়ে ধর্মঘট চলেছিল ২২শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত একটানা ৪১ দিন।

মুখ্যমন্ত্রীর কড়া চিঠি পেয়ে কোম্পানী অবশ্য ভাড়া বাড়াবার সিদ্ধান্ত স্থগিত রেখেছিল। ২১শে সেপ্টেম্বর রবিবার সকালে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর আইন সচিব

কে. কে. হাজরাকে বাড়িতে ডেকে পাঠালেন। দুই জনে ঘণ্টাখানেক ধরে রুদ্ধ কক্ষে বসে কোম্পানীর শেষ প্রস্তাব, আর ধর্মঘটী শ্রমিকদের সংশোধিত দাবির প্রস্তাব,—দুই-ই খতিয়ে দেখছিলেন। দেখতে দেখতে একটা ফরমুলা বা মীমাংসার সূত্র বার করা হলো। মুখ্যমন্ত্রী আমাকে ডেকে ট্রাম-কর্তৃপক্ষ ও ইউনিয়ন-নেতাদের উদ্দেশ্যে লম্বা একখানা চিঠির ডিক্‌টেশন দিতে লাগলেন। এটা করবার সময় যুগ্ম-কমিটির প্রতিনিধি হিসাবে কংগ্রেস এম-এল-এ নেপাল রায় তাঁর সঙ্গে দু-দুবার দেখা করলেন। দ্বিতীয় বার যখন দেখা করলেন, তখন শ্রমিকদের পক্ষ থেকে তিনি ডাঃ রায়কে সবুজ সংকেত জানালেন। চিঠিখানা টাইপ করা হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রীর নামাঙ্কিত আধা-সরকারী চিঠির কাগজে। হাজরা পরামর্শ দিলেন,—এতে আপনি নিজে সই করবেন না, আপনার নিজের দপ্তরের কোনো অফিসারকে দিয়ে সই করান।

সেদিন রবিবার, ছুটির দিন , ব্যক্তিগত সহায়ক হিসাবে এক আমি ছাড়া হাতের কাছে আর কোনো অফিসার নেই। ঠিক হলো, চিঠিখানা যাবে একখানা নির্দেশনামা হিসাবে, আর তাতে থাকবে আমার সই। এমন একটা জরুরী দলিলে আমার মতো লোকের সই থাকলো ভেবে আমি রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলাম সন্দেহ নেই।

পরের দিন এই প্রস্তাব ধর্মঘটী কর্মীদের সাধারণ সভায় গৃহীত হলো। বেতন বাড়লো শতকরা ৫, কমপক্ষে মাসিক ৫ টাকা। মূল বেতন ও মহার্ঘ ভাতা নিয়ে যা হয়, তার ৬৪ শতাংশ হলো প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, গ্রাচুয়িটির টাকার হিসাব হবে চাকরিকালের প্রত্যেক বছরে ১৫ দিনের মূল বেতন ধরে। আর ঐ সঙ্গে কোম্পানীর সংস্থান-সম্পর্কে একটি তদন্ত-কমিটি বসাতেও রাজী হলেন সরকার। মুখ্যমন্ত্রী এ আশ্বাসও দিলেন যে, ধর্মঘটের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাদের প্রত্যেককেই ছেড়ে দেওয়া হবে।

এইভাবে যানবাহন-সংক্রান্ত সব থেকে দীর্ঘদিনের ধর্মঘট মিটলো, শহর-বাসীও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো।

ভারতের প্রথম এক্সপ্রেস হাইওয়ে

দুর্গাপুর ইস্পাত প্রকল্পের জন্য মনোরম এক আধুনিক শহর গড়ে উঠছিল। গাছের সারি-সাজানো সুন্দর সুন্দর রাস্তাগুলির নামকরণ হচ্ছিল রবীন্দ্রনাথ,

শ্রীঅরবিন্দ ও বিবেকানন্দের নামে, যেখানে ছিল বন আর ধানের ক্ষেত। দুর্গাপুরে যেতে-আসতে মুখ্যমন্ত্রী কেবলি ভাবতেন, এই শিল্পনগরীর সঙ্গে কলকাতার সংযোগ আরও সংক্ষিপ্ত ও আরও সহজ করা যায় কীভাবে। দুর্গাপুরকে যদি একদিন ভারতের 'রূঢ়' হতে হয়, তাহলে এর জন্য চাই দ্রুতগামী যান-চলাচলের উপযুক্ত প্রধান একটি সড়ক। যেই ভাবা, অমনি কাজ। নিজের একদল ইঞ্জিনিয়ারের সাহায্য নিয়ে বসে গেলেন কাজ করতে। ব্লু-প্রিণ্ট বা নক্সা-টক্সা যখন তৈরি হয়ে গেল, তখন চললেন দিল্লী, কেন্দ্রের অনুমতি ও টাকার মঞ্জুরী আনতে। ৭ই অক্টোবর কেন্দ্রীয় যানবাহন ও যোগাযোগ-মন্ত্রী ঘোষণা করলেন,—নতুন একটি জাতীয় সড়ক, ভারতে এই-ই প্রথম, কলকাতা থেকে দুর্গাপুর পর্যন্ত তৈরি হবে, মোট খরচ পড়বে ১৬ কোটি টাকা, কেন্দ্র বরাদ্দ দান করলেন ৫ কোটি টাকা। শুধু মোটর গাড়িগুলিকে চলতে দেওয়া হবে এর ওপর দিয়ে। মোট টাকাটার সংস্থান করতে হবে—এর ওপর দিয়ে যে সব গাড়ি যাবে, তাদের ওপর বিশেষ কর বসিয়ে। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি, এই সড়ক তৈরি হয়ে গেছে, কলকাতা আর দুর্গাপুরের জীবনে জীবন যোগ করা হয়েছে।

আমেরিকা ও ইয়োরোপ-সফর

ডাঃ রায় কয়েকটি ইউরোপীয় দেশ আর আমেরিকা যাবার কথা ভাবছিলেন তাঁর স্বাস্থ্য-পরীক্ষা ও একজন ভিয়েনার সার্জনকে ডান চোখটা দেখানোর জন্য। এ ছাড়া, দেশের বাইরে থেকে তিনি আবেদন পেয়েছিলেন দুর্গাপুরে সার-কারখানা তৈরি করার, আবেদন পেয়েছিলেন দুর্গাপুর থেকে কলকাতা পর্যন্ত গ্যাস-চলাচলের লাইন বসানোর। ডাঃ রায় ব্যক্তিগত কাজে বাইরে গেলেও পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন প্রকল্পগুলির জন্য বড়ো বড়ো নামকরা সংস্থাগুলিতে ঘোরাফেরা করার সুযোগ ছাড়তেন না। ১৫ই অক্টোবর তিনি বোম্বাই পৌঁছলেন। তাঁর ব্যক্তিগত কর্মচারীর মধ্যে আমরা চারজন তাঁর সঙ্গে ছিলাম। দুটো দিন তিনি ছিলেন বোম্বাইতে। গেছেন রেম্যাণ্ড হোম্‌স দেখতে, শিশু-কল্যাণ কেন্দ্র আর শিল্প-এলাকার গৃহ-নির্মাণ প্রকল্পগুলি পর্যবেক্ষণ করতে। বোম্বাইকে বাংলার মতো দেশবিভাগ-জনিত ক্ষতি স্বীকার করতে হয় নি, প্রবল উদ্বাস্তু-স্রোতের ধাক্কা সামলাতে হয় নি, বিভক্ত প্রদেশকে আর যে

সব সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়, তার কোনটাই হতে হয় নি। বোম্বাইতে ডাঃ রায়, শিল্পে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ঐ রাজ্য যে প্রভূত উন্নতি করছে, তার জন্য ভূয়সী প্রশংসা করলেন।

১৭ই অক্টোবর রাত্রে আমরা সবাই গেলাম সাণ্টাক্রুজ বিমানবন্দরে মুখ্যমন্ত্রীকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে। তখন প্রায় দশটা। 'বাংলার অতি-প্রয়োজনীয় ব্যক্তিটি' (ভি আই পি)র জন্য শুল্কবিভাগীয় পরীক্ষার কাজ মুহূর্তেই শেষ হয়ে গেল। আমরা একপাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম, এয়ার-ইণ্ডিয়ার অতিকায় বিমানটি এখুনি তাঁকে নিয়ে উড়ে চলে যাবে। তাঁর বিশ্বস্ত বেয়ারা কার্তিকও আমাদের সঙ্গে দাঁড়িয়েছিল। তিনি কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে ফিরে এলেন —আমাদের হাতে একটি করে একশো টাকার নোট গুঁজে দিয়ে বললেন, বোম্বাইতে সব কেনাকাটা করবে।

কার্তিকের হাতে দিলেন আরও একখানা একশো টাকার নোট, বললেন, ওহে, তোমরা কার্তিককে তোমাদের সঙ্গে ফার্স্ট ক্লাশেই নিয়ে যেও, একা-একা ও নিচু ক্লাসে যাবে কেন?

প্লেনটা উড়ে যাবার পরও কয়েক মুহূর্ত আমরা ওখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

মুনাফা-বিরোধী অর্ডিন্যান্স

মুখ্যমন্ত্রী ইয়োরোপ চলে যাবার এক সপ্তাহের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার মুনাফা-বিরোধী অর্ডিন্যান্সটি জারি করলেন। এই আইনের বলে তাঁরা দৈনন্দিন ব্যবহার্য নির্দিষ্ট কয়েকটি জিনিসের ওপর সর্বোচ্চ দর বেঁধে দিতে পারবেন, আর মুনাফা-লোটার জন্য শাস্তিও দিতে পারবেন। এই আইনের আসল উদ্দেশ্য ছিল কয়েকটি জিনিসের ব্যাপারে মুনাফা রোধ করা। জিনিসগুলি হলো, চাল, গম ও গমজাত দ্রব্য, মটরডাল, মশলা, খাওয়ার তেল, চিনি, বেবী-ফুড আর ওষুধ-বিসুধ। এই সব নির্দিষ্ট জিনিসে যদি কেউ মুনাফা লোটে, তাহলে তাকে দু' বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া অথবা জরিমানা করা চলবে, কিম্বা দুই-ই। সঙ্গে সঙ্গে তার সেই নির্দিষ্ট জিনিসের মজুদও বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে। ২৪শে অক্টোবর রাজ্য সরকার সর্বোচ্চ খুচরো দর বেঁধে দিলেন এই রকম: সেরপ্রতি: গম—৩৭ নয়া পয়সা, ময়দা—৫৬ নয়া পয়সা, আটা—৪০ নয়া পয়সা।

ডাঃ রায়ের প্রত্যাবর্তন

আমেরিকা ও ইয়োরোপে চল্লিশ দিনের ভ্রমণ-সূচি শেষ করে ডাঃ রায় ফিরে এলেন ২২শে নভেম্বর। দমদমে বিমান থেকে নামা মাত্রই তাঁর অফিসাররা আর তাঁর বহু বন্ধু তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। বিমানবন্দর থেকে তিনি সরাসরি অফিসে এলেন। প্রফুল্লচন্দ্র সেন তাঁর কাছে ছিলেন ঘণ্টাখানেক, তাঁর অনুপস্থিতিকালে কী কী হয়েছে তার ফিরিস্তি দিতে। সাংবাদিকদের বেশ বড়ো একটা দলও ছিলেন। রাজ্য সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পগুলির জন্য তিনি কী কী করে এলেন বিদেশে, এই-ই ছিল তাঁদের জিজ্ঞাস্য। উত্তর দিতে গিয়ে ডাঃ রায় বললেন, যুগোশ্লাভিয়ার শিল্পসংস্থাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। তাঁরা দুর্গাপুর থেকে কলকাতা পর্যন্ত গ্যাসের পাইপ লাইন বসাতে রাজী হয়েছেন। তাঁদের পাওনা যা হবে, তা দেবো আমাদের টাকার ভিত্তিতে। তাঁরা তাতেই রাজী হয়ে গেছেন।

আমরা জানি, পরে এটা হয়ে গিয়েছিল।

তিনি আরও জানালেন, আমেরিকায় আমি কয়েকটা সংস্থাকে বলেছি, টিউবওয়েল বসিয়ে কলকাতার বস্তিতে জল দিতে হবে, আগুন লাগলে তা নেভানোর জন্যও ঐ ভাবে জল দিতে হবে, তোমরা দর বা কোটেশন দাও। তোমাদের পাওনা কিন্তু শোধ করবো আমাদের টাকার ভিত্তিতে, তোমাদের ডলারে নয়।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, ঐ ঘটনার দুই মাস পরে মধ্য কলকাতায় সাংঘাতিক আগুন লেগে শহরের সব থেকে ব্যস্ত ব্যবসা-কেন্দ্রটির একটি অংশ একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়। তখন জল-সরবরাহ-যন্ত্র বা হাইড্র্যাণ্টগুলি থেকে প্রয়োজনীয় জল খুব কমই পাওয়া গিয়েছিল।

দুর্গাপুরে কোকচুল্লী ইতিমধ্যেই চালু হয়ে গিয়েছিল। এই চুল্লী থেকে যা যা পাওয়া যেতে পারে, তার মধ্যে 'কোল্-টার' অন্যতম। জার্মানীতে মুখ্যমন্ত্রী কয়েকটি শিল্প-সংস্থার সঙ্গে কথা বলেছেন 'কোল টার'-তৈরির পরিকল্প পাকা-পাকি করবার জন্য। পরিকল্পনা-কমিশন এ জন্য আগেই অনুমতি দিয়ে রেখেছিলেন।

ভিয়েনাতে তিনি বিখ্যাত চক্ষু-বিশেষজ্ঞ ডাঃ বকের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন তাঁর খারাপ ডান চোখটির বিষয় নিয়ে। ১৯৫৩তে এই

ভিয়েনাতেই তাঁর বাঁ-চোখটার অপারেশন বা শল্য-চিকিৎসা করেছিলেন ডাঃ লিণ্ডনার, পৃথিবীর একজন সেরা চক্ষু-বিশেষজ্ঞ। বিশ্ববিদ্যালয়ে লিণ্ডনারের পদে এসেছিলেন এই ডাঃ বক। ডাঃ বক ভারতে আসতে রাজী হয়েছিলেন, এবং সত্যিই এসেছিলেন এক বছর পরে। এসে, দার্জিলিঙে তাঁর চোখ অপারেশন করেছিলেন।

সাংবাদিকরা চলে গেলে স্বরাষ্ট্র বিভাগের যে তরুণ অফিসারটি (রথীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত) বাইরে অপেক্ষা করছিলেন, তাঁকে ডেকে পাঠানো হলো। নেহেরু-নুন চুক্তি অনুসারে যে সব ছিট-মহলের বিনিময় হবে, সে সংক্রান্ত একরাশ ফাইল তাঁর হাতে ছিল। অফিসের বাকি সময়টা ডাঃ রায়ের কাটলো ঐ সব ফাইলের মধ্যে ডুবে গিয়ে।

১লা নভেম্বর মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ-প্রতিরোধ কমিটির প্রতিনিধিরা ডাঃ রায়ের সঙ্গে দেখা করতে এলেন মহাকরণে। এঁদের কাছে এই প্রথম তিনি বললেন,—খাদ্য বিভাগের দুজন অফিসারকে দিল্লী পাঠিয়েছি ওড়িষ্যা আর বর্মা থেকে সরাসরি পাঁচ লক্ষ টন চাল আর কেন্দ্রের কাছ থেকে তিন লক্ষ টন গম জোগাড় করতে। এ রাজ্যের ভিতর থেকেও এক লক্ষ টন চাল জোগাড় করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে এ নিয়ে কথাও হয়ে গেছে।

শীগগিরই কাগজে দেখা গেল, জেলাগুলিতে চালের দর কমে যাচ্ছে। উত্তর বঙ্গের জেলাগুলিতে চাল বিক্রি হচ্ছে ২১ টাকা মণ দরে, আর কলকাতার দর কমে গেছে ৩৩ থেকে ৩০ টাকায়, মণ প্রতি ৩ টাকা কম। বিরোধীদের মিলিত গোষ্ঠী যে খাদ্য-আন্দোলনের হুমকি দিয়েছিল, ডাঃ রায় এই ভাবে তার মোকাবিলা করেছিলেন।

হলদিয়া বন্দর

মাসের শেষ সপ্তাহে বিশ্বব্যাঙ্কের একজন বন্দর-বিশেষজ্ঞ কলকাতায় এলেন। বিশ্বব্যাঙ্ক কলকাতার কাছেই কোনো পরিপূরক বন্দর তৈরির কাজে আর্থিক সহায়তা করতে রাজী হয়েছিলেন। রাজ্য সরকার ও পোর্ট কমিশনার্স-এর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পর ঐ পরিপূরক বন্দরের যায়গা নির্বাচিত হলো হলদিয়ায়। (হলদিয়া এখন পূর্ব ভারতের এক বিরাট নৌ-ঘাঁটি হিসাবে

উন্নয়ন লাভ করতে চলেছে এর জাহাজ-নির্মাণ ও পেট্রো-কেমিক্যাল শিল্প-এলাকা নিয়ে।)

কলকাতা শহরে গোলমাল আর রাজনৈতিক আবর্ত থাকা সত্ত্বেও শিক্ষা ও স্থাপত্য সম্পর্কে কয়েকটি জরুরী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল, প্রধানত মুখ্যমন্ত্রীরই চেষ্টায়। ৩০শে নভেম্বর রবিবার মুখ্যমন্ত্রীর আমন্ত্রণে নেহেরু এলেন কলকাতায় একদিনের মধ্যে ছয়-ছয়টি জরুরী কাজ সেরে ফেলতে। তাঁর ঠাসা কর্মসূচির প্রথমটি ছিল, তাঁর নিজের ভাষায়: 'খুব সুন্দর একটি বলিষ্ঠ শিল্প'এর আবরণ উন্মোচন। ১৩ ফিট পাথরের স্তম্ভ বিশেষের ওপর দাঁড় করানো ১১ ফিট উঁচু ব্রোঞ্জ-ধাতু নির্মিত প্রতিমূর্তি মহাত্মা গান্ধীর—তৈরি করেছেন দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী। কলকাতার উপযোগী মহাত্মাজীর শ্রেষ্ঠ ব্রোঞ্জ-নির্মিত প্রতিমূর্তি তৈরি করার জন্য ডাঃ রায় তাঁকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সেদিন জনসমক্ষে নেহেরু যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তা ছিল আবেগে ভরপুর, শ্রোতাদের হৃদয় সহজেই স্পর্শ করেছিল। নেহেরু বললেন যে,—এই প্রথম তিনি গান্ধীজীর প্রতিমূর্তির উন্মোচন করলেন, এর আগে তা করতে একেবারেই রাজী হন নি।

এখান থেকে নেতা দুজন গেলেন শহরের উত্তরাঞ্চলে। সেখানে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর জন্ম শতবার্ষিকী উৎসবের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী। ডাঃ রায় ব্যক্তিগতভাবে জানতেন এই বিরাট ভারতীয় বৈজ্ঞানিককে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর রেখে-যাওয়া দায়াধিকার জগদীশ বসু গবেষণা-মন্দির তাঁর ব্যক্তিগত মনোযোগ সব সময়ই পেয়েছে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে, কলকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠানের মেয়র হিসাবে, শিক্ষাবিদ হিসাবে, এবং শেষে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে। শতবার্ষিকী কমিটির সভাপতি হিসাবে ডাঃ রায় নেহেরুকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন,—বৈজ্ঞানিকশ্রেষ্ঠ চেয়েছিলেন তাঁর বসু-গবেষণা-মন্দিরটি হয়ে উঠুক একটি বিজ্ঞান-চর্চার কেন্দ্র, দেশ-বিদেশের বৈজ্ঞানিকরা এখানে এসে আলোচনা ও মত-বিনিময় করুন। তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য কমিটি একটি কর্মসূচি তৈরি করেছেন।

একটি এক্স-রে-ক্লিনিকের দ্বারোদ্ঘাটন করে প্রধানমন্ত্রী ইণ্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যাণ্ড বিজনেস ম্যানেজমেণ্ট-ভবনের একটি চারতলা ব্লকের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন। এখানে থাকবে একটি প্রদর্শশালা বা

মিউজিয়াম, পরিসংখ্যান ও মনস্তাত্ত্বিক নিরীক্ষামূলক একটি গবেষণাগার। কিন্তু এই অনুষ্ঠানের বিশেষ একটি আকর্ষণ ছিল এর প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের পূর্ণ প্রতিকৃতি ছাত্রদল কর্তৃক নেহেরুকে উপহার দান। সেই থেকে ওটি শোভা পাচ্ছে ইন্সটিটিউটের প্রধান হলঘরে।

শহরের যে-সব প্রতিষ্ঠানের তিনি পৃষ্ঠপোষকতা করতেন, তার মধ্যে এটি ছিল একটি। এইরকম প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ইচ্ছা জেগেছিল দ্বিজেন্দ্রকুমার সান্ন্যালের মনে। এঁর সংস্পর্শে ডাঃ রায় প্রথমে আসেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তখন সান্ন্যালমশাই ছিলেন ওখানে লেকচারার। ডাঃ রায় ওঁর প্রস্তাব শুনে উৎসাহিত হয়ে ওঁকে একটি পরিকল্প রচনা করতে বলেন, আর তারই ফলশ্রুতি হচ্ছে এই ইন্সটিটিউট।

বেরুবাড়ি-প্রসঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার উত্তর এলাকার ছোট্ট একটি অংশ, আয়তন হচ্ছে ৮·৭৫ বর্গমাইল, বাস করে বারো হাজার লোক মাত্র (১০০ জন মুসলমান) হঠাৎ একদিন কলকাতার কাগজগুলির প্রথম পৃষ্ঠার শিরোনাম হয়ে বসলো। বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনের শুরুতেই,—১৫ই ডিসেম্বর,— বিরোধীপক্ষ চার-চারবার মুলতুবী প্রস্তাব আনলেন, ৯ই ডিসেম্বর লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী যে বিবৃতি দিয়েছিলেন, তার জন্য। বিবৃতিটি হচ্ছে একটি সিদ্ধান্তের ওপর। কিসের সিদ্ধান্ত? জলপাইগুড়ি জেলার 'বেরুবাড়ি-ইউনিয়ন' পাকিস্তানকে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে 'পশ্চিমবঙ্গের রাজস্ব-আধিকারিকদের মত'-এর ওপর ভিত্তি করে। (সর্বশেষ খবর, দুই বন্ধু-দেশের নেতাদের মধ্যে আলোচনাক্রমে বেরুবাড়ি সমস্যার মীমাংসা হয়ে গেছে।)

বিধানসভায় এই প্রসঙ্গ ওঠায় মুখ্যমন্ত্রী এ-জন্য সময় চেয়ে নিয়েছিলেন। দুদিন পরে তিনি সদস্যদের জানালেন যে, প্রস্তাবিত বেরুবাড়ি-হস্তান্তর সম্পর্কে তিনি প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে টেলিগ্রাম-মারফৎ উত্তর পেয়েছেন। সেটি এখানে পাঠকদের অবগতির জন্য পুরোপুরি তুলে দেওয়া হলো :—

> সীমান্তসমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে করতে বলেছিলাম যে, আমরা ওগুলো প্রথমে অফিসারদের স্তরে বিবেচনা করেছিলাম, সচিবরা ও রাজস্ববিভাগীয় কর্তৃপক্ষরা আমাদের পরামর্শ দিচ্ছিলেন। এর পরে ভারত

ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রিদ্বয় বৈঠক করে ও-বিষয়ে বিচার-বিবেচনা করলেন। বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে বেরুবাড়ি ইউনিয়নও ছিল, আর দুপক্ষই ও-এলাকা পুরোপুরি দাবি করছিলেন। এর পরে শোনা যায় আমি নাকি বলেছিলাম,—'প্রধানত আমরা পশ্চিমবঙ্গের রাজস্ববিভাগীয় কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্যদের পরামর্শ গ্রহণ করেছি, তারা বলেছিলেন, এটা করা যেতে পারে।' যে ভাবে কাগজে লেখা হয়েছে, তাতে কিছু ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে। আমি বাক্যাংশটি ব্যবহার করেছিলাম ব্যাপক এই অর্থে যে, এই সমস্ত সমস্যা সম্পর্কেই আমরা ওঁদের সঙ্গে পরামর্শ করেছিলাম। এ কথা বলা অবশ্যই ঠিক মনে হবে না যে আমরা বেরুবাড়ি ইউনিয়নের অংশ হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম পশ্চিমবঙ্গের রাজস্ববিভাগীয় আধিকারিকদের মতামতের ভিত্তিতে। বস্তুত এই বিশেষ বিষয়ে তাঁদের কিছুই করার ছিল না। এ হচ্ছে একটি তদর্থক (অ্যাডহক্) সিদ্ধান্ত, আমাদের ও পশ্চিমবঙ্গের অফিসারদের মধ্যে পরামর্শ হওয়ার পর নেওয়া হয়েছিল। দায়িত্ব ছিল আমাদের ওপর, রাজস্ব বিভাগীয় আধিকারিকদের ওপর নয়। আমি আজ (১৬ই) রাজ্য সভায় কথাটা তুলছি, চেষ্টা করবো ব্যাপারটা পরিষ্কার করতে।'

মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় বললেন যে, খোঁজখবর নিয়ে তিনি জেনেছেন, রাজ্য সরকারের রাজস্ববিভাগীয় আধিকারিকরা, মুখ্যসচিব সত্যেন্দ্রনাথ রায় এবং ভূমি-জরীপ বিভাগের অধিকর্তা রঘু বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার দলের মধ্যে ছিলেন। দিল্লীতে যখন নেহেরু-নুনের মধ্যে বৈঠক চলছিল, তখন তাঁরা সবাই পাশের ঘরে অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু ঐ বিষয়ে অর্থাৎ বেরুবাড়ির অংশ হস্তান্তর করার ব্যাপারে, তাঁরা কোনো মতামত দেন নি, দেবার কোনো অধিকারও তাঁদের ছিল না।

২৯শে ডিসেম্বর ডাঃ রায় বিরোধীপক্ষের নেতার সঙ্গে পরামর্শ করে বেরুবাড়ি-সম্পর্কে বিশেষ প্রস্তাবের খসড়া তৈরি করলেন; এর মধ্য দিয়ে জনমতই অভিব্যক্ত হয়েছিল বলা যেতে পারে। বিধানসভায় সর্বসম্মতিক্রমে যে প্রস্তাব নেওয়া হলো, তার মূল কথা ছিল, 'এই বিধানসভার মতে উক্ত বেরুবাড়ি-ইউনিয়ন ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত ভূভাগের অংশ হিসাবেই থাকবে।'

তাঁর তিরিশ মিনিটের ভাষণের শেষের দিকে ডাঃ রায় তাঁর এবং তাঁর সরকারের মতামত ব্যক্ত করলেন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় :—

'এই সরকার যতটা সংশ্লিষ্ট, তা হচ্ছে, আমরা ঐ এলাকায় টাকা খরচ করেছি রাস্তাঘাট সেতু ইত্যাদি তৈরি করার জন্য, কিছু উদ্বাস্তুদের বসিয়েছি, যার জন্য টাকা খরচ করেছে ভারত সরকার। সেজন্য আমরা বিশেষভাবে চাই যে বেরুবাড়ি ইউনিয়ন পশ্চিমবঙ্গেই থাকুক। পশ্চিম-বঙ্গই ঐ এলাকার নিয়ন্ত্রণ ও প্রশাসন চালিয়ে যাচ্ছে।'

বিধানসভায় বিষয়টি ওঠাতে কেন তিনি রাজী হয়েছিলেন, সে সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী বললেন :—

'আমার সামনে যখন বিষয়টা এলো, আমি তখন এটা বিধানসভায় আলোচনার জন্য পেশ করলাম এইজন্য যে, এর ফলে ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মনোভাব জানতে পারবেন, পশ্চিমবঙ্গের জনগণের মনোভাব জানতে পারবেন ; আর তাছাড়া, দুজন প্রধানমন্ত্রী যেভাবে সীমান্ত-পুনর্বিন্যাস করার কথা বলেছেন, তার বিরুদ্ধে আমরা সুস্পষ্ট প্রতিবাদ জানাতে পারবো। (স্থির হয়েছিল, ঐ ইউনিয়নের অর্ধেক, চার বর্গমাইলেরও বেশি, পাকিস্তানকে দিয়ে দেওয়া হবে।)

কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রীর এই ভাবে প্রকাশ্যে সোচ্চার হয়ে ওঠা নতুন নয়, যখনই বাংলার স্বার্থে ঘা লেগেছে, তখনই তিনি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন, অথবা অবিচারের প্রতিবাদ করেছেন। বেরুবাড়ি তার একটি উদাহরণ মাত্র।

॥ ১৬ ॥

১৯৫৯ সাল

৩১শে মার্চ দিল্লীতে সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির পরিকল্পনা উপ-সমিতির বৈঠক। সুবৃহৎ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্গত খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে এই বৈঠকে। কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ রায় ও সি. ডি. দেশমুখকে বিশেষ নিমন্ত্রিত ব্যক্তি হিসাবে এই বৈঠকে উপস্থিত থাকতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। এই বৈঠকের একদিন আগে ডাঃ রায় দিল্লী রওনা হয়ে গেলেন। কংগ্রেস উপ-সমিতির বৈঠক ত আছেই, তার তিন দিন পরে

আছে জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদের বৈঠক। তিনি সঙ্গে নিয়ে গেলেন কয়েকটি জরুরী পরিকল্পের খসড়া। ইয়োরোপ ও আমেরিকার কারিগরী সংস্থাগুলির সঙ্গে তাঁর সেই যে যোগাযোগের কথা বলেছিলাম, এই পরিকল্পগুলি হচ্ছে তারই ফলশ্রুতি। এগুলির জন্য চাই ভারত সরকারের মঞ্জুরী এবং অর্থবরাদ্দ। প্রধান বিবেচ্য বিষয়গুলি ছিল তৃতীয় পরিকল্পনার অর্থ-সংস্থান, দ্রব্যমূল্য, আয়, বেতন ও মুনাফা, সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ-কাঠামোর রূপরেখা, গ্রামাঞ্চল থেকে সংগৃহীত সংস্থানসমূহের সদ্ব্যবহার। এ সবই হচ্ছে মৌল প্রশ্ন, জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদের বৈঠকের জন্য এই সব প্রশ্ন সংক্রান্ত নির্দেশনা দিতে হবে কংগ্রেস দলেরই উঁচু মহলকে।

বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের উপস্থিতিতে জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদ সব থেকে জরুরী যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলেন সেটি হচ্ছে, রাজ্য-পরিচালিত খাদ্যের ব্যবসা। এই পরিকল্পে ছিল, বাঁধা দরে রাজ্যের জন্য ধান কিনতে প্রতিনিধি বা সমবায় সমিতির নিয়োগ। সরকারের কাছ থেকে লাইসেন্স নিয়ে ধান-কলগুলিও কিছু পরিমাণ ধান কিনতে পারবেন, যার ২৫ শতাংশ যাবে সরকারের কাছে। লাইসেন্স ছাড়া কেউই নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশি ধান বা চাল রাখতে পারবেন না, সরকারের অধিকার থাকবে ঐ লাইসেন্সে গৃহীত ধান বা চাল সংগ্রহ করার। ক্রেতাদের কাছে তা বিক্রি হবে ন্যায্য মূল্যের দোকানের মারফৎ। ঘাটতি এলাকায় ধান দেওয়া হবে টেষ্ট রিলিফ-কেন্দ্রের মাধ্যমে। কিন্তু আসল লক্ষ্য হলো, মধ্যস্বত্ব-ভোগীদের সংখ্যা যতদূর সম্ভব কমিয়ে ফেলা। বেসরকারী বণিকদের কাছ থেকে খাদ্যের ব্যবসা ধাপে ধাপে নিয়ে নেওয়ার পরিকল্পের উদ্গাতা ও উৎসাহী সমর্থক ছিলেন ডাঃ রায়। ডাঃ রায়কে তাঁর নিজের রাজ্যে বছরের পর বছর যেমন খাদ্যের বিষয়ে প্রবল আন্দোলনের মুখোমুখি হতে হয়েছিল, এমন আর কোনো মুখ্যমন্ত্রীর হয় নি।

বৈঠকগুলির ফাঁকে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তিনি দেখা করলেন ৪ঠা এপ্রিল। নানান বিষয়ের মধ্যে যুগোশ্লোভ সরকার কলকাতায় গ্যাস সরবরাহ করবার জন্য গ্যাসের লাইন বসানোর ও গ্যাস পরিস্রুত করার কারখানা স্থাপনের যে প্রস্তাব দিয়েছিল, সে বিষয়েও আলোচনা করলেন। বড়ো বড়ো পরিকল্পের ব্যাপারে তাঁকে সবসময়ে অবহিত রাখাই ছিল ডাঃ রায়ের রীতি। প্রথমে মুখে বলে, পরে চিঠিতেও সে কথা জানাতেন। পরের দিন ভোরবেলা আমি

দিল্লীতে তাঁর বাসায় পৌছতেই তিনি ঐ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লেখালেন আমাকে ডিক্‌টেশন দিয়ে। তাতে ঐ গ্যাস সংক্রান্ত কাজকর্মের কথাই ছিল, বাহুল্য বোধে সে চিঠি এখানে আর তুলে দিলাম না।

৬ই এপ্রিল মুখ্যমন্ত্রী দিল্লী ত্যাগ করলেন বিমানে, আমি এলাম প্রথম যে মেল ট্রেন পেলাম, সেই ট্রেনে।

কৃষ্ণ মেনন ও কফি ছাঁকবার যন্ত্র

এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে ভারতের প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী কৃষ্ণ মেনন কলকাতায় সফরে এলেন, যাকে বলে 'প্রথামাফিক' সফরে। এই সফরের অন্যতম জরুরী কর্মসূচি ছিল মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করা। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় থেকেই এঁদের দুজনের বন্ধুত্ব ছিল প্রগাঢ়। প্রতিরক্ষা-মন্ত্রীকে নিয়ে ফৌজী গাড়ি যখন রক্ষী-টক্ষি নিয়ে ডাঃ রায়ের বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়ালো, ডাঃ রায় সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গেলেন তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে। মেননকে দেখে প্রথম তাঁর মুখে যে কথাটা এলো, সেটা হচ্ছে,—'মেনন, আমরা একটা ক্যানবেরা হারিয়েছি।'

মেনন উত্তরে বললেন,—হ্যাঁ, হারিয়েছি। কিন্তু চালক দুজন বেঁচে গেছে, তাদের ফিরিয়েও আনা হয়েছে।

দুদিন আগে ভারতীয় বিমানবাহিনীর একটি ক্যানবেরা বিমান, যার চালক ছিলেন স্কোয়াড্রন লীডার জে. সি. সেনগুপ্ত,—পাকিস্তানের ভিতরে ঢুকে যেতে রাওয়ালপিণ্ডির কাছে তাঁর বিমানটিকে গুলি মেরে নামানো হয়েছিল।

যাই হোক, মেনন তাঁর একজন সহকারীর দিকে ফিরলেন। তিনি মেননের হাতে একটি মোড়ক দিলেন। আমরা ওঁদের দুজনের পিছনে পিছনে অফিস-ঘরের দিকে যাচ্ছি, এমন সময় মেনন নিজেই মোড়কটি খুলে একটি ঝক্‌ঝকে কফি-ছাঁকবার যন্ত্র ডাঃ রায়ের হাতে দিয়ে বললেন,—আমাদের প্রতিরক্ষা দপ্তরের কয়েকটি বিভাগ এই সব তৈরি করছে অসামরিক লোকদের ব্যবহারের জন্য।

আমি প্রথমে বুঝতে পারি নি। ভেবেছিলাম, নতুন ধরনের কোনো অস্ত্রশস্ত্র হবে বুঝি! কিন্তু না, আমাদের অস্ত্র-তৈরির কারখানা থেকে সৌখীন জিনিসের উৎপাদন চলছে! (পরে, ১৯৬২ সালে, নেফাতে ভারতীয় সৈন্যদের

বিপর্যয়ের পর, দূরদর্শিতার অভাব এবং আমাদের সৈন্যবিভাগের অস্ত্রশস্ত্রের অপ্রস্তুতির নিদর্শন হিসাবে এই কফি-ছাঁকবার যন্ত্রটির কথাই তুলে ধরা হয়েছিল, যার ফলে মেননকে চলে যেতে হয়েছিল।)

কিন্তু, যা বলছিলাম, মেনন জানতেন, ডাঃ রায় কফি ভালোবাসতেন, আর সব থেকে ভালো জাতের কফি বন্ধুদের খাওয়াতেও ভালোবাসতেন। তাই-ই হলো। ডাঃ রায় ঐ যন্ত্রে কফি বানাবার নির্দেশ দিয়ে দিলেন সঙ্গে সঙ্গে। তারপরে দুই বন্ধুতে বসে আলোচনা করতে লাগলেন, কলকাতা ময়দানের কোথায় ফুটবলের স্ট্যাডিয়াম তৈরি করা যায়। কলকাতা ময়দানের জমি রয়েছে কেন্দ্রের প্রতিরক্ষা-মন্ত্রকের আওতায়। সেজন্য প্রতিরক্ষা-মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা না করে স্ট্যাডিয়ামের জমি পাওয়া যাবে কী করে? রাজ্যসরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগ থেকে তৈরি নক্সা আর সংশ্লিষ্ট নোট বা মন্তব্য, সবই টেবিলের ওপর বিছিয়ে রেখে আলোচনা চলতে লাগলো। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী কথা দিলেন, তিনি দিল্লীতে গিয়ে সব কিছু খুঁটিয়ে দেখে তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেবেন।

নৃত্য, নাট্য ও সঙ্গীত একাডেমি

দেশের অন্যান্য অংশের মতো বাংলাতেও জমিদারী-প্রথা উচ্ছেদ হবার আগে রাজা, মহারাজা আর জমিদাররাই সব রকম আর্ট বা কলাচর্চার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এখন জমিদাররা নেই, সুতরাং জনসাধারণের সাংস্কৃতিক উন্নয়নের কথা সরকারকেই ভাবতে হবে। আমরা আগেই বিখ্যাত গায়ক পঙ্কজকুমার মল্লিকের কথা বলেছি। রাজ্যসরকার তাঁকে দিয়ে লোকরঞ্জন শাখা খুলিয়েছেন। এ ছাড়া, বছর দুই আগে ডাঃ রায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোর বসতবাড়িতে একটি নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। এ বছর ১লা বৈশাখ (১৫ই এপ্রিল) নবনির্মিত সেই চারতলা ভবনে প্রদীপ জ্বালিয়ে ডাঃ রায় পশ্চিমবঙ্গের নৃত্য, নাট্য ও সঙ্গীত একাডেমির উদ্বোধন করলেন। ৯,৩০০ বর্গফিটেরও বেশি জায়গার ওপর এই বিরাট ভবনটি তৈরি হয়েছে, নৃত্য, নাট্য ও সঙ্গীতের ক্লাস যাতে সুষ্ঠুভাবে বসতে পারে। সঙ্গে রয়েছে ছোট্ট একটি মনোরম প্রেক্ষাগৃহ, ৩০০ দর্শক যেখানে বসে মঞ্চাভিনয় ইত্যাদি দেখতে পারে। ঐ তিনটি বিভাগের অন্তর্গত ব্যবহারিক ও পুঁথিগত, উভয় শিক্ষাই ভালোভাবে গ্রহণ করে এখানে তরুণ প্রতিভা যাতে

সম্যক্ বিকাশ লাভ করতে পারে, এই একাডেমির সেটি হচ্ছে অন্যতম উদ্দেশ্য। বাংলার নাট্য জগতের দিকপাল অহীন্দ্র চৌধুরী এখানকার ডীন হিসাবে রাজ্য-সরকারকে সহায়তা করেছিলেন, যাতে সারা দেশের মধ্যে প্রথম এই ধরনের এই শিক্ষায়তনটির উচ্চ মান বজায় থাকে।

ভারতীয় প্লাস্টিক শিল্পের অভ্যুদয়

রেজেস্ট্রিকৃত নতুন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যার দিক দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ অগ্রগামী ছিল ১৯৫৬-৫৭ এবং ১৯৫৭-৫৮ সালে। কোম্পানী-আইন সচিব ডি. এল. মজুমদার মুখ্যমন্ত্রীকে জানালেন যে, ঐ দুই বছরে যথাক্রমে ৮৪৮ ও ৯৬১টি প্রতিষ্ঠান রেজেস্ট্রিকৃত হয়েছে, যদিও বোম্বাইতে রেজেস্ট্রিকৃত প্রতিষ্ঠানগুলির মোট আদায়ীকৃত মূলধন পশ্চিমবঙ্গের পরিমাণের থেকে ঢের বেশি। ছোট ও বড়ো শিল্প প্রতিষ্ঠার পক্ষে আবহাওয়া যাতে অনুকূল হয়, সরকারী ও বেসরকারী উন্নয়ন প্রকল্পগুলি তৃতীয় পরিকল্পনার কর্মসূচি অনুসারে যাতে রূপায়িত হয়ে উঠতে পারে, দূরদর্শী মুখ্যমন্ত্রীর সেদিকে চেষ্টার অন্ত ছিল না, তিনি তাতে সাফল্যও লাভ করেছিলেন। কলকাতার কাছে রিশড়ায় একটি বড়ো পলিথিন-তৈরির কারখানা গড়ে তোলবার জন্য 'ইম্পীরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রিজ'-এর প্রতিনিধিরা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বেশ কয়েকবার দেখা করলেন। এ-বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে রাজ্য সরকারের তিন বছর ধরে যোগাযোগ চলছিল, যার ফলে আই সি আই কোম্পানী ঐ কারখানা তৈরির জন্য আগ্রহ-শীল হয়ে পড়ে। ঐ কারখানার দ্বারোদ্‌ঘাটন অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যোগ দিতে ২রা মে সকালবেলা কলকাতায় এসে পৌঁছলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী মোরারজী দেশাই। আলকালি-বিভাগের চেয়ারম্যান জে. এম. লালের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী ও শ্রীদেশাই গেলেন রিশড়াতে।

অনুষ্ঠানের শেষে সবাই যখন ফিরছেন, তখন পথে একটা খানা পড়লো। মুখ্যমন্ত্রীর রক্ষিদল তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলো মুখ্যমন্ত্রীকে ঐ খানা পেরোতে সাহায্য করতে, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী তাদের সাহায্য না নিয়ে নিজে নিজেই গেলেন খানাটা পার হতে লাফ দিয়ে। কিন্তু তা পারলেন না, হাঁটুতে চোট খেলেন। সন্ধ্যার সময় যখন তিনি বাড়িতে ঢোকবার সময় গাড়ি থেকে নামলেন, তখন রীতিমত খোঁড়াচ্ছেন।

খাদ্যনীতিতে পরাজয়

জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে অন্যান্য বছরের মতো এবারও মন্ত্রিসভার বৈঠক বসবে বলে মন্ত্রীরা চলে গেলেন দার্জিলিঙে। ব্রিটিশ আমলে গভর্ণররা সাঙ্গ-পাঙ্গ আর লোকলস্কর নিয়ে বছরে দু-দুবার করে আসতেন দার্জিলিঙে রীতিমত জাঁকজমক করে। গভর্ণরদের সঙ্গে আসতেন মন্ত্রিপরিষদ, বিভাগীয় প্রধান ও বাছা বাছা কর্মচারী, আর সেই সঙ্গে আসতেন রাজা, মহারাজা আর জমিদাররা, তাঁদের চাপরাসাধারী আর্দালীদের নিয়ে। গভর্ণর স্যর জন অ্যাণ্ডারসনের আমলে সে জাঁকজমক একটা দেখবার জিনিস ছিল। স্বাধীনতার পরে অবশ্য সে সব কমে গেছে খুবই।

যাই হোক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক, দুই কারণেই ডাঃ রায় বছরে অন্ততঃ দুবার যেতেন দার্জিলিঙে, পাহাড়ী এলাকার উন্নয়ন-সম্পর্কে ভালো-মতো খোঁজখবর রাখতে। জুন মাসে দার্জিলিঙে মন্ত্রিসভার কয়েকটি বৈঠক হয়ে যাবার পর, মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে হাওড়া জেলা কংগ্রেস থেকে টেলিগ্রাম এলো, 'চালের অবস্থা খুব খারাপ। বাজার থেকে চাল সম্পূর্ণ উধাও হয়ে যাবার আগে দয়া করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিন।'

মার্চ মাসে চালের অবস্থার কিছুটা উন্নতি দেখা গেলেও মে মাসে খারাপের দিকে গিয়েছিল। বামপন্থী দল যারা তিন মাসের জন্য পশ্চিমবঙ্গ খাদ্য ও ত্রাণ উপদেষ্টা পর্ষদের বৈঠক বর্জন করেছিল, তারাও ডাঃ রায়ের দার্জিলিঙ যাবার আগে ২রা জুন তাঁর রুদ্ধদ্বারকক্ষে বৈঠকে বসেছিলেন। খাদ্যসংগ্রহ ও বণ্টনের ব্যাপারে সরকারকে সাহায্য করার জন্য বিরোধীপক্ষ 'গণ-কমিটি' গঠন করার দাবি জানিয়েছিলেন। ডাঃ রায় তার উত্তরে একটি বিবৃতি মারফৎ জানিয়ে-ছিলেন যে, রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধি নিয়ে তৈরি ঐ গণ-কমিটি দিয়ে ধান চাল সংগ্রহের কাজ খুব সুবিধাজনক হবে না। এই বছর এই পশ্চিমবঙ্গেই প্রথম, সরকারের 'রাজ্য ব্যবসা-পরিকল্প' চালু হয়েছিল, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর ঐ উক্তির ফলে বিরোধী পক্ষরা এই পরিকল্পের কাজে সহযোগিতা করা বন্ধ করে দেয়।

দার্জিলিঙে খবর এসে পৌছলো, ২৪ পরগণা জেলার প্রান্ত থেকে ক্ষুধার্ত গ্রামের লোক হাজারে হাজারে কলকাতায় আসছে খাবার খুঁজতে। সরকারী সূত্রে বলা হয়েছে, এ রকম লোক আসছে দৈনিক তিন হাজার করে। (তখন

চালের দরের গড় ছিল মণ প্রতি ২২'৭৫ টাকা।) ছোট ছোট খুচরো দোকানদারদের ওপর পুলিশী হামলা পরিস্থিতি আরও ঘোরালো করে তুলেছিল। বছরের বাড়তি চাল যা বাজারে আসে, সেগুলি পাইকার আর মিলমালিকদের খপ্পরে পড়ে ইতিমধ্যেই উধাও হয়ে গেছে। সরকার স্বভাবতই সমস্যায় পড়লেন। দার্জিলিঙ থেকে মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রীকে লম্বা একখানা চিঠি লিখে খাদ্যের ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা জানালেন। কেন্দ্র অবশ্যই ঘাটতির পুরোটাই জোগাতে রাজী হয়েছিল, প্রায় সাড়ে ন-লক্ষ টন।

মুখ্যমন্ত্রী ১১ই জুন কলকাতা ফিরে এলেন খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন এবং বিভাগীয় যুগ্মসচিব বিনয়রঞ্জন গুপ্তের সঙ্গে খাদ্য পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে। কেন্দ্রীয় খাদ্যসচিব বিনয়ভূষণ ঘোষ কলকাতা এসেছিলেন আসল তথ্য জানতে। ঘন ঘন বৈঠক বসলো, তার মধ্যে সব থেকে বেশি সময় নিয়েছিল ১৪ই জুনের বৈঠকটা। বসেছিল ডাঃ রায়ের বাড়িতে, সময় নিয়েছিল আড়াই ঘণ্টা। মাসিক বরাদ্দ ৭৫ হাজার টনের ওপর আর দশ হাজার টন চাল দিতে কেন্দ্র রাজী হল। রাজ্যের লোকসংখ্যার ⅓ অংশই (প্রায় দশ মিলিয়ন) ছিল সংশোধিত রেশন ব্যবস্থার আওতায়। একমাত্র কলকাতাতেই ৪'২ মিলিয়ন লোক রেশন নিতো সপ্তাহ-পিছু ১½ সের চাল আর ১ সের গম।

২২শে জুন সন্ধ্যাবেলা তাঁর বাড়িতে একটি সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে খাদ্যনীতিতে এক বিরাট পরিবর্তনের কথা ঘোষণা করলেন ডাঃ রায়। এর আগে, মহাকরণে কংগ্রেস সংসদীয় দলের একটি সভায় তিনি খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করে নিয়েছিলেন। অবশ্য, খাদ্যমন্ত্রীর ওপর দায় না চাপিয়ে সরকারের খাদ্যনীতির ব্যর্থতার সমস্ত দায়িত্ব নিজে নিয়েছিলেন তিনি। মিল-মালিকদের ওপর লেভি-আদেশ, আর ধানচালের মূল্য-নিয়ন্ত্রণ আদেশ, দুই-ই স্থগিত রাখা হলো। সমস্যার মূল কারণ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বললেন, চলতি বছরে উৎপাদন কম হওয়ার কারণ হচ্ছে খরা। ধান-চাল-সংগ্রহ পুরোপুরি আবশ্যিক এবং পুরো-রেশন-ব্যবস্থার প্রবর্তন,—এ দুটি না করে লেভি আর মূল্য-নিয়ন্ত্রণ করলে বর্তমান খাদ্য সমস্যার সমাধান করা যাবে না।

তিনি আরও জানালেন,—গরীব মানুষদের জন্য তাঁর সরকার সংশোধিত রেশন-দোকান থেকে চাল আর গম মিলিয়ে খাদ্য ঠিক যুগিয়ে যাবেন, তবে

ঠিক কতো পরিমাণ চাল বা গম দেওয়া হবে, সেটা নির্ভর করবে কেন্দ্রীয় সরকার কতোটা দেয়, তার ওপর।

তিনি বললেন,—খাদ্যের ব্যাপারে মূল্য-নিয়ন্ত্রণ নীতি এবং সরকারী ব্যবসা, ঘাটতি রাজ্যে সফল হতে পারে না।

৭৭তম জন্মদিনের উৎসব

এই প্রথম দেখা গেল তাঁর জন্মদিনের কোনো অনুষ্ঠান করতে দিতে নারাজ হচ্ছেন ডাঃ রায়। শেষপর্যন্ত অবশ্য কংগ্রেসী বন্ধুদের অনুরোধে ১লা জুলাই তাঁর জন্মদিনের প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে তিনি যোগ দিয়েছিলেন। আসলে তাঁর মনের মধ্যে অন্য এক চিন্তার আলোড়ন চলছিল। খাদ্য-উৎপাদনের ব্যাপারে আরও জোরদার কর্মসূচি নেওয়া দরকার বলে মনে করছিলেন তিনি। তাঁর চোখ পড়লো তাঁর তরুণ সহকর্মী তরুণকান্তি ঘোষের ওপর। 'আরও খাদ্য ফলাও অভিযান'-কে ব্যাপক ও নিবিড় করার জন্য কৃষি-দপ্তরকে তিনি পুনর্বণ্টিত করলেন। এ সম্পর্কে তাঁর ঘোষণা বেরুলো ৮ই জুলাই তারিখে। পতিত জমি উদ্ধার করে ধান-উৎপাদন বাড়ানোর তেমন সুবিধা ছিল না এই রাজ্যে। সেজন্য একরপ্রতি ফলন বাড়ানোই ছিল একমাত্র পথ। ৩৪ বছর বয়স্ক তরুণকান্তি ঘোষকে পূর্ণমন্ত্রী করে কৃষি ও খাদ্য উৎপাদন বিভাগের ভার দিলেন তাঁর ওপর। ১৯৫২-র নির্বাচনের পর তরুণবাবুকে উপমন্ত্রী করা হয়েছিল। এই ঘটনার পরের দিন সকালে অন্য একজন প্রতিমন্ত্রী, তিনি মহিলা, এলেন ডাঃ রায়ের কাছে তাঁর নিজের সম্পর্কে তদ্বির করতে। তিনি বললেন,—আমাকে যদি পূর্ণমন্ত্রী না করা হয়, তাহলে লোকে ভাববে কী?

বলতে বলতে ভদ্রমহিলা প্রায় কেঁদেই ফেললেন বলা চলে। ডাঃ রায় মহা অপ্রস্তুত। এ রকম বিপদে তিনি আগে কখনো পড়েন নি। শেষ পর্যন্ত অবশ্য বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাঁকে শান্ত করেছিলেন তিনি। তাঁর দপ্তরে মন্ত্রী হিসাবে তিনি যে ভাবে কাজ করেছেন, তাতে তাঁর প্রতি তাঁর খুবই আস্থা রয়েছে,—এই ছিল ডাঃ রায়ের বক্তব্য। কথাটা বলে আর তিনি দাঁড়ান নি, মুখ ফিরিয়ে সোজা গাড়িতে উঠে অফিসের দিকে রওনা হয়ে গিয়েছিলেন।

খাদ্যশস্যের ব্যাপারে সরকারী ব্যবস্থা চালু করতে সরকার অপারগ হাওয়ার পর রাজ্যের কম্যুনিস্ট ও তাঁদের সহযোগী দলের লোকেরা চুপচাপ বসেছিলেন

না। কেরালার কম্যুনিষ্ট সরকার রাজ্যব্যাপী এক বিরাট আন্দোলনের সম্মুখীন হয়েছিলেন এই সময়। তাঁরা দমননীতি গ্রহণ করায় সাধারণ মানুষের মনে দারুণ ক্ষোভ জমেছিল, এই আন্দোলন তারই ফলশ্রুতি। কেরালার মুখ্যমন্ত্রী নাম্বুদ্রিপাদ ও তাঁর মন্ত্রিসভা প্রায় ভেঙে পড়ে আর কী! এঁদের পতন রোধ করার জন্য সবার দৃষ্টি অন্য দিকে টেনে নেবার কৌশল হিসাবে বাংলার কম্যুনিস্ট দল ৫২ পৃষ্ঠাব্যাপী টাইপ-করা এক স্মারক-লিপি রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের কাছে পেশ করলেন। এতে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে পুরোপুরি কু-শাসন চলছে বলে লেখা হয়েছিল; আর লেখা হয়েছিল অসংখ্য অভিযোগ। ঐ দলের উপ-নেতা বঙ্কিম মুখার্জী, তাঁর দলের একজন বিধানসভা-সদস্যকে নিয়ে ঐ স্মারকলিপি প্রথম পেশ করলেন রাজ্যপাল পদ্মজা নাইডুর কাছে, ৩০শে জুলাই তারিখে। ঐ দিন বিকালে বিধানসভায় তিন জন কম্যুনিস্ট বিধানসভা-সদস্য স্মারকলিপির একটি কপি মুখ্যমন্ত্রীর হাতে দিয়েছিলেন। যে সব অভিযোগ করা হয়েছিল, সেগুলি ঘটেছিল বলে বলা হয়েছিল ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত, অর্থাৎ ডাঃ রায়ের কার্যকালে। তালিকার মধ্যে ১৯৪৭-এর সাতমাস যে ডঃ প্রফুলচন্দ্র ঘোষের মন্ত্রিত্বকাল ছিল, সে সব উল্লেখ করা হয় নি। কারণ, তখন যে তিনি প্রজা-সোস্যালিস্ট দলের নেতা হিসাবে বিরোধীপক্ষে যোগ দিয়েছিলেন।

এর পরের দিন, কেরালায় যা আশঙ্কা করা গিয়েছিল, তাই-ই ঘটলো। ভারতের প্রথম এবং একমাত্র কম্যুনিস্ট সরকার, যারা দুটি আসনের সংখ্যাধিক্যে ১৯৫৭-র এপ্রিল থেকে ক্ষমতায় ছিলেন, তাঁদের বরখাস্ত করলেন রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ। পরের দিন বাংলায় কম্যুনিস্ট দল থেকে প্রতিবাদে একটি মিছিল বার করা করা হল! 'মিছিল-নগরী'-র অন্যতম বৃহৎ মিছিল।

রাজ্য সরকারকে উলটে দেবার হুমকি

খাদ্যমূল্যবৃদ্ধি প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে বিরোধীপক্ষ সরকারকে প্রবল আক্রমণে পর্যুদস্ত করতে চাইলেন। তাঁদের লক্ষ্য মুখ্যমন্ত্রী ততটা নন, যতটা খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন। মন্ত্রিসভায় প্রফুল্লবাবুর স্থান ছিল ডাঃ রায়ের পরেই। তাছাড়া অতুল্য ঘোষের সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস দলের অন্যতম নিয়ামকও ছিলেন তিনি। বিরোধীরা ভাবলেন, একবার যদি এঁকে সরানো যায়, তাহলে শুধু দলই নয়,

মন্ত্রিসভাও রীতিমত ধাক্কা খাবে। মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষপ্রতিরোধ কমিটি ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছিলেন যে, যদি খাদ্যপরিস্থিতির উন্নতি করার জন্য ব্যবস্থা না নেওয়া হয়, তাহলে তাঁরা গণ-আন্দোলন শুরু করবেন ২০শে আগষ্ট থেকে। কলকাতায় মোটা চালের দাম উঠে গিয়েছিল মণপ্রতি ২৯ টাকা, সরু চাল ৩৫ টাকা। অর্থাৎ দু-মাসের মধ্যে ৫ টাকা বৃদ্ধি।

প্রজা-সোস্যালিষ্ট পার্টির নেতা ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ পূর্বনির্দিষ্ট সময় মতো মুখ্যমন্ত্রী ও খাদ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে এলেন ১৪ই আগষ্ট। খাদ্য-পরিস্থিতিই ছিল তাঁদের আলোচনার বিষয়বস্তু। এই বৈঠক চলেছিল ১৮০ মিনিট ধরে। এই আলোচনার ওপর ভিত্তি করেই ডাঃ রায় ও ডঃ ঘোষের যুগ্ম স্বাক্ষরে একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছিল। যে সব বিষয়ে তাঁরা একমত হতে পেরেছিলেন, সেগুলিই ছিল ঐ বিবৃতির মধ্যে। দুজনেই তাঁরা মনে করেন, কেন্দ্র যে সহায়তা দিচ্ছেন, তা পর্যাপ্ত নয়। তাছাড়া, গ্রামাঞ্চলে রেশনকার্ডধারীদের শ্রেণীবিভাগ করতে হবে কার কতো জমি আছে তার ভিত্তিতে। চার একরের বেশি যাঁর জমি তিনি ন্যায্য মূল্যের দোকান থেকে চাল কিনতে অধিকারী হবেন না। সেচবিহীন জমি যে সব চাষীদের দু-একরের মতো রয়েছে, তাদের কর রেহাই দিতে হবে। এ ছাড়া গ্রাম-এলাকার এই শ্রেণীর লোকদের সপ্তাহে দুদিন রেশন তুলতে দেওয়া হবে।

যাই হোক, এই যুগ্ম বিবৃতি বার হবার পর একটা কথা খুব রটে গেল যে, ডঃ ঘোষ শীগগিরই মন্ত্রিসভায় যোগ দিচ্ছেন। নেহেরু তাঁকে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করবার জন্য দিল্লীতেও ডেকে পাঠালেন। তার আগে ডঃ ঘোষ যখন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে ফিরে আসছিলেন, তখন সাংবাদিকরা তাঁকে ঘিরে ফেলে প্রশ্ন করতে থাকেন—মন্ত্রিসভায় যোগ দিচ্ছেন নাকি?

কথাটার জবাব সরাসরি না দিলেও এ-সম্ভাবনাকে তিনি একেবারে গুজব বলে উড়িয়েও দিতে পারলেন না, বললেন, আমার দল অনুমতি দিলে এ অসম্ভব ঘটনা সম্ভবও হতে পারে। আশ্চর্য কী?

কিন্তু বিরোধীপক্ষের নেতা জ্যোতি বসু বললেন অন্য কথা। বললেন, এই বিবৃতিতে আমি এমন কিছু পেলাম না, যা এই পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাতে পারে।

পুলিশ ও স্বরাষ্ট্র বিভাগের প্রধানদের সঙ্গে নিজের বাড়িতে গোপনে বৈঠক করার পর মুখ্যমন্ত্রী একটি লিখিত বিবৃতি দিয়ে সাবধান-বাণী উচ্চারণ করলেন। মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির দাবির অন্তর্গত প্রত্যেকটি বিষয়ের উত্তর দিয়েছিলেন তিনি। ঐ কমিটি হুমকি দিয়েছিলেন যে তাঁরা চালের মজুতদারির বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন করবেন, আইন অমান্য করবেন, অবস্থান ধর্মঘট আর পিকেটিং করবেন।

ডাঃ রায়ের বিবৃতির শেষে ছিল, কোনো সরকারই আর চুপচাপ বসে থাকতে পারে না। কোনো সরকারই পারে না এই ধরনের আইন-ভঙ্গকারী গণ-আন্দোলন চলতে দিতে। আইন যারা ভাঙতে চায় তাদের সেজন্য ফলভোগও করতে হবে।

রাজ্য সরকারের তখনকার পুলিশ-কর্তাদের মধ্যে তাঁর বিরাট আস্থা ছিল প্রসাদ বসুর ওপর। এঁর সংস্পর্শে ডাঃ রায় এসেছিলেন সেই ১৯৪৮-৪৯ সালে, যখন শ্রীবসু ছিলেন কলকাতায় 'স্পেশাল ব্রাঞ্চ'-এর কর্তা। কম্যুনিস্ট ও তার সঙ্গীদলের লোকেরা কী-কী নাশকতামূলক কাজের পরিকল্পনা করছে সে-সম্পর্কে শ্রীবসুর পাঠানো গোপন প্রতিবেদনগুলো খুঁটিয়ে পড়তেন তিনি, নিয়ম-মতো সাপ্তাহিক বৈঠক করতেন ঐ সব সংকটময় দিনে। আন্দোলনের পাণ্ডাদের নামের তালিকা নিয়ে তাঁর কাছে এলেন গোয়েন্দা বিভাগের অফিসাররা। এই তালিকা অনুসারে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হবে, মুখ্যমন্ত্রীর অনুমোদন পেলে। গভীর রাতে বৈঠক শেষ করে অফিসাররা যখন ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিলেন, আমি শ্রীবসুর খুব কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করলাম,—পুলিশী তৎপরতা আর ধরপাকড় শুরু হবে মনে হচ্ছে। তাই না?

শ্রীবসু কিছু না বলে শুধু একটু হাসলেন। বৈঠক হয়েছিল খুবই গোপনে, কারণ, কোন রকমে একটু খবর বেরিয়ে গেলেই ঐ সব নেতারা গা ঢাকা দেবেন।

দুই দিন পরে, অর্থাৎ ১৭ই আগস্ট খুব ভোরে পুলিশ কলকাতা আর জেলাগুলিতে তৎপরতা চালিয়ে যে সব নেতারা গণ-বিক্ষোভ ও আইন ভঙ্গ করার হুমকি দিয়েছিলেন, তাঁদের ছেঁকে বার করলো। সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার কম্যুনিস্ট দলের অফিসগুলিও সার্চ করা হলো। গ্রেপ্তার করা হলো মোট

৬৩ জনকে, তার মধ্যে ১৪ জন ছিলেন বিধানসভা-সদস্য। এঁরা বিভিন্ন দলভুক্ত, যেমন, কম্যুনিস্ট দল, বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক দল (আর এস পি), সোসালিস্ট ইউনিটি সেণ্টার (এস ইউ সি) আর ফরোয়ার্ড ব্লক। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির এঁরাই ছিলেন প্রধান সরিক। পুলিশ জ্যোতি বসুর বাড়িতেও হানা দিয়েছিলো, কিন্তু তাঁকে পাওয়া যায় নি। শুধু তিনি নন, আরও অনেক কর্মীই ঐ সময় গা-ঢাকা দিয়েছিলেন।

রাজ্যপাল-ভবনের মধ্যে অবস্থিত খাদ্যমন্ত্রীর ভবনের সামনে আইনভঙ্গকারীরা বিক্ষোভ দেখাতে এলে তাদের নিষিদ্ধ এলাকার বাইরে আটকে দিতে হবে এবং প্রয়োজন হলে কঠোর হতে হবে,—এই-ই ছিল পুলিশের ওপরে পুলিশমন্ত্রী কালীপদ মুখোপাধ্যায়ের কড়া হুকুম। বামপন্থীরা কলকাতায় ৩১শে আগস্ট প্রবল গণ-বিক্ষোভে নামবে, তাই তার প্রতিরোধ করতে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে, সে সম্পর্কে মন্ত্রিসভার একটি জরুরী বৈঠক বসেছিল ২৭শে আগস্ট। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে, কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন লোকসভায় খাদ্যসংক্রান্ত বিতর্কের দ্বিতীয় ও শেষ দিনে খাদ্য পরিস্থিতি, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য পরিস্থিতির ঠিকমতো মোকাবিলা না করতে পারার জন্য পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। তাঁর জায়গায় নেওয়া হয়েছিল এস কে পাতিলকে।

এই রকম উত্তেজনা যখন চলছে, তখন অনেক চিঠি আমরা পেয়েছিলাম, যাতে মুখ্যমন্ত্রীর প্রাণ নেওয়া হবে বলে হুমকী পর্যন্ত ছিল। এগুলি সহজেই তাচ্ছিল্য করা চলে না। সঙ্গে সঙ্গেই চিঠিগুলি পুলিশ-কর্তার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডেপুটি কমিশনারের ব্যক্তিগত পরিচালনাধীনে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির চারিধারে রক্ষা-ব্যবস্থা আরও দৃঢ় করা হলো। কোনো পক্ষই পিছু হটতে রাজী নন, চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত এ সংগ্রাম চলবে বলে মনে হচ্ছিল।

ডাক্তার রায়ের গোপন উইল

এই রকম সময়ে কোনো এক রবিবারে সরকারী সলিসিটার নৃপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র এলেন ডাঃ রায়ের বাড়িতে। এবং আসামাত্রই তাঁকে ভিতরে নিয়ে যাওয়া হলো। মুখ্যমন্ত্রী তাঁরই জন্য একতলার অফিসঘরে অপেক্ষা করছিলেন।

ঘণ্টাখানেক পরে আমার ঘরের ঘণ্টাটা বেজে উঠলো। আমি উঠে তাঁর ঘরে ঢুকতেই ডাঃ রায় আমার হাতে কয়েকখানা হাতে-লেখা কাগজ দিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন,—ওহে তোমার ঘরে কেউ আছে?

বললাম,—হ্যাঁ স্যর, টেলিফোন-অপারেটার আর আর্দালী।

সঙ্গে সঙ্গে বললেন,—ঘর থেকে ওদের সরিয়ে দাও। দিয়ে, এগুলি ষ্ট্যাম্প-কাগজের ওপর খুব গোপনে টাইপ করে আনো।

সত্যি কথা বলতে কী, আমি একটু হক্‌চকিয়ে গেলাম। কতো গোপন জিনিসই না আমার ঘরে টাইপ করা হয়েছে ওদের সামনে, কিন্তু কোনো খবর কখনো বাইরে যায় নি। আর, তাঁরও ছিল অগাধ বিশ্বাস তাঁর ব্যক্তিগত কর্মচারীদের ওপর। তাহলে আজ আবার এ সতর্কতা কেন? কাগজগুলো টাইপ করতে করতেই ব্যাপারটা বুঝলাম। যদি হঠাৎ মরে যান, তাই উইল তৈরি করে দিয়ে যাচ্ছেন। উইলে তাঁর স্থাবর অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি তিনি দিয়ে যাচ্ছেন তাঁর ভাইপো সুবিমল রায়কে। সুবিমলবাবু তখন ব্যারিস্টার বা ব্যবহারজীবী, পরে সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারক হয়েছিলেন। আমি টাইপ শেষ করে কাগজগুলো তাঁর হাতে দিলাম। নৃপেনবাবু ভালো করে পড়ে দেখলেন। উইলে সাক্ষী হিসাবে ডাঃ রায় নৃপেনবাবুকেই সই করতে বললেন। নৃপেনবাবু সেই মতো সই করার পর বললেন,—কিন্তু আরও একজন সাক্ষী চাই যে!

ডাঃ রায় আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন, বললেন,—তুমি টাইপ করেছো, এর ভিতরের কথাটাও জানো, সুতরাং সাক্ষী হিসাবে তুমিও সই কর। তাছাড়া, আমার ব্যক্তিগত সহায়ক হলেও তুমি ব্রাহ্মণ।

আমি অবাক্ হয়ে গেলাম! এমন মানুষের উইলের সাক্ষী হবে আমার মতো সামান্য লোক! কিন্তু দ্বিধার কিছু নেই, আমি সই করলাম। ডাঃ রায়ও নিশ্চিন্ত হলেন এই ভেবে যে, এর বিন্দু-বিসর্গও কেউ জানতে পারবে না, এমন কী—উইলের ফলে যাঁরা উপকৃত হবেন তাঁরাও না। এইখানে বলে রাখি, সত্যিই তাই হয়েছিল। ১৯৬২ সালের ১লা জুলাই তাঁর মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তাঁর উত্তরাধিকারী এ কথা একদম জানতে পারেন নি।

যাই হোক, ওদিকে এগিয়ে এলো সেই চরম দিন। ৩১শে আগষ্ট প্রায় পঁচিশ হাজার বিক্ষোভকারী, তাদের মধ্যে ছিল অনেক স্ত্রীলোক, ছোট ছোট

ছেলেমেয়ে, আর গাঁয়ের চাষী, তারা সারিবদ্ধভাবে মিছিল করে এগিয়ে গেল ময়দানে জনসভা করবার পর। জনসভায় অনেক বামপন্থী নেতাই ভাষণ দেন, জ্যোতি বসু ছাড়া (তিনি গা ঢাকা দিয়েছিলেন)। মিছিলের সামনে ছিল এক সার স্বেচ্ছাসেবক, তাদের পিছনে তাদের নেতারা। মিছিলের স্লোগান ছিল,—'সস্তা দরে চাল দাও, নয়ত গদী ছেড়ে দাও', 'প্রফুল্ল সেন গদী ছাড়ো', 'মহাকরণের দিকে এগিয়ে চলো', ইত্যাদি।

মিছিল সন্ধ্যাবেলা এসে পৌছলো গভর্নমেণ্ট প্লেস ইষ্ট-এ। ওখানে দাঁড়িয়েছিল কয়েক হাজার পুলিশ বেটন আর লাঠি হাতে, আর পুলিশ-অফিসারদের সঙ্গে পিস্তল। পুলিশ-বেষ্টনীর সামনাসামনি এসে মিছিল বসে পড়লো রাস্তার ওপর। প্রায় দেড়ঘণ্টা তারা বসে রইলো। রাত তখন প্রায় সাড়ে সাতটা হবে, হঠাৎ সেই বিরাট মিছিল উঠে দাঁড়িয়ে সামনে এগিয়ে যাবার জন্য পুলিশ-বেষ্টনীতে দিলো প্রবল ধাক্কা। ঘটনাটা ঘটে গেল মুহূর্তের মধ্যে। বেষ্টনী প্রায় ভেঙে পড়লো বলা চলে। পুলিশের কয়েকজন ডেপুটি কমিশনার ছিলেন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। কিন্তু সেই বিপুল জনতার ধাকাধাক্কি সাম্‌লানো কি সোজা কথা? বেটন আর লাঠি চার্জ, আর তার সঙ্গে টিয়ার-গ্যাস। এ সবের সঙ্গে কিছুক্ষণ যুঝবার পর জনতা পিছু হটে পালাতে লাগলো। পুলিশের লোক তাদের ধাওয়া করে গেল পিছনে পিছনে। শান্তিরক্ষা হলো, মহাকরণ বাঁচলো উৎপাত থেকে, খাদ্যমন্ত্রীও রক্ষা পেলেন। কিন্তু সারা শহরে শীগ্‌গিরই অশান্তির ঢেউ ছড়িয়ে পড়লো। আন্দোলনের সমর্থকরা রাস্তায় রাজত্ব করতে লাগলো বলা চলে। স্টেটবাস পোড়ানো, দুধ-বিক্রির যায়গা (বুথ) পোড়ানো,—এ সব চলতে লাগলো বেপরোয়াভাবে। সারা দিনে গ্রেপ্তারের সংখ্যা দাঁড়ালো তিন শ। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল আহতদের ভিড়ে ভরে গেল। পুলিশের কর্তা সব রকম মিছিল আর সভা সারা শহরে নিষিদ্ধ করে দিলেন।

পরের দিন, অর্থাৎ ১লা সেপ্টেম্বর, এ সব কাজ হাতে নিলো সমাজ-বিরোধীরা। পাঁচ-পাঁচটা থানা আক্রমণ করে লুটপাট করা হলো। কিন্তু সব থেকে উপদ্রুত হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির চার ধারের এলাকা। নিষেধ অমান্য করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেরা (ওঁর বাড়ি থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরত্ব মাইল খানেকের মধ্যে) মিছিল করে এসে, পুলিশকে ধোঁকা দিয়ে, মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির

ওপর পাথর আর ইঁটপাটকেল ছুঁড়তে লাগলো। সশস্ত্র পুলিশের একটি দল এসে পড়ায় খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যে সারা যায়গাটা জুড়ে ভাঙা কাঁচ, ডাবের খোলা, জুতো, পোস্টার আর তক্তার জঞ্জাল জড়ো হয়ে গেল। গুণ্ডার দল বড়ো বড়ো রাস্তাগুলো 'ব্যারিকেড' করে চলাচলকারী পুলিশদের আসার পথ বন্ধ করে দিলো। পুলিশ-কমিশনার তাঁর অফিসারদের নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলেন, বললেন—মাত্র লাঠি, বেটন আর টিয়ার গ্যাস দিয়ে মারমুখী জনতাকে বাগে আনা যাচ্ছে না।

দুটো দিন ধরে পুলিশ উন্মত্ত জনতার সঙ্গে লড়াই করছিল গুলি-গোলা ছাড়াই। এ প্রস্তাবের পর মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী গোবিন্দবল্লভ পন্থের সঙ্গে যোগাযোগ করে গুলি চালাবার অনুমতি চাইলেন। তা না হলে পরিস্থিতি আয়ত্বে আনা যাচ্ছে না। দিল্লী থেকে অনুমতি এলো বিকালবেলা। ফলে, ৬৫ জনকে আহত অবস্থায় বিভিন্ন হাসপাতালে দেওয়া হলো, তার মধ্যে চার জনকে আনা হয়েছিল মৃত অবস্থায়, দুজন মারা গিয়েছিল হাসপাতালে।

পরের দিন, ২রা সেপ্টেম্বর, রাজ্য সরকারের অনুরোধে সৈন্যদল রাস্তায় নেমে গেল। তার আগের রাতে জ্যোতি বসু বিবৃতি দিয়েছিলেন,—সরকারের সব রকম নৃশংসতা সত্ত্বেও আমাদের আন্দোলন কর্মসূচি অনুসারে চলবে।

২রা সেপ্টেম্বর, গুলি-চালাবার ব্যবস্থা নেওয়ার পর, আগের দিনের মারদাঙ্গার নিন্দা করলেন মুখ্যমন্ত্রী, বিশেষ করে—অ্যাম্বুলেন্স-গাড়ির ওপর আক্রমণ হওয়ায় তিনি বিশেষ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তিনি বললেন,—কম্যুনিস্টরা লোকদের ক্ষেপিয়েছে এমনভাবে যে, যাতে পুলিশ গুলি ছুঁড়তে বাধ্য হয়। ভূতপুর্ব কেরালা সরকার জনতার ওপর যে গুলি চালিয়েছিল, সেই কাজটা যুক্তিযুক্ত হয়েছিল বলে প্রমাণ করার জন্য এই পথ ওরা নিয়েছে।

যাই হোক, পরের দিন কলকাতার অবস্থা অনেক শান্ত হয়ে গেল। দু-একটি ঘটনা ছাড়া অপ্রীতিকর আর কিছুই ঘটে নি। প্রজা সোসালিস্ট পার্টি খাদ্য আন্দোলন এক পক্ষ কালের জন্য স্থগিত রাখলেন, ইতিমধ্যে তাঁদের নেতা ডঃ ঘোষ যাতে রাজ্য সরকারের সঙ্গে তাঁর অসমাপ্ত আলাপ-আলোচনাটা শেষ করে নিতে পারেন। কলকাতার এই পাঁচ দিনের অশান্তিতে ৩১টি প্রাণ গিয়েছিল, আহত হয়েছিল তিন হাজার জন, আর সম্পত্তির ক্ষতি হয়েছিল প্রচুর।

প্রসঙ্গক্রমে আমাদের কথা একটু বলি। ১লা সেপ্টেম্বরের কথা। সকাল আটটার আগেই অফিসে পৌছলাম আমরা। দাঙ্গাহাঙ্গামার প্রকোপ সেদিন ছিল সব থেকে বেশি। ডাঃ রায়ের কাছে খুব কমই রোগী এসেছিল। আসবে কী করে? একে ত যানবাহনের অভাব, তার ওপর মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে ঢোকা বিপজ্জনক, কারণ ওঁর বাড়িটাই ত আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যস্থল। যে রাস্তা দিয়ে ডাঃ রায়ের গাড়ি যাতায়াত করে, সে সব জায়গায় কড়া পাহারার ব্যবস্থা হয়েছিল, যাতে তাঁর না কোনো ক্ষতি হতে পারে। আমরা যখন পৌছলাম, তখন বাড়িতে দু-একজন ছাড়া লোক কোথায়? আমি যাওয়ামাত্র যে কাজ তিনি সবার আগে করলেন, সেটা হচ্ছে একটা চিঠির ডিক্‌টেশন দেওয়া। চিঠিটা লিখলেন প্রধানমন্ত্রীকে, খুব জরুরী,—প্রথম যে বিমান পাওয়া যাবে, সেই বিমানেই যাবে। চিঠিটা হচ্ছে এই :

কলকাতা

১লা সেপ্টেম্বর ১৯৫৯

প্রিয় জওহর,

খাদ্য সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবার জন্য আমরা ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদের বৈঠকে মিলিত হচ্ছি। কয়েক মাস আগে তুমি মুখ্যমন্ত্রীদের লিখেছিলে বলে মনে পড়ছে, খাদ্য সমস্যার গুরুত্ব বুঝে মুখ্যমন্ত্রীদের উচিত খাদ্য-দপ্তরের ভার নিজেদের হাতে নেওয়া। তুমি কি এখনো এই মত পোষণ করো? জাতীয় পর্ষদের বৈঠকে এটা কি তুমি প্রস্তাব আকারে তুলবে?

তোমার প্রীতিভাজন

বিধান

উত্তরে প্রধানমন্ত্রী লিখলেন—

নয়াদিল্লী

৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৫৯

প্রিয় বিধান,

দু-তিন দিন আগে তুমি চিঠিতে আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছো—আমি মুখ্যমন্ত্রীদের কাছে যে প্রস্তাব দিয়েছিলাম, তার কথা। অর্থাৎ খাদ্য দপ্তরের দারুণ গুরুত্ব থাকায় মুখ্যমন্ত্রীদের নিজেদেরই উচিত ঐ দপ্তরের ভার নেওয়া,

এই আমার মত ছিল কিনা? হ্যাঁ ঠিক তাই, আমি ঐ রকম প্রস্তাবই দিয়েছিলাম। আমি মনে করি, এই মুহূর্তে খাদ্য উৎপাদন ইত্যাদি প্রশ্ন খুবই গুরুতর, আর সেজন্য মুখ্যমন্ত্রীরা যদি এর ভার নেন ত সব থেকে ভাল হয়। আমি জানি তোমার বোঝা সাংঘাতিক। তবু যদি তুমি অন্য কোনো দপ্তর-টপ্তর ছেড়ে খাদ্যের ভার নাও ত খুব ভালো হয়।

তোমার প্রীতিভাজন

জওহরলাল

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য দপ্তরের পরিবর্তন ঘটানো অভীপ্সিত হলেও সহজ ছিল না। যে প্রফুল্ল সেন তাঁর সুখে-দুঃখে বিশ্বস্ত সহকারী, তাঁকে দপ্তর বদলানোর কথা বলা যে কতো কঠিন, তা তিনি জানতেন। মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত সরকার আর তাঁদের কংগ্রেস-দল,—এই দুইয়ের মাঝে সেতু বিশেষ ছিলেন এই প্রফুল্ল সেন। তিনি দল ও দলের নেতার জন্য সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছেন, বিক্ষোভের লক্ষ্য হয়েছেন এবং সময় সময় নিদারুণ জনপ্রিয়তাহানিও ঘটেছে তাঁর। এই অভাবিত খাদ্য-আন্দোলনের ফলে যে সংকটের সৃষ্টি হয়েছিল, তার মোকাবিলা করতে এগিয়ে গিয়েছিলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। এখন যদি দপ্তরের পরিবর্তন করতে যান, তাহলে বিরোধীপক্ষের খুব সুবিধাও হয়ে যাবে, কারণ এটাই ত তারা চাইছিল! তবু প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে চিঠি পেয়ে তিনি প্রফুল্ল সেনকে ব্যাপারটার একটু আঁচ দিলেন। কিন্তু প্রফুল্লবাবু খাদ্য দপ্তর ছাড়তে একেবারেই নারাজ। মন্ত্রিসভার এই সংকট কিছুদিন চললো। ডাঃ রায় অবশ্য শিগগিরই বুঝলেন যে, সরকার উল্টে দেবার জন্যে বাইরের শত্রুরা যেখানে তৎপর হয়ে উঠেছে, সেখানে দ্বিধাবিভক্ত মন্ত্রিসভা নিয়ে সংগ্রাম করা ঠিক হবে না। সেজন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাব মতো পথ অবলম্বন করা থেকে শেষপর্যন্ত বিরত হলেন তিনি।

৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে লোকসভার বিরোধীপক্ষীয় তিনজন সদস্য (এম পি) তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন খাদ্য-আন্দোলনের ব্যাপারে একটা মীমাংসায় আসার জন্য। তাঁরা কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী অজিতপ্রসাদ জৈনের উদাহরণ দিয়ে প্রফুল্ল সেনের পদত্যাগের দাবি জানালেন। ডাঃ রায় তাঁদের মুখের ওপর জবাব দিলেন,—

মন্ত্রিসভায় মন্ত্রী-নির্বাচনের দায়িত্ব আমার, আমি যতদিন দরকার বুঝবো প্রফুল্ল সেনকে রাখবো।

মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের খোলাখুলি এ-ও বললেন,—সরকার দ্বিতীয় পদক্ষেপ অর্থাৎ বন্দীদের মুক্তি দেবার কথা চিন্তা করার আগে আন্দোলন অবশ্যই থামিয়ে দিতে হবে।

১১ সেপ্টেম্বর সেই মতো কাজও হলো। রাজ্য সরকার খাদ্য সংক্রান্ত আন্দোলনের ব্যাপারে ধৃত বন্দীদের ১০২ জনকে মুক্তি দিলেন।

কলকাতা ও কানপুরে পুলিশকে যে গুলি ছুঁড়তে হয়েছিল, সে-সম্পর্কে একটি গোপনীয় চিঠি প্রধানমন্ত্রী লিখলেন সমস্ত মুখ্যমন্ত্রীদের কাছে। চিঠিখানি তুলে দেওয়া হলো :

৬ নভেম্বর ১৯৫৯

প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী,

সম্প্রতি কানপুরে যে শোচনীয় ঘটনা ঘটে গেল, যার ফলে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হলো ব্যাপক, বহু পুলিশ আহত হলো, পুলিশের গুলি চালনার ফলে ১৭ জন মারা গেল,—সে সবই আমাদের পক্ষে খুব উদ্বেগের বিষয়।

আমরা প্রায়ই বলে থাকি, চরম পরিস্থিতি ছাড়া পুলিশের গুলি চালনা সব সময়ই পরিহার করে চলতে হবে। আর এটাই হচ্ছে আমাদের সমস্ত রাজ্য সরকারেরই অবলম্বিত পন্থা। সম্প্রতি, কলকাতার দাঙ্গা-হাঙ্গামার বেলায় পুলিশের হাতে দুটো দিনের বেশি বন্দুক দেওয়া হয় নি। আর দেওয়া হয় নি বলে ক্ষতি হয়েছে প্রচুর, কলকাতার মতো মস্ত শহরের একটা অংশ প্রকৃতপক্ষে নিয়ন্ত্রণ করছিল মারমুখী জনতা। এই ঘটনা যখন ঘটতে থাকলো তখনই বন্দুক দেওয়া হয়েছিল। পুলিশ যখন এই বন্দুক ব্যবহার করলো, তখনই হৈ হৈ পড়ে গেল। কলকাতার ঘটনাই দেখিয়ে দিচ্ছে কী কঠিন পরিস্থিতিই না গড়ে উঠতে পারে, যার মোকাবিলা করতে হয় সরকারকে, পুলিশকে। আড়াই দিন ধরে দারুণ দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলেছিল, কারণ পুলিশ বন্দুকের সাহায্য ছাড়া পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে পারছিল না। এটা যদি চলতে দেওয়া হতো, তাহলে তার ফল আরও সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়াতো। পুলিশকে যখন বন্দুক দেওয়া হলো, তখনই গুলি চললো, আর দুর্ভাগ্যবশতঃ কয়েকটি লোক মারা পড়লো। এজন্য পুলিশকে দেওয়া হলো দোষ। যখন

দোষারোপ করা হলো, তখন সে-দোষের পরিমাণ যে কতখানি, তার হিসাব করতে আমি পারছি না। কিন্তু অনুরূপ পরিস্থিতির যেভাবে উদ্ভব হচ্ছে বার-বার সেটাই হয়ে দাঁড়াচ্ছে আমার চিন্তার বিষয়।

যে দুটি বিষয় আমাদের বিবেচনা করতে হবে, সে হচ্ছে :

(১) এই রকম পরিস্থিতি বেড়ে ওঠবার আগে অঙ্কুরেই কী করে একে রোধ করা যায়। প্রকৃত ঘটনার শুধু তদন্ত করলেই চলবে না, কী এর কারণ অথবা কী ভাবে এই পরিস্থিতি গড়ে ওঠে,—সেটা আরও গভীরভাবে খুঁজে দেখতে হবে। আমি বুঝতে পারছি যে, কখনো-কখনো কোনো শয়তান ব্যক্তি বা গোষ্ঠী ইচ্ছা করে এই রকম পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। যদি তাই-ই হয়, তাহলে বার-বার সংকটের মধ্যে না পড়ে কী ভাবে এর মোকাবিলা করবো?

(২) দ্বিতীয় যে বিষয়টি আমাদের খুব ভালো করে বিচার করে দেখতে হবে, সেটি হচ্ছে পুলিশ ও জনগণের মধ্যে তিক্ততার ভাব কী করে কমানো যায়? এই তিক্ততা জনতা বা পুলিশ, কারোর পক্ষেই ভালো হতে পারে না। ক্ষতিকারক শয়তানরা থাকা সত্ত্বেও আমি সচরাচর দেখেছি যে জনসাধারণের কাছে যদি সমঝোতার ভাব নিয়ে এগিয়ে যাওয়া যায়, তাঁদের যদি পরিস্থিতির কথা বুঝিয়ে সহযোগিতা চাওয়া যায়, তাহলে তাঁরা বেশ ভালোভাবেই সাড়া দিয়ে থাকেন। যাই হোক, সে রকম কিছু কিছু চেষ্টা সব সময়ই আমাদের করতে হবে।

এই সব নিয়ে যাতে আপনারা ভেবে দেখতে পারেন, সে জন্যই এ বিষয়ে আপনাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই চিঠি লিখছি। পরিস্থিতির মোকাবিলা আমাদের করতে হবে একেবারে গোড়া ধরে। ভারতের সর্বাঙ্গীণ আবহাওয়া আর জনজীবন এই সব শোচনীয় সংঘর্ষের জন্য আবিল হয়ে উঠবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত

জে, নেহেরু

১৯৫৯-এর বিপুল বন্যা

সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে অভাবিত বৃষ্টিপাতের ফলে বাংলার অর্ধেক পড়েছিল বিধ্বংসী বন্যার কবলে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল নয়টি জেলা—পুরুলিয়া, বর্ধমান,

মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, নদিয়া ইত্যাদি। ঠিক সেই ১৯৫৬ সালের পুনরাবৃত্তি, যার ভয়াবহ ক্ষতির হাত থেকে জনসাধারণ এখনো সম্পূর্ণ মুক্তি পায় নি। এইবার ক্ষতির পরিমাণ উঠলো চরমে।

সরকারী হিসাব অনুসারে অন্ততঃ দশ লক্ষ একর ধানের জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। খাদ্য আন্দোলনের ভয়াবহ মারদাঙ্গার ক্ষয়ক্ষতির আঘাত সরকার তখনো পুরোপুরি সামলে উঠতে পারে নি, তার ওপর এলো প্রকৃতির রোষ। সঙ্গে সঙ্গে বিপদের সংকেত চলে গেল দিল্লীতে। আর সেটা পেয়ে কলকাতা চলে এলেন কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী এস কে পাতিল তাঁর সচিব বি বি ঘোষকে নিয়ে ৫ অক্টোবর তারিখে, বন্যার প্রকোপ আর অবস্থার মোকাবিলা করতে রাজ্যের প্রয়োজনই বা কতখানি সে সব সরজমিনে দেখতে। সকালে মুখ্যমন্ত্রীর অফিসে বসে তাঁর সঙ্গে পরিস্থিতি নিয়ে শ্রীপাতিল আলোচনা করলেন প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে। কিন্তু খাদ্য সমস্যার মোকাবিলা করতে সব থেকে জরুরী বৈঠকটি বসেছিল পরে, ওড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী হরেকৃষ্ণ মহতাবের উপস্থিতিতে। তিনি এসেছিলেন ডাঃ রায়ের পরিকল্পনার বিষয়টাকে চূড়ান্ত করতে। ডাঃ রায়ের পরিকল্পনা ছিল—ওড়িষ্যা কেন্দ্রকে তার বাড়তি চাল না পাঠিয়ে সেই চাল পশ্চিমবঙ্গকে দেবে। এজন্য পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রের কাছ থেকে অনুমতি চাইছিল, যাতে করে পশ্চিমবঙ্গ ওড়িষ্যা থেকে সরাসরি চাল আমদানী করতে পারে। এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের পরিকল্পনা ছিল ওড়িষ্যাকে নিয়ে একটি সম্মিলিত এলাকা করবার। এই পরিকল্পনা গৃহীতও হয়েছিল কয়েকটি রক্ষাকবচ রেখে। বাজারে বিক্রি করার মতো বাড়তি চাল ওড়িষ্যার ছিল ৫ লক্ষ টন বলে অনুমান করা হয়েছিল। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, বাকি চাল আমদানীর এই ব্যবস্থা বেশ কয়েক বছর ধরে চলেছিল।

বৃহত্তর জল ও স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ সংস্থার উদ্ভব

বৃহত্তর কলকাতা, হুগলি নদীর উভয় তীরে ৪০ মাইল নিয়ে যার এলাকা, তার মধ্যে কলকাতা করপোরেশন, ৩০টি পৌর প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় সংস্থাগুলির চিরকেলে সমস্যা হচ্ছে জল সরবরাহ ও পয়ঃপ্রণালীর সমস্যা। বছরের পর বছর ধরে পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থার কোনো স্থায়ী সমাধানের পথ না খুঁজে এই সমস্যার মোকাবিলা করতে গিয়ে রাজ্যের বহু টাকা অযথা ব্যয় হয়ে গেছে।

ডাঃ রায় এজন্য একটি সম্মিলিত পরিকল্পনার খসড়া করলেন যার ফলে ভবিষ্যতে তৈরি হয়েছিল, যাকে বলে বৃহত্তর কলকাতার জল ও স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, আর সেই সঙ্গে টাউন অ্যাণ্ড কান্ট্রি প্ল্যানিং বিভাগ। কলকাতা শহরের উন্নয়নই এদের লক্ষ্য, আর লক্ষ্য সন্নিহিত এলাকা, যেখানে রয়েছে পাট, সুতি ও কারিগরী সংক্রান্ত দেশের শ্রেষ্ঠ শিল্প সংস্থাগুলি। তিনি তাঁর দূরদৃষ্টি দিয়ে বুঝেছিলেন, এই সব শিল্প-এলাকাকে যদি উন্নতি করতে হয়, বিশ্বের বাজারে প্রতিযোগিতায় নামতে হয়, তাহলে বিদ্যুৎ যোগাযোগ, বাসগৃহ, জল সরবরাহ ও পয়ঃপ্রণালীর সুবিধা অবশ্যই এখানে করে দিতে হবে। স্বাস্থ্য কৃত্যকের অধিকর্তা জেনারেল ডি এন চক্রবর্তী এবং জনস্বাস্থ্য ইঞ্জিনিয়ারিং-এর চীফ ইঞ্জিনিয়ার পি সি বোস-কে নিয়ে ঐ সংস্থার গোড়াপত্তন হলো। প্রাথমিক পর্যায়ে এই সংস্থার অক্লান্ত চেষ্টাতেই ঐ দুটি শাখা গড়ে উঠেছিল, যারা আজ বিরাট বিরাট পরিকল্পনা রূপায়িত করছে পৃথিবীর সব থেকে ঘনবসতিপূর্ণ বিপুল এলাকা জুড়ে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা হেলথ অরগানাইজেশন ১৪ অক্টোবর চার জন বিশেষজ্ঞ পাঠালেন কলকাতায়। তাঁরা মহানগরীর প্রধান প্রধান সমস্যা-গুলিই শুধু বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখবেন না, দেখবেন পশ্চিমবঙ্গের গাঙ্গেয় উপত্যাকার বৃহত্তর অঞ্চলও। এখানেই ত বন্যার জন্য ত্রাণ ব্যবস্থার ব্যাপারে কোটি কোটি টাকা খরচ হয়ে গেছে, কিন্তু ফল আশানুরূপ হয় নি।

নেহেরু বন্যাপ্লাবিত অঞ্চল ঘুরে দেখলেন

২১ অক্টোবর সকালবেলা ডাঃ রায় দমদম গেলেন নেহেরুকে স্বাগত জানাতে। নেহেরু আসছিলেন বাংলার বন্যাপ্লাবিত অঞ্চল দেখতে। ওঁর বিমান এসে নামলো বেলা প্রায় দশটায়। ওখান থেকেই একটা হেলিকপ্টারে উঠলেন ডাঃ রায় প্রফুল্ল সেনকে নিয়ে। মেদিনীপুর ও হুগলি জেলার প্লাবিত এলাকা আকাশ থেকে দেখবেন। হুগলি জেলার একটি গ্রামে গিয়ে নামলো ওদের হেলিকপ্টার। নেহেরু স্বচক্ষে দেখলেন—নিজের বাড়ি নিজে বানাও পরিকল্পের অধীনে যে সব বাড়ি তৈরি হয়েছিল, সেগুলি বন্যার প্রকোপ সহ্য করে ঠিক টিঁকে আছে।

ওরা বিকেল পর্যন্ত ৩৫০ মাইলের মতো ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা আকাশপথে ঘুরে ঘুরে দেখলেন। কলকাতায় ফিরে নেহেরু বললেন, বিরাট এ বন্যা—ক্ষয়ক্ষতি

প্রচণ্ড, ব্যাপক। এখন বন্যার জল আটকালে চলবে না, ওকে খুব তাড়াতাড়ি বার করে দিতে হবে।

পরদিন সকালে কলকাতা ত্যাগ করলেন নেহেরু। বিশেষ বিমানটিতে উঠতে যাবার আগে তাঁর একবার মনে হলো কী যেন ফেলে যাচ্ছেন, কিন্তু মনে করতে পারলেন না—ডাঃ রায়কে জড়িয়ে ধরে যথারীতি বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে চলে গেলেন। শহরে ফিরে আসবার পথে গাড়ির পিছনের আসন থেকে চেঁচিয়ে উঠলেন ডাঃ রায়—ঐ যাঃ, নেহেরুকে একটা জিনিস দেবার ছিল, একদম ভুলে গেছি!

আমাকে পথে শেয়ালদা স্টেশনের কাছে নামিয়ে দিলেন—বললেন, খুব ভালো দেখে বারোটা ডাব কিনে নিয়ে এসো ত?

আমি বেছে বেছে বারোটা ডাব কিনে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে ঢুকলাম। সন্ধ্যাবেলা মাধোপ্রসাদ বিড়লা এসেছিলেন ওঁর সঙ্গে দেখা করতে। উনি পরদিন দিল্লী যাচ্ছেন শুনে ডাঃ রায় বললেন, এই ডাবগুলি নিয়ে যাও ত? নিয়ে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে দেবে। ইন্দিরা গান্ধীর পেটের কী গোলমাল দেখা দিয়েছে। ডাক্তাররা বলেছে ডাব খেতে। পরে শ্রীমতী গান্ধীর পেটের রোগ অবশ্য ধরা পড়ে এবং তাঁকে অস্ত্রোপচার করতে হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে দুটি চিঠির আদান-প্রদান হয়েছিল ডাঃ রায় ও নেহেরুর মধ্যে। এর থেকে নেহেরুর সঙ্গে ডাঃ রায়ের মানসিক সম্পর্ক যে কতো গভীর ছিল সেটা বোঝা যাচ্ছে—আর পাওয়া যাচ্ছে নেহেরুর স্নেহশীল পিতৃহৃদয়ের পরিচয়।

প্রধানমন্ত্রীর বাড়ি, নয়াদিল্লী,
৩০ অক্টোবর ১৯৫৯

(ব্যক্তিগত)

প্রিয় বিধান,

আজ তোমার চিঠি পেলাম—আমি যে ৮ই নভেম্বর শান্তিনিকেতন যাচ্ছি সেই গুজব সম্পর্কিত চিঠি। এই খবরের প্রতিবাদ করে আমি তোমাকে টেলিগ্রাম করেছি। ৮ই নভেম্বর শান্তিনিকেতন যাবো, এ আমি কখনোই ভাবিনি। জানি না এই মিথ্যা খবর রটে গেল কীভাবে। ৮ ও ৯ই নভেম্বর আমি দিল্লীতেই থাকছি, ১০ই সকালে যাচ্ছি ইন্দোর।

ইন্দিরা (তখন কংগ্রেস সভাপতি) সব কিছু সত্ত্বেও সফর করে বেড়াচ্ছে। আজ রাতে সে গেছে উত্তর প্রদেশের কোনো কোনো যায়গায় ঘুরতে। তিন চার দিন পরে ফিরবে, ফিরে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যাবে বোম্বাই ও কচ্ছে। সেখান থেকে ফিরবে ১০ তারিখে। সেজন্য তুমি ৮ই যখন এখানে আসছো, তখন সে থাকছে না।

আমি তার সফর-সূচি সীমায়িত করবার চেষ্টা করেছিলাম খুবই। কিন্তু আরও দুটি যায়গায় সে যেতে চাইছেই। একটি হচ্ছে মহীশূর। অনেকদিনের প্রতিশ্রুতি এটা তার, সেজন্য নভেম্বরের শেষের দিকে চার পাঁচ দিনের জন্য যেতে চাইছে। আর যদি তুমি সঙ্গত মনে করো ত খুব অল্পসময়ের জন্য কলকাতাও সে একবার ঘুরে আসতে চায়। তার এই সফরের প্রধান উদ্দেশ্য বন্যা ততটা নয় যতটা মনস্তাত্ত্বিক। অনেক আগেই সে কলকাতা যেতে চেয়েছিল, কিন্তু অন্য সব সফর-সূচিতে জড়িয়ে পড়ায় আর যেতে পারে নি। যদি তুমি মনে করো তার যাওয়া উচিত দুই বা তিন দিনের জন্য, তাহলে তোমার ও তার সুবিধামতো সে ব্যবস্থা করা যেতে পারবে। ১৬ই নভেম্বর পর্যন্ত সে ব্যস্ত অর্থাৎ বিভিন্ন সফর-সূচি শেষ করে সে দিল্লী ফিরছে ঐ ১৬ই নভেম্বর। দু তিন দিন দিল্লী কাটিয়ে সে কলকাতা যেতে পারে ধরো ১৮ই আর ১৯শে। যদি তুমি সুবিধা মনে করো তাহলে বন্যাপ্লাবিত একটি দুটি অঞ্চল সে ঘুরেও দেখে আসতে পারে। সাধ্যের অতিরিক্ত পরিশ্রম সে করুক এ আমি এখন চাই না। তুমি যখন ৮ তারিখে আসছো তখন সঙ্গে কিছু ডাব নিয়ে আসতে পারবে? ডাক্তাররা ওকে যে ডাব খেতে বলেছে এতো তুমি জানোই।

তোমার প্রীতিভাজন

জওহর

কলিকাতা

২রা নভেম্বর ১৯৫৯

(ব্যক্তিগত)

প্রিয় জওহর,

তোমার ৩০ অক্টোবরের চিঠির জন্য ধন্যবাদ। আমি দিল্লী যাচ্ছি ৭ই, ৮ই নয়। ৮ই আমি দিল্লী থাকছি, ৯ই ফিরে আসছি। গত বুধবার ১২টা ডাব আমি পাঠাবার ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই করেছি, আরও কিছু সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।

আমি খুবই লজ্জিত যে তুমি চাওয়া সত্ত্বেও আমি সেদিন তোমার বিমানে কয়েকটা ডাব তুলে দিতে একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। ইন্দুর কলকাতা আসার ব্যাপারে আমি দিল্লীতে তোমার সঙ্গে আলোচনা করবো।

তোমার প্রীতিভাজন

বিধান

পুনশ্চ: আমি জানতে পারলাম ৮ই নভেম্বর তুমি কলকাতা আসছো এই খবরটা শিক্ষা সচিব ধীরেন সেনকে দিয়েছিল শান্তিনিকেতনের রেজিস্ট্রার।

বিধানসভা-সদস্যদের জন্য সুযোগ-সুবিধা

উক্ত ঘটনার আগের কিছু কথা বলার আছে সেটা এই সুযোগে বলে নেই। সদস্যদের বেতন ও ভাতা সংক্রান্ত আইনের একটি সংশোধনী পাস করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা কিছুদিন আগে। এতে সদস্যদের রেলপথে বিনা ব্যয়ে প্রথম শ্রেণীতে যাতায়াতের সুবিধা দেওয়া হয়েছিল। আর হয়েছিল দৈনিক ও রাহা খরচের ভাতার কিছু পরিবর্তন। প্রথম শ্রেণীতে করে সারাভারত জুড়ে বছরে তিন হাজার মাইল পর্যন্ত তাঁরা ভ্রমণ করতে পারবেন।

এটা প্রধানমন্ত্রীর গোচরে এলে তিনি তৎক্ষণাৎ মুখ্যমন্ত্রীকে একটি চিঠি লিখে তাঁর তীব্র প্রতিক্রিয়ার কথাটা জানিয়ে দিয়েছিলেন। চিঠি লিখেছিলেন তিনি ৭ই অক্টোবর। বাহুল্য বোধে চিঠিখানা এখানে তুলে দিলাম না। কিন্তু তাতে তিনি লিখেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের এই বিশেষ পরিস্থিতি যখন, এত দুঃখকষ্ট রয়েছে, রয়েছে এত বিক্ষোভ, তখন এর ফলে জনসাধারণ বিক্ষুব্ধ হতে পারে, আন্দোলন করার একটা সুযোগও সৃষ্টি হতে পারে।

মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য পরের দিনই অর্থাৎ ৮ই অক্টোবর তারিখেই নেহেরুর চিঠির উত্তর দিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন:

প্রিয় জওহরলাল

তোমার ৭ই অক্টোবর (১৯৫৯)-এর চিঠি।

সদস্যদের বছরে তিন হাজার মাইল পর্যন্ত ভ্রমণ করবার সফর-কুপন দেওয়ার প্রশ্নটি নিয়ে আমাদের এবং রেলওয়ে বোর্ডের মধ্যে গত আড়াই বছর ধরে যে আলোচনা চলছিল, মাত্র এইবার তাঁরা এটির অনুমোদন দিলেন। আমার মনে হয় এ সুবিধাটুকু বন্ধ করে দেওয়া উচিত হবে না, কারণ আমরা চাই আমাদের

সদস্যদের সারা দেশ জুড়ে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে যে বিভিন্ন পরিকল্প রূপায়িত হচ্ছে, তা তাঁরা ঘুরে ঘুরে ভালো করে দেখুন। সাধারণভাবে আমরা তাঁদের যাতায়াতের খরচ দিয়ে থাকি, যখন তাঁরা সব জিনিস দেখতে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যান, যেমন দুর্গাপুর, সিন্ধ্রি, ইত্যাদি। এসব ব্যাপার যখন প্রায়ই ঘটে তখন বারবার ও নিয়ে ঝামেলায় না পড়ে আমরা চেয়েছিলাম একটা নিয়মতান্ত্রিক রীতি বা ধারা গড়ে ওঠা ভালো। বছরে এ জন্য মোট খরচ হবে ৮৫,০০০ টাকা।

রাহাখরচ ও দৈনিক ভাতা সম্পর্কে তোমাকে ভুল খবর দেওয়া হয়েছে। ১৯৩৭ সালের পুরানো আইনে এই ব্যবস্থা ছিল, যে লোক বিধান সভা ভবনের ২৫ মাইলের মধ্যে বাস করবে, সরকার তার দৈনিক ভাতা নিয়মমাফিক নাকচ করে দিতে পারবে। ঐ সময়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল মুসলীম লীগ। তারা নিয়ম করে দিলো যে, যারা বিধান সভা ভবনের ২৫ মাইলের মধ্যে বাস করে, তারা ভাতা পাবে না। সদস্যদের মধ্যে এই রকম পার্থক্যের সৃষ্টি ভারতের আর কোথাও হয় নি। আমি শুনেছি মুসলীম লীগ যে এই নিয়ম করেছিল তার কারণ হচ্ছে তারা জানতো অধিকাংশ সদস্যই যারা কলকাতা ও কলকাতার আশে পাশে বাস করতো, তারা বিরোধী গোষ্ঠীর লোক। কিন্তু সে যাই হোক আমি এটাই সঙ্গত মনে করেছি যে বিধান সভার সমস্ত সদস্যেরই সমান সুযোগ-সুবিধা পাওয়া উচিত।

অন্য একটি যে জিনিস করা হয়েছে সেটি হচ্ছে এমন আইন, যার ফলে সদস্যরা রেলপথের বদলে আকাশপথে সফর করতে পারবে। কোচবিহার অথবা জলপাইগুড়ির মতো যায়গা থেকে কলকাতা যাতায়াত রেলের থেকে বিমানে অপেক্ষাকৃত সস্তা। তাছাড়া এতে সময়ও বাঁচে। এই সব বিচার করেই আমরা মনে করেছি দুর্গম এলাকা থেকে সদস্যদের কলকাতা আসার পক্ষে ট্রেনের থেকে বিমানই ভালো।

এই বিশেষ কাজে বিরোধী পক্ষের কয়েকজন অনমনীয় সদস্য ছাড়া আর সবারই সমর্থন রয়েছে, অথচ সত্যি কথা বলতে কী, বিরোধী পক্ষের কয়েকজন বিধান সভা সদস্য এই সুবিধা পাবার জন্য বেশ কিছুদিন ধরে হৈ চৈ করছিল। এক দিক দিয়ে বলতে গেলে সদস্যদের কোনো বাড়তি সুবিধা দেওয়া হলো না। তাদের এক গোষ্ঠীর সঙ্গে অপরের যে পার্থক্য করা হয়েছিল সেটা বিদূরিত করা হলো।

তোমার স্নেহভাজন

বিধান

চীনা হামলার প্রতিক্রিয়া

২১শে অক্টোবর লাদাকে চীনাদের হামলার ফলে ১৭ জন ভারতীয় পুলিশ মারা গিয়েছিল। এই ঘটনা বাংলার বিধান সভার বিরোধী পক্ষগুলির ওপর প্রবল প্রতিঘাতের সৃষ্টি করেছিল। ২৩ নভেম্বর তারিখে ছয়টি মুলতুবী প্রস্তাব উঠেছিল একদিকে ভারত-বিরোধী এবং চীন-সমর্থনের প্রচার অভিযানের বিরুদ্ধে আলোচনার জন্য, অন্যদিকে কম্যুনিস্ট দল সদস্যরা আলোচনা করতে চাইছিলেন ভারত যে রাজকীয় যুদ্ধ শিবিরে যোগ দেবার চেষ্টা করছে তার বিরুদ্ধে। ২৮ নভেম্বর কম্যুনিস্ট দল প্রধান আক্রমণের লক্ষ্যস্থল ছিল শুধু কংগ্রেসের পক্ষ থেকে নয়, প্রজাসোস্যালিস্ট দল থেকেও। এটা ঘটেছিল প্রজাতন্ত্রী চীন ও ভারতের জাতীয়তা বিরোধী রাজনৈতিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে বিধান সভায় যখন একটি প্রস্তাব পাস হচ্ছিল, তখন। প্রস্তাব সম্পর্কে বলতে গিয়ে ভারতের সীমান্ত প্রসঙ্গে সিদ্ধার্থশংকর রায় সেদিন বলেছিলেন, চীনাদের দাবি ইতিহাসের দিক থেকে ভুল, রাজনীতির দিক থেকেও জোরালো নয়, আইনের দিক থেকে যুক্তিহীন এবং নীতির দিক থেকে অসঙ্গত। এ দাবি আক্রমণকারীর দাবি। পরিস্থিতির মোকাবিলা নেহেরু যেভাবে করছেন তার বিরুদ্ধে সমালোচনার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। চীন সম্পর্কে নেহেরুর যে নীতি, তার পিছনে রয়েছে ঐক্যবদ্ধ ভারতের দৃঢ় সমর্থন। চীনের হয়ে গোয়েন্দাগিরি বন্ধ করতেই হবে। কালিংপঙে যে গোয়েন্দার বাসা হয়েছে সেটা ভাঙতে হবে।

ডাঃ রায় বিধান সভায় কম্যুনিস্ট ব্লকের দিকে আঙুল তুলে বললেন, চীনা নীতিকে যে সমর্থন করেছে সে দেশদ্রোহিতার পরিচয় দিয়েছে। এটা অদ্ভুত, যে দলের পা রয়েছে ভারতের মাটিতে, তার সদস্যরা দৌড়চ্ছে চৌ এন লাইয়ের কাছে, কী করবে না করবে জানতে।

তাঁর ভাষণের উপসংহারে মুখ্যমন্ত্রী আরও বললেন, দেশ সেই দলকে বরদাস্ত করবে না, যে দলের এদেশের মাটিতে পা কিন্তু এ দেশের পতাকা তারা নেয় না, নেয় অন্য দেশের পতাকা ধার করে। ভারতের প্রধান অস্ত্র হচ্ছে ঐক্য। এই ঐক্যের বিরুদ্ধে যে যাবে সে বিশ্বাসঘাতক।

কম্যুনিস্ট দল সেই থেকে ফাঁপরে পড়ে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে দলটি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং এই বই লেখার সময় পর্যন্ত দেখছি এই ভাগ

হয়ে যাওয়া দুই দলের মধ্যে ফারাক আরও বেড়ে গেছে, যদিও ১৯৬২ সালের যুদ্ধের স্মৃতি এখন অনেক ঝাপসা হয়ে গেছে। ১৯ ডিসেম্বর জ্যোতি বসু মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। তাঁর নালিশ ছিল, তিনি শুনেছেন কয়েকজন কংগ্রেসী ও পি এস পি নেতা তাঁদের মিছিলে নাকি বাধা দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কম্যুনিস্টরা ঐদিন ময়দানে সভা ডেকেছিল। এই সভার উদ্দেশ্য ছিল ভারত-চীন সীমান্তবিরোধ সম্পর্কে তাঁদের দলের নীতি জনগণকে বুঝিয়ে বলা।

কিন্তু শ্রীবসু যা আশংকা করেছিলেন তাই হলো। দক্ষিণ কলকাতায় কম্যুনিস্ট ও কম্যুনিস্ট-বিরোধী এই দুটি মিছিলের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধলো। ময়দানের সভাতেও গোলমাল। জ্যোতি বসু তাঁর ভাষণ শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই দুটি বোমা ফাটলো পর পর। কম্যুনিস্ট দলের সভা ও মিছিলের ওপর এই প্রথম সংঘবদ্ধ আক্রমণ। চীনা কম্যুনিস্টদের কার্যকলাপ ভারতীয় কম্যুনিস্টদের ওপর প্রচণ্ড আঘাত হানলো।

চীনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক মতামত ক্রমশই কঠোর হচ্ছিল। এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীকে ডাঃ রায় একখানা চিঠি লিখেছিলেন ২৩শে অক্টোবর তারিখে। চিঠিটি হলো এই:

প্রিয় জওহর,

কম্যুনিস্ট সমস্যা-সম্পর্কে দেশের ভবিষ্যৎ মনোভঙ্গি কী, সে সম্পর্কে ১৮ই অক্টোবর সাণ্ডে স্ট্যাণ্ডার্ড-এ একটি নিবন্ধ বেরিয়েছে। আমি সেটি এই সঙ্গে পাঠালাম। চীনে ছাত্র হিসাবে দুটি বছর ছিল এমন একজন বিশেষ সংবাদদাতার লেখা ধারাবাহিক রচনাও তোমাকে পাঠালাম। যদি তোমার সময় থাকে ত দয়া করে পড়ে দেখো।

তোমার স্নেহভাজন
বিধান

প্রধানমন্ত্রী তাঁর মতামত জানাতে দেরি করলেন না। ২৮ অক্টোবর তারিখের চিঠিখানায় কম্যুনিস্ট দল সম্পর্কে তাঁর সরকারের নীতি এবং দেশের আভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ তাঁর অসামান্য দূরদর্শিতারই পরিচয় বহন করছে। তিনি লিখেছিলেন:

প্রিয় বিধান,

কয়েকটি নিবন্ধসহ প্রেরিত তোমার ২৪শে অক্টোবরের চিঠির জন্য ধন্যবাদ। স্টেটসম্যানএ প্রকাশিত এই ধরনের কয়েকটি নিবন্ধ আমি ইতিপুর্বেই পড়েছি।

লাল-বিরোধী ফ্রন্ট-এর ওপর লেখা নিবন্ধটি আমার মনে একটুও দাগ কাটে নি। নিবন্ধটিতে যে মনোভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে তা আমার কাছে পুরোপুরি ভুল ধারণা থেকে সম্ভূত বলে মনে হয়েছে, আর তা ছাড়া বিশেষ করে আজকের দিনে তা অচল। আমার মনে হয় ভারতে তথাকথিত এই কম্যুনিজম-বিরোধী মনোভাব ভারতে কম্যুনিজম-এর বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামকেই দুর্বল করে দেবে। এর ফলে কংগ্রেস যা আছে তা বিলীন হয়ে যাবে, কারণ তখন যত সব আজেবাজে গোষ্ঠী এসে এর সঙ্গে জুড়ে যাবে। গত বারো তেরো বছরে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে করে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়। অদ্ভুত ব্যাপার, ইউরোপে এটা দিনের পর দিন আরও অনুভূত হচ্ছে এবং তুমি জানো, এখন একটা জোরদার আন্দোলন চলছে দুই বিরাট শক্তি আমেরিকা ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে একটা সমঝোতা সৃষ্টি করার জন্য। এটা সত্যি যে চীন অন্যরকম ব্যবহার সুরু করেছে এবং তা করেছেও অশোভন ভাবে। চীন যা করছে তার বিরোধিতা করা এক জিনিস আর যেহেতু তারা কম্যুনিষ্ট, সেইহেতু তাদের বিরোধিতা করতে হবে এটা হয়ে দাঁড়ায় সম্পূর্ণ অন্য জিনিস এবং তা করলে আমরা সেই স্নায়ুযুদ্ধের শরিক হয়ে পড়বো, যে যুদ্ধ ব্যর্থ হয়ে গেছে ইউরোপে অথবা মধ্যপ্রাচ্যে। যে নিবন্ধটি তুমি আমাকে পাঠিয়েছো, ঐ নিবন্ধের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে প্রধানত ডালেসের দৃষ্টিভঙ্গি। ডালেসের মৃত্যুর পর আমেরিকায় সম্প্রতি যে সব উন্নতি লক্ষণীয়, তার মধ্যে একটি হচ্ছে আমেরিকার মনোভঙ্গির ব্যাপক পরিবর্তন, বিশেষ করে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের। ডালেসের বহু গুণ ছিল। খুবই বিবেকবান ব্যক্তি ছিলেন তিনি। কিন্তু নিজের মতবাদে এতো বিশ্বাসী বা গোঁড়া ছিলেন যে তাঁর ঐ গোঁড়ামির জন্য বেশ কয়েকবার বিশ্বযুদ্ধ বেধে যাচ্ছিল আর কী! তার ওপর মধ্যপ্রাচ্য এলাকার ব্যাপার-স্যাপারগুলোয় তিনি এমন তালগোল পাকিয়ে গেছেন যে, তার ফল যা হয়েছে তা এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি। যেই মুহূর্তে তাঁর অমোঘ প্রভাব শেষ হয়ে গেছে, সেই মুহূর্ত থেকে প্রেসিডেন্ট

কাজ করতে শুরু করেছেন এবং ডালেসের পথ থেকে সরে গিয়ে একটা বাস্তব-সম্মত পথ ধরেছেন। ম্যাকমিলান তাঁকে অবশ্য সাহায্য করেছেন।

তাহলেই তুমি দেখতে পাচ্ছো পশ্চিম ইউরোপ এবং আমেরিকার ঘটনার প্রবণতা স্নায়ুযুদ্ধ থেকে অনিবার্য কারণে সরে গেছে, আর সোভিয়েট ইউনিয়ন এই প্রবণতার খুবই অনুকূলে। প্রকৃতপক্ষে যা সবাই জানে, সোভিয়েট ইউনিয়ন চীনের নীতি অনুমোদন করে নি, বরং চীনের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত। যখন চীন তার বিপুল জনসংখ্যাকে শ্রমশিল্পমুখীন করে তুলবে, তখন তার মতিগতি কী হয়ে দাঁড়াবে?

তোমার পাঠানো নিবন্ধে যে পথ দেখানো হয়েছে, সেই পথে যাওয়া খুবই ভুল হয়ে দাঁড়াবে, বিশেষ করে এই মুহূর্তে। গত দশ বছরে আমরা যে খ্যাতি পেয়েছি তা সব ধুয়ে মুছে যাবে এবং আমাদের নিয়ে দাঁড় করাবে তাদেরই পাশে, যারা ভবিষ্যতে যুদ্ধ চাইছে। পশ্চিম ইউরোপে এবং আমেরিকায় যখন আমাদের নীতি ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে, তখন এই ধরনের প্রস্তাব আসা খুবই অদ্ভুত ব্যাপার।

চীনের যে বিরোধিতা করতে হবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু সে হচ্ছে আলাদা ব্যাপার। নীতির দিক থেকেই হোক আর কৌশলের দিক থেকেই হোক, আমাদের অতীতের প্রণালী ছেড়ে দিয়ে এমন কিছু করা উচিত হবে না, যা আমাদের অসুবিধা ও বিপদ বাড়িয়ে তুলবে।

আমি এ-ও ঠিক বুঝতে পারি না, মাত্র কম্যুনিজম বিরোধিতার জন্য কংগ্রেসও অন্যান্য সাম্প্রদায়িক দলগুলির সঙ্গে মিশে যাবে? আমরা পি এস পির সঙ্গে নানান বিষয়ে মিশে যেতে পারতাম, যেমন অনেকটা করেছি আমরা কেরালায়, কিন্তু পি এস পি হচ্ছে একটা পাচমিশেলী লোকের সমাহার, কোনো বিষয়ে এদের কোনো স্বচ্ছ ধারণা নেই, আছে শুধু আবেগ আর সংস্কার। তাছাড়া সম্প্রতি তারা ঘোষণা করেছে, কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা করবে না।

তোমার স্নেহভাজন,

জওহর

ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে জ্যোতি বসু জনসভায় মাইক্রোফোন ব্যবহারের ব্যাপারে তাঁদের দলের প্রতি বৈষম্য করা হচ্ছে

বলে অভিযোগ আনলেন। এই মর্মে তিনি তার পরে একটি চিঠিও লিখেছিলেন ৫ই ডিসেম্বর। চিঠিটা হচ্ছে এই :

প্রিয় ডাঃ রায়,

হাজরা পার্ক, বি কে পাল অ্যাভিনিউ, টালা পার্ক আর কাদাপাড়ায় শনিবার, রবিবার ও সোমবার পুলিশ কম্যুনিস্ট পার্টিকে মাইক্রোফোন ব্যবহার করতে অনুমতি দেয় নি, এসব সভায় ভাষণ দিতেন সোমনাথ লাহিড়ী, মণিকুন্তলা সেন, রণেন সেন, গণেশ ঘোষ, আমি ও আরও অনেকে। আমি এই নিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলেছি। কিন্তু বলার পর জানতে পারলাম গতকাল রিপন স্কোয়ারের এক সভায় কংগ্রেস নেতারা ভাষণ দিয়েছেন আর সেখানে মাইক্রোফোনও ব্যবহার করা হয়েছে। এ হচ্ছে বৈষম্যের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত যেটা আপনি বলেছেন সরকারের অভিপ্রেত নয়। আমাদের মতামত ব্যাখ্যা করবার জন্য আমরাও বড় বড় জনসভা করছি এবং লোকেও ধৈর্য ধরে তা শুনছে। আমি আশা করি আপনি ব্যাপারটা নিয়ে খোঁজ খবর করবেন এবং ঐরকম বৈষম্যমূলক অনুমতির বিরুদ্ধে নির্দেশনামা জারি করবেন। আমাদের নীতি জনগণই বিচার করে দেখুক। আগামীকাল জলপাইগুড়ি থেকে ফিরে এসে আমি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবো।

আপনার বিশ্বস্ত
জ্যোতি বসু

দুদিন পরে মুখ্যমন্ত্রী এর উত্তর দিলেন।

প্রিয় জ্যোতি,

তোমার ৫ ডিসেম্বরের চিঠি।

চিঠির বিষয়মতো আমি তদন্ত করেছি। দেখা যাচ্ছে পুলিশের অভিমত, সম্প্রতি জনসভাগুলিতে বিশেষ করে অকটারলনি মনুমেণ্টের সভায় যে সব ভাষণ দেওয়া হয়েছে, ভারত-চীন বিষয়ে এখন হাওয়া গরম থাকায় এতে করে জনগণের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হতে পারে। ভবিষ্যতে এরকম পরিস্থিতি যাতে না হয় সেজন্যই পুলিশ কমিশনার ঐ রকম নির্দেশ জারি করেছিলেন।

এ নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। আমাদের মত হচ্ছে জনসভায় মাইক ব্যবহার করার জন্য সব দলকেই অনুমতি দেওয়া হবে, যদি তারা সভা

করবার জন্য আগে ভাগে নোটিশ দেয়। এই অনুমতি দেওয়ার পর সরকার দেখবে যে সে সুযোগের অপব্যবহার করা হচ্ছে কিনা। সভায় যে সব ভাষণ দেওয়া হবে, সরকারের মতে যদি তা জনগণের শান্তি ও শৃঙ্খলার পরিপন্থী হয় তাহলে ঐ সব সভা নিষিদ্ধ করে দেওয়া যেতে পারবে।

তোমার বিশ্বস্ত
বি সি রায়

কম্যুনিস্ট দলের চীন-সমর্থক গোষ্ঠী ও তাদের সহযোগীরা প্রচার চালাচ্ছে বিশেষ করে কালিংপঙ মহকুমায়, মুখ্যমন্ত্রী এই মর্মে রিপোর্ট পেলেন, যার জন্য চূড়ান্ত কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। ৩০ নভেম্বর ডাঃ রায় প্রধানমন্ত্রীকে লিখেছিলেন যে, দেশে কম্যুনিস্ট দলকে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হোক। এর উত্তরে ২রা ডিসেম্বর নেহেরু বিষয়টির খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ করে যে চিঠি দিয়েছিলেন সেটি এখানে তুলে দেওয়া হল :

প্রিয় বিধান,

তোমার ৩০ নভেম্বরের চিঠির জন্য ধন্যবাদ। বিশেষ করে আমাদের সীমান্ত এলাকায় গোলমাল থাকার জন্য তুমি স্বাভাবিকভাবেই মনোযোগ দিয়ে কম্যুনিস্ট দলের কার্যকলাপ লক্ষ্য করে চলেছো। এটা পরিষ্কার যে তাদের কার্যকলাপ তাদের বিরুদ্ধে জনসাধারণের মন বেশ বিষিয়ে দিয়েছে। কী তারা বেছে নেবে এ একটা কঠিন প্রশ্ন তাদের সামনে, আর এজন্য তারা খুবই অসুবিধায় পড়েছে, এমন কী ভিতরে ভিতরে তারা ভিন্ন পথে যাবার চেষ্টা করছে। একদিকে তারা তাদের তথাকথিত আন্তর্জাতিক নীতি আঁকড়ে প্রত্যক্ষে অথবা অপ্রত্যক্ষে চীনকে সমর্থন করতে পারে, আর নয়ত এগিয়ে এসে তাদের আরও খোলাখুলিভাবে চীনা হামলার নিন্দা করতে হবে। যদি তারা আগের পথ নেয়, তাহলে ভারতের জনমণ্ডলীর কাছে তারা নিজেদেরকে বাতিল করে ফেলবে। আর যদি তারা দ্বিতীয় পথটি নেয়, তাহলে কম্যুনিস্ট দৃষ্টিকোণ থেকে নিজেদেরকে কিছু পরিমাণে হেয় প্রতিপন্ন করবে। এতেও তাদের যে খুব ভালো হবে তা নয়।

আমার মনে হয় এই স্তরে কম্যুনিস্ট দলকে নিষিদ্ধ করা আমাদের পক্ষে খুবই অনভিজ্ঞতার কাজ হবে। তার ফলে তারা এই সংকট থেকে বেরিয়ে ত

আসবেই, জনগণের বেশ কিছু সহানুভূতি পেয়ে যাবে। তা ছাড়া এর আন্তর্জাতিক ফলশ্রুতিও ভারতের পক্ষে ক্ষতিকর হবে।

কিন্তু তা বলে জনসভায় ভাষণ দিয়ে বা অন্য কোন উপায়ে কোনো ব্যক্তি যদি আইন ভঙ্গ করে, তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন না করার কোনো কারণ নেই। আমরা মিছিলের ব্যাপারে আরও কঠোর হতে পারি। ৬ই ডিসেম্বর তারিখে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে পাঞ্চেত পাহাড়ে।

তোমার স্নেহভাজন,

জওহর

॥ ১৭ ॥

(১৯৬০)

দার্জিলিঙে ডাঃ রায়ের চোখে ভালোভাবেই অস্ত্রোপচার করলেন অষ্ট্রিয়ার সার্জন বা শল্য চিকিৎসক ডাঃ বক। অস্ত্রোপচারে তাঁর সহযোগিতা করেছিলেন ডাঃ রায়ের বন্ধু ও ভারতের চক্ষু বিশেষজ্ঞ ক্যাপ্টেন কিরণ সেন। অস্ত্রোপচারের এই সাফল্যের কথা প্রধানমন্ত্রীর কর্ণগোচর হলে তিনি দিল্লী থেকে ৬ জানুয়ারি তাঁকে একটি ব্যক্তিগত চিঠি লেখেন।

প্রিয় বিধান,

তোমার চোখের অপারেশন যে ভালোভাবে নিষ্পন্ন হয়েছে এবং তুমি যে এখন সেরে উঠছো এ খবর পেয়ে আমি খুব খুশি হয়েছি। আশা করি তাড়াতাড়ি কলকাতায় ফিরে না এসে তুমি ওখানে কিছুদিন ভালোভাবে বিশ্রাম নেবে।

আর দিন দুয়েকের মধ্যে ব্রহ্মপুত্র সেতুর ব্যাপারে আমি আসাম রওনা হবো। সেখান থেকে আমি সরাসরি দিল্লী হয়ে যাবো বাঙ্গালোর। তার মানে আমি দিল্লী থেকে দূরে থাকবো ১১ দিন। আমি যেদিন দিল্লী ফিরবো ঠিক তার পরের দিনই প্রেসিডেন্ট ভরোশিলভ তাঁর বৃহৎ দলবল নিয়ে এখানে এসে পৌছচ্ছেন।

এইসব বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি কাজকর্ম সত্ত্বেও আমরা প্রতিদিন মন্ত্রিসভায় বসে পরবর্তী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, আর তার সঙ্গে সীমান্ত-প্রতিরক্ষার বিষয় নিয়েও আলোচনা করছি। এক অর্থে দুই-ই পরস্পরের সঙ্গে ওতপ্রোতরূপে বিজড়িত, যদিও প্রতিরক্ষাসংক্রান্ত বিষয়গুলির ওপরই অনিবার্যরূপে বিশেষ জোর দিতে হচ্ছে।

ফেব্রুয়ারির প্রথম দিকে আমার মনে হয় ইন্দিরা কলকাতায় যাবে অপারেশন করাতে। আমি ঠিক জানি না। এ জন্য কোনো তারিখ এখন পর্যন্ত স্থির হয়েছে কিনা জানি না, সম্ভব হলে আমিও সে সময় ওখানে থাকবো।

তোমার স্নেহভাজন

জওহর

এই চিঠির উত্তর ডাঃ রায় দিয়েছিলেন ৯ জানুয়ারি।

প্রিয় জওহর,

তোমার ৬ জানুয়ারির চিঠি।

মাত্র দুদিন আগে ডাক্তাররা আমাকে একটা চোখ ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছে, অন্য যে চোখটির অপারেশন হয়েছে, সেটিও অল্প অল্প ব্যবহার করা যেতে পারে। ব্যথা এখনো রয়েছে, কিন্তু আমার মনে হয় আমি খুব দ্রুতই সেরে উঠছি, ডাক্তাররা বলছেন আমি ১৭ই তারিখে কলকাতা রওনা হতে পারি। কিন্তু আরও সাতদিন আমার পক্ষে কাজকর্ম করা সম্ভব হবে বলে মনে করি না। ঐ সময় আমি কলকাতায় না থেকে ব্যারাকপুরে গিয়ে থাকবো। সেই মর্মে আমি রাজ্যপাল কুমারী পদ্মজা নাইডুকেও বলেছি, তিনি তাঁর ওখানকার কুটিরটি আমাকে ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছেন। আমি তোমাকে দিল্লীর ঠিকানায় এই চিঠি দিচ্ছি এই আশায় যে, আসাম থেকে দিল্লী ফিরে বাঙ্গালোর রওনা হবার মধ্যে এটা তুমি পেয়ে যাবে।

আমার এই বাধ্যতামূলক বিশ্রাম আমাকে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে আমার রাজ্যের বিভিন্ন পরিকল্পনা সম্পর্কে ভাববার অবসর দিয়েছে। এটা সত্যি কথা, সীমান্তের প্রতিরক্ষা এই রাজ্যের পক্ষে যতটা প্রযোজ্য তা একমাত্র মিলিটারি বসিয়েই ফলপ্রসূ করা সম্ভব। কিন্তু আমার বিশ্বাস ভবিষ্যতের কোনো জটিল পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে অসামরিক জনমণ্ডলীর মধ্যে উদ্দীপনা জাগানোর জন্য অনেক কিছু করা যেতে পারে এবং তা করা উচিতও।

ইন্দিরার অপারেশনের জন্য আপাতত ৭ অথবা ৮ই ফেব্রুয়ারি দিন স্থির করা হবে। আশা করি সে সময় তুমি আসতে পারবে।

তোমার স্নেহভাজন,

বিধান

১৭ জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী বিশেষ বিমানে দার্জিলিঙ থেকে ফিরে এলেন। রইলেন গিয়ে কথামতো ব্যারাকপুরে। আমার মা এইসময় খুব অসুস্থ ছিলেন বলে আমি দার্জিলিঙে যেতে পারি নি। ডাঃ রায় ফিরে আসবার পর রোজ আমরা চিঠিপত্র আর ফাইল নিয়ে ব্যারাকপুরে যেতাম তাঁর নির্দেশের জন্য। এইরকম একদিন ফাইল নিয়ে গেছি, উনি আমার মায়ের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। আমি জানালাম, আজ সকালে কালো পায়খানা হয়েছে, খুবই অস্থির অস্থির করছেন।

আমার দিকে তাকালেন ডাঃ রায়, জিজ্ঞাসা করলেন, পায়খানার কী রকম রঙ? কফির মতো?

হ্যাঁ স্যার।

তিনি এক মুহূর্ত থেমে থেকে তারপরে বললেন, ঐ রঙের অর্থ হলো রক্ত পড়ছে। তুমি ওটা বুঝবে না। তুমি বরং এখ্‌খুনি বাড়ি যাও। গিয়ে মায়ের বিছানার কাছে থাকো।

পরের দিনই আমার মা মারা গেলেন।

ডাঃ রায় রোগীকে না দেখে শুধু তার অবস্থার বিবরণ শুনেই বলতে পারতেন কী হতে চলেছে। আমার মায়ের ব্যাপারে অন্ততঃ এটা আমি প্রত্যক্ষ করেছিলাম।

রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের সফর

এই ঘটনার তিন দিন পরে সোভিয়েট প্রেসিডেন্ট মার্শাল কে ই ভরোশিলভ, ইউ এস এস আর মন্ত্রিসভার ভাইস চেয়ারম্যান মিঃ কোজলভ এবং মিঃ ওয়াই ডি ফুরস্তেভকে নিয়ে ইলিউশিন ১৮ বিমানে দমদমে এসে নামলেন। এঁদের স্বাগত জানাবার জন্য উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল পদ্মজা নাইডু, মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়, অন্যান্য মন্ত্রী ও শহরের কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। মার্শালের গাড়ির সারি চললো রাজভবনের দিকে। একটা গাড়ির মাঝখানে মার্শাল, দুদিকে রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রী, আট মাইলের এই পথ পার হতে লাগলেন, আর দুধারে দাঁড়িয়ে কাতারে কাতারে লোক তাঁদের অভ্যর্থনা জানালো। পরদিন অর্থাৎ ২ ফেব্রুয়ারি মেয়র ওঁদের নাগরিক অভ্যর্থনা জানালেন রঞ্জি স্ট্যাডিয়ামে। বৃদ্ধ মার্শাল কিছু বললেন না বটে, কিন্তু ভাইস চেয়ারম্যান কোজলভ তাঁদের দু সপ্তাহের ভারত ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে ভারত সরকার ও জনগণ তাঁদের

বর্মার রাষ্ট্রপতি উ-নু, সোভিয়েট রাশিয়ার ক্রুশ্চেভ এবং পণ্ডিত নেহেরুর সঙ্গে ডাঃ রায়

ক্রুশ্চেভের এই কথা ডাঃ রায় প্রায়ই পুনরাবৃত্তি করে শোনাতেন যখন বিধানসভার কম্যুনিস্ট সদস্যরা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আরব্ধ উন্নয়ন সম্পর্কে সমালোচনা করতো। তিনি বলতেন, তাহলে শোন তোমাদের মহান নেতা কী বলেছেন।

যাইহোক, পরের দিন ২রা ফেব্রুয়ারি ভারত ত্যাগের পুর্বে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী তাঁর দুই কন্যা নিয়ে ফটো তোলবার জন্য দাঁড়ালেন—সঙ্গে দাঁড়ালেন প্রধানমন্ত্রী নেহেরু, রাজ্যপাল পদ্মজা নাইডু, বর্মার নেতা উ নু এবং ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। ক্রুশ্চেভ তাঁর কৌতুকের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। বিমান বন্দরে পৌঁছে ডাঃ রায়ের সঙ্গে হাতে হাত মেলাতে গিয়ে বললেন, আমি দেখছি প্রত্যেক দিনই আপনি একটু একটু করে লম্বা হচ্ছেন।

তিনি দৈহিক উচ্চতা মাপছিলেন নিজের, নেহেরুর এবং ডাঃ রায়ের।

মুখ্যমন্ত্রী যখন ক্রুশ্চেভের সঙ্গে বিরোধী পক্ষের নেতা হিসাবে আলাপ করিয়ে দিলেন জ্যোতি বসুকে, ক্রুশ্চেভ সাদরে তাঁর সঙ্গে করমর্দন করলেন। কিন্তু তারপরে ডাঃ রায় যখন বললেন, শ্রীবসু কম্যুনিস্ট পার্টিরও নেতা, তখন ক্রুশ্চেভ ওঁর দিকে তাকিয়ে চোখ টিপলেন, তারপরেই হেসে উঠলেন হো হো করে।

পরদিন মুখ্যমন্ত্রী দিল্লী গেলেন পশ্চিমবঙ্গের ৪৮০ কোটি টাকার তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খসড়া নিয়ে। পরিকল্পনা কমিশন ঘোষণা করেছিলেন যে দ্বিতীয় পরিকল্পনার আকার থেকে তৃতীয় পরিকল্পনার আকার যেন দেড় গুণের বেশি না হয়। সেই অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের ঐ ৪৮০ কোটি টাকার পরিমাণ যাতে কাটা না হয় সেজন্য প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী মোরারজী দেশাইয়ের সঙ্গে তিনি আলোচনা করবেন। জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদ তখন তৃতীয় পরিকল্পনার আকার কী হবে সেই নিয়ে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে আলোচনার জন্য বৈঠকে বসছিলেন। এইসব বৈঠকে ডাঃ রায় প্রভাব বিস্তার করতেন সমধিক। তাঁর অর্থসম্বন্ধীয় প্রগাঢ় জ্ঞান ও সমস্যা সমাধানে বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গির জন্য পর্ষদ তাঁর বহু প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন। আগের জিনিস আগে করতে হবে। আর তিনি পরিষ্কার বুঝতেন এই আগের জিনিস কোন্ কোন্‌টা। ডাঃ রায় সাধারণত ভাষণ দিতেন প্রধানমন্ত্রীর পরেই। এবারও তাই বললেন। জোর দিয়ে বললেন, ভারতের তৃতীয় পরিকল্পনার বরাদ্দ

৯,৯৫০ কোটি টাকার কম হতে পারে না। তিনি বললেন, তৃতীয় পরিকল্পনাকে ভবিষ্যতের পরিকল্পনাগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান ধাপ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।

নতুন চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি

বিধানসভার বৈঠক বসলো ২২শে ফেব্রুয়ারি। সদস্যরা এই বৈঠকেই রাজ্যপালের ঘোষণা শুনলেন শিক্ষা বিষয়ে রাজ্যের উদ্যোগ সম্পর্কে, শুনলেন শিল্পায়নের মাধ্যমে চাকরি সৃষ্টির সুযোগ ও আরও অনেক বিষয় সম্পর্কে। আগের এক বৈঠকে বিধানসভা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় বিলটি পাস করেছিল, আর সেই অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়টির কাজকর্মও শুরু হয়ে গিয়েছিল। নতুন আর একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তরবঙ্গে প্রতিষ্ঠা করবার উদ্যোগ চলছিল। তা ছাড়া কল্যাণীতেও একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার বিল বিবেচনার জন্য বিধান সভার সামনে ইতিমধ্যেই পেশ করা হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে ১২ বছরের কংগ্রেস রাজত্বে ডাঃ রায় শিক্ষার ক্ষেত্রে যে কৃতিত্বের সৃষ্টি করেছিলেন, তার পরিমাপ করা যায় এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রতিষ্ঠা থেকে। তাঁর মৃত্যুর পর একটিও নতুন বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হয় নি। পৃথিবীর সব থেকে বড়ো বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, যার অধীনে আছে ২০০টিরও বেশি কলেজ। এটি বাদ দিয়ে আরও চারটি বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত হলো। পরে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের নামাংকিত করা হয়েছিল একটিকে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় নাম দিয়ে।

তিনদিন পরে রাজ্য সরকারের বাজেট বিধানসভায় পেশ করলেন অর্থমন্ত্রী। রাজস্ব আদায় ৮৮.১৭ কোটি টাকা, আর ব্যয়বরাদ্দ ৮৯.২৩ কোটি টাকা। বাজেট বক্তৃতায় ডাঃ রায় দেশের অর্থনীতি যে লক্ষণীয় স্থিতিশীল উন্নতি করেছে, সেই কথাটিই তুলে ধরলেন বেশি করে। বড়ো বড়ো শিল্প গড়ে তোলার বিনিয়োগ কর্মসূচিতে প্রথম দিকে আর্থিক কষ্ট হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু পরে এ থেকেই সমৃদ্ধি আসবে। স্বাধীনতার বছরে রাজস্ব আদায় ছিল ৩১.৭৬ কোটি, আর ১৯৬০-এ এই অঙ্ক বেড়ে হয়েছিল প্রায় তিন গুণ, ৮৮ কোটি টাকা।

বিধানসভার এই অধিবেশনের কর্মসূচিতে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল। সেটি হচ্ছে জালান বাজোরিয়া পরিবারের ওরিয়েণ্টাল গ্যাস কোম্পানীর পরিচালন ভার রাজ্য সরকার কর্তৃক গ্রহণ ও পরে পুরোপুরিই অধিগ্রহণ করা।

মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভাকে জানালেন যে, তাঁর সাতটি বৃহৎ পরিকল্প পরিকল্পনা কমিশনের অনুমোদন লাভ করেছে। সেগুলি হলো—

(১) লবণ হ্রদ পুনরুদ্ধার (১৯ কোটি টাকা) (২) জলঢাকা জলবিদ্যুৎ পরিকল্প (৪.৫ কোটি) (৩) ব্যাণ্ডেল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র (৭৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সৃষ্টিতে সক্ষম) (৪) দুর্গাপুর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র (৫) দুর্গাপুর রাসায়নিক সার প্রকল্প (২০ কোটি টাকা) (৬) দুর্গাপুরে টার নিষ্কাশন কারখানা এবং (৭) কলকাতা দুর্গাপুর গ্যাস লাইন স্থাপনের প্রকল্প। এই সব পরিকল্পের জন্য মোট খরচ দাঁড়িয়েছিল ৮২ কোটি টাকা; এর মধ্যে ৩২ কোটি ছিল বিদেশী মুদ্রার বিনিময়ে। প্রকল্পের সবগুলিই রূপায়িত হচ্ছিল শুধু দুর্গাপুর রাসায়নিক সার প্রকল্পটি ছাড়া—এটা কেন্দ্রীয় সরকার রূপায়িত করেছিল। আগের দিন অর্থাৎ ৪ঠা মার্চ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বিশ্ব ব্যাংকের তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক মিশনের সাক্ষাৎকার ঘটলো। এদের কাছে তিনি ৩২ কোটি টাকার ঋণ চাইলেন; দরকার হলে এ ঋণ টাকার হিসাবে শোধ দেওয়া হবে।

কলকাতা বন্দরে সংকট

হুগলি নদীতে ক্রমাগত পলি পড়ে নদীর গভীরতা কমতে থাকার ঘটনা যুগপৎ সরকার এবং জাহাজ চলাচলকারীদের ভাবিয়ে তুলেছিল। ৮ই এপ্রিল বিদেশী জাহাজী প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিনিধিরা প্রকাশ্যেই তাঁদের মতামত ব্যক্ত করলেন যে, এইরকম অবনতি যদি আর দুবছর চলে তাহলে কলকাতা বন্দর বন্ধ হয়ে যাবে। নদীর গর্ভ থেকে আরও অনেক বেশি মাটি খুঁড়ে ফেলা বা ড্রেজিং ছাড়া নদীতে নতুন জল আনা দরকার, আর এটা করতে হলে গঙ্গা ব্যারাজ পরিকল্পের কাজ খুবই শীগ্‌গির শেষ করে ফেলতে হবে এই ছিল তাঁদের মত। মুখ্যমন্ত্রী বন্দরের এই বিপদের কথা আগেই বুঝতে পেরেছিলেন। এ এমন এক বন্দর যেখান থেকে যায় ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যের ৪৫ শতাংশ। মুখ্যমন্ত্রী ১৯৫৪-৫৫ সালে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রচনার সময় থেকে গঙ্গা ব্যারাজ প্রকল্পের জন্য চাপ দিয়ে আসছিলেন। কলকাতার সুবৃহৎ বন্দরটির সম্ভাব্য সংকটের কথা বিদেশী জাহাজী বিশেষজ্ঞরা প্রকাশ্যে বলতেই বিষয়টা একেবারে সামনে এসে গেল। এ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর তিনখানি চিঠির বিনিময় হয়েছিল। ১২ই মার্চের চিঠিতে

প্রধানমন্ত্রী নিশ্চিত আশ্বাস দিয়েছিলেন যে গঙ্গা ব্যারাজ পরিকল্পকে অবশ্যই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্গত করা হবে। প্রথম চিঠিটি তিনি লিখেছিলেন ৬ই মার্চ। এতে তিনি লিখেছিলেন :

গত বছর গঙ্গা থেকে ভাগীরথীতে জল আসার ব্যাপার নিয়ে কিছু ব্যবস্থা হাতে নেওয়া হয়েছিল, ১৯৫৯-এর ২৫ মে-তে লেখা আমার চিঠির পরবর্তী পদক্ষেপ অনুসারে। আমি জেনেছি ঐ কাজের ফল হয়েছে অভূতপূর্ব। বন্যা এবার গঙ্গার বুকে গভীর খাদের সৃষ্টি করে গেছে, এবং নদীটির অনুকূল বাঁক থেকে ভাগীরথীতে জল যাচ্ছে বিশ্বনাথপুরের উজানে ২।৩ মাইল থেকে, আর ভাটিতে ২।৩ মাইল পর্যন্ত। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই নিয়মিত জলস্রোত প্রবাহিত হতো, কিন্তু ভাগীরথী-বক্ষের কয়েকটি বাধা তা হতে দিচ্ছে না।

ঐ চিঠিতে তিনি ভাগীরথী-বক্ষের এই বাধা অপসারিত করবার কথাও লিখেছিলেন।

ঐ চিঠির উত্তর দিয়েছিলেন ডাঃ রায় ৮ই মার্চ। এটাই এ পর্যায়ের দ্বিতীয় পত্র। ডাঃ রায় এতে লিখেছিলেন :

এই প্রকল্প নিয়ে আমি বিস্তর চেঁচামেচি করে আসছি। ১৯৫৪-৫৫ সালে যখন দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা তৈরি হচ্ছে তখনই এটা আমি সামনে এনে হাজির করেছিলাম। মিঃ নন্দা তখন ছিলেন ঐ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত। তিনি পরিকল্পনা কমিশনের অন্য সবার সামনে আমাকে নিশ্চিত আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার বিষয়টা হাতে নেবে, সেজন্য এটা আর পরিকল্পনার অন্তর্গত করার দরকার নেই। কিন্তু কিছুই হয় নি। কতো কমিশন এলো আর কতো কমিশন গেল। কতবার যে তদন্ত হলো তার ঠিক নেই। কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা। এখন আমি জানতে পারলাম, অতীতে যে সব তদন্ত হয়েছে তার ফল নিয়ে পরিকল্পনা কমিশন খুব সন্তুষ্ট নন, সেজন্য আর একদল বিদেশী বিশেষজ্ঞ দিয়ে আর একবার তদন্ত করিয়ে নিতে চান। ইতিমধ্যে কী হচ্ছে—না পূর্ব পাকিস্তান সরকার তাদের কপোতাক্ষ পরিকল্পের জন্য গঙ্গা থেকে ৮০০০ কিউসেক জল নিয়ে নিয়েছে এবং শীগ্‌গিরই জল পাম্প করে গঙ্গা থেকে কপোতাক্ষ পর্যন্ত ঐ সংখ্যা বাড়িয়ে ২০,০০০ কিউসেক জল নিয়ে নেবে। তার মানে আমরা পড়ে থাকবো অনেক পিছনে। আমি গুজব শুনেছি যে গঙ্গা ব্যারাজ প্রকল্প নিয়ে আমাদের

চেঁচিয়ে কথা বলা উচিত নয়, তাতে করে পাকিস্তান সরকার বিচলিত হতে পারেন। আমাদের নিজেদের রাজ্য যখন সংকটের মুখে, তখন কি আমরা আর অপেক্ষা করে থাকতে পারি?

এই চিঠির উত্তরেই এসেছিল নেহেরুর ১২ই মার্চের চিঠি, এই পর্যায়ের তৃতীয় পত্র। এতেই তিনি লিখেছিলেন যে গঙ্গা ব্যারাজ হবেই, আর তাতে দেরিও হবে না, পরিকল্পনা কার্যসূচির ভিতরে এই কাজটাকে নিশ্চয় নেওয়া হবে।

দণ্ডকারণ্য

মধ্যপ্রদেশের অরণ্যভূমি দণ্ডকারণ্যে ১৮,০০০ উদ্বাস্তু পরিবারকে পুনর্বাসনের জন্য পাঠানো হয়েছিল একটি কেন্দ্র পরিচালিত পরিকল্প অনুসারে। এই পরিকল্প রূপায়ণে যে অফিসারটি নেতৃত্ব করছিলেন তাঁর নাম ফ্লেচার। কী কেন্দ্র কী রাজ্য উভয় সরকারেরই আশা ছিল এখানে বড়ো আকারে পুনর্বাসন দেওয়া যাবে উদ্বাস্তুদের। কিন্তু এজন্য দণ্ডকারণ্য আদৌ উপযোগী কিনা সে প্রশ্ন দেখা দিতে লাগলো। উদ্বাস্তুদের প্রতিনিধিরা বাংলার মন্ত্রীদের জানালেন যে দণ্ড-কারণ্য উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কাঠামোয় যদি আমূল পরিবর্তন না করা যায়, তাহলে সমস্ত পরিকল্পটাই অকেজো হয়ে যাবে। ওখানে সেচের সুবিধা নেই, উদ্বাস্তুদের প্রায় সবাই ক্যাম্পে বা তাঁবুতে বাস করছে। তখন পর্যন্ত মাত্র একটি বাড়ি তৈরি হয়েছিল। উদ্বাস্তুদের যেখানে রাখা হয়েছে, সেখানে গভীর নলকূপ না থাকায় পানীয় জলের প্রচণ্ড অভাব।

সরজমিনে ব্যাপারটা বোঝা আর উদ্বাস্তুদের কথা শোনবার জন্য মন্ত্রীদের একটি দল নিয়ে দণ্ডকারণ্যে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ডাঃ রায়, ত্রাণমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন, খাদ্যমন্ত্রী তরুণকান্তি ঘোষ, দুজন মহিলা উপমন্ত্রী, বিভাগীয় সচিবরা এবং কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী মেহেরচাঁদ খান্না, এঁরা সবাই মিলে তিন দিনের সফরে বিশেষ বিমান যোগে দণ্ডকারণ্য রওনা হয়ে গেলেন ২৪শে এপ্রিল। দণ্ডকারণ্যে ডাঃ রায় যখন বিমান থেকে নামছিলেন, তখন খান্না তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলেন তাঁকে সাহায্য করতে।

—না, ডাঃ রায় বললেন, আমি তোমার ওপর নির্ভর করতে চাই না, আমি নিজে নিজেই নেমে যাবো।

কথাটা বোধ হয় তিনি বিশেষ অর্থে বলেছিলেন। দণ্ডকারণ্যের উন্নয়নমূলক অগ্রগতি সম্পর্কে খান্নার বক্তব্যের ওপর তিনি নির্ভর করতে চান নি, তিনি চেয়েছিলেন উদ্বাস্তুদের নিজেদের কথা শুনতে। তারা ওখানে কেমন আছে? যদি সেচের সুবিধা করে দেওয়া হয়, পানীয় জল, কৃষিজমি, ঘরবাড়ি তৈরি, যোগাযোগের ব্যবস্থা এসবও করে দেওয়া হয় তাহলে তারা এখানে থেকে যেতে রাজী আছে কিনা। ঐ তিন দিন তিনি উদ্বাস্তুদের সঙ্গে খুব খোলাখুলিভাবে মিশেছিলেন। মেশামেশি করে এবং বাঁধের জায়গা দেখে এসে ডাঃ রায় সন্তোষ লাভ করলেন, বুঝলেন দণ্ডকারণ্য প্রকল্পকে একটা ভালোমতো সুযোগ দিয়ে দেখা যেতে পারে।

কলকাতায় ফিরে তিনি একটি নোট তৈরি করলেন। দণ্ডকারণ্য প্রকল্প যাতে ফলপ্রসূ হয়ে উঠতে পারে, তার জন্য এই নোটে তাঁর অনেক বাস্তবসম্মত প্রস্তাব ছিল। ১৪ই জুন তিনি আড়াই ঘণ্টা বৈঠক করলেন খান্নাকে নিয়ে। বলা বাহুল্য এ বৈঠকে তাঁর মেজাজে প্রসন্নতা ছিল না। কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় পশ্চিমবঙ্গ ও দণ্ডকারণ্যের ক্যাম্পে যারা বাস করছে সেই সব উদ্বাস্তুদের ওপর নোটিশ জারি করে যেভাবে ক্যাম্পগুলি বন্ধ করে দেবার প্রশ্নটির মোকাবিলা করছে তিনি তার কঠোর সমালোচনা করেন। এ বিষয়ে তিনি প্রধান-মন্ত্রীকেও কড়া চিঠি দিয়েছিলেন। তার পরে প্রধানমন্ত্রীরই আমন্ত্রণে পুনর্বাসন-মন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি দিল্লী গেলেন ১৬ই জুন তারিখে। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর যে আলোচনা হলো তার ফলে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে ১৭ই জুন একটি প্রেসনোট বেরুলো. তাতে ছিল দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে পুনর্গঠিত করা হলো, পুরো সময়ের জন্য একজন চেয়ারম্যানও নিযুক্ত হলো। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যসচিব এবং পরে যিনি ভারতের নির্বাচন কমিশনার হয়েছিলেন সেই সুকুমার সেনই হলেন চেয়ারম্যান। এঁর হাতে প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া হলো, যাতে তিনি খুব তাড়াতাড়ি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের কাজটা সেরে ফেলতে পারেন।

১৭ই জুন মুখ্যমন্ত্রী উত্তরপ্রদেশের পাহাড়ী শহর রাণীক্ষেতে গেলেন তিন সপ্তাহের ছুটি কাটাতে। রাণীক্ষেত পছন্দ করার পিছনে তাঁর দুটি কারণ ছিল। রাণীক্ষেতের উপত্যকা দার্জিলিঙের মতো উঁচুনিচু নয়, সমতল। তার মতো বয়স্ক লোকের পক্ষে চলাফেরার সুবিধা। আর তাছাড়া নিজের রাজ্য

থেকে অনেক দূরে, অতিথি অভ্যাগতদের ভীড় হবার সম্ভাবনা খুবই কম। দ্বিতীয় কারণটা হচ্ছে তিনি ১লা জুলাই তাঁর জন্মদিনের প্রকাশ্য অনুষ্ঠান এড়াতে চেয়েছিলেন। তার বদলে তিনি সমস্ত সময়টা পুরোপুরি রাজ্যের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রস্তুতি নিয়ে কাটাতে পারবেন। তাঁর কর্মচারীদের তিনি বলেছিলেন, পরিকল্পনা কমিশন যে খসড়া পরিকল্পনা পাঠিয়েছিল সেটি এবং তার সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র ও ফাইল সঙ্গে করে নিয়ে যেতে। রাণীক্ষেতে তাঁর বাংলোর মধ্যে একটা বিরাট দেওদার গাছের তলায় বসে সকালবেলা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ভাবতেন, আর তা লিখে রাখতেন। আমাদের তখন তাঁকে মুনিঋষির মত মনে হত। তফাৎ এই, মুনিঋষিরা নিজেদের মুক্তির জন্য তপস্যা করেন, আর ইনি তপস্যা করছেন তাঁর আদরের পশ্চিমবঙ্গ ও পশ্চিম-বঙ্গের জনগণের জন্য। সন্ধ্যাবেলা তিনি আমাকে ডেকে কয়েক ঘণ্টা ধরে ডিকটেশন দিতেন পরিকল্পনার কাঠামো সম্পর্কে। তিনি যা করতেন তা একেবারে গোড়া থেকে করতেন। অপরে যা করেছে তাই কিছু অদল বদল করে চালিয়ে দেওয়া তাঁর পছন্দ হতো না। এই ভাবে কিছুটা কাজ যখন এগুলো তখন মহাকরণ থেকে রাজ্য সরকারের দুজন অফিসারকে টেলিগ্রাম করে ডেকে পাঠানো হলো। একজন হচ্ছেন এন কে পাল, আর অন্যজন হচ্ছেন হিমাংশু দাশগুপ্ত। তাঁদের সঙ্গে কিছু কাগজপত্র ও পরিসংখ্যানও আনতে বলা হলো। এঁদের থাকার যাতে অসুবিধা না হয় সেজন্য ওখানকার একটি হোটেলে গিয়ে সব থেকে ভালো কামরা নিজেই দেখে পছন্দ করেছিলেন। এঁরা দুজনে রাণীক্ষেতে পৌছবার পর তিনজনের মধ্যে সপ্তাহব্যাপী বৈঠক বসতে লাগলো সকালে আর বিকালে। তৃতীয় পরিকল্পনার ভিত্তির কাঠামো রাণীক্ষেতেই সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এন কে পাল, যিনি বিশ বছর ধরে রাজ্যের বাজেটে, রাজ্যের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রভৃতি তৈরির ব্যাপারে ছিলেন মূল ব্যক্তি, তিনি এখনো কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন, বাদলার দিনে নিজে ডাঃ রায় তাঁর মাথায় ছাতা ধরে তাঁকে বাস ষ্ট্যাণ্ডে পৌছে দিয়েছিলেন ড্রাইভারের পাশের আরাম-দায়ক আসনটা জোগাড় করে দেবার জন্য।

যাই হোক, তাঁর ৭৯তম জন্মদিন এবার রাণীক্ষেতে পালন করা হলো খুবই সাধারণ ভাবে, অন্যান্য বারের মতো আড়ম্বর না করে। তাঁর অনুরাগী মাত্র চারজন এসেছিলেন রাণীক্ষেতে।

আসামের গোলমাল

জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে প্রফুল্লচন্দ্র সেনের একটি টেলিগ্রাম পাওয়া গেল, তাতে তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে জানাচ্ছেন, আসামের কয়েকটি জেলায় ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ব্যাপক হারে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটতে আরম্ভ করেছে আর তার ফলে বাঙালীরা দলে দলে আসাম থেকে পালিয়ে আসছে। ৮ই জুলাই প্রফুল্ল সেন ডাঃ রায়ের সঙ্গে টেলিফোনেও যোগাযোগ করলেন, বললেন, আসামের পরিস্থিতি খুবই খারাপ, আপনি শীগ্‌গির ফিরে আসুন কলকাতায়।

ওদিকে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘটের হুমকি ছিল ১১ জুলাইয়ের মধ্যরাত্রি থেকে। এর ফলে বিমান চলবে না আকাশপথে, রেলের চাকা বন্ধ থাকলে রাস্তা দিয়ে বাস বা অনুরূপ যানবাহনও চলাচল করবে না। একদিকে এই ব্যাপার, অন্যদিকে প্রফুল্লবাবুর তাগিদ। ডাঃ রায় সিদ্ধান্ত নিলেন সেইদিনই কলকাতা ফিরবেন। আমাদের বললেন জিনিসপত্র তাড়াতাড়ি বাঁধাবাঁধি করে তৈরি হয়ে নাও।

আমরা কাঠগুদামে গিয়ে রাতের ট্রেন ধরলাম প্রবল বৃষ্টি মাথায় করে। ডাঃ রায় আমাকে, তাঁর দেহরক্ষী হেম ভট্টাচার্য আর বেয়ারা কার্তিককে বললেন, তোমরা আমার কামরায় এসে ওঠো।

তাই করেছিলাম আমরা। বাইরে কুমায়ুন পাহাড়ের ঝড় মাতামাতি করছে আর বৃষ্টি পড়ছে মুষলধারে। ট্রেন যে সব জায়গায় থামবার কথা নয় সে সব জায়গায়ও থামতে থামতে চলেছে। পরদিন সকালবেলা জানা গেল আরও নিচের দিকে কোথাও একটা ট্রেনের চাকা লাইনের বাইরে চলে যাওয়ায় এই ট্রেনের আর এখন নড়বার সম্ভাবনা নেই, অন্তত কয়েক ঘণ্টা ত নয়ই।

ডাঃ রায় অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়লেন, দুপুরবেলা লক্ষ্ণৌতে গিয়ে অমৃতসর মেল ধরতে হবেই। তা না হলে রেল ধর্মঘট শুরু হবার আগে গিয়ে কলকাতা পৌঁছনো যাবে না।

তিনি কামরার বাইরে এলেন। সৌভাগ্যই বলতে হবে, সেই ট্রেনেই যাচ্ছিলেন উত্তরপ্রদেশের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ সম্পূর্ণানন্দ। ডাঃ রায় তাঁর সঙ্গে পরিস্থিতি নিয়ে কথাবার্তা বলতে লাগলেন। ইতিমধ্যে হয়েছে কী, এক স্থানীয় চিনি ব্যবসায়ী ডঃ সম্পূর্ণানন্দের জন্য তাঁর গাড়িখানা নিয়ে উপস্থিত। ডঃ সম্পূর্ণানন্দ নিজে গাড়িখানা না নিয়ে আমাদের কামরায় এসে ডাঃ রায়কে নিতে

ডাঃ রায়ের কলকাতা পৌছবার একদিন আগে ৯ই জুলাই তারিখে শিলিগুড়ি, আলিপুরদুয়ার আর জলপাইগুড়িতে আসাম থেকে উদ্বাস্তুরা এসে পৌছনোর পর গোলমাল আরম্ভ হয়ে গেল। প্রতিশোধাত্মক এই হিংসার ঘটনায় মারা পড়লো ছয়টি মানুষ। ১০ই জুলাই সর্বভারতীয় নেতাদের প্রথম দল গিয়ে হাজির হলেন আসামে। সরজমিনে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করবার জন্য বিমানে আসাম গেলেন কংগ্রেস সভাপতি সঞ্জীব রেড্‌ডি আর প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ভি কে কৃষ্ণ মেনন। এই দুজন নেতা পরিস্থিতি চট করে বুঝে নিয়ে একটি তদন্ত কমিশন নিয়োগ করার সুপারিশ করলেন।

ওদিকে পশ্চিমবঙ্গে বিরোধী পক্ষ কলকাতায় হরতাল ডেকে বসলেন ১৬ই জুলাই তারিখে। শহরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লো, অবাঙালীদের ওপর নাকি হামলা হবে। ১৪ই ও ১৫ই জুলাই অবাঙালী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের হোমরা চোমরারা এসে দেখা করলেন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে, তাঁদের ধনপ্রাণ বাঁচাতেই হবে। হরতালের ঠিক আগে মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতির মাধ্যমে গুণ্ডা আর সমাজবিরোধীদের কঠোরভাবে সাবধান করে দিলেন। পুলিশ কর্তাদের বলা হলো, তাঁরা যেন কঠোর হস্তে হিংসাত্মক ঘটনা দমন করেন। হরতালের দিন মুখ্যমন্ত্রী অফিসে এলেন সকাল আটটায়। এসেই পুলিশ কমিশনার ও আই জির সঙ্গে কথা বলে জানলেন অবাঙালীদের এলাকায় কেমন পাহারা মোতায়েন করা হয়েছে। আমি নিজে যখন রাস্তা দিয়ে তাঁর গাড়ির পিছনে পিছনে আর একখানা গাড়ি করে আসছিলাম, তখন দেখেছিলাম গাড়ি করে সৈন্যদল রাস্তায় টহল দিচ্ছে, আর মোক্ষম যায়গাগুলিতে লৌহ শিরস্ত্রাণ মাথায় দিয়ে পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে, হাতে বন্দুক আর লাঠি। ব্যবস্থা দেখে এবং শুনে মুখ্যমন্ত্রী খুশি হলেন। শহরে এবং শহরতলীতে সবই শান্ত রয়েছে। অবাক হয়ে দেখলাম মুখ্যমন্ত্রী তাঁর অশ্বক্ষুরাকৃতি টেবিলে তাস বিছিয়ে পেসেন্স খেলছেন। নটার পরে প্রথম টেলিফোন এলো, টেলিফোন করেছিলেন বিড়লা-বাড়ির একজন, এল এন বিড়লা। তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানালেন তাঁর সরকার যে সুন্দর ব্যবস্থা নিয়েছে তার জন্য। এরপরে এক এক করে বহু টেলিফোন আসতে লাগলো ব্যবসায়ী মহল থেকে আর রাজনৈতিক নেতাদের কাছ থেকে। তাঁরা সবাই ধন্যবাদ জনাচ্ছেন উপযুক্ত ব্যবস্থা তিনি নিয়েছেন বলে। এক বন্ধুকে একসময় তিনি কৌতুক করে বললেন টেলিফোনে, এখন আমি কী করছি

ভাবতে পারো? পেসেন্স খেলছি। টেবিলে ফাইলও নেই চিঠিও নেই সব ফাঁকা, তাই তাস বিছিয়ে খেলে নিলাম কয়েক গেম পেসেন্স, বুঝলে?

সারা দিনটা কেটে গেল, কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলো না, অবাঙালীরাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো।

হরতালের দিন একটিমাত্র লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তিনি হচ্ছেন মার্চেন্টস চেম্বার-এর সভাপতি সওয়ালরাম গোয়েঙ্কা। বাঙালীদের বিরুদ্ধে তিনি মারোয়াড়ী সম্প্রদায়কে ক্ষ্যাপাচ্ছিলেন এবং বিভিন্ন কর্তৃপক্ষদের কাছে মিথ্যে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে অবাঙালীদের ওপর সাম্প্রদায়িক হামলার গুজব ছড়াচ্ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী তিন দিনের সফরে গিয়ে আসাম পৌছলেন ১৭ই জুলাই, গৌহাটি ও শিলংয়ে দুটি জনসভায় ভাষণ দিলেন। এই ভাষণে যে এলাকায় ঘরবাড়ি ধ্বংস করা হয়েছে সেখানে পিটুনী ট্যাক্স বসানো হবে বলে ইঙ্গিত দিতেও তিনি ছাড়েন নি। ১৯শে জুলাই তিনি জোড়হাটের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার ওপর দিয়ে বিমানে উড়ে গেলেন, শিবসাগরে জনসভায় ভাষণ দিলেন। ২০শে জুলাই রাজধানীতে ফিরে বিবৃতি দিলেন যে, আসাম এখন পুরোপুরি শান্ত, উদ্বাস্তুরা ফিরে যেতে পারে।

২৭শে জুলাই মুখ্যমন্ত্রী দিল্লী পৌছলেন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে যোগ দিতে। এই সুযোগে আসাম পরিস্থিতি নিয়ে নেহেরুর সঙ্গে দীর্ঘ সময়ের জন্য কথাবার্তা বলেছিলেন তিনি, আসাম তাঁর মন জুড়ে থাকলেও তিনি তাঁর প্রিয় দুটি প্রকল্প, ব্যাণ্ডেলের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র আর দুর্গাপুরের সার কারখানা, এ নিয়েও কথা বলতে ছাড়েন নি। এ দুটির স্থাপনা করবার অনুমোদন তিনি প্ল্যানিং কমিশনের কাছ থেকে আদায় করে নিয়েছিলেন।

ন'জন সংসদ সদস্য নিয়ে একটি সংসদীয় দল অজিতপ্রসাদ জৈনের নেতৃত্বে আসাম যাবার জন্য রওনা হয়ে গেল ২৮শে জুলাই। এঁরা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ঘুরে বিভিন্ন লোকের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করে তাঁদের প্রতিবেদন পেশ করলেন ৩০শে আগস্ট। ওদিকে পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে এই প্রথম স্বাধীনতা দিবস (১৫ই আগস্ট) পালিত হলো শোক প্রকাশ ও প্রতিবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে। কালো পতাকা উড়তে লাগলো, বিকেলবেলা নীরব মিছিল চলতে লাগলো পথে। ঐদিন মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীকে লিখলেন, আসামের পরিস্থিতির উন্নতি হয় নি।

১লা সেপ্টেম্বর থেকে আসাম পরিস্থিতি নিয়ে লোকসভায় বিতর্ক শুরু হয়ে গেল। প্রধানমন্ত্রী বিতর্কের উদ্বোধন করে বললেন, আসামে যে গোলমাল হয়েছে তা ভয়ানক। একে বড়ো আকারে নতুন ধরনের ব্যাপার বলে ব্যাখ্যা করতে পারি, যা আমাদের দেশের ভিত্তিভূমি আর ঐক্যের মূলে গিয়ে নাড়া দিয়েছে।

কথা উঠেছিল বিচার বিভাগীয় তদন্ত করার বিষয় নিয়ে। কিন্তু সর্বাত্মক ও ব্যাপক বিচার-বিভাগীয় তদন্তের পক্ষপাতী ছিলেন না নেহেরু। তার বদলে তিনি স্থানীয় তদন্ত হোক বলে মত প্রকাশ করলেন। পাঁচটি কি ছটি এলাকায় বিচার বিভাগীয় বা প্রশাসনিক তদন্ত হোক বলে মত প্রকাশ করলেন। পাঁচটি কি ছটি এলাকায় বিচার বিভাগীয় বা প্রশাসনিক তদন্ত হোক স্থানীয়ভাবে, এই ছিল তাঁর মত, যাতে করে দুষ্কৃতকারীদের ধরা যায়। কিন্তু সে যাই হোক পশ্চিমবঙ্গের সংসদ সদস্যদের কাছে প্রধানমন্ত্রীর ৯০ মিনিটের বক্তৃতা হতাশাব্যঞ্জক মনে হলো। তাঁর ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বারবার বাধা পেয়েছেন। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগ আসামে কেন কার্যকরী হলো না তার সন্তোষ-জনক জবাব তিনি দিতে পারেন নি। জবাব দিতে পারেন নি এই কথারও—চল্লিশ বছরের ছাত্রনেতা (পাঁচ ছেলের বাপ) দুলাল বড়ুয়া রাজ্য সরকারের ভূতপুর্ব কর্মচারী, গ্রাজুয়েট না হয়েও সরকারী স্নাতক জলপানি যে পাচ্ছে সে কেমন করে বহ্নিমান আসামের পরিস্থিতিতে ঐরকম প্রধান ভূমিকা নেয়?

যাইহোক তিন দিনের বিতর্কের শেষে অতুল্য ঘোষ উত্থাপিত একটি সংশোধিত প্রস্তাব লোকসভায় সরকার পক্ষ গ্রহণ করেন। প্রধানমন্ত্রীও তা মেনে নেন। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার, আসাম-বিতর্কে অতুল্যবাবু সংসদে অন্যতম বক্তারূপে শ্রেষ্ঠতা অর্জন করেছিলেন। প্রস্তাবে তদন্তের কথাই ছিল। একজন বা একাধিক সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়ে ব্যাপক তদন্ত করা হবে আসামের গোলমাল নিয়ে। এঁরা নাগরিকদের অধিকার রক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থা কী হতে পারে তাও বলবেন। ভবিষ্যতে এ ধরণের ঘটনা যাতে না ঘটে, সে সম্পর্কে কী কী করা দরকার সে পরামর্শও দেবেন এই তদন্ত কমিটি।

১লা সেপ্টেম্বর ১৪৪ ধারা অমান্য করার জন্য সংসদ ভবনের কাছে দিল্লীতে বাংলার চারজন বিধানসভার সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়। এঁদের মধ্যে ফরোয়ার্ড ব্লকের অপুর্বলাল মজুমদারও ছিলেন, যিনি পরে পশ্চিমবঙ্গে বিধান-সভার অধ্যক্ষ হয়েছিলেন।

সংসদে বিতর্ক যখন চলছিল, তখন পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায়ও প্রস্তাব নেওয়া হয় বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করে। তদন্ত যিনি করবেন তিনি হবেন সুপ্রিম কোর্টের ভূতপূর্ব অথবা বর্তমান কোনো বিচারপতি। তিনি দোষীদের ধরে শাস্তিও দিতে পারবেন।

এই সময় তিনজন সর্বভারতীয় নেতা জে. বি. কৃপালনী, হৃদয়নাথ কুঞ্জরু এবং ভূপেশ গুপ্ত প্রকাশ্যে ডাঃ রায়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন আসামের গোলমাল চলার সময়ে তিনি যেভাবে সংকটময় পরিস্থিতির মোকাবিলা করেছিলেন সেজন্য। ১৫ই সেপ্টেম্বর আসামের মুখ্যমন্ত্রী বিমলপ্রসাদ চলিহা দমদম বিমান বন্দরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বললেন, ডাঃ রায়কে জাতীয় নেতা হিসাবে গণ্য করা উচিত। পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নে যেমন তিনি আগ্রহশীল, ঠিক তেমনি আগ্রহশীল আসামের উন্নয়নের জন্য।

আসামে ভাষা আন্দোলনের ফলে শুধু যে বাঙালীরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তা নয়। রাজ্যের ভাষার প্রশ্নে সরকার যে ব্যবস্থা নিয়েছিলেন তার বিরুদ্ধে আসাম মন্ত্রিসভার পাঁচজন সভ্য যাঁরা পার্বত্য এলাকা থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন তাঁরা একযোগে পদত্যাগ করে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন। আর শুধু তাই নয়, তাঁরা পার্বত্য এলাকাগুলিকে আসাম থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেবার দাবি জানালেন। গারো, খাসি এবং জয়ন্তীর পার্বত্য জেলাগুলি স্বতন্ত্র রাজ্যের দাবি করলো; মিজো চাইলো আলাদা প্রশাসন, শুধু মিকির ও উত্তর কাছাড়ের পার্বত্য এলাকাই আলাদা প্রশাসন চায় নি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী গোবিন্দবল্লভ পন্থ তিনদিন শিলং সফর করলেন। আসামের জন্য আসামী ও হিন্দী উভয় ভাষাই রাজ্যের সরকারী ভাষা হোক বলে পরামর্শ দিয়ে ভাষার প্রশ্নে একটা সমঝোতা আনবার চেষ্টা করলেন তিনি।

আসামের মুখ্যমন্ত্রীর মতে ৮ই অক্টোবর পর্যন্ত ৪৩৮২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ৪০জন প্রাণ হারিয়েছে, আর ৫২,০০০ লোক গোলমালের জন্য প্রত্যক্ষে অথবা অপ্রত্যক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তিনি এও স্বীকার করলেন যে পুলিশী ব্যবস্থা পর্যাপ্ত ছিল না। ১০ই অক্টোবর যখন বিতর্কিত আসামের সরকারী ভাষা সংক্রান্ত বিল বিধানসভায় উত্থাপিত হলো, তখন পার্বত্য এলাকার কার্যকরী পর্ষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আদিবাসী কল্যাণ মন্ত্রী ডাবলিউ এ সাংমা এবং দু'জন সংসদীয় সচিব পদত্যাগ করলেন। ঐ বিলে ঘোষিত হলো যে

সরকারী ভাষা হলো আসামী এবং ইংরেজী (যতদিন না এর বদলে হিন্দী হয়)। কাছাড় জেলায় বাংলার ব্যবহার চলতে পারবে, ইত্যাদি। কাছাড় কংগ্রেসের এম এল এরা, মন্ত্রী স্যাংমা এবং আরও আটজন পার্বত্য এলাকার সদস্য এই বিলের প্রশ্নে বিধানসভা থেকে বেরিয়ে এলেন। এই বঙাল খেদা প্রশ্নে কীভাবে বাঙালীরা নিরাশ্রয় হয়ে আসাম থেকে চলে এসেছিল তার বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে ডাঃ রায় নেহেরুকে আরো দু'খানি চিঠি লিখেছিলেন। তার সবটুকু তোলার দরকার নাই। তথ্য হিসাবে এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে ২৫ হাজার নিরাশ্রয় নরনারী এসে ভীড় করেছিল বাংলার ৩টা জেলায়—জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং এবং কোচবিহারে—বাংলার পক্ষে এ কম চাপ নয়। এতগুলো লোককে যায়গা দেওয়া একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাঁর দ্বিতীয় চিঠিতে দেখা যায় সর্ব সাকুল্যে আসাম থেকে পালিয়ে আসা লোকের সংখ্যা হয়েছিল প্রায় ৪৫ হাজার। এই চিঠিতে বিধানসভায় গৃহীত বিচার বিভাগীয় তদন্তের প্রস্তাবের প্রসঙ্গও ছিল।

কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের সর্বাত্মক ধর্মঘট

কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের সারা দেশব্যাপী ধর্মঘটের প্রথম দিন ১২ই জুলাই কেটে যায় কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে। একে প্রায় সর্বাত্মক ধর্মঘট বলা চলে—সরকারী কাজকর্ম অচল, যানবাহন-ব্যবস্থা বানচাল। রেলের চাকা, পোষ্ট আপিসের কাজকর্ম সব বন্ধ। কলকাতায় কেন্দ্রীয় সরকারের অফিসগুলি ফাঁকা, শুধু টেলিফোন আর বিমান চলাচল কিছু বজায় রাখা হয়েছিল। আমরা দিল্লী ও শিলংয়ের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর টেলিফোন যোগাযোগ করে দিতে পারছিলাম, আসাম পরিস্থিতি নিয়ে তিনি যখন কথাবার্তা বলতে চাইছিলেন। ধর্মঘটী সরকারী কর্মচারীরা একটি সংযুক্ত সংগ্রাম পর্ষদ গঠন করেছিলেন, তার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের ইউনিয়নগুলিও যুক্ত ছিল। এদের পরিচালনা করছিলেন প্রজা সোস্যালিষ্ট দলের চেয়ারম্যান অশোক মেহতা। ধর্মঘটীরা সরকারের নতি স্বীকার দেখবেন বলে আশা করছিলেন, কিন্তু তাঁরা নিজেরাই ধর্মঘট পাঁচদিনের বেশি অব্যাহত রাখতে পারলেন না। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে অশোক মেহতার সারাদিনের প্রলম্বিত এবং ঘনঘন আলোচনার পর (একজন ব্যতীত অধিকাংশ নেতাদেরই গ্রেপ্তার করা হয়েছিল) ১৬ই জুলাই পাঁচদিনের ধর্মঘটের

অবসান হলো। প্রজা সোস্যালিষ্ট দল প্রভাবিত ধর্মঘট ভেঙে পড়লো, বহু সরকারী কর্মচারী পড়লেন বিপাকে। কলকাতাতেই প্রায় ৬৫ হাজার অস্থায়ী কর্মচারীদের ওপর কর্মচ্যুতির নোটিশ ঝুললো, স্থায়ীদের ওপর সাসপেণ্ড করার নোটিশ। ধর্মঘট অবসানের দিন বিকেলবেলা মুখ্যমন্ত্রী এলেন মহাকরণে। এসে প্রথমেই তিনি টেলিফোন করলেন দিল্লীতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী পন্থকে। তিনি যেন সরকারী কর্মচারীদের ওপর প্রতিশোধাত্মক ব্যবস্থা না নেন, এই-ই ছিল তাঁর একান্ত অনুরোধ। ধর্মঘটীদের মধ্যে কারা পুনর্বহাল হবেন সেটা খুঁটিয়ে দেখার জন্য যখন ষ্টেট রিভিউইং বোর্ড গঠিত হলো, তখন মুখ্যসচিব এস এন রায়কে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন, যতদূর সম্ভব উদারনীতি যেন নেওয়া হয়। যার ফলে সাসপেণ্ড হওয়া, বরখাস্ত হওয়া এবং গ্রেপ্তার হওয়া বহু কর্মচারী আবার তাঁদের চাকরি ফিরে পেলেন। হাজার হাজার পরিবার এভাবে বেঁচে গিয়েছিল।

রাজ্যের তৃতীয় পরিকল্পনা

অক্টোবরে বিমানযোগে দিল্লী গেলেন মুখ্যমন্ত্রী, যোজনা ভবনে পরিকল্পনা কমিশনের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠকে বসলেন। পশ্চিমবঙ্গের তৃতীয় পরিকল্পনায় রাজ্য থেকে যা ধরা হয়েছিল তা যাতে কাটা না হয়, সে বিষয়ে কমিশনকে রাজী করালেন ডাঃ রায়। তাঁরা রাজী হলেন ডাঃ রায়ের এই আশ্বাসে যে, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য স্তরে যে ১৬০ কোটি এবং ৯০ কোটি টাকা যথাক্রমে আসবে, তার সঙ্গে মোট টাকার যে ঘাটতি হচ্ছে (৯১ কোটি টাকা) সেটা পশ্চিমবঙ্গই পুরণ করে দেবে। পরিকল্পনার মোট বরাদ্দ ধরা হয়েছিল ৩৪১ কোটি টাকা। কলকাতায় ফিরে এসে বিষয়টি বিস্তারিতভাবে জানিয়ে তিনি নেহেরুকে চিঠি দিয়েছিলেন, তারপর দিয়েছিলেন পরিকল্পনা মন্ত্রী গুলজারিলাল নন্দাকে। শেষোক্ত জনকে যে চিঠি দিয়েছিলেন তাতে দেখা যায় আগের হিসাবের সঙ্গে একটু গরমিল হয়েছে। রাজ্যস্তরে যে টাকা উঠবে সেটা ৯০ কোটি নয়, হবে ৯৩ কোটি। তাহলে ডাঃ রায়ের প্রতিশ্রুত ঘাটতি পূরণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৮৮ কোটি, ৯১ কোটি নয়। দুটি চিঠিতেই তিনি তাঁর বরাদ্দের যৌক্তিকতা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। বাহুল্য বোধে চিঠি দুটি এখানে আর দেওয়া হলো না।

ভারতের রূঢ়

অসানসোলে রাজ্য শিল্পমেলার উদ্বোধন করবার জন্য ২৩শে অক্টোবর নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। মেলা প্রাঙ্গণের সামনে বিশেষভাবে তৈরি চল্লিশ ফিটের এক ফোয়ারা, বোতাম টিপে চালু করে মেলায় উদ্বোধন করলেন তিনি। এই প্রসঙ্গে কয়লাভিত্তিক শিল্পের সম্প্রসারণ নিয়ে অতি সুন্দর কথা বললেন মুখ্যমন্ত্রী। বললেন, পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে কয়লাভিত্তিক শিল্পগুলির ব্যাপক উন্নয়নের ওপর। আর কয়লা রয়েছে প্রচুর এই আসানসোল অঞ্চলে। ধাতব সম্পদের প্রাচুর্যের জন্য এ অঞ্চলকে ভারতের রূঢ় বলা হয়ে থাকে। দেশের কল্যাণের জন্য এখানকার যে সব সম্পদ এখনো আহরিত হয় নি, তা পুরোপুরি কাজে লাগাতে হবে।

কলকাতার জন্য ফোর্ড ফাউণ্ডেশন মাস্টার প্ল্যান

৭ই নভেম্বর মুখ্যমন্ত্রী তাঁর অফিসে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে বসেছিলেন ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের ভারতস্থ অধিকর্তা ডঃ ডগলাস এন্‌সিম্মার ও তাঁর সহযোগীদের সঙ্গে। কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অশোক সেনও উপস্থিত ছিলেন। বিষয়বস্তু ছিল সামগ্রিক কলকাতার জন্য একটি মাস্টার প্ল্যান। ডায়মণ্ড হারবার থেকে বালী উত্তরপাড়া পর্যন্ত সবটুকু শিল্প এলাকা নিয়ে গঠিত হবে বৃহত্তর কলকাতা। এই প্রকল্পের মধ্যে ছিল বস্তী অপসারণ, নতুন নতুন রাস্তা খুলে দেওয়া, শহরটাকে সৌন্দর্যের আকর করে তোলা, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যাবতীয় সুখসুবিধাও থাকবে এতে। ডাঃ রায় যখন দিল্লী যেতেন তখন এন্‌সিম্মার নিয়মিত আসতেন তাঁর কাছে। কলকাতা নিয়ে দুজনে আলোচনায় বিভোর হয়ে থাকতেন, বর্তমান লেখক তা বহুবার দেখেছে নিজের চোখে। বিদেশী মূলধন বা বিদেশী কারিগরির ব্যাপারে ডাঃ রায়ের কোনো খুঁৎখুঁতানি ছিল না। তা সে সমাজ-তান্ত্রিক দেশ থেকেই আসুক আর ধনতান্ত্রিক দেশ থেকেই আসুক, শুধু ওর সঙ্গে কোনো বিশেষ চাপ বা সর্ত না থাকলেই হলো। কলকাতার উন্নয়ন বিশেষ করে বস্তী অপসারণের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীকে আগ্রহান্বিত করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি। ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের কাজ ছিল প্রকল্পের রূপায়ণ করা নয়, কারিগরি ব্যাপারের বন্দোবস্ত এবং ফাউণ্ডেশন সূত্র থেকে অর্থ সংগ্রহ করা। ৬ই ডিসেম্বর মুখ্যমন্ত্রী ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের লোকদের সঙ্গে তাঁর যে যোগাযোগ চলছে

এ বিষয়ে লিখে জানান প্রধানমন্ত্রীকে। বাহুল্যবোধে সে চিঠির বয়ান দেওয়া হলো না।

নেতাজীর কন্যা

প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছিলেন সুভাষচন্দ্র বসুর কন্যা কুমারী অনিতা বসুর আসন্ন ভারত সফর সংক্রান্ত বিষয়ে। ১৮ই নভেম্বর ডাঃ রায় ব্যক্তিগত চিঠি লিখলেন প্রধানমন্ত্রীকে। সে চিঠি হলো এই :—

প্রিয় জওহরলাল,

অনিতা বসু সংক্রান্ত তোমার চিঠিখানা। আমি জানি না নেতাজী বসুর ভাইঝি ললিতা কোথায় রয়েছে। আমি স্বর্গত শরৎ বসুর ছেলে অমিয় বসুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম ললিতার খোঁজখবর সে দিতে পারে কি না। সে আমাকে বললো, ললিতা কলকাতায় নেই, সে কোথায় আছে জানে না। তবে অমিয় বসুও আমাকে বললো অনিতা ললিতাকে লিখেছে, সে যেন অনিতাকে আনতে ভিয়েনা না যায়, তার ভারত সফর নিয়ে কোনো হৈ চৈ করতেও সে মানা করে দিয়েছে। আমি জানি না অনিতার এই ইচ্ছা ঐ পরিবার থেকে কতটা মেনে নেওয়া হবে। গোলমালটা হচ্ছে এই যে, প্রচারের জন্য ঐ পরিবারই একমাত্র দায়ী নয়, প্রচার করবে দলীয় লোকেরা, ফরোয়ার্ড ব্লকের লোকেরা।

তোমার স্নেহভাজন

বিধান

৯ই ডিসেম্বর দিল্লী থেকে প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে আরও একখানা চিঠি লিখেছিলেন :

প্রিয় বিধান,

তুমি জানো অনিতা ভিয়েনা থেকে সরাসরি কলকাতা আসছে ১১ই ডিসেম্বর। সে দিল্লী আসতে চাইছে ১৭ই ডিসেম্বর। আসুক সে। সুস্বাগতম্। আমি তাকে একটা চিঠি লিখেছি। সে কলকাতা এলে তার হাতে চিঠিখানা তুমি দয়া করে দেবে কী? চিঠিখানা এইসঙ্গে পাঠালাম।

তোমার স্নেহভাজন

জওহর

বিধানসভায় রাজ্যের তৃতীয় পরিকল্পনা পেশ

২৫শে নভেম্বর রাজ্যের তৃতীয় পরিকল্পনা পেশ করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের সর্বাত্মক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি চিত্তাকর্ষক চিত্র তুলে ধরেন। তিনি বলেন ১৯৪৭এ শূন্য তহবিল নিয়ে শুরু করে ১৯৬০-৬১তে প্রারম্ভিক তহবিল দাঁড়িয়েছে ৮ কোটি টাকা। ১৩ বছরে এই রাজ্য ব্যয় করেছে ৪৯৪ কোটি টাকা (ডি ভি সিতে যা ব্যয় হয়েছে সেটা এইসঙ্গে না ধরে)। এর ওপরে তৃতীয় পরিকল্পনায় ৩৪১ কোটি ব্যয় করার প্রস্তাব হয়েছে। তার মানে এই রাজ্য উন্নয়ন প্রকল্পে ব্যয় করছে প্রায় ৮৩৫ কোটি টাকা। প্ল্যানিং কমিশন তৃতীয় পরিকল্পনার ব্যয় বরাদ্দ ৩৪১ কোটি কেটে ২৫০ কোটি করেছে। কিন্তু আমরা তা করবো না। আমাদের আয়ে যদি কম পড়ে, আমরা যদি টাকা যোগাড় করতে না পারি, তাহলে আমাদের দরকার মতো আমরাই কাট ছাঁট করে নেবো। রাজ্যের উন্নয়নে এ হচ্ছে সর্বাত্মক পরিকল্পনা। আমাদের মনে রাখতে হবে তিনটি প্রয়োজনীয় এলাকা আছে যেখানে আমরা উন্নয়ন প্রকল্প রূপায়িত করছি। প্রথম হচ্ছে কলকাতা ও কলকাতার আশেপাশে জলনিকাশী ও পয়ঃপ্রণালীর সুষ্ঠু ব্যবস্থা ও উপনগরী গঠন। দ্বিতীয় হচ্ছে ফারাক্কা ব্যারেজ, আর তৃতীয় হচ্ছে সুন্দরবন এলাকার সমস্যাগুলির স্থায়ী সমাধান। আমার মনে হয় ৩৪১ কোটি টাকাও পর্যাপ্ত নয়, কিন্তু তা বলে আমাদের হাঁও খুব বড়ো করা উচিত নয়।

নেতাজীর চিতাভস্ম

লোকসভার ২রা ডিসেম্বরের কার্যসূচিতে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের চিতাভস্ম টোকিও থেকে আনার ব্যাপারে একটি প্রস্তাব ছিল। এ বিষয়ে ঐ দিনই প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীকে একটি চিঠি লিখলেন :

প্রিয় বিধান,

লোকসভার আজকের কার্যসূচিতে একটি প্রস্তাব ছিল, যাতে সরকারকে বলা হয়েছিল টোকিও থেকে সুভাষ বসুর চিতাভস্ম নিয়ে আসার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হোক এবং দিল্লীর লালকেল্লার সামনে তাঁর স্মৃতিতে একটি সৌধও নির্মাণ করা হোক। এই প্রস্তাব-প্রসঙ্গ পর্যন্ত আমরা আজ যেতে

পারি নি। এবারকার অধিবেশনেই পরে কোনো সময় প্রস্তাবটা উঠতে পারে।

এই প্রশ্নে অতীতে আমাদের মনোভাব ছিল এই যে, আমরা খুশি মনে সাহায্য করবো, কিন্তু এর তাগিদটা আসা দরকার সুভাষ বসুর পরিবার থেকে। তাঁরা যদি চিতাভস্ম এখানে আনতে চান, আমরা তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করবো।

স্মৃতিসৌধের ব্যাপারে আমার মনে হয় না দিল্লীর লালকেল্লার সামনে অমন একটা জিনিস করা যাবে। প্রকৃতপক্ষে ঐ জায়গাটা আমরা সংরক্ষিত রেখেছি একটা বিরাট স্মৃতিসৌধ করার জন্য। সে স্মৃতিসৌধ হবে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের যারা শহীদ তাদের সবার স্মৃতিতে। আর রায়চৌধুরী সেটা তৈরিও করছে। আমার মনে হয় চিতাভস্ম যদি এখানে আনা হয় তাহলে তা কলকাতাতেই রাখা উচিত।

এ বিষয়ে তোমার উপদেশ চাই, কী মনোভঙ্গি আমার গ্রহণ করা উচিত।

তোমার স্নেহভাজন
জওহর

মুখ্যমন্ত্রী নেতাজীর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। এবিষয়ে নিম্নলিখিত দুখানি চিঠি তিনি লিখেছিলেন প্রধানমন্ত্রীকে :

কলকাতা
৪।৫ ডিসেম্বর ১৯৬০

প্রিয় জওহর,

তোমার চিঠি। সুভাষ বসুর ব্যাপারে কী ব্যবস্থা করা যায় সে সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে চেষ্টা করবো। আমি জানিনা এই ব্যাপারে ঐ পরিবারের লোকজনদের বর্তমান মনোভঙ্গি কী। তুমি জানো সুভাষ বসুর দাদা সুরেশ বসুর ধারণা যে, সুভাষ জীবিত আছে।

আমি খোঁজখবর নিয়ে তোমায় জানাচ্ছি।

তোমার স্নেহভাজন
বিধান

কলকাতা
২০শে জানুয়ারি ১৯৬১

প্রিয় জওহরলাল,

সুভাষের চিতাভস্ম সংক্রান্ত তোমার ১৯৬০-এর ২রা ডিসেম্বরের চিঠি এবং তোমার ব্যক্তিগত সচিবের ১১ই জানুয়ারি ১৯৬১-র চিঠি।

আমি ঐ পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছিলাম, কিন্তু এ বিষয়ে তাদের কোন নির্দিষ্ট ধারণা নেই।

তোমার স্নেহভাজন
বিধান

বেরুবাড়ি

নেহেরু-নুন চুক্তি অনুসারে বেরুবাড়ি দিয়ে দেওয়ার যে কথা হয়েছিল তার বিরোধিতা করে সর্বসম্মত কণ্ঠস্বর গর্জে উঠলো বিধানসভায় ২৯শে নভেম্বর তারিখে। তাঁদের সম্মিলিত দাবি, বেরুবাড়ি ভারতেই থাকবে। বিশেষ প্রস্তাব হিসাবে উত্থাপন করে ডাঃ রায় বললেন, ভারতের জনগণকে একথা বলবার আমাদের সার্বিক অধিকার আছে যে বেরুবাড়ি ইউনিয়নকে আমরা বাইরে যেতে দেবো না, এর কারণ শুধু ভাবাবেগ নয়, এর কারণ বেরুবাড়ি দেশের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে।

ঐদিন বেরুবাড়ি বিলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোচবিহার ছিটমহল সংক্রান্ত বিষয়-গুলি থাকায় তা বিধানসভায় মুলতুবী হয়ে যায়, কারণ নির্দল সদস্য সিদ্ধার্থশংকর রায় একটি বৈধতার প্রশ্ন তুলেছিলেন। যে আকারে এটি রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো হয়েছে সে ভাবে পাঠানোর অধিকার রাজ্য বিধানসভার আছে কি? এই তাঁর প্রশ্ন এবং চ্যালেঞ্জও বটে।

পাকিস্তানের ছিটমহলগুলির সঙ্গে কোচবিহার ছিটমহলগুলির বিনিময় করলে এই রাজ্য হারাবে প্রায় ৮ বর্গমাইল। পাকিস্তানে ভারতের ছিটমহলের সংখ্যা ১১৯, মোট আয়তন ২৬ বর্গমাইল, আর সে জায়গায় ভারতে পাকিস্তানের ছিটমহলের সংখ্যা ৭৪, আয়তন ১৮ বর্গ মাইল।

৩০শে নভেম্বর বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী একটি প্রস্তাব উত্থাপন করলেন এই মর্মে যে, বিলটি হচ্ছে সুপ্রিম কোর্টের মতামতের পরিষ্কার বিরুদ্ধাচরণ।

যেদিন পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় বেরুবাড়ি নিয়ে বিতর্ক হলো, সেইদিনই লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী বললেন যে পাকিস্তানী প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথাবার্তার সময় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আধিকারিকরা দিল্লীতে উপস্থিত ছিলেন এবং বহির্বিষয়ক মন্ত্রী রাজ্য সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁদের সঙ্গে পরামর্শও করেছিলেন। এই হস্তান্তরে বাংলার প্রতিনিধিদের যে সম্মতি আছে সেটা তাঁকে (প্রধানমন্ত্রীকে) জানিয়েছিলেন কমনওয়েলথ সেক্রেটারি।

পরদিন এই বিবৃতি নিয়ে বিরোধী পক্ষ হৈ চৈ লাগিয়ে দিলেন। বেরুবাড়ি হস্তান্তর নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী যে কথা বলেছিলেন, প্রধানমন্ত্রী যে বলছেন তার উলটো কথা, ব্যাপার কী? বিধানসভায় দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে বললেন, বেরুবাড়ি ব্যবচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সম্পূর্ণ প্রধানমন্ত্রীর স্তরে, রাজস্ব আধিকারিকদের পরামর্শে নয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরামর্শে ত নয়ই।

এও এক অত্যন্ত বিরল উদাহরণ, যেখানে দুই নেতা প্রকাশ্যে পরস্পরের বিপরীত মত প্রকাশ করলেন।

১০ই ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীকে একটি চিঠিতে জানালেন যে বেরুবাড়ি বিষয়ে কোনো পরিবর্তন আয়ুব খানের একেবারেই মনঃপুত নয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে লেখা তাঁর চিঠির স্বর ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও আপত্তিজনক। আর সেজন্য ঐ বিলটি নিয়ে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া তাঁর আর কোন গত্যন্তর নেই।

অতএব উক্ত বিল যার মধ্যে বেরুবাড়ি ব্যবচ্ছেদ ছিল অন্যতম, তা কোনো রকম অদলবদল না করেই শেষ পর্যন্ত পাস হয়ে গেল লোকসভায় এবং ২২শে ডিসেম্বর রাজ্য সভায়। এই অধিবেশনে আইনমন্ত্রী অশোক সেন এবং বাংলার কংগ্রেসী সংসদ সদস্যরা কেউ উপস্থিত ছিলেন না।

(১৮)

(১৯৬১)

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে ১৯৬১ এবং ১৯৬২ এই দুটি বছর হচ্ছে ডাঃ বিধান রায়ের জীবনের সব থেকে গৌরবময় অধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গের শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির দ্যোতক। রাজনীতিবিদ-চিকিৎসকের গণ্ডী ছাড়িয়ে তিনি কিংবদন্তীর পুরুষ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। রাজ্যের যেখানেই তিনি যেতেন সেখানেই হাজার হাজার লোক আসতো তাঁকে অভিনন্দন জানাতে। বিপুল জনতা তিনি আকর্ষণ করতেন, যেটা পারতেন একমাত্র নেহেরু। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁর বড়ো কয়েকটি পরিকল্প বাস্তবে রূপ নিয়েছিল, তৃতীয় পরিকল্পনার অধীন আরও বিরাট বিরাট পরিকল্প রূপায়ণের পথে অগ্রসর হচ্ছিল। বহু প্রকল্প প্রস্তুতি পর্ব ছাড়িয়ে এখন এসে দাঁড়িয়েছে উৎপাদন পর্বে। গগনচুম্বী চিমনীগুলো দুর্গাপুরের আকাশে ধূমোদ্গীরণ করছে, যেন নতুন আশার সঞ্চার করছে মানুষের মনে। চাল-উৎপাদন সমস্ত রেকর্ড ভঙ্গ করে ৫.৩ মিলিয়ন টনে এসে দাঁড়িয়েছে। ডাঃ রায়ের বয়স তখন ৮০র কাছাকাছি, কিন্তু তাঁকে দেখে মনে হতো জরা তাঁকে আদৌ স্পর্শে করে নি ; নতুন নতুন পরিকল্পনা রচনা করে চলেছেন পুরোদমে, বিশেষজ্ঞ এবং অর্থনীতিবিদদের তা দেখে তাক লেগে যেতো। চীনের প্রশ্নে তাঁর প্রধান বিরোধী কম্যুনিষ্টরা দুভাগে ভাগ হয়ে দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। জাতীয়তাবাদের শক্তি প্রাধান্যলাভ করছিল।

পূর্বাঞ্চলীয় কাউন্সিল এবং জাতীয় উন্নয়ন কাউন্সিলের বৈঠকে যোগ দেবার জন্য মুখ্যমন্ত্রী ১২ জানুয়ারি দিল্লী গেলেন বিমানযোগে। পরের দিন একটা দারুণ দুর্ঘটনা থেকে তিনি দৈবক্রমে বেঁচে গিয়েছিলেন। মন্ত্রী তরুণকান্তি ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে জাতীয় উন্নয়ন কাউন্সিলের বৈকালীন অধিবেশনে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন তিনি। গাড়ি থেকে সবে নেমেছেন, এমন সময় পিছন থেকে একটা ট্যাক্সি হুড়মুড় করে তাঁর ঘাড়ের ওপর এসে পড়লো, অতো বয়স তবু তরুণ ব্যায়ামবীরের মতো তিনি চট করে সরে দাঁড়ালেন, না দাঁড়ালে বাঁচতেন না। কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশটি একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল, তরুণকান্তি ভীতিবিহ্বল। অপ্রতিভ মুখ্যমন্ত্রী একটু হেসে বিজ্ঞান ভবনের প্রধান ফটকের মধ্য দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলেন।

এই সময় নেহেরু দার্জিলিং যাবেন কথা ছিল। প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডাঃ জগদীশ বসুর স্মৃতিরক্ষার্থে যে জগদীশ বসু বিজ্ঞান প্রতিভা অনুসন্ধান কমিটি হয়েছিল, তাঁর সভাপতি ছিলেন ডাঃ রায়। এই কমিটির মিটিংগুলি নিয়মিত বসতো তাঁর অফিসে, আর এতে যাঁরা উৎসাহী হয়ে যোগ দিতে আসতেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন স্যর জাহাঙ্গীর গান্ধী। এর জন্য টাকা জোগাড় করা হতো শিল্পপতিদের কাছ থেকে। এই পরিকল্পের উদ্বোধন করবার জন্য নেহেরুকে আমন্ত্রণ জানিয়ে তিনি চিঠি লিখলেন ২০ জানুয়ারি।

প্রিয় জওহরলাল,

তুমি মনে করতে পারবে দিন কয়েক আগে তুমি প্রতিভা সন্ধানের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়ে বলেছিলে, আমাদের স্কুল আর কলেজের প্রকৃত মেধাবী ছাত্রদের খুঁজে তাদের বৃত্তি দিতে হবে, যাতে মাত্র গরীব বলেই যেন তাদের পড়াশোনা ব্যাহত না হয়। ঐ সময় আমি বলিনি বাংলায় আমরা কী করছি। ডঃ জগদীশচন্দ্র বসুর স্মৃতিতে অনুরূপ প্রতিভা অনুসন্ধানের কর্মসূচি আমরা নিয়েছি, তাতে অগ্রগতিও হয়েছে। খ্যাতনামা অধ্যাপক ও শিক্ষাসংক্রান্ত নানান বিষয়ে সংশ্লিষ্ট এমন ব্যক্তিদের সাহায্যে গত ডিসেম্বরে একটি পরীক্ষা নিয়েছি। পরবর্তী পাঠ্যকাল ১ জুলাই থেকে আমরা বৃত্তি দিয়ে পরিকল্পের সূচনা করতে যাচ্ছি। আমি একটা ফোল্ডার তোমাকে পাঠাচ্ছি, এতেই পাবে আমরা কী ভাবে এগোচ্ছি সে বিষয়ে কিছু তথ্য। দার্জিলিং যাবার পথে কিংবা দার্জিলিং থেকে আসবার সময় কলকাতায় উপস্থিত থেকে এই বিশেষ পরিকল্পটির উদ্বোধন করা কি তোমার পক্ষে সম্ভব হবে? এই সংগঠনের সঙ্গে জড়িত এবং এর উন্নতিকল্পে যাঁরা সাহায্য করছেন, তাঁদের নামের একটি তালিকা পাঠালাম।

তোমার স্নেহভাজন,
বিধান

মহাকরণ ও সেক্রেটারিয়েট পাঠাগার

মহাকরণের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে সেক্রেটারিয়েট পাঠাগারটির আধুনিকীকরণেও প্রবল আগ্রহশীল ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এ উদ্দেশ্যে মহাকরণের ভিতরে বেশ বড়ো একটা স্থানও তৈরি করিয়ে ফেলেছিলেন তিনি। জানুয়ারির দ্বিতীয়

সপ্তাহে পাঠাগারটি উঠে এলো এই নতুন প্রশস্ত কক্ষে। ৯ জানুয়ারি মন্ত্রিসভার সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে ডাঃ রায় এর উদ্বোধন করলেন। বাংলার সেক্রেটারিয়েট ও তার পাঠাগার বা লাইব্রেরীর ঐতিহাসিক পটভূমিকা খুব কম লোকেরই জানা আছে। খুব কম লোকই জানেন উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে এটি কীভাবে বাড়ির পর বাড়ি বদলেছে। একশ বছরেরও আগে বাংলার সরকারী সচিবালয় বা সেক্রেটারিয়েট অবস্থিত ছিল কলকাতার ষ্ট্র্যাণ্ড রোডের সমারসেট বিল্ডিংসে। বার কয়েক বাড়ি বদলাবার পর বর্তমান মহাকরণ-ভবনে এর স্থিতি। এই সঙ্গে এর লাইব্রেরীটিও ঐরকম ঘন ঘন বাড়ি বদলেছিল: লাইব্রেরীটি ঠিক কোন্ সময়ে খুলেছিল জানা যায় না, কিন্তু এর সব থেকে পুরোনো যে ক্যাটালগটা পাওয়া যায় তাতে ছাপা আছে ১৮৬৭ সাল। প্রথমে এটি ছিল মহাকরণের এক তলার ২ নম্বর ব্লকে, তারপরে মূল বাড়ির মধ্যে তিনটি ঘর নিয়ে লাইব্রেরীটি অবস্থান করছিল। এখন এই পাঠাগারটির পুস্তকসংখ্যা ৭০,৩৮০। বহু দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান গ্রন্থে সজ্জিত, তার মধ্যে সরকারী প্রকাশনগুলো ত আছেই।

ভারতরত্ন পুরস্কার

২৬শে জানুয়ারি সাধারণতন্ত্র দিবসের একদিন আগে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে রাষ্ট্রপতির ভারতরত্ন পুরস্কার দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হলো। ঘোষণাটি যখন করা হয়, তখন ডাঃ রায় কলকাতায় মহাকরণে বিধানসভার সদস্যদের নিয়ে একটা বৈঠক করতে ব্যস্ত ছিলেন। কলকাতার কাছে ডায়মণ্ড হারবার রোডে আরেকটি উপনগরী গড়ে তোলবার চূড়ান্ত প্ল্যান নিয়ে, তার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করছিলেন। বৈঠকে তিনি কমিউনিষ্ট এম এল এদেরও ডেকেছিলেন। সদস্যদের তিনি জানালেন, বৃহত্তর কলকাতার জল সরবরাহ এবং পয়ঃপ্রণালী সংক্রান্ত ২০০ কোটি টাকার প্রকল্পের জন্য টাকা দিতে রাজী হয়েছে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন। এই প্রতিষ্ঠান ছাড়া আন্তর্জাতিক উন্নয়ন তহবিল এবং ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাও এইসব প্রকল্পের জন্য টাকা দিতে এগিয়ে আসবেন বলে আশা করা যায়। বৃহত্তর কলকাতার জল সরবরাহ ও জল ধরে রাখার যে পরিকল্প, তার প্রস্তুতির খরচ বহন করতে উ এন এমারজেন্সি ফাণ্ডও রাজী হয়েছে। এই

কলকাতার দমদম বিমানবন্দরে ইংলণ্ডের রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথকে
সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন ডাঃ রায়

নতুন উপনগরী প্রকল্পের জন্য তিনি সমর্থন চাইছিলেন বিরোধীপক্ষগুলির। এই নতুন উপনগরী প্রকল্প গড়ে উঠবে ডায়মণ্ড হারবার রোডের দুই পাশে ৮৪ বর্গমাইল জুড়ে। তার মধ্যে ৫০,০০০ একর পড়েছে ধানের জমি, আর ৫,০০০ পড়েছে বসতজমি। যে সব পরিবার এতে পড়ে যাবেন তাঁদের সংখ্যা হচ্ছে ২০,০০০ চাষী এবং ৯০০০ অচাষী পরিবার। অবশ্য এই উপনগরী কাগজ-কলমেই রয়ে গিয়েছিল, কারণ তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পরবর্তী সরকার এটিকে রূপায়িত করেন নি।

রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের সফর

২১ জানুয়ারি ইংলণ্ডের রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ তাঁর স্বামী ডিউক অব এডিনবরাকে নিয়ে দিল্লী এসে পৌঁছেছিলেন। তাঁকে যথাযথভাবে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য রাজ্য সরকার প্রস্তুত হচ্ছিলেন। ক্রুশ্চেভ ও বুলগানিনের সময় যেমন করেছিলেন, তেমনি বিভিন্ন সাব-কমিটি গঠন করে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এই সব বৈঠকগুলো তাঁর অফিস ঘরেই বসছিল। রাণী এসে নামলেন পানাগড়ে, তাঁকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে স্বাগত জানালেন মুখ্যসচিব রঞ্জিৎ গুপ্ত। পানাগড় থেকে দুর্গাপুর এই দশ মাইল পথ একটা উৎসবের চেহারা নিয়েছিল। রাণী দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা দেখলেন। কারখানাটা তৈরি করেছিল একটি বৃটিশ সংস্থা 'ইস্কন'।

রাণী কলকাতায় অর্থাৎ দমদম বিমান বন্দরে এসে নামলেন তার পরদিন বিকেল ৫টা ৫৫ মিনিটে। রাণী বিমানের সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতেই তাঁকে সম্ভাষণ জানালেন রাজ্যপাল। তিনি সাদা আচকান আর ধুতি পরিহিত ডাঃ রায়কে রাণীর সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিলেন। বিমান বন্দরের সম্ভাষণাদি শেষ হবার পর রাজ্যপালের সঙ্গে রাণী চললেন সমারোহ সহকারে একটি গাড়িতে করে রাজভবনের দিকে। পিছনের গাড়িতে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ও ডিউক। সারা পথের দু'ধারে জড়ো হয়েছিল কাতারে কাতারে লোক, অনুমান করা হলো তাদের সংখ্যা ২৫ লক্ষ হবে।

পরের দিন রাণী দিনের অধিকাংশ সময়টা কাটালেন অতীত ও নতুন ভারতের সাজানো প্রদর্শনী ইত্যাদি দেখে। জাতীয় কৃষিমেলা দেখলেন, পুরো একটি ঘণ্টা কাটালেন ভিকটোরিয়া মেমোরিয়ালে। ২০ ফেব্রুয়ারি রবিবার

বেলা ১১টার একটু পরে দশ লক্ষ জনতার উল্লাসধ্বনির মধ্য দিয়ে রাণী ফিরে চললেন। দমদম বিমান বন্দর পর্যন্ত রাণীর সঙ্গে গাড়িতে ছিলেন রাজ্যপাল, ডিউকের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী। রয়্যাল ব্রিটানিয়া বিমানখানি উড়ে যাবার আগে রাণী বললেন, আমি খুব খুশি হয়েছি। যে সম্বর্ধনা পেলাম তা কখনো ভুলবো না।

বাজেট অধিবেশন

রাণী চলে যাবার পরের দিনই বিধানসভায় ১৯৬১-৬২ সালের বাজেট পেশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর ভাষণে ছিল আশাবাদীর কণ্ঠস্বর। দ্বিতীয় পরিকল্পনা-কালে দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল ছিল গঠনের পথে। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে কাজ শুরু হলে আরও কয়েকটি পরিকল্পেরও ফল পাওয়া শুরু হবে। এ সব কথা বলে তিনি কলকাতার কথা তুললেন। কলকাতার উন্নয়নের জন্য রাজ্যের অবদান ১০ কোটি টাকা ধার্য করে রাখা হয়েছে। আরও ১০ কোটি দিচ্ছেন কেন্দ্র ভরতুকি হিসাবে।

গোবিন্দবল্লভ পন্থের জীবনাবসান

ফেব্রুয়ারির ২১ তারিখে ভোরবেলায় ডাঃ রায় টেলিফোনযোগে জানতে পারলেন যে গত রাত্রে পণ্ডিত পন্থ সেরিব্র্যাল থ্রম্বসিসের দ্বারা মৃদুভাবে আক্রান্ত হয়েছেন। সেজন্য তাঁকে দিল্লীতে আসতে বলা হলো। দমদম বিমানবন্দরে ভাড়া করা একটি প্লেন প্রস্তুত রাখা ছিল, তিনি বিধানসভা ভবন থেকে সোজা ওখানে চলে গেলেন। দিল্লীর পালাম বিমান বন্দরে নেমে পন্থের বাড়ি গেলেন সরাসরি। অন্য চারজন ডাক্তারদের একটি দলের সঙ্গে পন্থকে পরীক্ষা করে অপেক্ষারত সাংবাদিকদের ডাঃ রায় বললেন, ওঁর অবস্থা এখনো উদ্বেগজনক, তবে হার্টের অবস্থা আগের থেকে ভালো।

পরদিন তিনি নতুন একটা ওষুধ দিলেন, যেটা বিমানযোগে কলকাতা থেকে দ্রুত নিয়ে আসা হলো। ওষুধ খাবার ঘণ্টা দুই পরে তাঁর হার্টের স্পন্দন, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে এলো। ২২ ফেব্রুয়ারি সারা দিনটা তিনি রোগীর বিছানার পাশে রইলেন। প্রধানমন্ত্রী ও শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁকে দেখতে এলেন, অসুখ সম্পর্কে ডাঃ রায়কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। ২৩ ফেব্রুয়ারি ডাঃ রায় কলকাতা রওনা হয়ে গেলেন। ১৪ দিন অজ্ঞান

অবস্থায় থাকবার পর ভারতের অন্যতম প্রথম সারির নেতা গোবিন্দবল্লভ পন্থ মারা গেলেন। ৭ মার্চ বিকেলে পন্থের মৃত্যু সংবাদ তাঁকে দেওয়া হলো। তিনি তখন অর্থনীতিসংক্রান্ত দৈনিক পত্র ইকনমিক টাইমস-এর উদ্বোধনী ভাষণ সবে শেষ করেছেন। মৃত্যুসংবাদ সম্বলিত একটি লিখিত কাগজ তাঁর হাতে দেওয়া হলো। দেখে মনে হচ্ছিল বেশ ধাক্কা খেয়েছেন, খানিকক্ষণ কাগজটার দিকে চেয়ে রইলেন, তারপরে উঠে ঘোষণা করলেন দুঃসংবাদটা।

নেহেরু ৬ মার্চ মুখ্যমন্ত্রীকে একখানা চিঠি লিখেছিলেন, কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে যোগ দিতে ভারতের বাইরে চলে যাবার ঠিক আগে। তাতে পন্থজীর অসুখ সম্পর্কে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত ছিল। খুবই উদ্বেগ ও বেদনা ছিল তাঁর মনে। ঐ চিঠির এক জায়গায় বলছেন, দুঃখভার বহন করেই ইংল্যাণ্ড যাচ্ছি, এই সংকট-মুহূর্তে দেশের বাইরে যাবার মতো মনের অবস্থা আমার একেবারেই নেই।

ফরাক্কা ব্যারেজের জন্য সবুজ সংকেত

২৪ ফেব্রুয়ারি ফরাক্কা ব্যারেজ বা বাঁধের জন্য সবুজ সংকেত দিলেন কেন্দ্রীয় সরকার। এই প্রকল্পের জন্য তখন ব্যয়বরাদ্দ ধরা হয়েছিল ৫৬'৪ কোটি টাকা। ফরাক্কায় গঙ্গার ওপর দিয়ে থাকবে একটা বাঁধ ও সেতু। আর দ্বিতীয় ব্যারেজটি হবে জঙ্গীপুর ভাগীরথীর ওপর দিয়ে। সওয়া ২৬ মাইল লম্বা একটা ফিডার ক্যানাল দিয়ে ফরাক্কা বাঁধের ওপর দিকের অংশ থেকে জল এসে পড়বে ভাগীরথীতে এই ক্যানাল বা খাল দিয়ে, তাতে কলকাতা বন্দর রক্ষা পাবে।

আসামের উদ্বাস্তু

২৭শে ফেব্রুয়ারি উত্তর বঙ্গের উদ্বাস্তু শিবিরের কয়েকজন নেতা ডাঃ রায়ের সঙ্গে দেখা করলেন তাঁর অফিসে। উদ্বাস্তুদের আসাম ফিরে যাওয়া সবে আরম্ভ হয়েছিল, আর তাদের স্বাচ্ছন্দ্য ও সুবিধার জন্য ব্যবস্থাদি নিতে ব্যস্ত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এই সব বিষয়ে তিনি ঐদিনই চিঠি লিখলেন প্রধানমন্ত্রীকে।

কলকাতা

২৭।২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৬১

প্রিয় জওহরলাল,

আসাম থেকে পালিয়ে এসে উত্তর বঙ্গের শিবিরে যারা বাস করছিল তাদের বেশ কিছু লোক আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল আজ। এদের সঙ্গে এসেছিলেন রাজনৈতিক দলগুলির কয়েকজন নেতা। এই নেতাদের মনোভঙ্গি যা দেখলাম তা খুবই যুক্তিসঙ্গত। এদের ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে তাঁরা বলছেন, অশোক সেন এবং আসামের মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে যেরকম কথাবার্তা হয়েছিল সেই ভাবে আর্থিক অবস্থা যার যেমন ছিল তেমন সাহায্য করতে হবে, যাতে তাদের নিজেদের কাজকর্ম আবার তারা শুরু করতে পারে। অশোক সেনের কাছ থেকে শুনেছি এইরকমই হবে বলে ঠিক হয়েছিল।

তুমি জানো শিবিরে এই সব লোকের পরিসংখ্যান নেওয়া হয়েছিল যুগ্মভাবে, এবং তাতে যা পাওয়া গিয়েছিল, তা আসাম সরকারের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল জানুয়ারির শেষের দিকে। তাঁরা তদন্ত করে এ পর্যন্ত ৮০০টি পরিবার অর্থাৎ প্রায় চার হাজার লোক পেয়েছিলেন, যারা এই ত্রাণ ব্যবস্থার সুযোগ পাবার অধিকারী। বাকি লোকগুলির ব্যাপার এখনো খুঁটিয়ে দেখা হয় নি, আমি জানি না কবে তাঁরা পুরো তালিকাটা তৈরি করে দিতে পারবেন। ইতিমধ্যে আসাম থেকে আগতদের আমি জিজ্ঞাসা করেছি, আসামে যাওয়া মাত্রই যদি তারা আর্থিক সাহায্য পায় তাহলে তারা এখুনি আসামে চলে যেতে রাজী আছে কিনা? তারা রাজী হয়েছে। আমি এখন তোমাকে ঘোষণা করতে অনুরোধ করবো যে, আসামে যে সব বাঙালী ফিরে যাবে তাদের আসাম সরকার এমন পরিমাণ অর্থসাহায্য দেবে, যাতে তারা তাদের জীবন আবার শুরু করতে পারে ও ফিরে যেতে উৎসাহ বোধ করে। এ পর্যন্ত আসাম থেকে আগত উদ্বাস্তুদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রায় ৪৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছে। ভারত সরকারের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার আগে তোমাকে লিখেছিলাম কিন্তু এখনো পর্যন্ত সে বিষয়ে তোমার কাছ থেকে কোনো উত্তর পাইনি।

তোমার স্নেহের,

বিধান

এর উত্তরে দিল্লী থেকে ১ মার্চ নেহেরু লিখলেন :

প্রিয় বিধান,

তোমার ২৮শে ফেব্রুয়ারির চিঠি এইমাত্র আমার হাতে এলো। আসাম থেকে যে সব মানুষ পশ্চিমবঙ্গে তোমাদের শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে, এ চিঠি তাদের সম্পর্কে। ঘটনাচক্রে অশোক সেনও এইমাত্র আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন, আর আমারও কথা হলো তাঁর সঙ্গে। আমিও চাইছি এরা যত শীগ্‌গির হোক আসামে ফিরে যাক। এ বিষয়ে আমি চালিহাকে লিখছি।

সন্দেহ নেই এই সব লোকদের অন্ততঃ অধিকাংশরা যাতে আবার নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারে তার জন্য সাহায্য করতে হবে। তবে এই মুহূর্তেই বলা কঠিন, কতদূর পর্যন্ত সাহায্য তাদের করা যাবে। আমি আমাদের অর্থমন্ত্রীকে এ বিষয়ে জানাচ্ছি, আমাদের যে করেই হোক কিছুটা সাহায্য করতেই হবে। আসামে এই কাজে সাহায্য করার জন্য মেহেরচাঁদ খান্নাকে নিয়োগ করতে অশোক সেন আমাকে বলেছেন। আমি তাঁকে বলেছি আমি তা করতে রাজী আছি, সেই মর্মে মেহেরচাঁদকেও আমি বলবো।

তোমার স্নেহভাজন

জওহর

দ্বিতীয় হুগলি সেতু

বিধানসভায় ১০ই মার্চ মূলধনী বরাদ্দের অনুদান মঞ্জুর করার বিষয়ে বলতে গিয়ে ডাঃ রায় ঘোষণা করলেন, তাঁর সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ইতিমধ্যেই একটি প্রস্তাব দিয়েছে যে হুগলি নদীর ওপর দ্বিতীয় একটি সেতু নির্মাণ করা দরকার, কারণ বর্তমান সেতুটি কলকাতার ক্রমবর্ধমান যানবাহনের ভীড় আর একা বইতে পারছে না। (এই প্রসঙ্গে বলে রাখি বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায়ের ব্যক্তিগত চেষ্টায় এই সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হয়ে গেছে ১৯৭২ সালে।)

১লা এপ্রিল তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্বোধন কালে মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের জনগণের উদ্দেশে বললেন, আপনারা গঠন করুন আমাদের স্বপ্নের বাংলা, সমৃদ্ধিশালী ভারতে সমৃদ্ধিশালী বাংলা।

কল্যাণী সূতাকল

জনগণের উদ্দেশে ঐ বাণী দেবার আগের দিন ডাঃ রায় তাঁর ভাবধারার অন্যতম একটি বাস্তব রূপ দিলেন ৫০,০০০ টেকো বিশিষ্ট (২.৪ মিলিয়ন পাউণ্ড সামর্থ্যসম্পন্ন) কল্যাণী সুতাকলটির সুইচ টিপে সেটিকে চালু করে দিয়ে বললেন, এই ধরনের সংস্থার পরিচালন-ভার গ্রহণ রাজ্য সরকারের পক্ষে এই প্রথম। তৃতীয় পরিকল্পনার সমাপ্তিকাল পর্যন্ত বাংলার তাঁত এবং মোজা ও গেঞ্জি শিল্পের জন্য যে পরিমাণ সুতো দরকার তা হচ্ছে আনুমানিক ৫৯ মিলিয়ন পাউণ্ড। কল্যাণী সূতাকল যা তৈরি করবে তার সঙ্গে আরও দুটি ঐ ধরনের কল যা তৃতীয় পরিকল্পনাকালে গড়ে তোলবার প্রস্তাব আছে, তার উৎপাদনের পরিমাণ ধরে নিলেও কম পড়ছে ১৪ মিলিয়ন পাউণ্ড। (তাঁতশিল্পের উৎপাদন দেশ বিভাগের পর প্রসার লাভ করেছে ছ কোটি গজ থেকে ১৯ কোটি গজ পর্যন্ত।)

সরকারী ভাষা হিসাবে নেপালী

৮ই এপ্রিল প্রধানমন্ত্রীর দার্জিলিং যাবার কথা। হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইন্সটিটিউট তাঁর সৃষ্টি, আর এটি মাথা থেকে বেরিয়েছিল ডাঃ রায়ের। দুজনে মিলে এটির অগ্রগতি কতদূর হয়েছে তা দেখবেন। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার দার্জিলিং জেলার তিনটি পার্বত্য মহকুমার নেপালী ভাষাভাষী জনগণের মধ্যে নেপালীকে সরকারী ভাষা হিসাবে গণ্য করার দাবি সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। সর্বভারতীয় গোর্খা লীগের দার্জিলিং জেলা কমিটিই এই আন্দোলনের নেতৃত্ব করছিলেন। ১৯৫৯ সালের জুন মাসে গোর্খা লীগ এই দাবিতে একটি প্রস্তাবও পাস করেছিল। ১৯৫১র আদমসুমারীতে দেখা যায় দার্জিলিং জেলার নেপালী ভাষাভাষীর সংখ্যা ১৯.৯৮ শতাংশ এবং সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে ১ শতাংশেরও নিচে।

নেহেরুর দার্জিলিঙে পৌঁছবার দুদিন আগে মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতির মাধ্যমে এই আশ্বাস দিলেন যে, ১৯৬১-এর আদমসুমারীর সংখ্যা যখনই পাওয়া যাবে, (আমি আশা করি আদমসুমারীতে দেখা যাবে দার্জিলিং জেলার নেপালী ভাষা-ভাষীর সংখ্যা বেড়ে গেছে) তখনই সংবিধানের ৩৪৭ ধারা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের অন্তত পার্বত্য অঞ্চলে নেপালীকে সরকারী ভাষা হিসাবে ঘোষণা করার জন্য রাষ্ট্রপতির সম্মতি পাবার ব্যবস্থা করা হবে।

ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের সঙ্গে ডাঃ রায়

কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতি তাদের খুশি করতে পারে নি। নেপালীরা আগেকার তা প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাবার ব্যাপারে উৎসাহ দেখালো না। বদলে ডাঃ রায়কে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী যখন তাঁর গাড়িতে করে পাহাড়ী রাস্তা রাজভবনের দিকে যাচ্ছিলেন (সঙ্গে ছিলেন ইন্দিরা গান্ধীও) তখন তারা নেপালী ভাষার সমর্থনে বিভিন্ন শ্লোগান-সম্বলিত প্ল্যাকার্ড প্রদর্শন করছিল। এই প্রথম নেপালীরা ভাষার প্রশ্নে এককাট্টা হয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে তাদের ক্রোধ প্রকাশ করলো। (এই বই যখন লিখছি তখন তাদের ভাষাগত আন্দোলন বদলে গিয়ে অন্যান্য বিবিধ দাবিতে পরিণত হয়েছে।)

দার্জিলিঙে ৯ই এপ্রিলের রাত্রিতে প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বেরুবাড়ির সীমানা চিহ্নিতকরণ এবং তিব্বতী উদ্বাস্তুদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করলেন। ১১ই এপ্রিল তাঁরা সবাই ফিরে এলেন কলকাতায়। কলকাতায় তাঁর সাড়ে তিনঘণ্টার স্থিতিকালের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী জগদীশ বসু জাতীয় বিজ্ঞান প্রতিভা অনুসন্ধান-পুরস্কার বিতরণ সভায় ভাষণ দিলেন। এজন্য মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে আগে গেই চিঠিতে অনুরোধ জানিয়ে রেখেছিলেন।

রাষ্ট্রপতি সর্বোচ্চ পুরস্কার দিলেন

এপ্রিলের শেষের দিকে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় দিল্লী গেলেন ভারতের মেডিক্যাল কাউন্সিলের এক বৈঠকে যোগ দিতে। এই কাউন্সিলের তিনি ছিলেন প্রাণস্বরূপ এবং বহু বছর ধরে এর সভাপতি ছিলেন। এই বছর সভাপতি হয়েছিলেন বোম্বাইয়ের ডাক্তার সি এস প্যাটেল। এই কাউন্সিলের বৈঠকগুলো বসতো দিল্লীতে কাউন্সিলের নিজের বাড়িতে। পরিচালক সমিতির বৈঠক-সমাপ্তি শেষে কথা বলতে বলতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছেন ডাঃ রায়, ডাঃ প্যাটেল একসময় তাঁর বাঁ পাটা দেখিয়ে বললেন, মশাই আপনার বাঁ পাটা ফুলো ফুলো দেখাচ্ছে কেন?

—ও কিছু নয়, ডাঃ রায় বললেন, ছোট বেলায় খুব বড়ো একটা দুর্ঘটনা হয়েছিল। সেই থেকে ঐ পাটা আমার একটু দুর্বল, মাঝে মাঝে ফুলে যায়, ব্যথাও হয়।

ডাঃ রায় এভাবে ব্যাখ্যা করলেও ডাঃ প্যাটেলের চোখের ভাব থেকে সন্দেহ গেল না। ডাঃ প্যাটেল বোম্বাইয়ের খুব নাম করা সার্জেন। ডাঃ রায় মোটরে

উঠতে যাচ্ছেন, এমন সময় ডাঃ প্যাটেল বললেন, ডাঃ রায় তবু একটু সতর্ক থাকা ভালো। কলকাতায় পৌঁছেই রক্ত আর প্রস্রাবটা পরীক্ষা করিয়ে নেবেন। ডাঃ রায়ের দেহরক্ষী ও আমি তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে বসেছিলাম। বোম্বাইয়ের ডাক্তারের সাবধান-বাণী ভিতরে ভিতরে আমাদের খুবই উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল সেদিন।

২৭শে এপ্রিল বিকেলবেলা ডাঃ রায় খদ্দরের ধুতির ওপর বোতামওয়ালা সাদা কোট পরলেন রাষ্ট্রপতি ভবনের দরবারকক্ষে গিয়ে ভারত রত্ন পুরস্কার নেবেন বলে। পোষাক আশাক সম্পর্কে তিনি কখনো সচেতন ছিলেন না, তবু এই আনুষ্ঠানিক পর্বের জন্য তিনি এই বোতামওয়ালা কোটটি নিয়ে গিয়েছিলেন কলকাতা থেকে। বস্তুতঃ খুবই হাসিমুখে তিনি ছিলেন সারাদিন। দরবার হলে বন্ধুদের নিয়ে যাবার জন্য দুটি পাশ ছিল তাঁর সঙ্গে। একটি যেন কাকে দিয়ে দিয়েছিলেন আগেই, অপরটি নিতে চেয়েছিলাম আমি। উনি যখন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাচ্ছেন ঠিক তখনই একজন খ্যাতনামা বাঙালী কংগ্রেস কর্মী এসে পাশ চাইলেন। তখন বাড়তি আরেকটি পাশ জোগাড় করার সময়ও ছিল না। ডাঃ রায় আমার দিকে তাকালেন। আমি আর করি কী পাশটা নিয়ে তাঁরই হাতে গুঁজে দিলাম।

কলকাতায় যখন ফিরে এলেন ডাঃ রায়, তখন তাঁর নাতি (ভাইপো সুবিমল রায়ের ছেলে) একদিন ভারত রত্ন মেডেলটি দেখতে পেয়ে ওটা চাইলো। ডাঃ রায় সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, ওটা অর্জন করো।

এর থেকে বোঝা যায় জাতির সেবা এবং জাতীয় পুরস্কারকে কতোটা মর্যাদা তিনি দিতেন।

যাইহোক, আমরা তাঁর কাজকর্মের প্রসঙ্গে আবার ফিরে যাই। কলকাতা ও তার সন্নিহিত এলাকার ব্যাপক উন্নয়নের ব্যাপারে একটি চূড়ান্ত পরিকল্পনা তৈরি করার জন্য একটি পরিচালক মণ্ডলী স্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ১লা মে মন্ত্রিসভা কলকাতা মহানগরী উন্নয়ন পর্ষদ বা ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন প্ল্যানিং অরগানাইজেশন গঠনের সিদ্ধান্ত নিলেন। এই পর্ষদ সরাসরি থাকবে মুখ্যমন্ত্রীর অধীনে। সঙ্গে এর দায়িত্বে সচিব থাকবেন স্বাস্থ্য কৃত্যকের অধিকর্তা জেনারেল ডি. এন. চক্রবর্তী। প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারীও থাকবেন। বৃহত্তর কলকাতার জল সরবরাহ, পয়ঃপ্রণালী প্রভৃতি

সমস্যা সংক্রান্ত চূড়ান্ত পরিকল্পনা তৈরি করবেন এঁরা। এর সঙ্গে থাকবে হুগলি নদীর দুই পাশের পৌর এলাকাগুলির উন্নয়ন, কলকাতার কাছের উপনগরী, বস্তী অপসারণ পরিকল্প, কলকাতার ভিতরের ও আশেপাশের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, গৃহ নির্মাণ প্রভৃতি। ফোর্ড ফাউণ্ডেশন এবং বিশেষ করে এর অধিকর্তা ডঃ ডগলাস এনসমিঙ্গারের পরামর্শেই উক্ত সি.এম.পি.ও গড়ে উঠেছিল। চূড়ান্ত পরিকল্পনা তৈরির খরচ ফোর্ড ফাউণ্ডেশন বহন করতে রাজী হয়েছিলেন। ২৯শে জুলাই ফোর্ড ফাউণ্ডেশন মোট ১˙৪ মিলিয়ন ডলার কলকাতার উন্নয়নের জন্য দেবেন বলে ঘোষণা করলেন। তাঁদের মতে শহরাঞ্চলীয় সমস্যার দিক থেকে কলকাতার সমস্যা অবশ্যই হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে শোচনীয়।

রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর অনুষ্ঠান

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী পড়েছিল এই বছরে। এর উদ্‌যাপন করবার জন্য সারা ভারত জুড়ে, না শুধু ভারত জুড়ে কেন, সারা পৃথিবী জুড়ে সরকারী বেসরকারী নানান অনুষ্ঠান হচ্ছিল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে এই শতবার্ষিকীর বিশেষ তাৎপর্য ছিল, কারণ এই বাংলাই ছিল তাঁর জন্মস্থান, তাঁর কর্মক্ষেত্র। সারা বছর জুড়ে বহু অনুষ্ঠান হতে লাগলো, ডাঃ রায়ের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এজন্য একটি সুচিন্তিত কর্মসূচি প্রণয়ন করলেন। তাঁর চিন্তা ও ভাবধারার প্রচারের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভরতুকি দিয়ে সুলভ মূল্যে ১৫ খণ্ডে রবীন্দ্র রচনাবলী প্রকাশ করলেন। তাঁর স্মৃতিতে মুখ্যমন্ত্রী স্থায়ী কিছু করে যাওয়াও মনস্থ করলেন। কবিগুরুর বাড়িতে তাঁর নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় ও সংগ্রহশালা তিনি স্থাপন করলেন প্রথমে। কলকাতায় কোনো জাতীয় নাট্য-শালা ছিল না এবং এজন্য প্রথম যে পদক্ষেপ নেওয়া হলো, সেটি হচ্ছে আচার্য জগদীশ বোস রোড (পূর্বতন লোয়ার সার্কুলার রোড) ও ক্যাথিড্রাল রোডের মোড়ে ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধের দিকে মুখ করে রবীন্দ্র স্মৃতি থিয়েটার ভবন নির্মাণ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে মুখ্যমন্ত্রী বললেন, যে সাংস্কৃতিক জীবনের ভাবধারার পত্তন করে গেছেন রবীন্দ্রনাথ, এখানে তারই অনুশীলন হবে। এখানে শেখানো হবে গান, নাটক, বিজ্ঞান এবং অন্যান্য মানবিক বিষয়।

রবীন্দ্রনাথের জীবন ও রচনা নিয়ে রিসার্চ করবে এ যুগ ও আগামী যুগের মানুষেরা।

নেহেরুও তাঁর ভাষণে বললেন, কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গেই কবিগুরুর জন্ম-শতবার্ষিকী পালন করা হচ্ছে না, সারা পৃথিবী জুড়ে হচ্ছে। কিন্তু এ অনুষ্ঠান বিশেষ করে আমাদেরই, যদিও রবীন্দ্রনাথ দেশ কালের গণ্ডী পেরিয়ে গেছেন।

এর আগে উক্ত থিয়েটার ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে নেহেরু বলেছিলেন, জাতীয় নাট্যশালা আনবে জাতীয় ঐক্য, যে কথা বারবার বলে গেছেন রবীন্দ্রনাথ, যার জন্য লড়াই চালিয়ে গেছেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ আমাদের ভারতীয় জ্ঞানী ও ঋষি-ধারার মানুষ, কিন্তু তার সঙ্গে মিশেছিল আধুনিকতা। অতীত ও বর্তমানের চিন্তাধারার তিনি মূর্তিমান সমাহার।

ঐদিন আমার বারবার নিজের জীবনের একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছিল। ছোট্ট ঘটনা, ঘটেছিল তিরিশের দশকে, আমি রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম কিছুক্ষণের জন্য। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার, আর চ্যান্সেলার স্যর জন এণ্ডারসন। শ্যামাপ্রসাদের নেতৃত্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সিদ্ধান্ত নিলো যে, সমাবর্তন উৎসবে রবীন্দ্রনাথই এবার সমাবর্তন ভাষণ দেবেন। রবীন্দ্রনাথ রাজী হলেন একটি সর্তে, তিনি ভাষণ দেবেন বাংলায়, আচরিত প্রথার মতো ইংরেজীতে নয়। বিশ্ববিদ্যালয় সানন্দে রাজী হলো। আমি তখন ইউনাইটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়া সংস্থার একজন রিপোর্টার বা প্রতিবেদক। আমাদের সংস্থা খবর পেলো যে রবীন্দ্রনাথ ভাষণটি নিয়ে কলকাতা আসছেন, শান্তিনিকেতন থেকে ট্রেন এসে হাওড়ায় পৌছবে বিকেলবেলা। যথাসময়ে হাওড়া স্টেশনে হাজির রইলাম। আমার বন্ধু অধুনালুপ্ত অ্যাডভ্যান্স পত্রিকার হেমেন্দ্রনাথ রায়ও খবর পেয়ে এসে উপস্থিত। ট্রেন থামলে একটি প্রথম শ্রেণীর কামরার দিকে আমরা ছুটে গেলাম। তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করে অভিপ্রায় জানালাম। তিনি বললেন তাহলে আমার সঙ্গে জোড়াসাঁকো চলে এসো, ওখানে শ্যামাপ্রসাদ অপেক্ষা করবেন। ভাষণের কপি আগে আমাকে শ্যামাপ্রসাদকেই দিতে হবে।

কবিগুরু প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে বড়ো একটা গাড়িতে উঠলেন। আমরা ট্যাক্সি করে চললাম পিছনে পিছনে। কবিগুরুর বাড়ির দোতলার বসবার ঘরে শ্যামাপ্রসাদ বসেছিলেন। কিন্তু তাঁর আগেই সাংবাদিকরা ভাষণের কপি পেয়ে

যাবে, এটা তাঁর মনঃপূত নয়। আমাকে চিনতেন ডঃ মুখোপাধ্যায়। ডেকে বললেন, অফিসে ফিরে যাও। আমি সমাবর্তন-ভাষণের অনুমোদিত ইংরেজী অনুবাদ পরে পাঠিয়ে দেবো। ভাষণ দেবার আগেই যে ভাষণটা কাগজে ছেপে বেরিয়ে যাবে এ আমি চাই না।

ওঁর পিছনেই দাঁড়িয়েছিলেন কবিগুরু স্বয়ং। তাঁকে ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। আমরা কী করবো? ফিরে গেলাম। কিন্তু শ্যামাপ্রসাদ কথা রেখেছিলেন। যথাসময়ে কবির সচিব অধ্যাপক অমিয় চক্রবর্তীর করা ভাষণটির অনুমোদিত অনুবাদ আমাদের অফিসে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

তৃতীয় অর্থ কমিশন

পরের দিন এ কে চন্দের নেতৃত্বে যে অর্থ কমিশন হয়েছিল, তাঁদের কাছে দেওয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ৮৬ পৃষ্ঠার ছাপা স্মারকলিপি কাগজে প্রকাশ হয়ে গেল। মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে কমিশন দার্জিলিঙে এসেছিল পশ্চিমবঙ্গের বক্তব্য শুনতে। স্মারকলিপির বেশির ভাগ অংশ ডাঃ রায় নিজেই তৈরি করেছিলেন। এতে জোরালো ভাষায় এবং যুক্তিসঙ্গতরূপে দেখানো হয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গের ওপর কী রকম অর্থনৈতিক অবিচার করা হয়েছিল। বিশেষ করে বেকারত্বর প্রসঙ্গ তুলে পশ্চিমবঙ্গের আশু প্রয়োজনের কথা স্মারকলিপিতে বলা হয়েছিল। এতে প্রথম ও দ্বিতীয় অর্থ কমিশনের একটা ভুল ধারণার কথা বলা হয়েছিল। তাঁরা রাজ্যের প্রয়োজনটাকে দেখেছিলেন জনসংখ্যার হিসাবের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু এটা ঠিক নয়। রাজ্যের মাথা পিছু প্রয়োজনগুলি নির্ভর করে ঘনবসতির ওপর। এক রাজ্যের তুলনায় অন্য রাজ্যে জনসংখ্যা বেশি হলেও দেখা যায় তাদের রাজ্যের আয়তন বড়ো থাকায় তারা বেশ ছড়িয়ে বাস করছে। সেখানকার তুলনায় যে রাজ্যের আয়তন কম সেখানে অপেক্ষাকৃত কম জনসংখ্যা হলেও ঘন বসতির দিক থেকে মাথাপিছু আর্থিক প্রয়োজন তাদের অনেক বেশি। এটা বিচার করে দেখা উচিত।

আসামে আবার হিংসাত্মক ঘটনা

২০শে মে আসামের গণ্ডগোল আবার নতুন করে বেড়ে গেল, যখন শিলচরে পুলিশের গুলিতে ১১ জন সত্যাগ্রহী মারা গেল। বাংলাকে রাজ্যের একটি

ভাষা হিসাবে গণ্য করার জন্য ওখানকার বাঙালীরা অবিরাম আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলেন, সর্বভারতীয় কয়েকজন নেতা, এমন কি পণ্ডিত নেহেরুও আসাম সফর করে যাবার পর। ২১শে মে ভাড়া করা বিমানে করে আসামের কয়েকজন নেতা ঐ নিহত সত্যাগ্রহীদের চিতাভস্ম কলকাতায় নিয়ে এলেন। কলকাতায় হরতাল হলো স্বতঃস্ফূর্ত। বিকেলবেলা নীরব মিছিল পরিক্রমা করলো মহা-নগরীর পথ, কিন্তু যা আশংকা করা গিয়েছিল তা হলো না, মিছিল ছিল আশ্চর্যরকম শান্ত।

এর আগে বাংলার কংগ্রেস নেতারা সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন ডেকেছিলেন দুর্গাপুরে। এতে মুখ্যমন্ত্রী সায় দিয়েছিলেন দুটি কারণে। এর ফলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভাস্থ সর্বভারতীয় নেতারা স্বচক্ষে দেখতে পাবেন নতুন শিল্প-নগরী দুর্গাপুরে কী কী উন্নয়ন ঘটেছে, আর দ্বিতীয় কারণটি হচ্ছে বাংলার মাটিতে বসে আসামের ভাষা সমস্যার প্রশ্নের সমাধান করবার জন্য জাতীয় সংহতি কমিটির প্রতিবেদন প্রসঙ্গে দ্রুত সিদ্ধান্তে আসতে পারবেন তাঁরা। ২৯ তারিখের সকালে দুর্গাপুরে সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন শুরু হয়ে গেল। আগের দিন সন্ধ্যাবেলা ডাঃ রায় একটি হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে যখন দুর্গাপুর থেকে ১৫ মাইল দূরে রাণীগঞ্জে গিয়েছিলেন, তখন কাছাড়ের বাঙালীদের ওপর গুলিচালনার জন্য ক্ষুব্ধ একদল লোক কালো নিশান হাতে বিক্ষোভ দেখাতে এসে ওঁর গাড়িতে পাথর টাথর ছোঁড়ে। আবার দুর্গাপুরে উত্তেজিত যে সব বিক্ষোভকারী প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য সর্বভারতীয় নেতাদের কাছে দাবি করছিল আসামে কঠোর ব্যবস্থা নেবার জন্য, তাদেরকে প্যাণ্ডেলের বাইরে আটকে দেওয়া হয়েছিল। তাদের অন্যতম শ্লোগান ছিল 'খুনী নেহেরু বাংলা থেকে ফিরে যাও'। কংগ্রেসের বৈঠকে অনিবার্যভাবে নেহেরু প্রসঙ্গটি তুলে বললেন, আমাকে খুনী বলা হচ্ছে। হ্যাঁ খুন করেছি দুর্গাপুরে, কয়েকটি মশা।

যাইহোক, দুর্গাপুরে প্রধানমন্ত্রী যে সব পরামর্শ দিয়েছিলেন, তার মধ্যে একটি হচ্ছে, ভাষার প্রশ্ন এক বছরের জন্য স্থগিত রেখে যে অবস্থা ছিল তাই বজায় রাখতে হবে। এই সময় কোনো আন্দোলনও করা চলবে না, আবার আসাম সরকারও ভাষার প্রশ্নে বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন করার জন্য কোনো ব্যবস্থা নিতে পারবে না। দুর্গাপুরের কংগ্রেস অধিবেশনে সব থেকে গুরুত্বপুর্ণ প্রস্তাব

নেওয়া হয় জাতীয় ঐক্যের প্রশ্নে। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে জাতীয় সংহতি পরিষদের যে প্রতিবেদন পেশ করা হয়েছিল, সেটি বিবেচনা করবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলতে গিয়ে ইউ এন ধেবর মন্তব্য করলেন, জাতি হিসাবে যদি আমাদের বেঁচে থাকতে হয়, তাহলে বর্ণ ধর্ম ও ভাষার ওপর ভিত্তি করার যে সংকীর্ণ চেতনা, তা আমাদের অবশ্যই ছাড়তে হবে। ছেড়ে দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজের সঙ্গে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নিতে হবে।

এই প্রস্তাব সমর্থন করতে উঠে কংগ্রেসের অধিবেশনে তাঁর যে ধারা ছিল ইংরেজীতে ভাষণ দেওয়া, এই প্রথম সেটা বদলে বাংলায় ভাষণ দিলেন ডাঃ রায়। আসামের সাম্প্রতিক গুলি চালনার উল্লেখ করে তিনি বললেন, জাতীয় সংহতির যদি কোনো অর্থ থাকে তাহলে সেটি হলো ব্যক্তির বিকাশের অধিকার, আর সেটা ফলপ্রস্বরূপে আয়ত্ত হয় একমাত্র তার মাতৃভাষার মাধ্যমে। জনগণের মধ্যে জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলায় সাহায্য করা কংগ্রেসেরই কাজ।

দুর্গাপুরে কংগ্রেস হাই কম্যাণ্ড লালবাহাদুর শাস্ত্রীকে ভাষা-সমস্যার সমাধানের সূত্র বার করবার জন্য আসামে যেতে বললেন। শাস্ত্রীও সেইমতো আসামের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরলেন ছ'দিন ধরে। দুই বিবদমান পক্ষের সঙ্গে দেখা করে একটা সিদ্ধান্তেও পৌছলেন। দিল্লী ফেরার পথে দমদম বিমানবন্দরে ডাঃ রায়ের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার কক্ষে বৈঠকে বসলেন জুনের ৬ তারিখে। বিমানবন্দরের বিশেষ কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে ডাঃ রায় সাংবাদিকদের বললেন, আমার মনে হয় শাস্ত্রীজী কতগুলি সমস্যার কিছুটা মীমাংসা করতে পেরেছেন।

এই ৮ দফা শাস্ত্রী-ফরমুলার প্রধান বিষয়গুলি হলো: (১) আসাম ভাষা আইন থেকে মহকুমা পরিষদ সংক্রান্ত ধারা বাদ দিতে হবে। মহকুমা পরিষদ, পৌর পরিষদ, এদের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল, তারা তাদের এলাকায় ইচ্ছা করলে দুইয়ের তিন অংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের ভোটে ভাষা বদল করে নিতে পারবেন। (২) রাজ্যের মহাকরণের সঙ্গে কাছাড় (বাঙালীরা এ জেলায় সংখ্যাগুরু) এবং স্বায়ত্তশাসিত পার্বত্য জেলাগুলির যোগাযোগ চলতে থাকবে ইংরেজীতে, যতদিন না ইংরেজীর বদলে হিন্দী চালু হয়। (৩) রাজ্যস্তরে এখন ইংরেজীই চলতে থাকবে, পরে ইংরেজী চলবে আসামীর পাশাপাশি। (৪) ভারত সরকারের ১৯৫৬র ১৯শে সেপ্টেম্বরের স্মারকলিপি অনুসারে রাজ্যের ভাষাগত সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সংরক্ষিত হবে।

চারদিন পরে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী দলীয় সদস্য, ভাষাবিদ এবং বিরোধী পক্ষের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রকাশ্যে বিবৃতি দিলেন যে, ভাষাগত বিরোধ সংক্রান্ত বিষয়ে শাস্ত্রীজী যে সমাধানের পরামর্শ দিয়েছেন তা যথাযথ এবং মিটমাটের মাধ্যম হিসাবে সবারই এটা মেনে নেওয়া উচিত। এই সঙ্গে তিনি নিজেও ৩টি দফার একটি ফরমূলা দিয়েছিলেন : (১) প্রতি রাজ্যকে বহু ভাষাভাষী রাজ্য হিসাবে ঘোষণা করার প্রয়োজনীয়তা। কোনো রাজ্যে একটির বেশি ভাষা গৃহীত হতে গেলে তা ঐ রাজ্যের পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করবে। (২) ভারত সরকারের ১৯৫৬র সেপ্টেম্বরের স্মারকলিপিতে যে সুপারিশগুলি ছিল তা আরও পরিষ্কার ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিখতে হবে এবং সংখ্যালঘুদের রক্ষার ধারাগুলি বিভিন্ন রাজ্যে যথাযথ পালিত হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষমণ্ডলী গঠন করতে হবে। (৩) ৩৪৭ ধারা অনুসারে বিশেষ কোনো রাজ্যের ভাষাগত সংখ্যালঘুদের রক্ষা করতে হলে ঐ ধারার ভাষাও পালটান হবে, যাতে সংবিধান রচয়িতারা যে ভাবে চেয়েছিলেন সেইভাবে রাষ্ট্রপতি কাজ করতে পারেন। বিরোধীপক্ষের নেতা জ্যোতি বসু ১৩ই জুন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এই বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘ বৈঠক করেছিলেন এবং তিনি মুখ্যমন্ত্রীর ফরমূলায় তাঁর সমর্থন জানিয়েছিলেন।

আসামের উগ্রপন্থীরা শাস্ত্রী ফরমূলায় খুশি হয় নি, তারা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হাইলাকান্দি শহর আক্রমণ করে বাঙালী উদ্বাস্তুদের ঘরবাড়ি ধূলিসাৎ করে দেয়, বহু লোককে আহত করে। পুলিশ গুলি চালাতে বাধ্য হয় এবং তার ফলে সাতজন মারা যায়।

ডাঃ রায়ের ৮০তম জন্মদিনে জাতিকে নিজের বসতবাড়ি উপহার

১৯৫৯ সালে ডাঃ রায় গোপন উইলে তাঁর ভাইপো সুবিমলচন্দ্র রায়কে যে তাঁর স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করেছিলেন সে কথা আগেই উল্লেখ করেছি। জুন মাসে তাঁর সলিসিটার বন্ধু নৃপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রকে ডেকে তাঁর ৩৬নং ওয়েলিংটন স্ট্রীটের বসতবাড়িটির ব্যাপারে নতুন একটা উইল করতে বললেন। সত্যিকার যারা রোগী তাদের উপকারের জন্য এই বাড়িটা জাতির উদ্দেশে দান করে যেতে চাই, এই ছিল তাঁর বক্তব্য।

আমরা অবশ্য এই দানের কথা কয়েক মাস আগে থেকেই জানতাম। তিনি গোপনে তাঁর বাড়ির একটা অংশ আদর্শ এক নার্সিং হোমে পরিবর্তিত করে চলেছিলেন। অন্য অংশে থাকবে কিছু বিনামূল্যের রোগী-শয্যা, সঙ্গে থাকবে রোগ-নির্ণয় রিসার্চ-এর সুযোগ সুবিধা। এটি ছিল তাঁর স্বপ্ন, আর এই স্বপ্নকেই তিনি যথা সত্বর বাস্তবে পরিণত করতে চাইছিলেন।

নার্সিং হোমের পরিচালনার জন্য একটি অবৈতনিক ট্রাস্ট তৈরি হলো। যাঁদের তিনি ট্রাষ্টি নিযুক্ত করেছিলেন, তাঁরা কেউ মন্ত্রিসভার লোক নন, তাঁরা তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু। আর তাঁর পরিবারের প্রতিনিধি হিসাবে ছিলেন সুকুমার রায়। তাঁর জন্মদিনের আগের দিন তিনি সাংবাদিকদের কাছে তাঁর এই দানের কথা ঘোষণা করলেন।

পরদিন অর্থাৎ তাঁর জন্মদিন (১লা জুলাই) বিশেষ জাঁকজমকের সঙ্গে সম্পাদিত হলো। জাতীয় সংস্কৃতি পরিষদ মহাজাতি সদনে একটি বিশেষ সভার মাধ্যমে তাঁকে অভিনন্দনগ্রন্থ উপহার দেবার ব্যবস্থা করলেন। এবারে স্বয়ং রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ এলেন কলকাতায়, অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে ঐ উপহার ডাঃ রায়ের হাতে তুলে দিতে। ডাঃ রায় ও রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রায় ৪০ বছর ধরে পরস্পরের বন্ধুই শুধু নন, রাজেন্দ্রবাবু বড়ো অসুখ বিসুখে পড়লে সব সময়ই ডাঃ রায়ের শরণাপন্ন হতেন। এইখানে প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে, রাজেন্দ্র প্রসাদ ছিলেন হাঁপানীর পুরানো রোগী, আর সেইজন্য ডাঃ রায় তাঁকে একটি বিশেষ ধরনের যন্ত্র দিয়েছিলেন, হাঁপানীর টান উঠলে যা থেকে তিনি নিঃশ্বাস নিতে পারেন।

মহাজাতি সদনের পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ ডাঃ রায়ের হাতে সুদৃশ্য স্মারকগ্রন্থখানি তুলে দিয়ে সেদিন বলেছিলেন, বিধানবাবুর জীবন আমাদের জনগণ বিশেষ করে তরুণদের কাছে শিক্ষাস্থল হয়ে থাকা উচিত। যেদিকেই তিনি কাজ করতে চেয়েছেন, সেদিকেই তিনি উন্নতি করেছেন অধ্যবসায় ও কঠিন শ্রম দিয়ে।

ডাঃ রায় জনগণের ভালোবাসা ও প্রীতির প্রকাশ এবং রাষ্ট্রপতির অভিনন্দনের উত্তরে যখন উঠে দাঁড়ালেন, তখন তিনি অভিভূত, চোখে জল। বললেন, রাজ্যের সেবায় মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে যদি আমি সাফল্য লাভ করে থাকি তাহলে তার মূলকথা হচ্ছে আমি জনগণের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করতে পেরেছিলাম, যেমন পেরেছিলাম রোগীর সঙ্গে চিকিৎসক হিসাবে।

এই অনুষ্ঠানে তাঁর ছাত্রদের একজন তাঁকে একটি সোনার স্টেথিস্কোপ উপহার দিয়েছিলেন।

এই অনুষ্ঠান ইত্যাদির আগে রাজ্য কংগ্রেস সংসদীয় বোর্ড মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে সাপ্তাহিক বৈঠকে বসেছিলেন। বিষয় ছিল ১৯৬২র সাধারণ নির্বাচনের জন্য প্রার্থী বাছাই করা। এই সময় একটা গুজব রটে যায় যে, ডাঃ রায় রাজনীতি থেকে অবসর নিচ্ছেন। প্রাদেশিক কংগ্রেসের একটা গোষ্ঠী এই সময় এই দিকে কাজও শুরু করে দিয়েছিল, কিন্তু দিল্লী তার আঁচ পেয়ে নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা থেকে তাদের দূরে থাকতে নির্দেশ দিলেন, ডাঃ রায় যতদিন কার্যক্ষম আছেন ততদিন এ নিয়ে চিন্তা বৃথা। এইভাবে ষড়যন্ত্র অংকুরেই বিনষ্ট হলো। একদিন সকালবেলা বোর্ড কলকাতার অসুবিধাজনক নির্বাচনকেন্দ্রগুলির জন্য প্রার্থী বাছাই করছিলেন, ডাঃ রায় বৌবাজার কেন্দ্র থেকে তাঁর নিজের নির্বাচনকেন্দ্র চৌরঙ্গিতে সরিয়ে আনতে চান বললেন আর বললেন বাঁকুড়ার অনুন্নত এলাকা শালতোড়া থেকেও তিনি একই সঙ্গে দাঁড়াতে চান। বোর্ডের এক মাতব্বর তাঁর নির্বাচনকেন্দ্র বদল ও একই সঙ্গে দুটি নির্বাচনকেন্দ্র থেকে দাঁড়ানোর ব্যাপারটায় আপত্তি করলেন, যদিও ভোটে তাঁর আপত্তি টিকলো না, কারণ সবাই বুঝলেন নেতার নির্বাচনের ব্যাপারে কোনরকম ঝুঁকি নেওয়া চলতে পারে না। ডাঃ রায়কে সমর্থন জানালেন সবার আগে প্রফুল্লচন্দ্র সেন।

ভারতের বাইরে সফর

১লা জুলাই তাঁর জন্মদিনের অনুষ্ঠান সেরে ডাঃ রায় বাড়ি ফিরলেন সন্ধ্যাবেলা। আর ফিরেই তাড়াতাড়ি পোষাক পালটালেন, রাতের আহার সারলেন, তারপরে ছুটলেন বিমান বন্দরের দিকে, ৩৭ দিনের জন্য ভারতের বাইরে সফরে যাবেন বলে। তাঁর বিমান দমদম ছাড়লো রাত ৯টা ৫০ মিনিটে।

লণ্ডনে তিনি ছিলেন ১১ দিন। সেখান থেকে আমরা খবর পেলাম, তিনি পাঁচজন নাম করা চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করেছেন। তাঁরা বলেছেন চিকিৎসার জন্য এখানে থাকার মেয়াদ বাড়িয়ে দেবার মতো কোন অবস্থা তাঁর ঘটেনি, এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা

নাইডুও তখন অসুস্থতানিবন্ধন ছিলেন লণ্ডনে। বিশেষজ্ঞদের দিয়ে তাঁকে পরীক্ষা করানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন ডাঃ রায়। যাইহোক, ডাঃ রায় লণ্ডন থেকে গেলেন পোল্যাণ্ড। ১লা আগষ্ট সেখানে তিনি পোল্যাণ্ড ও ভারতের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতার সম্প্রসারণের বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেন। বিশেষ করে বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক বিষয়সমূহের মন্ত্রিদের সঙ্গে আলোচনা করলেন পশ্চিমবঙ্গের কয়লা শিল্পের জন্য পোল দেশীয় যন্ত্রপাতি আমদানী সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে। চারদিন ওখানে থাকবার পর ডাঃ রায় পোল্যাণ্ডীয় বৈদেশিক বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে একটি স্মারকলিপিতে স্বাক্ষর করলেন, যাতে পোল্যাণ্ড পশ্চিমবঙ্গে কয়লাখনির পুরো যন্ত্রপাতি সরবরাহ করতে রাজী বলে লিপিবদ্ধ হলো। ডাঃ রায় তাঁর বিশেষজ্ঞদের নিয়ে বিভিন্ন কয়লাখনি দেখলেন, দেখলেন ওখানে যে সব যন্ত্রপাতি লাগানো হয়েছে সেগুলো। পোল্যাণ্ড থেকে জার্মানী হয়ে ডাঃ রায় গেলেন নিউইয়র্ক। অন্যান্যদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ করিয়ে দেবেন বলে সংসদ সদস্য এম পি সুধীর ঘোষ আগেই ওখানে পৌঁছেছিলেন। শ্রীঘোষ ডাঃ রায়ের সঙ্গে বৈঠকের ব্যবস্থা করিয়ে দিলেন রাষ্ট্রসংঘের বিশেষ তহবিলের অধিকর্তা আর্থার গোল্ডস্মিথ এবং রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন এজেন্সির সংশ্লিষ্ট অফিসারদের সঙ্গে। বৈঠকের বিষয়বস্তু ছিল কলকাতার উন্নয়ন প্রকল্প ও জল সরবরাহ। কলকাতার ৩০০ বর্গমাইলব্যাপী মাষ্টার প্ল্যান তৈরির জন্য ফোর্ড ফাউণ্ডেশন ১.৪ মিলিয়ন ডলার অনুদানের অনুমোদন দিয়েছিলেন একথা আগেই বলেছি। ডাঃ রায় রাষ্ট্রসংঘের বিশেষ তহবিল থেকে জোগাড় করলেন আরও ৩,৩০,০০০ ডলার, বৃহত্তর কলকাতায় কারিগরী ব্যবস্থা, জল সরবরাহ, ময়লা নিষ্কাশন ও পয়ঃপ্রণালী সংক্রান্ত কাজকর্মের জন্য।

৭ই আগস্ট হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেণ্ট কেনেডির সঙ্গে দেখা করলেন ডাঃ রায়। ইউনাইটেড স্টেট্‌সের সিনেটের বৈদেশিক সম্পর্ক-পরিষদের সভাপতি জে ডাবলিউ ফুলব্রাইট তাঁকে ও সুধীর ঘোষকে বৈদেশিক সম্পর্ক-পরিষদ কক্ষে মধ্যাহ্ন-আহারে আপ্যায়িত করলেন। কলকাতার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে চূড়ান্ত আলোচনা হলো। সেনেটর ফুলব্রাইট এই বৈঠকে প্রকাশ করলেন, প্রেসিডেণ্ট কেনেডি নিজেই ডাঃ রায়কে অভ্যর্থনা জানাতে চেয়েছিলেন। এইসব বৈঠকের প্রসঙ্গে বলে রাখি—ডাঃ রায়ের চিকিৎসক হিসাবে খ্যাতি এতদূর

ব্যাপ্ত ছিল যে প্রেসিডেণ্ট কেনেডি শুধু তাঁর সঙ্গে সৌজন্যমূলক বা দেশসংক্রান্ত আলোচনাই করেন নি, তিনি রোগী হিসাবেও নিজেকে উপস্থিত করেছিলেন ডাঃ রায়ের কাছে। প্রেসিডেণ্ট কেনেডির আর্থ্রাইটিস রোগ ছিল, আমি শুনেছি, ডাঃ রায় তাঁকে পরীক্ষা করে চিকিৎসার ব্যবস্থাপত্রও দিয়ে এসেছিলেন।

এইখানে আবার সরাসরি আমাদের দেশের কথায় ফিরে আসি। মুখ্যমন্ত্রী ইয়োরোপে চলে যাবার পর নেহেরুর দুটি চিঠি এসেছিল। দুটিরই প্রধান বিষয় ছিল জাতীয় সংহতি। তাঁর মতে এটিকে পার্টির স্তরে বিবেচনা করলে হবে না, এর নামই বলছে কোন্ স্তরে একে দেখতে হবে। এ হচ্ছে জাতীয় সমস্যা, জাতীয় স্তরেই এর সমাধান করতে হবে।

আরেকটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পঠন-পাঠনের জন্য যদি স্থানীয় ভাষা গ্রহণ করে তাহলে পরস্পর থেকে তারা ক্রমশই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। কী অধ্যাপক কী শিক্ষক, কী অন্যান্য কর্মচারী কাউকেই সহজে বিনিময় করা যাবে না এবং সাধারণ ভাবে যে দৃষ্টিভঙ্গি এই পারিপার্শ্বিকতার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠবে, তা হবে সংকীর্ণ এবং কিছুতেই ততটা সর্বভারতীয় নয়।

যাই-হোক, ৬ই আগস্ট আমেরিকা থেকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিবের কাছে একটি তারবার্তা এসে পৌঁছলো এই মর্মে যে মুখ্যমন্ত্রী বোম্বাই হয়ে পালাম বিমানবন্দরে পৌঁছচ্ছেন ১১ই আগস্ট ; আমাকে এবং তাঁর রক্ষী অফিসারকে দিল্লীতে পাঠানো হোক একদিন আগে। আমরা সেই মতো তৈরি হলাম দিল্লী যাবার জন্য। মুখ্যসচিব আর গুপ্ত বিমানে রওনা হয়ে গেলেন জাতীয় সংহতি বৈঠকের জন্য দরকারী কাগজপত্র সঙ্গে নিয়ে। পালাম বিমান-বন্দরে যাঁরা ডাঃ রায়কে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন অতুল্য ঘোষ, প্রফুল্লচন্দ্র সেন এবং মুখ্যসচিব।

বিমান থেকে প্রথমেই নেমে এলেন ডাঃ রায়। বোম্বাইতে তিনি পোষাক বদলে নিয়েছিলেন—এখন পোষাক-আশাকে তিনি খাঁটি বাঙালী। অবাক হয়ে এই প্রথম দেখলাম, তিনি একটি ছড়ি ব্যবহার করছেন। লাউঞ্জের অপেক্ষমান বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করে আমাদের হাতে লাগেজের টিকিটপত্র দিয়ে সোজা চলে গেলেন দিল্লীতে—যাঁর বাড়িতে বরাবর উঠতেন সেই ডাঃ জে পি গাঙ্গুলির বাড়িতে। এখানে কয়েক মুহূর্ত কাটিয়েই তিনি চলে গেলেন জাতীয় সংহতি বৈঠকের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে যোগ দিতে। তিনি

যখন ভিয়েনায় ছিলেন, তখন তাঁকে জানানো হয়েছিল যে ১০ই থেকে ১২ই আগস্ট পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীদের কন্‌ফারেন্স বসবে। তিনি এই তারিখ বদলে ১২ই আগস্ট করবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী ২১শে জুলাই তাঁকে একটি চিঠিতে জানিয়েছিলেন, নানা কারণে এই তারিখ বদলানো সম্ভব নয়। অথচ ডাঃ রায়কে ছাড়া এই বৈঠক অর্থহীন। তাই তাঁকে অন্তত ১১ তারিখ সকালবেলা এসে পৌছতে অনুরোধ করেছিলেন নেহেরু। সেই মতো অতো তাড়াতাড়ি ডাঃ রায় আমেরিকা থেকে ছুটে এসেছিলেন দিল্লী। তাঁর ইচ্ছা ছিল সরাসরি কলকাতায় আসা, কিন্তু সেটা আর হয় নি, আগে গিয়ে পৌছতে হয়েছিল দিল্লী।

তিন দিনের কন্‌ফারেন্স শেষ হলো ১২ই আগস্ট। এই বৈঠক সুদূরপ্রসারী এক সিদ্ধান্ত নিলেন এই বলে যে, সারা দেশে একটি সাধারণ বর্ণমালা থাকবে আর সেটা হবে হিন্দী, ধাপে ধাপে তার প্রবর্তন করতে হবে। পরে আরও বড়ো একটা বৈঠক ডাকা হবে—স্থির হলো, তাতে সর্বমতের প্রতিনিধিরা থাকবেন। থাকবেন রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, শিক্ষাক্ষেত্র প্রভৃতি দিকের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। ভাষার প্রশ্নে সিদ্ধান্ত হলো, রাজ্যে যে ভাষা আছে সেটাই থাকবে, তবে কোনো জেলায় যদি ৬০ শতাংশ ও তারও বেশি ভাষাগত দিক থেকে সংখ্যালঘু থাকে, তাহলে সেই জেলায় সরকারী ভাষা হিসাবে আরও একটি ভাষা থাকবে, সেটি হচ্ছে ঐ জেলার ভাষা। জাতীয় সংহতি সম্পর্কে বৃহত্তর বৈঠক কেন ডাকা হবে সেই বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীদের একটি করে চিঠি দিয়েছিলেন ১৩ই আগস্ট। চিঠিখানা হলো এই :

প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী,

জাতীয় সংহতি বিষয়ে যে বৈঠক এখানে বসেছিল তাতে আপনারা উপস্থিত ছিলেন এবং তিন দিন ধরে সংশ্লিস্ট বিষয়গুলি নিয়ে আপনারা আলোচনাও করেছিলেন। বলা বাহুল্য যে, এই সভায় আমরা যারা উপস্থিত ছিলাম, বিষয়টির গুরুত্ব অনুভব করতে পেরেছি। যে কাজ আমরা করেছি আমার মনে হয় তা বৈশিষ্ট্যপুর্ণ এবং তা উপকারেই আসবে। কিন্তু আমরা প্রকৃত প্রস্তাবে এই সমস্যার কয়েকটি দিক নিয়েই আলোচনা করেছি মাত্র, আমাদের আবার মিলিত হতে হবে অন্যান্য দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করবার জন্য।

আমি এখন আপনাকে লিখছি, বৈঠকের শেষের দিকে আমি যা বলেছিলাম তার প্রতি আপনার দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করতে চাই বলে। যা বলেছিলাম সেটা হচ্ছে, জাতীয় সংহতির প্রশ্নটিকে বিবেচনা করতে হবে জাতীয় স্তরে, আর সেজন্য এই উদ্দেশ্যে একটি বৃহত্তর বৈঠক ডাকা বাঞ্ছনীয়। এই বৈঠকে অবশ্যই আমি চাইবো আপনারা আসুন। মুখ্যমন্ত্রীরা ছাড়াও আমি আমন্ত্রণ জানাতে চাইবো সংসদের বিভিন্ন দলের নেতৃস্থানীয় সদস্যদের এবং প্রখ্যাত ব্যক্তিদের, তাঁদের মধ্যে থাকবেন শিক্ষাবিদ, বৈজ্ঞানিক এবং অন্যান্য জীবিকার মানুষ।

আমি চাই না যে এই বৈঠক খুব বৃহৎ একটা ব্যাপার হোক। সরকারের বাইরে আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের সংখ্যা একশর বেশি হওয়া উচিত নয়। আমি আপনাকে পরামর্শ দিতে বলবো কাদের আমরা এই বৈঠকে আমন্ত্রণ জানাতে পারি, প্রধানত আন্তঃরাজনৈতিক ব্যক্তিগণ জীবনে যাঁদের গুরুত্ব আছে অথবা আছে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও অন্যান্য জীবিকার ক্ষেত্রে। সীমিত সংখ্যার জন্য হয়ত যাদের নাম আপনি পাঠাবেন, তাদের সবাইকে আমি আমন্ত্রণ জানাতে পারবো না কিন্তু তবু আমি এই ব্যাপারে আপনার সাহায্য চাই। দ্রুত উত্তর পেলে কৃতজ্ঞ থাকবো।

আমার মনে হয় এই বৈঠকের উপযুক্ত সময় হচ্ছে সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহের কোনো দিন। আশা করি এই সময়টা আপনার পক্ষে দেওয়া সম্ভবপর হবে। বৈঠকের কাল বিলম্বিত হোক এ আমি চাই না। কিন্তু আগস্টে এটা হওয়া কঠিন, আমি নিজেই ভারতের বাইরে যাচ্ছি ৩০শে আগস্ট, আর ফিরছি সম্ভবত সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি। সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সভা বসছে অক্টোবরে। এই সময়ের আগে আমাদের ঐ বৈঠকটা হলে ভালোই হয়।

আপনার বিশ্বস্ত

জওহরলাল

ডাঃ রায় দিল্লী থেকে কলকাতা আসবার জন্য সকালের একটি বিমান ধরলেন। আগের রাত্রিতে জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা কীভাবে ফিরছি। আমরা বললাম ট্রেনে বার্থ রিজার্ভ করা আছে। উনি বললেন, না না, তোমরা প্লেনে চলো আমার সঙ্গে।

কিন্তু প্লেনে যে আসবো আমাদের সঙ্গে টাকা কই? এয়ারলাইনের লোকেরা আমাদের কিন্তু উপকার করেছিল। যখন শুনলো যে আমরা ডাঃ রায়ের কর্মচারী তখন তারা ধারে আমাদের টিকিট দিতে দ্বিধা করলো না, আমরাও ট্রেনের বদলে প্লেনে করে কলকাতায় ফিরে এলাম।

কয়লাখনিগুলোর ওপর রাজ্যের অধিকার

১৬ই আগস্ট মহাকরণে কলকাতার সাংবাদিকদের কাছে ডাঃ রায় ইয়োরোপে ও আমেরিকায় তিনি কী কী কাজ করে এসেছেন সে সম্বন্ধে কিছু কিছু বললেন। তাঁর প্যারিস সফরের উদ্দেশ্য ছিল ফ্রেঞ্চ মেট্রো কোম্পানী ও ফরাসী সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা, যাতে তারা কলকাতার ভূগর্ভস্থ পথ সংক্রান্ত পরিকল্পটি তাড়াতাড়ি শুরু করে দেয়। তাঁর মাথায় ছিল কলকাতার পাতাল রেলের সঙ্গে বড়ো গঙ্গা বা হুগলি নদীর ভিতর দিয়ে একটা টানেল তৈরি করা—কলকাতার সঙ্গে হাওড়ার যোগ হবে এইভাবে, আর তার ফলে যানবাহন-চলাচলের সমস্যার অনেকটা সমাধান হবে। আমি বোধ হয় আগে বলেছি, তাঁর চেষ্টায় বছর দশেক আগে ঐ ফরাসী কোম্পানী কলকাতার ভূগর্ভস্থ পথ সম্পর্কে দশ ভল্যুমের একটা পরিকল্প তৈরি করেছিল যেটা বিদেশী মুদ্রার অভাবে রূপায়িত করা যায় নি।

যা-ই হোক, ডাঃ রায়ের এই সাংবাদিক বৈঠকের ফলে কাগজে যা বেরিয়েছিল সে সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে আগ্রহ দেখা দিলো প্রচুর। আর তাই কলকাতার শেরিফ একটি জনসভা ডাকলেন ডাঃ রায়কে শুধু অভিনন্দন জানাবার জন্য নয়, জনসাধারণ যাতে তাঁর নিজের মুখে শুনতে পারে উন্নয়ন সম্পর্কিত কথাবার্তা, সেই জন্য। এই বৈঠকে ডাঃ রায় জোর দিলেন পশ্চিম-বঙ্গের কয়লা-সম্পদের ওপর। বললেন, প্রত্যেকের বোঝা উচিত যে পশ্চিম-বঙ্গের একমাত্র সম্পদ হচ্ছে কয়লা, যার ওপর পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি আবার গড়ে তোলা যায়। পশ্চিমবঙ্গের মাটির নিচে রয়েছে একহাজার মিলিয়ন টন কয়লা। পশ্চিমবঙ্গ এর খোঁজ করতে চেয়েছিল, কিন্তু তখন প্রশ্ন দাঁড়ালো এটা করবে কে? জাতীয় কয়লা উন্নয়ন বোর্ড (কারণ কয়লা হলো কেন্দ্রীয় সরকারের বিষয়) না পশ্চিমবঙ্গ সরকার?

এইখানে একটু থেমে, তিনি সভার শ্রোতাদের জানালেন, আমি কেন্দ্রকে

বলে দিয়েছি—কয়লা হচ্ছে রাজ্যের সম্পত্তি আর সেজন্য রাজ্যই ও কাজটা করবে, কারণ বাংলার পক্ষে এ হচ্ছে জীবন-মরণের প্রশ্ন। আগামী পাঁচ বছরে রাজ্যে বহু শিল্প গড়ে উঠবে, আর তার জন্য চাই পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ শক্তি।

মুখ্যমন্ত্রী প্রসঙ্গক্রমে আরও জানালেন, বর্তমানে বিদ্যুৎ-শক্তিকে বাড়াবার কর্মসূচি আমাদের আছে। গ্রামের মানুষদের কোক কয়লা দিতে হবে। রাসায়নিক সার তৈরি করার জন্যও কয়লা তোলা দরকার। এজন্য কারখানা তৈরি করতে হবে—যেখানে কয়লাকে কোক কয়লায় পরিণত করতে পারা যাবে। আমার বাইরে যাবার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল এর জন্য যন্ত্রপাতি জোগাড় করা। কয়লা যদি তোলা যায় তাহলে সব কিছুই হবে।

এর আগে তিনি বাণিজ্য ও শিল্প বিভাগের অধীনে একটি খনি-সংক্রান্ত অধিকার (ডিরেকটরেট) তৈরি করে একজন খনি-সংক্রান্ত উপদেষ্টা নিয়োগ করেছিলেন। রাজ্যের সরকারী ক্ষেত্রে কয়লা, পাথর, ডলোমাইট, চায়না ক্লে প্রভৃতি বিভিন্ন খনিজ পদার্থগুলিও কাজে লাগানোই হচ্ছে এই বিশেষ বিভাগের কাজ। কয়লা খনি সম্পর্কে তাঁর মত ছিল এই যে, খনিগুলিকে নতুন করে লীজ দেওয়া বা নতুন খনি খোলা—এ সব হচ্ছে রাজ্য সরকারের অধিকারভুক্ত। রাজ্য সরকারই লাইসেন্স দেবে, রাজ্য সরকারই পুরানো খনির লীজ ফুরিয়ে গেলে রয়্যালটির পরিমাণ ঠিক করে দেবে। রাজ্য সরকারের অধিকার সাব্যস্ত করবার জন্য তিনি ইয়োরোপ যাবার আগে দিল্লীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে বেশ কয়েকখানা চিঠি লিখেছিলেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় ঐ বিভাগটি বাংলার দাবি পূরণ করতে ইচ্ছুক নয় দেখে তিনি প্রধানমন্ত্রীকে প্রতিবাদ-পত্র না লিখে পারেন নি। ২৩শে জুন তারিখে লেখা ঐ পত্রে ডাঃ রায় যুক্তি দিয়ে তাঁর মতটাকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। এবং সে যুক্তি ছিল অকাট্য। পরিশেষে তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন, যে সব রাজ্যে কয়লা আছে, সে সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের নিয়ে অবিলম্বে একটি বৈঠক ডাকা হোক—তোমার স্তরে ঐ নিয়ে আলোচনা হোক এবং এর পুরোপুরি মীমাংসা হোক।

বলা বাহুল্য, এ নিয়ে তিনি কেন্দ্রের ওপর ক্রমাগত চাপ দিয়ে গেছেন এবং সাফল্য যখন হাতের কাছে, এমন সময় মৃত্যু এসে তাঁকে হঠাৎই ছিনিয়ে নিয়ে গেল। তাঁর মৃত্যুর কয়েক মাসের মধ্যে খনিবিভাগের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কলকাতায় বৈঠকে বসেছিলেন। দিল্লীর চাপের কাছে শেষ পর্যন্ত রাজ্য সরকার

অবশ্য নতি স্বীকার করলেন এবং কয়লা খনির ওপর রাজ্যের অধিকার নিয়ে ডাঃ রায় যে কঠোর লড়াই চালিয়ে গিয়েছিলেন, সেটাকে ধামা চাপা দিলেন। সবাই বলতো, ডাঃ রায় যদি আর কয়েকটা মাস বেঁচে থাকতেন তাহলে কয়লা কেন্দ্রের না হয়ে রাজ্যের বিষয় হয়ে দাঁড়াতো আর কয়লার অধিকার পেলে বাংলার অর্থনীতি উন্নতির সৌধচূড়ায় গিয়ে পৌঁছতো।

বিদেশ সফরের খরচপত্র

কলকাতায় ফিরে আসার পর ডাঃ রায় নেহেরুকে একটা চিঠি লিখেছিলেন। বিদেশে তাঁর চিকিৎসায় ডাঃ রায় যাতে ১২০০ পাউণ্ড খরচ করতে পারেন তার অনুমতি চেয়েছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রণালয়ের কাছে কিন্তু তাঁরা তা দিতে চান নি। এই নিয়েই তাঁর চিঠি।

কলকাতা
১৮ই আগস্ট ১৯৬১

ব্যক্তিগত

প্রিয় জওহরলাল,

আমার বিদেশ সফরের ব্যয়-সংক্রান্ত হিসাব এই সঙ্গে পাঠালাম। এ সব বিষয় নিয়ে তোমাকে বিব্রত করতে চাই না, কিন্তু অর্থ মন্ত্রণালয় যে বিপুল অসুবিধার সৃষ্টি করে বসেছিলেন, তাতে মনে হয়েছিল প্রকৃত অবস্থাটা তোমাকে জানিয়ে রাখাই সব থেকে ভালো।

আমি চিকিৎসার জন্য যখন ইয়োরোপ যাওয়া মনস্থ করলাম, তখন ডাক্তারদের বললাম বিদেশে চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যাপারে আমার কতো বিদেশী মুদ্রার দরকার হতে পারে আমাকে পরীক্ষা করে সেই মর্মে একটা সার্টিফিকেট দিতে।

তারা আমাকে সার্টিফিকেট দিলো এই বলে যে আমার দরকার হবে ১২০০ পাউণ্ড। কিন্তু অর্থ মন্ত্রক বা মন্ত্রণালয়ের লোকজনদের যেভাবেই হোক ধারণা হয়েছিল যে তারা ডাক্তারদেরও থেকে বেশি জানে, আর সেই জন্য তারা প্রশ্ন করলো ৬০০ পাউণ্ডে চলবে কি না? আমি উত্তরে লিখলাম, আমার পক্ষে কতো টাকা লাগবে তা ধারণা করা সম্ভব নয়, বিশেষ করে যেখানে

ডাক্তারেরা বিদেশী মুদ্রার সুপারিশ করে সার্টিফিকেট দিচ্ছে। তারা যা সুপারিশ করবে আমাদের তাই মেনে নিতে হবে এটাই হচ্ছে আইন। অবশ্য টাকাটা দেবো আমি, কেন্দ্রীয় সরকার শুধু বিদেশী মুদ্রার ব্যবহারের অনুমতিটুকু দেবে। আমি তাদের এ-ও বলেছিলাম, আমি যতটা পারি টাকা বাঁচাতে চেষ্টা করবো কারণ বিদেশী মুদ্রার খরচ যতটা পরিহার করা যায় ততই ভালো। আমি ডাক্তারী পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছিলাম কোথায় কোথায় জানো? ইংলণ্ডে সুইজারল্যাণ্ডে ভিয়েনায় পশ্চিম জার্মানী এবং পোল্যাণ্ডে। আর যদি সম্ভব হয় ত প্যারিসে। লণ্ডনে আমাকে পরীক্ষা করেছিল পাঁচজন ডাক্তার, সুইজারল্যাণ্ডে একজন ও ভিয়েনায় একজন। এদের মতামতে আমি এই বুঝেছিলাম যে আর কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষার দরকার নেই; এরা সবাই এক কথাই বলেছিল। সেজন্য আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, প্যারিসে অথবা পোল্যাণ্ডে কোনো বিশেষজ্ঞ দেখিয়ে দরকার নেই। এই ডাক্তাররা আমার কাছে পরীক্ষা বাবদ কিছু তো নিলোই না, এমন কি রোগটাকে ঠিক ঠিক ধরবার জন্য যে সব রক্ত-পরীক্ষা, এক্স-রে ইত্যাদি করিয়েছিল, তারও টাকা নিলো না। এরা আমার কৃতজ্ঞতাভাজন। এদের জন্য আমি কিছু টাকা বাঁচাতে পেরেছি। আমি প্রায় এক হাজার পাউণ্ড ফিরিয়ে এনেছি।

একটা স্তরে এমন হয়েছিল যে সেক্রেটারিয়েট অফিসারদের একজন আমাকে লিখে বসেছিল যে প্রথম দফায় অর্ধেক টাকা নিলে আমার চলবে কি না, পরে যদি দরকার পড়ে তখন না হয় আরও টাকা মঞ্জুর করা যাবে। আমি এই সর্তে রাজী হই নি, কারণ ডাক্তাররা যদি তাদের পারিশ্রমিক চাইতো তাহলে আমি মুশকিলে পড়তাম। এ শুধু ব্যক্তিগতভাবে আমিই মুশকিলে পড়তাম তাই নয় সারা দেশের পক্ষেই একটা হীনতার সৃষ্টি হতো। আমি তোমাকে এ সব লিখছি শুধু তোমার অবগতির জন্য।

ওয়াশিংটনে বিশ্বব্যাংকের চেয়ারম্যানের সামনে বিশ্বব্যাংকের একজন সদস্য মিঃ রুশিনিস্কি কী বলেছিলেন সে বিষয়ে আমি মোরারজীকে একটি চিঠি লিখেছিলাম, সেই চিঠির একটি কপিও আমি তোমাকে পাঠালাম। এটা একেবারেই অযাচিত ও অবাঞ্ছিত।

তোমার স্নেহভাজন,
বিধান

নতুন দিল্লী ২১শে আগষ্ট ১৯৬১

প্রিয় বিধান,

তোমার ১৮ আগস্টের চিঠি, যাতে তুমি বিদেশে তোমার খরচপত্র ও প্রায় এক হাজার পাউণ্ড বাঁচানোর কথা বিস্তৃত ভাবে লেখবার কষ্ট স্বীকার করেছো তার জন্য ধন্যবাদ। আমাকে স্বীকার করতেই হবে, এই টাকা বাঁচানোর ব্যাপারে তুমি বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেছো।

আমি বুঝতে পারি না রুশিনিস্কি কী করে কলকাতা সম্পর্কে ঐ রকম বিবৃতি দেয়? আমরা সত্যি সত্যি যা করতে যাচ্ছি ঐ বিবৃতি তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

তোমার স্নেহভাজন,

জওহর

পাটশিল্পে সংকট

১৯৬০-৬১তে পাটশিল্পে একটা সংকট দেখা দিলো। কাঁচা পাটের দামে প্রচণ্ডভাবে তারতম্য ঘটলো, যার ফলে পাট চাষীরা ভয় পেয়ে গেল আর সেজন্য বাজারে পাটেরও অভাব পড়ে গেল। বিদেশী মুদ্রা অর্জনের দিক থেকে পাট ছিল অন্যতম বস্তু, সব থেকে বেশি শ্রমিক কাজ করতো এই শিল্পের ক্ষেত্রে। পাটকলগুলো পাটবোনা যন্ত্র বন্ধ করে দিতে লাগলো, কাজের সময় কমিয়ে দিতে লাগলো অথবা কিছুদিনের জন্য পুরোপুরি কারখানা বন্ধ করে দিতে লাগলো, যার ফলে পাটকলের শ্রমিকদের কষ্টের আর সীমা রইলো না। দেশ বিভাগের সময় পশ্চিমবঙ্গে পাট তৈরি হতো বার্ষিক প্রায় ছ লক্ষ গাঁট, যেটা পরে বেড়ে হয়েছিল ২০.৮৯ লক্ষ গাঁট। কিন্তু দাম কমে যাওয়ার জন্য পাটের চাষ ১৯৫৫-৬০এ যেখানে হয়েছিল ৮.২৪ লক্ষ একর, সেখানে ১৯৬০-৬১তে কমে গিয়ে দাড়ালো ৭.২০ লক্ষ একর। চাষের পরিমাণ যখনই বাড়তো তখনই দাম কমে যেতো, আর চাষীরা ভয় পাবার দরুন যখন চাষের পরিমাণ কমে যেতো তখন শিল্পে দেখা দিতো সংকট।

মুখ্যমন্ত্রী ভারতীয় পাটকল সমিতির প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে বসে এই সংকট মোচনের জন্য তিন দফার একটি ফরমূলা দিলেন। (১) চাষীদের একটা নির্দিষ্ট দাম দিতে হবে যাতে তারা চাষের খরচ, জমির ভাড়া, বেতন, যানবাহনের

ব্যয় ইত্যাদি সংকুলান করতে পারে আর তার সঙ্গে কিছু যেন মুনাফাও পায়। (২) পাটকল মালিকরা ও সরকার একটি বাফার স্টক বা সংকটকালীন ভাণ্ডার সৃষ্টি করবেন এবং কিছু পরিমাণ মূল্য-সমর্থন (প্রাইস সাপোর্ট) দেবেন। (৩) পাটচাষীদের চাষ বাড়ানোর জন্য দরকারী সরঞ্জাম ও জিনিসপত্র দিয়ে উৎসাহিত করতে হবে। এই সঙ্গে তিনি সতর্ক করতেও ভুললেন না যে, ভারতের সব থেকে বড়ো প্রতিযোগী হচ্ছে পাকিস্তান। তাদের আধুনিক যন্ত্রপাতি-সম্বলিত নতুন নতুন পাটকল হয়েছে, যদিও তাদের কলের উৎপাদনের পরিমাণ সীমিত।

ডাঃ সুবোধ মিত্রের মৃত্যু

৫ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যাবেলা মুখ্যমন্ত্রী যখন গাড়ি থেকে নামলেন আমি তাঁকে ভিয়েনা থেকে আগত একটি তারবার্তা দিলাম যাতে ডাঃ সুবোধ মিত্রের মৃত্যুর খবর ছিল—আগের রাত্রে ভিয়েনাতে হৃদরোগে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। চিত্তরঞ্জন সেবা সদন ও ক্যান্সার হাসপাতাল সংগঠনের ব্যাপারে ডাঃ মিত্র ছিলেন ডাঃ রায়ের দক্ষিণ হস্ত বিশেষ। ডাঃ মিত্র ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং একজন প্রখ্যাত ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ। তিনি ভিয়েনা গিয়েছিলেন একটা কন্‌ফারেন্স বা বৈঠকে যোগ দিতে। বলা বাহুল্য, ডাঃ মিত্রের পরিবারের লোকজন এবং অনুরাগীরা তাঁর মৃতদেহ কলকাতায় আনবার জন্য ব্যগ্র ছিলেন, কিন্তু এজন্য বিদেশী মুদ্রার মঞ্জুরী চাই। মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী মোরারজী দেশাইয়ের সঙ্গে দিল্লীতে টেলিফোনে যোগাযোগ করে ঐ টেলিফোনেই প্রয়োজনীয় মঞ্জুরীর ব্যবস্থা করলেন। উপাচার্যের মরদেহ বহন করে নিয়ে আসার সমস্ত খরচ যোগালেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

সরকারী ভাষা হিসাবে বাংলা

সব থেকে উল্লেখযোগ্য যে সব ব্যবস্থা নিয়েছিলেন রাজ্য সরকার, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে 'পশ্চিমবঙ্গ সরকারী ভাষা-বিল ১৯৬১' পাস। এই বিলেই বাংলা ভাষাকে সরকারী কাজে ব্যবহার করার নির্দেশ রয়েছে। বিনা বাধায় বিলটি বিধানসভায় পাস হয়ে গেল ২৫শে সেপ্টেম্বর। এর মধ্যে সরকারী ভাষা হিসাবে বাংলার পাশাপাশি নেপালী ভাষারও স্থান রইলো—দার্জিলিং জেলার

তিনটি মহকুমা দার্জিলিং, কালিম্পঙ ও কার্শিয়ং-এ ব্যবহার করার জন্য। বিধানসভায় এই বিল উঠলে বাংলা ভাষার মহিমা কীর্তন করে জ্যোতি বসু যে আবেগময় ভাষণ দিয়েছিলেন তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই বই লেখবার সময়ও দেখছি, ৩০ বছর পরে বিধানসভায় ইংরেজীর বদলে বাংলায় ভাষণ দেওয়ার রেওয়াজ হয়েছে, কিন্তু সরকারী নথিপত্রে ইরেজী সরিয়ে বাংলা এখনো তার স্থান করে নিতে পারে নি।

সেপ্টেম্বরের শেষে মুখ্যমন্ত্রী বিমানে দিল্লী গেলেন জাতীয় সংহতি বৈঠকে যোগ দেবার জন্য। কন্‌ফারেন্স বা বৈঠকের উদ্বোধন করলেন উপরাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণ। বৈঠকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীরা ছাড়াও বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাঁরা দিকপাল হয়েছেন সেই সব নেতৃবৃন্দও ছিলেন। নেহেরু তাঁর ভাষণে চারটি শয়তানির বিষয় উল্লেখ করলেন যা দেশ জুড়ে বসে আছে। সেগুলি হলো সাম্প্রদায়িকতা, বর্ণবিদ্বেষ, প্রাদেশিকতা, আর ভাষাগত সংকীর্ণতা। তিনি বললেন, এই শয়তানিগুলিই ভারতকে আরও দ্রুত এগুতে দিচ্ছে না বা ভারতে সামাজিক ও অর্থ নৈতিক পরিবর্তন আনতে দিচ্ছে না।

রাধাকৃষ্ণণ তাঁর ভাষণে ১৯৬৫র পরেও অন্যতম সরকারি ভাষা হিসাবে ইংরেজী চালু রাখবার কথা বললেন। তাঁর বক্তব্য দক্ষিণ এবং পুর্ব ভারতের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে বাহবা কুড়োলো। তিনি বললেন, আন্তর্জাতিক জাতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে আমরা অগ্রসর হচ্ছি এবং আন্তর্জাতিক বিষয়গুলিতে আমরা গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করছি।

এই কন্‌ফারেন্স দুটি কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করলো যারা রাজনৈতিক দলগুলির জন্য একটা আচরণ বিধি তৈরি করবে এবং জাতীয় সংহতি গড়ে তুলতে চেষ্টা করবে (শেষপর্যন্ত জাতীয় সংহতির শপথ বাক্য রচিত হয়েছিল, প্রত্যেক বছরে বিশেষ একটি দিনে স্কুলে কলেজে জনসভায় সেটি পড়া হতো)।

নির্বাচনী অভিযানের উদ্বোধন

কংগ্রেসের নির্বাচনী অভিযান পশ্চিমবঙ্গে শুরু হলো এবার প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুকে দিয়ে নয়—মুখ্যমন্ত্রীকে দিয়ে। কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গে জিতবে বলে তাঁর ধারণা এতদূর বদ্ধমূল ছিল যে নেহেরুকে এজন্য তিনি আর কষ্ট দিতে চান নি। এক কাঁধে প্রশাসনের দায়িত্ব, অন্য কাঁধে দলের দায়িত্ব, এই

দুটি ভার নিয়ে তিনি এগিয়ে চললেন। প্রথম নির্বাচনী সভার স্থান হিসাবে বেছে নিলেন বর্ধমান। সমস্ত নির্বাচনী সভাতেই দুটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় রাজ্য যে আর্থিক অগ্রগতি লাভ করেছে সে সব কথাই তিনি বেশির ভাগ বলতে লাগলেন। ১লা অকটোবর বর্ধমান টাউন হলের ময়দানে বিপুল জনসভায় তিনি দেশের উন্নয়ন সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললেন, এই কৃতিত্ব সম্ভবপর হয়েছে জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতার জন্য। তাঁরা বুঝতে পেরেছেন একমাত্র কংগ্রেসই দেশকে একটি কল্যাণমূলক রাজ্যে পরিণত করতে পারে। তাঁরা পরিকল্পনার স্বাদ পেয়েছেন—দেশকে গড়ে তোলবার জন্য আরও দুর্বার গতি তাঁরা কামনা করছেন।

নির্বাচনী অভিযানে বেরিয়ে তিনি রাজ্যের প্রায় প্রত্যেক জেলাতেই গেছেন আর যেখানেই গেছেন হাজার হাজার লোক এসে জড়ো হয়েছে তাঁর কথা শুনতে। উত্তরবঙ্গ থেকে ফিরে একবার তিনি তাঁর এক বন্ধুকে বলেছিলেন, আমি অবাক হয়ে দেখলাম প্রায় কুড়ি হাজার লোক ফরাক্কায় এসে জড়ো হয়েছে আমাকে শুধু দেখবে বলে। ওখানে কোনো জনসভার কর্মসূচি ছিল না। তারা শুধু শুনেছিল আমি ঐ পথে চলে আসবো। সত্যি বলছি, লোকেরা আমাকে যেভাবে তাদের প্রীতি ও স্নেহের নিদর্শন দেখিয়েছে আমি তাতে অভিভূত হয়ে গেছি।

এর দুই সপ্তাহ পরে ১৪ই অকটোবর নেহেরু এলেন আসানসোলের কাছে চিত্তরঞ্জনে, ডাঃ রায় ও রেলমন্ত্রী জগজীবন রামের উপস্থিতিতে ভারতে নির্মিত প্রথম ১২৩ টন বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভটি চালু করতে। এই সঙ্গে সবারই মনে পড়লো পশ্চিমবঙ্গে রেল ইঞ্জিন কারখানা তৈরির পিছনে ডাঃ রায়ের কী অনলস সাধনাই না ছিল।

নেহেরু কিন্তু এই অনুষ্ঠানের সভায় আসন্ন নির্বাচনের কোনো কথাই তুললেন না। বিষয়টা তিনি তাঁর বন্ধু ডাঃ রায়ের উপযুক্ত হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন।

নির্বাচনী সফরে ৪ঠা নভেম্বর বাঁকুড়া জেলায় এসে ডাঃ রায় তাঁর নতুন নির্বাচনী এলাকা শালতোড়ায় গেলেন। বাঁকুড়া শহর থেকে শালতোড়া, এই ৩৫ মাইল পথে অনেক তোরণ তৈরি করা হয়েছিল, দোকানে দোকানে, লোকের বাড়িতে বাড়িতে কংগ্রেস পতাকা উড়ছিল, পুরস্ত্রীরা তাঁকে সম্বর্ধনা জানাচ্ছিলেন

শাঁখ বাজিয়ে। তাঁর নির্বাচনী এলাকা হিসাবে কেন তিনি শালতোড়ার মতো অনুন্নত গ্রাম্য অঞ্চল বেছে নিলেন সে সম্পর্কে জনসভায় তিনি বললেন, পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম্য অঞ্চলে যাঁরা বাস করেন আমি তাঁদের জানতে চেয়েছিলাম। শুধু শহরের সমস্যা নিয়েই নিজেকে আমি ব্যস্ত রাখতে চাই না। রাজ্যের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮০ শতাংশই বাস করে গ্রামে। তাদের সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে মনপ্রাণ দিয়ে।

কিন্তু তাঁর পরবর্তীরা তাঁর এই আশ্বাস বাণীকে কার্যে পরিণত করেন নি। এই সেদিন ১৯৭২-৭৩ সালে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায় শালতোড়ার লোকদের বলেছেন, ডাঃ রায়ের ইচ্ছা তিনি পূরণ করবেন।

১৬ই নভেম্বর কলকাতার ময়দানের জনসভায় ছয়টি বামপন্থী দলের যুক্তফ্রন্ট (সি পি. আই., আর এস. পি., এস. ইউ. সি., ফরোয়ার্ড ব্লক, ফরোয়ার্ড ব্লক মার্কসিষ্ট ও আর. সি. পি. আই.) তাঁদের নির্বাচনী অভিযান শুরু করলেন। সভায় নেতারা পশ্চিমবঙ্গে বিকল্প সরকার গঠনের শ্লোগান তুললেন। প্রসঙ্গক্রমে বলা দরকার এর কয়েকদিন পরে কম্যুনিষ্ট দল তাদের এক সুযোগ্য নেতাকে হারালো, তিনি হচ্ছেন বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়। যেদিন তিনি মারা যান সেদিন সকালবেলা কয়েকজন কমিউনিষ্ট বন্ধু ডাঃ রায়ের সঙ্গে দেখা করে বঙ্কিমবাবুর অবস্থার কথা জানালেন। তাঁকে ভর্তি করা হয়েছিল কলকাতা মেডিকেল কলেজে। ডাঃ রায় তখ্খুনি ফোন তুলে মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপালের সঙ্গে কথা বললেন, চিকিৎসার কী কী ব্যবস্থা হয়েছে বা হবে সে সম্পর্কে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আলোচনা করলেন। আমরা দেখেছি ডাঃ রায় ও বঙ্কিমবাবুর মধ্যে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। বঙ্কিমবাবু ২০-এর দশকে যখন রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন কংগ্রেস কর্মী হিসাবে ডাঃ রায় তখন থেকেই তাঁকে জানতেন।

নির্বাচনী প্রচার অভিযান সংক্রান্ত ব্যস্ততার মধ্যেও অক্টোবর মাসে দুজন মান্যগণ্য অতিথিকে অভ্যর্থনা জানাতে হয়েছিল ডাঃ রায়কে। ৯ই অক্টোবর বিধানসভা ভবনে মুখ্যমন্ত্রীর কামরায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন ভারতে নিযুক্ত আমেরিকার রাষ্ট্রদূত অধ্যাপক জে. কে. গলব্রেথ। তিনি এবং তাঁর দলের লোকজন কলকাতার উন্নয়ন সংক্রান্ত পরিকল্পনা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করলেন এক ঘণ্টা ধরে। বৈঠকের শেষে অধ্যাপক গলব্রেথ অপেক্ষমান সাংবাদিকদের বললেন, আপনাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে

কলকাতার সমস্যা নিয়ে আমার যে আলোচনা হলো তা যেমন তথ্যসমৃদ্ধ তেমনি শিক্ষণীয়। ওঁর কথা শুনতে শুনতে আমার মনে হচ্ছিল এই বৃদ্ধ বয়সেও ঐ সব বিষয়ে অধ্যাপনার কাজ করতে তিনি সম্পূর্ণ সক্ষম।

রাষ্ট্রদূত আরও জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর আমেরিকা ভ্রমণের সময় আমেরিকার প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে তিনি অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলে প্রেসিডেণ্ট এমন মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তিনি নিজেই কলকাতার পরিকল্পনাগুলি সম্পর্কে আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেছিলেন।

২১শে নভেম্বর ডাঃ রায় প্রদেশ কংগ্রেসের কর্তা অতুল্য ঘোষকে নিয়ে দিল্লী গেলেন কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির সভায় যোগ দিয়ে বিধানসভা এবং লোক-সভার নির্বাচনের জন্য রাজ্যের কংগ্রেস প্রার্থীদের তালিকা চূড়ান্ত করে নিতে। প্রধানমন্ত্রী নেহেরু প্রায় দু' ঘণ্টা ছিলেন এই সভায়। তিনি বেরিয়ে এসে সাংবাদিকদের বললেন, পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস এবার দারুণভাবে জয়ী হবে।

মুখ্যমন্ত্রীকে বলা হলো, তিনি কলকাতায় চৌরঙ্গি থেকে নির্বাচনে দাঁড়ান আর নয়ত বাঁকুড়ার শালতোড়া থেকে। কলকাতায় মুখ্যমন্ত্রী ফিরে এলেন ২৪শে নভেম্বর। এর চার দিনের মধ্যে অর্থাৎ ২৮শে নভেম্বর তিনি হারালেন তাঁর বড়ো ভাই ব্যারিস্টার সুবোধ রায়কে। ঐ তারিখেই তাঁর কামরায় একটি ফরাসী সংস্থার সঙ্গে চুক্তি হলো, তাঁরা পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করবেন ৬ কোটি টাকার দুর্গাপুর রাসায়নিক প্রকল্পের ব্যাপারে। এই-ভাবে ঐ প্রকল্পের প্রথম স্তর সংগঠিত হলো। পরিকল্পনায় ছিল দুর্গাপুর কোকচুল্লী কারখানার বাই প্রডাক্ট বা সহ উৎপাদনকে কাজে লাগিয়ে ৬,৬০০ টন ফেনল তৈরি করা হবে। এও আশা করা হয়েছিল যে ফেনল, থালিক অ্যানহাইড্রাইড, কষ্টিক সোডা এবং ক্লোরিণের মতো প্রধান প্রধান রাসায়নিক দ্রব্যগুলি তৈরি করার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে বহু মূল্যবান এবং বিভিন্নমুখী রাসায়নিক শিল্প গড়ে উঠবে। ঐদিন ঐখানে ফরাসী সংস্থার প্রতিনিধিরা চলে গেলে তিনি তাঁর কয়েকজন বন্ধুর কাছে পশ্চিমবঙ্গের বিপুলায়তন শিক্ষিত বেকারদের সমস্যার সমাধানে তিনি কী চিন্তা করেছেন তা খুলে বলেন। নিচু গলায় তিনি সেদিন বলেছিলেন, দেখ আমার একটা স্বপ্ন আছে। আর যদি দুটি বছর আমি বেঁচে থাকি তাহলে আমি যুবক গ্র্যাজুয়েটদের উৎসাহ দেবো গঙ্গা আর দুর্গাপুর খালের দুই ধারে তারা সারি সারি কুটিরের মতো করে শিল্পসংস্থা

গড়ে তুলুক। আমি তাদের জমি দেবো মূলধন দেবো আর স্বলভ মূল্যে বিদ্যুৎ শক্তি দেবো। তারা দুর্গাপুর থেকে পাবে প্রধান প্রধান রাসায়নিক দ্রব্য, ইস্পাত, লোহা আর কয়লা। বাঙালী যুবকদের সামর্থ্য আর বুদ্ধির ওপর আমার পুরো আস্থা আছে। আমি যদি তাদের মন এই সব শিল্পের দিকে ঘোরাতে পারি, তাহলে আমি এই বিরাট শিক্ষিত বেকারদের সমস্যার মোকাবিলা করতে পারবো। আমি জানি মুক্তি এই পথেই।

বলতে বলতে তিনি দুটি চোখ বুজে চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণের জন্য। আমরা যারা তখন তাঁর ঘরে থাকবার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলাম, তারা তাঁর এই স্বগতোক্তি শুনেছিলাম।

২রা ডিসেম্বর নেহেরু এলাহাবাদ থেকে দমদম বিমান বন্দরে এসে পৌঁছলেন। ১৯৫২ এবং ১৯৫৭-র নির্বাচনের প্রাক্কালে যেখান থেকে ভাষণ দিয়েছিলেন, এবারেও সেখান থেকে ভাষণ দিলেন, তবে এবারকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি একেবারে আলাদা। এবারের ভাষণে তিনি সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের বিরুদ্ধে ততটা বললেন না, যতটা বললেন চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধ নিয়ে। লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে তিনি ঘোষণা করলেন, ভারত চুপ করে থাকবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত চীনের সঙ্গে তার সীমান্তের ব্যাপারটার কোনো ফয়সালা হয়। তিনি বললেন, এ বিষয়ে আমরা যে ব্যবস্থা নেবো, তা হবে সুচিন্তিত এবং সুদৃঢ়।

তাঁর ভাষণে চীনের প্রসঙ্গ বারবার টেনে আনায় জনসমুদ্রে উল্লাসের করধ্বনি জাগলেও আমি অবাক হয়ে দেখেছিলাম, সভায় উপস্থিত কয়েকজন চীনা কূটনীতিবিদ আসন ছেড়ে উঠে যাচ্ছেন ; তাঁদের মুখগুলো রাগে থমথম করছে। ডাঃ রায় সভাপতিত্ব করছিলেন। তিনি মঞ্চ থেকে একটু ঝুঁকে দেখছিলেন, মুখে তখন মৃদু মৃদু হাসির রেখা। চীনের ব্যাপারে ভারতের কম্যুনিস্ট দল যে ভূমিকা নিয়েছে সে প্রসঙ্গও তুললেন নেহেরু, বললেন, তাদের ভূমিকা বিদঘুটে। এরপরে তিনি গোয়ার কথা তুললেন। গোয়ার জাতীয়তাবাদীদের ওপর পর্তুগীজরা আতংকের শাসন চালিয়েছে। তিনি ইঙ্গিত দিলেন, ওখানকার জনগণকে মুক্ত করার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দুদিন পরে রাশিয়ার নেতা ব্রেজনেভ এলেন কলকাতায়। একটি ভাষণে তিনি ঘোষণা করলেন, ভারতের মাতৃভূমি থেকে বিদেশী ঔপনিবেশিক শক্তির

ছিটেফোঁটা দূর করতে ভারতের যে সংগ্রাম, তার প্রতি সোভিয়েত দেশ এবং আমাদের জনগণের পুরো সমর্থন আছে।

দক্ষিণ আমেরিকায় গেল বাংলার চিতাবাঘ

১৯৬১-এর বছরটি শেষ হলো বাংলার চিতা আর দক্ষিণ আমেরিকার উটজাতীয় প্রাণী লামার বিনিময়ের মধ্য দিয়ে। বাংলা থেকে গেল দুটি চিতার বাচ্চা। আর পেরুর লীমার চিড়িয়াখানা থেকে এলো উচ্চ পর্বতবাসী দুটি লামা। ইউনেস্কোর একজন বাঙালী অফিসার তাঁর কাজে নিযুক্ত ছিলেন দক্ষিণ আমেরিকায়, তাঁর নাম বিমলেন্দু চট্টোপাধ্যায়। তিনি আগে এ বিষয়ে ডাঃ রায়কে চিঠি লিখেছিলেন। আর তাতেই লামাদুটিকে দার্জিলিং চিড়িয়াখানার জন্য জোগাড় করতে উঠে পড়ে লেগেছিলেন ডাঃ রায়। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে তিনি একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চিতার বাচ্চাদুটিকে আন্তর্জাতিক এক বিমান কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিলেন; তাঁরা ওদের নিয়ে রওনা হবেন পেরুতে। এর পরের বছর লামা দুটি কলকাতা এসে চিড়িয়াখানায় কিছুদিন ছিল। তখন ওদের দেখতে প্রচুর ভীড় হতো চিড়িয়াখানায়। পরে অবশ্য ওদের দুটিকে দার্জিলিং পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

(১৯)

(১৯৬২)

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ৬৭তম বার্ষিক অধিবেশন বসলো পাটনায় জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে, কিন্তু আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যেতে পারলেন না নির্বাচনী প্রচার অভিযান নিয়ে ব্যস্ত থাকার দরুন। ১৯৫৭তে যা দেখেছি, এবারেও তাই। উত্তর অথবা দক্ষিণ বঙ্গের জেলাগুলিতে তিনি গেছেন একটি ডাকোটা বিমান ভাড়া করে। সঙ্গে থাকতেন প্রদেশ কংগ্রেসের কর্তা অতুল্য ঘোষ, আর দুজন প্রথম সারির সংবাদদাতা. একজন অমৃতবাজারের, অন্যজন আনন্দবাজারের। আমি আগেও বলেছি, নির্বাচনী প্রচারে একটি ছোট অ্যাটাসে কেস থাকতো তাঁর সঙ্গে। তাতে ভর্তি থাকতো ছোট বড়ো নোটের তাড়া, কংগ্রেসের নির্বাচনী তহবিল থেকে নেওয়া প্রার্থীদের খরচপত্র চালাবার জন্য। বাহুল্যবোধে এ নিয়ে আর বিস্তৃত আলোচনা এখানে করলাম না।

তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন

জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে তিনি ঝটিকা সফর করতে লাগলেন। বিরাট বিরাট জনসভায় ভাষণ দিতে লাগলেন। দুটি পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনাকালে কংগ্রেস কী কী কাজ করেছে তার ফিরিস্তি দিতেন। তাঁর ভাষণে তিনি সরাসরি আক্রমণ করতেন সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের ততটা নয়, যতোটা কমিউনিস্টদের।

১৬ই ফেব্রুয়ারি কংগ্রেস সংসদীয় বোর্ড দিল্লীতে তাঁদের নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে ডাঃ রায়কে দুটি নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে প্রতিযোগিতা করতে অনুমতি দিলেন। ফলে যুগপৎ চৌরঙ্গি ও শালতোড়া নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হতে এবং প্রতিযোগিতা করতে তাঁর আর কোনো বাধা রইলো না। বলা দরকার এই বৈঠকে ডাঃ রায় উপস্থিত ছিলেন না। এই প্রসঙ্গে কংগ্রেস সভাপতি এন সঞ্জীব রেড্ডি সাংবাদিকদের বললেন, ডাঃ রায় হচ্ছেন ডাঃ রায়, তাঁর কথাই আলাদা ; তিনি যেটা পছন্দ করবেন সেটাই হবে। তাঁর ব্যাপারে নিয়মের ব্যতিক্রম করা হয়েছে, তিনি যদি চান, একযোগে দুটি নির্বাচনী কেন্দ্র থেকেই তিনি প্রতিযোগিতা করতে পারেন।

যাইহোক, শুরু হলো তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন। রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই প্রথম ভোটাভুটি আরম্ভ হয়ে গেল। ভোটসংখ্যা হচ্ছে ১,৬১,৮৪,৬৮৫, মোট জনসংখ্যা হচ্ছে প্রায় সাড়ে তিন কোটি। দশ দিনের ভোট-সংক্রান্ত কর্মসূচি আরম্ভের তারিখ ১৬ই ফেব্রুয়ারি। ডাঃ রায় জেলাগুলিতে তাঁর ঝটিকা সফর শেষ করে এসে মন দিলেন কলকাতার ২৬টি কেন্দ্রের ওপর, তার মধ্যে নিজের চৌরঙ্গি কেন্দ্রটি অন্যতম। ১৯৫৭তে ২৫২টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস পেয়েছিল ১৫২, সি পি আই ৪৬, পি এস পি ২১ এবং অন্যান্য দল ও নির্দল প্রার্থী মিলে ৩৩, ঐ সালে কলকাতায় কংগ্রেস ভালো ফল করতে পারে নি, মুখ্যমন্ত্রীর আসনটিই যায় যায় হয়েছিল আর কী!

এবারে কলকাতায় ভোটের দিন ছিল ২৬শে ফেব্রুয়ারি, রবিবার। মুখ্যমন্ত্রী এবার তাঁর নির্বাচনী কার্যালয়ের কর্মীদের মধ্যে বেশ কিছু অদল বদল করেছিলেন। ডাঃ রায় নিজের নির্বাচনী কেন্দ্রের বিলি ব্যবস্থার তদারক নিজেই দেখে নিয়েছিলেন। যদিও বিচিত্র বাসিন্দা সমাবেশের জন্য চৌরঙ্গিকে কংগ্রেসের দিক থেকে নিশ্চিত এলাকা বলে গণ্য করা হতো। ২০শে ফেব্রুয়ারির বেলা ৩টে থেকে

ডাঃ রায় কখনো পায়ে হেঁটে কখনো গাড়িতে বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেড়িয়েছেন, বহু পথ সভায় ভাষণ দিয়েছেন। তাঁর নির্বাচনী সংগঠক ও স্বেচ্ছাসেবক তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী সি পি আই প্রার্থী বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের থেকে অনেক বেশি ছিল। প্রথম থেকে তাই তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন যে এ আসনটিতে তাঁরা কিছু করতে পারবেন না। বিশ্বনাথবাবুর দাদা রাজ্য সরকারের মন্ত্রী অজয়কুমার মুখোপাধ্যায় কোনো কোনো জায়গায় নিজের ভাইয়ের বিরুদ্ধেও প্রচার চালিয়েছিলেন।

যাইহোক, উক্ত রবিবার শান্তিতেই ভোটাভুটি হয়েছিল কলকাতায়। ভোট যখন শহরে চলছে, তখন বাঁকুড়া জেলায় মুখ্যমন্ত্রীর গ্রামীন নির্বাচনী এলাকা শালতোড়া থেকে টেলিফোনে খবর এলো যে, তিনি জিতেছেন ৬০২০ ভোটের ব্যবধানে, এবং নির্বাচিত বলে তাঁকে ঘোষণাও করা হয়েছে। পরের দিন কলকাতার ভোট গণনাও প্রায় শেষ। এখানে তাঁর জয় আরও চমকপ্রদ। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী যেখানে পেয়েছেন ৭৩৯০ ভোট, তিনি পেয়েছেন ২২,৫৫৬ ভোট। কলকাতার কাগজগুলো ব্যানার হেডলাইন দিয়ে খবর বার করলো, ডাঃ রায়ের ডবল জয়লাভ। সোমবার রাত্রে যাঁরা তাঁকে অভিনন্দন জানাতে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন হলেন অশোক সেন। তিনি তাঁর পুরানো উত্তর কলকাতা সংসদীয় নির্বাচনী কেন্দ্র থেকেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিলেন। ডাঃ রায় আর তিনি একতলার ঘরে বসেই কথাবার্তা বলছিলেন। কিছুক্ষণ পরে ডাঃ রায় আমাকে ডেকে অশোকবাবুর ভোটের ফলাফল কী তা জানবার জন্য নির্দেশ দিলেন। আমি খবর নিয়ে এসে দিলাম, অশোকবাবু বেশ ভালো ভোটের ব্যবধানেই তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী সি পি আই প্রার্থী এস কে আচার্যের থেকে এগিয়ে আছেন এবং বেশ বোঝা যাচ্ছে শ্রীআচার্যের জেতবার আর কোনো আশা নেই। এর কিছুক্ষণ পরে খুব খুশি মনেই অশোক সেন চলে গেলেন। ঐ ২৭শে ফেব্রুয়ারিই প্রধানমন্ত্রী তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে লিখলেন :

প্রিয় বিধান,

তোমার ডবল জয়লাভে আমার অভিনন্দন। যা উচিত তাই হয়েছে।

প্রিন্স ইয়ুসুফ মির্জার একটি চিঠি তোমাকে পাঠালাম। রাজ্য সভার জন্য সে একটি আসন চায়। এ সম্পর্কে তোমার কী মতামত আমি জানি না।

তোমার স্নেহভাজন

জওহরলাল নেহেরু

পরের দিন মুখ্যমন্ত্রী সকাল সকালই রওনা হলেন অফিসের দিকে। আমি পিছনের গাড়ি থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম পথচারীদের কাছে তিনি বিশেষ আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে উঠেছেন। মহাকরণে তিনি পৌঁছবার পর যিনি প্রথম এলেন দেখা করতে, তিনি প্রচার অধিকর্তা প্রকারস্বরূপ মাথুর। তিনি মাথুরের দিকে তাকিয়ে বললেন, কী হে, ফটোগ্রাফার নিয়ে এসেছো কেন? এখন তো কোনো ভি আই পি আসছে না। তাহলে?

মাথুর চালাকি করে প্রশ্ন এড়িয়ে গেলেন তাঁর চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে গিয়ে, আর আমাকে তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াতে অনুরোধ করে। তারপরে সবিনয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে তিনি বললেন, স্যর আমরা দুজন আপনার সঙ্গে ছবি তুলতে চাই। তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনে আপনার ডবল জয় লাভের পর এই আপনার প্রথম অফিসে আসা। আমাদের কাছে এই দিনটির বিশেষ তাৎপর্য আছে বই কী।

মুখ্যমন্ত্রী একটু হেসে ফটো তোলার অনুমতি দিলেন। তার পরে মাথুর প্রস্থান করলে আমাকে একটা চিঠির ডিকটেশন দিতে লাগলেন। এটি হচ্ছে নেহেরুর চিঠিখানার উত্তর।

কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি
১৯৬২

প্রিয় জওহর,

তোমার ২৭শে ফেব্রুয়ারির চিঠি। এর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।

আমি এই মাত্র শুনলাম যে অতুল্যবাবু সি পি আই এবং পি এস পি প্রার্থীদের পরাজিত করে সংসদে নির্বাচিত হয়েছেন। আমি এতে খুব খুশি হয়েছি, কারণ এ ছিল সম্ভ্রমের লড়াই।

একটা বিষয়ে নিশ্চিত যে, কলকাতা, ২৪ পরগণা ও হাওড়া, যেখানে আমরা গতবার দারুণ হেরে গিয়েছিলাম, সেখানে আমরা বেশ লাভবান হতে চলেছি।

ইয়ুসুফ মির্জার চিঠিখানা পড়লাম। তার নিজের সম্বন্ধে সে আমাকেও লিখেছিল।

তোমার স্নেহভাজন
বিধান

মার্চের প্রথম সপ্তাহে জেলাগুলি থেকে ভোটের ফলাফল আসতে লাগলো, আর সঙ্গে সঙ্গে জানা গেল বিপুল সংখ্যাধিক্যে কংগ্রেস বিধানসভায় জয়লাভ করেছে, ২৫২টি আসনের মধ্যে পেয়েছে ১৫৭টি আসন। কিন্তু কলকাতায় ২৬টি আসনের মধ্যে পেয়েছে ১৪টি আসন। লোকসভায় পশ্চিমবঙ্গে ৩৬টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস পেয়েছে ২২টি আসন। প্রসঙ্গত বলা যায় ভারতের তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস কেন্দ্রে এবং ১৫টি রাজ্যের মধ্যে ১৪টি রাজ্যে বিপুল সংখ্যাধিক্য লাভ করেছে।

কিন্তু নির্বাচনের প্রসঙ্গে এসে আমরা একটি জরুরী ঘটনার কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর নিমন্ত্রণে ভারতের কয়লা উৎপাদনকারী রাজ্যগুলি সাড়া দিয়ে ২৫শে জানুয়ারি কলকাতার মহাকরণে একটি বৈঠকে বসেছিল। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে বিহার, ওড়িষ্যা, অন্ধ্র, আসাম এবং মধ্যপ্রদেশের প্রতিনিধিরা একযোগে একটি পরিকল্পনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, সংশ্লিষ্ট রাজ্যের স্বার্থের মূল্যে কয়লা শিল্পের উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকারের যে নীতি অবলম্বিত, তাঁরা তার একটা পরিবর্তন আনতে চেষ্টা করবেন। কয়লা সম্পর্কিত এই বিষয়ে ডাঃ রায় ছিলেন অনমনীয়। সংবিধানের কয়েকটি ধারা উল্লেখ করে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, এ কথা ভাবা ভুল যে কয়লা এমন একটি বিষয় যা কেন্দ্রীয় সরকারের আওতায় পুরোপুরি পড়েছে। কয়লাখনির মালিকদের কাছ থেকে রয়্যালটি হিসাবে আয় বাড়ানোর ব্যাপারে রাজ্যগুলির ওপর বাধানিষেধ আরোপিত রয়েছে। তিনি প্রশ্ন করেন, কেন্দ্রীয় সরকারের এ এক্তিয়ার আছে কী? তিনি বললেন, রাজ্য সরকারই কয়লা এলাকার প্রকৃত মালিক, সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের মধ্যে কোনো অসদ্‌ভাবমূলক তফাৎ থাকা উচিত নয়।

এরপর তিনি একটি পরিকল্পনার পক্ষে সুপারিশ করেন, যার মাধ্যমে অবিচল ভাবে ধাপে ধাপে তৃতীয় পরিকল্পনা কালের মধ্যে ৯৭ মিলিয়ন টন কয়লা তোলার লক্ষ্য পূরণ করা যেতে পারে। তিনি বললেন, রাজ্যগুলির সঙ্গে এই বিষয়ে যদি সমান ব্যবহার করা হয়, একমাত্র তাহলেই এ কাজটা সম্ভবপর হতে পারে।

মন্ত্রিসভা গঠনের প্রস্তুতি হিসাবে দীঘা

নির্বাচনী অভিযানের কঠোর পরিশ্রমের পর একটু বিশ্রাম নেবার জন্য এর

দুদিন পরে ডাঃ রায় প্রফুল্ল সেন, কালীপদ মুখোপাধ্যায় ও অতুল্য ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে দীঘা রওনা হয়ে গেলেন। মন্ত্রিসভায় কাকে কাকে নেবেন তা ডাঃ রায় নিজেই ঠিক করতেন, এবার বোধহয় ব্যতিক্রম ঘটাচ্ছেন। কিন্তু দীঘাতে পৌঁছে কী সকালে জল খাবারের পরে, কী বিকেলবেলা তিনি নাড়াজোল রাজবাড়িতে বসে অতুল্যবাবু, প্রফুল্লবাবু আর কালীপদবাবুর সঙ্গে তাসই খেলতে লাগলেন। যদিও আমার মনে হয়, এরই মধ্যে পুরানো মন্ত্রীদের কাকে কাকে রাখবেন না রাখবেন তা পাকাপাকি স্থির না করলেও তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে রাখলেন। ওদিকে আমি অপেক্ষা করে বসে আছি, কখন আমার ডাক পড়ে, কখন আমাকে ডিকটেশন দিয়ে নতুন মন্ত্রিমণ্ডলীর তালিকা তৈরি করবেন। কিন্তু দীঘাতে তিনি তা শেষ পর্যন্ত করলেন না। আমরা সবাই দীঘা থেকে ফিরে এলাম ৭ই মার্চ। পরের দিন সকালে বিধান সভা ভবনে গিয়ে তিনি ৭০ জন নতুন কংগ্রেস এম এল এ-দের সঙ্গে মিলিত হলেন, প্রত্যেকের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে কথা বললেন গড়ে ৫ মিনিট করে। পাশের ঘরে প্রফুল্লচন্দ্র সেন নতুন সদস্যদের আপ্যায়িত করছিলেন মিষ্টি দিয়ে। অবশ্য মিষ্টির প্যাকেট থেকে আমরাও বঞ্চিত হই নি। এর দুদিন পরে অর্থাৎ ৯ই মার্চ উভয় সভার সদস্যরা কংগ্রেস ভবনে এক বৈঠকে মিলিত হয়ে দশমিনিটের মধ্যেই ডাঃ রায়কে তাঁদের নেতা নির্বাচিত করলেন। নতুন সদস্যদের উদ্দেশে ডাঃ রায় বললেন, মনে রাখবেন পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা প্রচুর। নেতা কিছুই করতে পারে না, যদি না তার সঙ্গে তার দলও সমান তালে চলতে থাকে। অনেক কঠিন কাজ আমাদের সামনে, কিন্তু এর কাঠিন্য অনেক কমে যায় যদি সদস্যরা আমার পাশে থাকেন।

এখান থেকে তিনি সোজা গেলেন রাজভবনে। সদস্যরা বসে জল্পনা কল্পনা করতে লাগলেন তাঁদের মধ্যে মন্ত্রিসভায় স্থান পাচ্ছেন কারা। সম্ভাব্য মন্ত্রীদের নাম ছাপিয়ে কাগজওয়ালারাও কম জল্পনা কল্পনা করে নি। আমি কিন্তু ভিতরে ভিতরে অস্থির হয়ে উঠছিলাম। ডাকছেন না কেন আমাকে ?

এর পরের দিন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন মহাকরণে না গিয়ে আমি যেন তাঁর পিছনে পিছনে বিধানসভা ভবনে যাই। সময়টা সকাল। তাঁর কামরার কাছে কোনো লোকজন ছিল না বললেই হয়। আমাকে ডিকটেশন দিতে লাগলেন, মন্ত্রীদের নামের তালিকা আর তাঁদের দপ্তর। এটা যাবে সুপারিশ

হিসাবে রাজ্যপালের কাছে। আমরা কাজ করতে করতে তালিকার আধা-আধি পৌঁছেছি, এমন সময় তাঁর চোখ পড়লো কারুর ওপর, কে যেন দরজা দিয়ে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। অমনি উনি থেমে গেলেন। আমাকে বললেন, দেখো ত বাইরে কে ঘোরাঘুরি করছে!

আমি তৎক্ষণাৎ বাইরে এসে একটি চেনা মুখ দেখতে পেলাম, আমাদেরই এক জানাশোনা সাংবাদিক বন্ধু। ফিরে এসে ওঁকে নামটা বললাম। শুনে উনি একেবারে জ্বলে উঠলেন! তাড়াতাড়ি বাইরে এসে তাঁকে মুখোমুখি জিজ্ঞাসা করলেন, কী করছেন এখানে? আমি ত কোনো বৈঠক ডাকি নি! গোপনে একটা জিনিস আমি করছি, আর আপনি আমার ঘরে উঁকি-ঝুঁকি মারতে আরম্ভ করেছেন কেন?

বলে তিনি ভদ্রলোককে প্রায় তাড়িয়েই বার করে দিলেন। ভদ্রলোক খবর সংগ্রহ করার আগ্রহে তাঁর সীমা একটু লংঘন করে ফেলেছিলেন, এই আর কী। আর সেজন্য তাঁকে মূল্যও দিতে হলো বই কী। সত্যি, সকালবেলা একটা অপ্রীতিকর ঘটনাই ঘটে গেল বটে!

চতুর্থ মন্ত্রিসভা

১১ই মার্চ রবিবার সকালবেলা থেকেই ত্রিবর্ণ পতাকা লাগিয়ে গাড়ির পর গাড়ি ঢুকতে লাগলো রাজভবনে। ডাঃ রায়ের চতুর্থ মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান দেখবার জন্যই এই আগ্রহ। দরবার কক্ষের প্রথম সারিতে তাঁরাই বসেছিলেন, যাঁদের মুখ্যমন্ত্রী তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্য হিসাবে বেছে নিয়েছেন। কলকাতা ও জেলাগুলি থেকে প্রায় ৫০০ লোক এসেছিল সকাল নটার এই অনুষ্ঠান দেখতে। রাজ্যপাল পদ্মজা নাইডুর কাছ থেকে ডাঃ রায় শপথ নেবার পর একে একে নিলেন প্রফুল্লচন্দ্র সেন, কালীপদ মুখোপাধ্যায়, খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়, ঈশ্বরদাস জালান, হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, পুরবী মুখোপাধ্যায়, শ্যামাদাস ভট্টাচার্য, জগন্নাথ কোলে, ডাঃ জীবনরতন ধর, শৈলকুমার মুখোপাধ্যায়, আভা মাইতি, এস এম ফজলুর রহমান এবং বিজয়সিং নাহার। এঁরা প্রত্যেকেই ক্যাবিনেট মন্ত্রী। এঁদের মধ্যে পাঁচজন ছিলেন নবাগত, তিন জনকে প্রতিমন্ত্রী থেকে মন্ত্রী করা হলো, আর আটজন ছিলেন পুরানো মন্ত্রি-সভার সদস্য।

মনে আছে, এর আগের রাত্রে পুরানো একজন মন্ত্রী এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে তাঁর বড়ো গাড়িটা করে। মুখ্যমন্ত্রী বাড়ি ছিলেন না। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি জানেন কাকে কাকে কী কী দপ্তর দেওয়া হচ্ছে ?

আমি চুপ করে রইলাম। তিনি বললেন, ফিরে এলে আমার কথা বলবেন।

আচ্ছা।

মুখ্যমন্ত্রী ফিরে এলে তাঁকে যথারীতি ওঁর কথা বলেছিলাম, ওঁর আসার উদ্দেশ্যও ব্যক্ত করতে ভুলিনি।

মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ ঘটলো। আরও মন্ত্রী নেওয়া হলো, ১১জন প্রতিমন্ত্রী আর ১০ জন উপমন্ত্রী। পূর্তবিভাগ মহাবিপদে পড়ে গেলেন। মহাকরণে ৩৭ জন মন্ত্রীকে যায়গা দেবার মতো ঘর কোথায়? কয়েকজন জুনিয়র মন্ত্রীর ঘরের পার্টিশন করে শেষ পর্যন্ত সবাইকে বসতে দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

প্রথম প্রথম দু একজন উপমন্ত্রীকে তো তাঁদের পি এদের সঙ্গে একই ঘরে কাটাতে হয়েছিল।

বাজেট অধিবেশন

নব গঠিত আইন সভার যুগ্ম বৈঠকে রাজ্যপাল ভাষণ দিলেন ৩১শে মার্চ। তৃতীয় পরিকল্পনাকালের প্রকল্পগুলির পরিচয় মোটামুটি দেবার পর রাজ্যপাল পদ্মজা নাইডু ঘোষণা করলেন যে, সব থেকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে খাদ্যে স্বয়ম্ভর হবার জন্য কৃষি উৎপাদনের ওপর। তা ছাড়া রয়েছে খনিজ সম্পদকে কাজে লাগানো, বিশেষ করে কয়লাখনির। এ জন্য ৮১ লক্ষ টাকা আলাদা করে রাখা হয়েছে। দরকার আরো বেশি বিদ্যুৎ শক্তির উৎপাদন এবং শিল্প উন্নয়ন।

প্রধানমন্ত্রীর অসুখ

প্রধানমন্ত্রী জ্বরে পড়েছিলেন, সে জ্বর কিছুতেই ছাড়ছিল না। ক্রমাগত তাই দুর্বল হয়ে পড়ছিলেন, অফিসে পর্যন্ত আসতে পারছিলেন না। চিকিৎসার ব্যাপারে পরামর্শ করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর ডাক্তাররা সকালবেলা দিল্লী থেকে

ফোন করতেন ডাঃ রায়কে। ৪ঠা এপ্রিল সকালবেলা ডাঃ রায় বিমানে দিল্লী গেলেন প্রধানমন্ত্রীকে পরীক্ষা করার জন্য। পালাম বিমানবন্দর থেকে তিনি সোজা গেলেন প্রধানমন্ত্রীর বাড়িতে। সেখানে প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক কর্ণেল রাও এবং অন্যান্য ডাক্তাররা অপেক্ষা করছিলেন ওঁর জন্য। ডাঃ রায় প্রধানমন্ত্রীকে পরীক্ষা করে আরও চারদিনের জন্য পুরোপুরি বিশ্রাম নিতে বললেন। দিল্লী থেকে তিনি আমাদের ফোন করলেন, বললেন, বিকেলের প্লেনে রোগীর জন্য একটি ডানলোপিলো বিছানা পাঠিয়ে দাও।

আমরা যথারীতি সে আদেশ পালন করলাম। ঐ দিন বিকেলবেলা কলকাতা ফিরে আসবার মুখে পালাম বিমানবন্দরে পণ্ডিত নেহেরুর অসুখ সম্পর্কে সবার উদ্বেগ প্রশমিত করবার জন্য তিনি একটি বিবৃতি দিলেন। এর আগের দিন, অর্থাৎ ৩রা এপ্রিল পণ্ডিত নেহেরু কেন্দ্রে কংগ্রেস সংসদীয় দলের নেতা নির্বাচিত হয়েছিলেন। অসুখের জন্য অবশ্য তিনি সভায় যোগ দিতে পারেন নি।

কলকাতা
৩০শে এপ্রিল ১৯৬২

প্রিয় জওহর,

জনরব শুনছি তুমি নাকি আবার ব্যস্ত সমস্ত হয়ে তোমার কাজের মধ্যে ডুবে যেতে চাইছো। আমি জানি না দেরাদুনে গিয়ে তুমি তোমার শক্তি ও স্বাস্থ্য কতটা ফিরে পেয়েছো। কিন্তু তবু আমি এই বিষয়ে তোমাকে কিছু পরামর্শ দিতে চাই।

মনে হয় তুমি বুঝতে পারবে যে তোমার এখনকার অসুখ ঐ ঘুষঘুষে জ্বর হয়েছে, দেহে কোনো বীজাণুর সংক্রমণ হয়েছে বলে। আর সেজন্য তোমায় বিছানায় শুইয়ে ফেলেছে পক্ষকালেরও বেশি সময়। এটা কেন হলো? ব্যাপারটা হলো এইরকম যে তোমার কিডনিগুলো যদিও কোনরকমে সংক্রমিত হয়নি বা সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, তবুও শরীরের অন্য সব প্রত্যঙ্গের তুলনায় বয়সের জন্য একটু হীনবল হয়ে পড়েছে। তার ফলে জ্বরের সময় দেহের আবর্জনা, যাকে আমরা সিটাবলিটিজ বলি, যেগুলি তাড়াতাড়ি

বেরিয়ে যাওয়া দরকার, তত তাড়াতাড়ি বেরুচ্ছে না, আর সেজন্য তোমার দুর্বলতা ও জ্বর সারতে যথেষ্ট সময় নিচ্ছে যদিও জ্বর কখনোই খুব বেশি হয় নি। আমার মনে হয় না যে রক্তচাপ, যা মাঝে মাঝে একটু ঊর্ধ্ব বা হাই হয়ে ওঠে, এ ছাড়া এই মুহূর্তে তোমার শরীরে আর কোনো গোলমাল আছে, শুধু ঐ শরীর থেকে আবর্জনা বের করে দেবার সামর্থ্যহীনতা ছাড়া।

আমি তোমার রোগের কথা লিখলাম এই জন্য যে, আমি চাই তুমি যাতে বুঝতে পারো, যে কোনো শারীরিক অথবা মানসিক পরিশ্রম তোমার শরীরে আবর্জনা বৃদ্ধি করবে। আর যেখানে কিডনিগুলি তা নিষ্কাশনে তেমন সক্ষম হচ্ছে না, সেখানে আবর্জনার স্তূপ দুর্বলতার কারণ হয়ে দেখা দেবেই। সেজন্য যা দরকার সে হচ্ছে :

(ক) যে কাজ মোটামুটি পরিহার করা চলে তা তোমাকে পরিহার করতে হবে, যেমন অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া বা যেখানে সেখানে জনগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার তোমার যে প্রবণতা। (খ) তোমার নিজের কাজের ব্যাপারে জনতার উদ্দেশে যেখানে সেখানে লম্বা লম্বা বক্তৃতা দেওয়া তোমাকে পরিহার করতে হবে। আমি বুঝি তোমার পক্ষে মানসিক কাজকর্ম পরিহার করা খুবই মুসকিল আর সেজন্য যে কাজটা একেবারে অপরিহার্য সেটাই করবে, আর যেটা পরিহার করতে পারবে, সেটা আর করবার দিকে ঝুঁকবে না। তবে আমার অনুরোধ এটাও তুমি নিজে বিবেচনা করে দেখো কতদূর পর্যন্ত তুমি পরিশ্রম এবং বাড়তি দায়িত্ব পরিহার করতে পারবে। একমাত্র যে সব কাজ ও দায়িত্ব তুমি ছাড়া কেউ করবার বা নেবার নেই, সেগুলিই তুমি করবে বা তার ভার নেবে। এ জন্য তোমাকে কেউ নির্দেশ উপদেশ দিতে পারবে না এক তুমি নিজে ছাড়া। তুমি আমাকে প্রশ্ন করতে, আমি আমার শক্তি বজায় রেখেছি কী করে। এর কারণ আর কিছুই নয়, যে সব অনুষ্ঠানাদি আমি পরিহার করতে পারি সেগুলি আর নেই না, যদিও সময় সময় আমাকে এজন্য বলা হয় যে আমি সহযোগিতাপ্রবণ লোক নই। কতগুলি জিনিস আছে যা শুধু আমি ছাড়া আর কেউই করতে পারে না। আবার তেমনি কতগুলি জিনিস আছে যা আমিও করতে পারি, অন্য লোকেও করতে পারে। এই রকম ক্ষেত্রে আমাকেই বিবেচনা করে দেখতে হয় কোন কাজটা আমার করা উচিত। তোমার নিজের ব্যাপারে আমি কোনো বক্তৃতা দিতে চাই না।

তোমার কার্যকলাপ সম্পর্কে তুমি নিজে ছাড়া আর বড়ো বিবেচক কেউ নেই, আরও সেজন্যই আমি তোমায় অনুরোধ করবো, ঠিক যেগুলি তুমি পরিহার করতে পারবে না সে কাজগুলির ওপরই তোমার মনোযোগ অর্পণ করো।

তোমার স্নেহভাজন
বিধান

এঁদের কাছে কপি পাঠানো হলো—

(১) ডঃ এস রাধাকৃষ্ণন, ভারতের রাষ্ট্রপতি

(২) কর্ণেল রাও (প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক)

এপ্রিল ১৬ থেকে ২০ তারিখের মধ্যে কলকাতার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় পশ্চিমবঙ্গের ছুটি বিরাট প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী। ১৬ই এপ্রিল তিনি উদ্বোধন করলেন বিশ কোটি টাকার প্রকল্প, লবণ হ্রদ-এর জমি উদ্ধার এবং গ্রামীন উন্নয়ন। যুগোশ্লাভ ইঞ্জিনিয়ার ও সহযোগী কর্ম প্রতিষ্ঠানের কারিগরদের উপস্থিতিতে এর সূচনা হলো সেদিন। কলকাতা শহর ও দমদম বিমান বন্দরের মধ্যপথে দক্ষিণতুয়ারী এলাকার ছয় বর্গমাইল জলা জমি উদ্ধারই হচ্ছে এই প্রকল্পের আসল কাজ। তিন মাইল দূরের ভাগীরথী (হুগলি) নদী থেকে পাইপে করে জলশুদ্ধ বালি এনে ফেলা হতে লাগলো এই জলা জমিতে। কয়েক বছর আগে ডাঃ রায় যখন হল্যাণ্ড সফরে গিয়েছিলেন, তখন রাইনের তীরে দাঁড়িয়ে ডাঃ রায়ের মনে এই কাজের কথা প্রথম জেগেছিল। ভেবে-ছিলেন, এরা যেভাবে করছে আমরাই বা সেভাবে পারবো না কেন ? উদ্বোধন কালে তাই তিনি বললেন, আইডিয়াগুলির ডানা আছে, এই ডানায় ভর করে তারা দেশ থেকে দেশান্তরে উড়ে যেতে পারে।

(এই বই লেখার সময় দেখছি ভি আই পি রোডের ওপর কমপক্ষে পনেরো হাজার নতুন বাড়ি সম্বলিত নতুন এক নগরী গড়ে উঠেছে।)

এর চারদিন পরে অবিশ্রান্ত ঝড় জলের মধ্যে গাড়ি চালিয়ে কলকাতা থেকে ৩৫ মাইল দূরে ব্যাণ্ডেলে গেলেন ডাঃ রায় আর আমেরিকার রাষ্ট্রদূত জন কেনেথ গলব্রেথ, আমেরিকার দীর্ঘস্থায়ী সহায়তার ভিত্তিতে গঠিত ৩০০ মেগাওয়াটের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের কার্যারম্ভের উদ্বোধন করতে। এই ছুটি

লবণ হ্রদ অঞ্চলে আমেরিকার রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে ডাঃ রায়

বিরাট প্রকল্প হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর কয়েক বছরের নীরব কর্মের ফলশ্রুতি, আর তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গের আধুনিকীকরণের কাজে তাঁর দীর্ঘ মন্ত্রীত্বকালের মধ্যে এই-ই তাঁর শেষতম অবদান বলা যেতে পারে।

মালদার হাঙ্গামা

এপ্রিলের দিকে মালদা জেলায় সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা দেখা দিল, আর সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেল প্রথমে পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী জেলা রাজসাহীতে, পরে ঢাকা এবং ওখানকার অন্যান্য যায়গায়। পাকিস্তানের কাগজগুলি নানারকম গল্প ফাঁদতে লাগলো, দলে দলে মুসলমান মারা যাচ্ছে, দলে দলে মুসলমান পালিয়ে আসছে ইত্যাদি। মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সশস্ত্র পুলিশের একটি দল বিশেষ করে ওখানে পাঠিয়ে আর হাঙ্গামাকারীদের গ্রেপ্তার করে হাঙ্গামা দমন করলেন অচিরেই, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে মালদার বদলা হিসাবে হাঙ্গামা ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়ছে বলে শোনা যাচ্ছিল। কয়েকদিন নীরব থাকবার পর পাকিস্তান অবশেষে খবরের ঢাকনা একটু খুললেন। খবর পাওয়া গেল তাঁরা সৈন্য নামিয়েছেন আর ২৮০ জন হাঙ্গামাকারীদের গ্রেপ্তার করেছেন। কলকাতার কাগজগুলিতে বেরুলো যে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার জিগীর তুলে ওখানে যুদ্ধের উন্মাদনার সৃষ্টি হচ্ছে। পাকিস্তানস্থ ভারতের হাই কমিশনার রাজেশ্বর দয়াল ঢাকায় ছুটে গেলেন, কিন্তু রাজশাহীতে গিয়ে নিজের চোখে সব কিছু দেখে আসতে তাঁকে অনুমতি দেওয়া হলো না। দিল্লী ফেরার পথে দয়াল মুখ্যমন্ত্রী ও মুখ্যসচিব রঞ্জিৎ গুপ্তের কাছে পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে গেলেন। পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত এলাকা আবার অশান্ত হয়ে উঠলো। ১৬ই জুন মহাকরণে খবর এলো, মালদা-রাজশাহী সীমান্তে আবার হাঙ্গামা দেখা দিয়েছে, আর এই হাঙ্গামার কারণ হচ্ছে উদ্বাস্তরা যখন মালদার দিকে পালিয়ে আসছিল, তখন পাকিস্তানী সৈন্যরা তাদের ওপর গুলি চালায় এবং তার ফলে কয়েকজন মারাও যায়। জুনের মাঝামাঝি পর্যন্ত ৪০০জন উদ্বাস্তু, তারা অধিকাংশই আদিবাসী সাঁওতাল, সীমান্ত পার হয়ে চলে এলো। উদ্বাস্তুদের যায়গা দেবার জন্য প্রচুর তাঁবু কলকাতা থেকে পাঠানো হলো। মুখ্যমন্ত্রী এসব নিয়ে দিল্লীর সঙ্গে যেমন প্রতিনিয়ত সংযোগ রাখছিলেন ঠিক তেমনি রাখছিলেন রাজ্যপাল পদ্মজা নাইডুর সঙ্গে। তিনি তখন ছিলেন

দার্জিলিঙে। স্থির হলো রাজ্যপাল দার্জিলিঙ থেকে কলকাতা আসবার পথে মালদায় নেমে যাবেন, উদ্বাস্তুদের সঙ্গে নিজে দেখা করবেন, আর ত্রাণ ব্যবস্থা কী হয়েছে না হয়েছে দেখবেন। ততদিনে পাঁচ হাজার উদ্বাস্তু এসে পৌঁছেছে মালদায়। রাজ্যপাল ব্যবস্থামতো মালদায় এসে পৌঁছলেন ২৩শে জুন। তার ফলে ত্রাণ ব্যবস্থা আরও গতি লাভ করলো, আরও সুষ্ঠু চেহারা নিলো, আর উদ্বাস্তুরাও প্রাণে একটু ভরসা পেলো। এর আগে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর যোগাযোগের ফলে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী মেহেরচাঁদ খান্না এসেছিলেন কলকাতায় মে মাসের শেষাশেষি। তাঁর সঙ্গে একটা বিষয় সাব্যস্ত হলো যে নতুন উদ্বাস্তুদের দণ্ডকারণ্যে যায়গা দেওয়া হবে। সেই মতো ২৯শে জুন একটি বিশেষ ট্রেন এক হাজার উদ্বাস্তু নিয়ে দণ্ডকারণ্যের দিকে রওনা হয়ে গেল, এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী-লিখিত দুটি চিঠি নিচে দেওয়া গেল :

নয়াদিল্লী ২১শে জুন ১৯৬২

প্রিয় বিধান,

যে সব উদ্বাস্তু রাজসাহী থেকে মালদায় আসছে, তাদের সম্বন্ধে মেহেরচাঁদ খান্নার সঙ্গে আমি কথা বলেছি। এটা আমাদের কাছে পরিষ্কার যে, যে সব লোকগুলো উদ্বাস্তু হয়ে আসছে তাদের জন্য অবশ্যই ত্রাণের ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু আসল প্রশ্নটা এই যে, ভবিষ্যতে এদের নিয়ে আমাদের কী করবার আছে? আপাতত আমি মেহেরচাঁদ খান্নাকে বলেছি আর সেও তাতে রাজী হয়েছে যে, সে তার মন্ত্রকের কয়েকজন প্রতিনিধিকে অবিলম্বে মালদায় পাঠাবে। তারা উদ্বাস্তুদের সঙ্গে দেখা করবে, সঠিক অবস্থাটা কী, তাও জেনে নেবে। প্রত্যেক উদ্বাস্তুকেই একটি করে আত্ম-পরিচিতির সংশাপত্র বা সার্টিফিকেট দিতে হবে।

দ্বিতীয়ত যারা দণ্ডকারণ্য যেতে রাজী আছে তাদের সেখানে পাঠানোর বন্দোবস্ত করতে হবে। এজন্য ওড়িশ্যা ও মধ্যপ্রদেশ সরকারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করতে হবে, এটা হয়ে যাবে, অন্তত এখনকার মতো যারা যাবে তাদের জন্য ত বটেই। অবশ্য যারা ওখানে যেতে রাজী হবে তাদেরই শুধু পাঠানো যেতে পারে। আমি জানি না, যে সব সাঁওতাল এসেছে তাদের মধ্যে কতজন যেতে রাজী হবে। তারপরে আছে জেলেদের প্রশ্ন। দণ্ডকারণ্যে চাষীদের জায়গা

করে দেওয়া যায়, কিন্তু জেলেদের মাছ ধরার জন্য কোনো ব্যবস্থা ওখানে করা যাবে না। তাছাড়া প্রত্যেক পরিবারকে সাত একর করে জমি দেবার প্রতিশ্রুতিও আমরা দিতে পারছি না। সেটা দেখতে হবে কত পরিমাণ জমি আমরা তাদের দিতে পারবো।

আসল সমস্যাটা যারা এসে পড়েছে তাদের নিয়ে নয়। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে আরও বহু লোক আসতে পারে, হয়ত বিপুল সংখ্যক লোকই এসে পড়বে। আমাদের চেষ্টা করতে হবে সেটা যেন না ঘটে। আগের চিঠিতে তোমাকে যা লিখেছি, বিপুল সংখ্যায় দলে দলে লোক আসবার পথ যদি খোলা থাকে, তাহলে তাদের ভারেই আমরা শেষ হয়ে যাবো। হাজার হাজার বা লক্ষ লক্ষ লোকের জন্য ব্যবস্থা করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব।

আমরা প্রথম পদক্ষেপ যা নিতে চাই সে সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়েছি। পরিস্থিতি এখনো কিছুটা অনিশ্চিত ও স্থিতিশীল নয়। সেজন্য এ বিষয়ে পরে আরও আমাদের ভাবতে হবে। কিন্তু এই মুহূর্তে যারা এসেছে তাদের সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে হবে, তাদের পরিচয়-পত্র দিতে হবে, যারা দণ্ডকারণ্যে যেতে রাজী, তাদের বাছাই করতে হবে আর সেখানে তাদের সরাসরি পাঠিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করতে হবে। আশা করি তুমি একমত হবে যে এই মুহূর্তে আমরা যা করতে পারি এটাই হচ্ছে তার চূড়ান্ত রূপ।

তোমার স্নেহভাজন

জওহরলাল

কলকাতা ২৬শে জুন ১৯৬২

প্রিয় জওহর,

মালদার লোকদের জন্য পাঠানো তোমার ৫০০০ টাকার চেক পেয়েছি। এজন্য তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। কালীবাবু কাল মালদা যাচ্ছেন। আমি আমার ত্রাণ ভাণ্ডার থেকেও ২০০০ টাকা দিয়েছি। এতে করে কিছু ত্রাণ ব্যবস্থা করা যাবে। আমি ধুতি শাড়ির ১১টা গাঁট পাঠাবো, বিড়লার কাপড় কল থেকে ৬টা, আর অন্য কল থেকে ৫টা। এখনকার মতো এতেই চলবে, কিন্তু যা আমি বলতে চাইছি সেটা হলো লোকগুলো একেবারে মাঠে পড়ে আছে। আর এই বর্ষাবাদলের দিনে তাদের আমরা গাছতলায় রাখতে

পারি কী? অথচ যদি চালা তুলে দেই তাহলে আবার লোকগুলো সে আশ্রয় ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে চাইবে কিনা সন্দেহ। আবার ওদিকে দেখ তুমি যেমন বলছো তেমনি যদি ওরা দণ্ডকারণ্যে যায় আর সে খবরটা যদি পূর্ব পাকিস্তানে পৌছয় তাহলে লক্ষ লক্ষ মানুষ এখানে চলে আসতে পারে, অবশ্য এ নিয়ে খুব খুঁৎ খুঁৎ করারও দরকার আছে বলে আমি মনে করি না। পূর্ব পাকিস্তানে এখনো ৭০।৮০ লাখ হিন্দু রয়ে গেছে, তারা তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে আসতে চায় না। এইসব লোকগুলো যারা এসেছে তারা হচ্ছে রাজসাহীর সাঁওতাল। পাকিস্তানীরা আসলে এদের তাড়িয়েই দিয়েছে বলতে হবে। এদের গোষ্ঠী আলাদা। এদের দণ্ডকারণ্যে যায়গা দিলে পূর্ব পাকিস্তান থেকে লক্ষ লক্ষ লোক চলে আসবে বলে আমার মনে হয় না। কিন্তু সে যাই হোক এদের জন্য কিছু একটা করতেই হবে।

এই মুহূর্তে আমি জি ডি বিড়লার সঙ্গে কথা বললাম। তুমি জানো রেহান্দ ড্যামে তারা একটা অ্যালুমিনিয়ামের কারখানা করছে। এ সম্বন্ধে ইনি তোমার সঙ্গে কথাও বলেছেন। আমি শুনতে পেলাম তুমি সেখানে যেতে চাইছো জুলাইয়ের শেষের দিকে। আমার মনে হয় শীতকালেই তোমার ওখানে যাওয়া ভালো। এর কারণ হচ্ছে রেহান্দ ড্যামের কাছাকাছি যে বিমান বন্দরে নামবার যায়গা আছে সেটা বর্ষাকালে ব্যবহার করা যায় না। যদি জুলাইতে যেতে হয় তাহলে তোমাকে মীর্জাপুরে নেমে গাড়ি করে প্রায় ৯৫ মাইল যেতে হবে। এখন বুঝতে পারছো? এইসব ধরণের ব্যাপারের কথাই তোমাকে আমি বলেছিলাম, যদিও জি ডি বিড়লা মশাই আমার টেবিলের সামনে বসে আছেন, তবু আমি বলছি তুমি রেহান্দ ড্যামে যাওয়া এখন পরিহার করো। তোমার অতোগুলি মন্ত্রীর মধ্যে কেউ কি নেই যে রেহান্দ ড্যামে গিয়ে কারখানাটার উদ্ঘাটন করে তোমার হয়রানিটা বাঁচাতে পারে? আমি তোমাকে পরিষ্কার বলেছি যে পরবর্তী এক বছরে এমন কোনো হয়রানি বা শ্রমসাপেক্ষ কাজ তোমার করা উচিত নয় যা তুমি সহজেই পরিহার করতে পারো। অন্য যে কোন মন্ত্রী এ কাজটা করতে পারে। তুমি কেন কষ্ট করবে? কেনই বা শারীরিক ধকল সহ্য করবে? কথাটা দয়া করে চিন্তা করে দেখো।

তোমার স্নেহভাজন,

বিধান

প্রাণঘাতী হৃদ্‌রোগের আক্রমণ

২৩শে জুন শনিবার সকালবেলা ডাঃ রায় তাঁর রোগী-দেখা ঘরে নামলেন প্রতি দিনের বাঁধা সময়ের একটু পরে। রোজ তিনি দেখতেন দশজন পুরুষ রোগী আর ছ'জন স্ত্রী রোগী—এই ছিল তাঁর নিয়ম। নিয়ম মাফিক রোগী দেখলেন তিনি ঘণ্টাখানেক ধরে। তারপরেই পশ্চিম দিনাজপুর থেকে আগত কয়েকজন কংগ্রেসীকে নিয়ে আমি তাঁর কাছে গেলাম। পশ্চিম দিনাজপুরের সদর বালুরঘাট থেকে রায়গঞ্জে সরিয়ে আনার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সরকার, এঁরা তার বিরুদ্ধে কথা বলতে এসেছিলেন। ওঁদের ইচ্ছা সদর বালুরঘাট যেমন আছে তেমনিই থেকে যাক, কিন্তু ডাঃ রায় সরকারী সিদ্ধান্তই বহাল রাখার পক্ষে। প্রতিনিধিদের একজন সদস্য এতে অখুশি হয়ে বেশ চেঁচিয়েই তর্ক জুড়ে দিয়েছিলেন। এতে মুখ্যমন্ত্রী চটে গেলেন। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, আমার শরীর আজ ভালো নেই, তুমি তোমার মতামত না হয় আরেক দিন এসে পেশ ক'রো।

এই বলে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন, নাছোড়বান্দা ভদ্রলোকটি তাঁর পিছন পিছন গিয়ে বালুরঘাটের পক্ষে যুক্তিজাল বিস্তার করতে লাগলেন। যুগপৎ অধৈর্য ও ক্রোধান্বিত হয়ে মুখ্যমন্ত্রী ঘুরে দাঁড়ালেন, বললেন, কংগ্রেসী হিসাবে তোমার কর্তব্য তোমাদের নেতার স্বাস্থ্যসম্পর্কে অবহিত থাকা। আমি তোমাকে বললাম যে আমার শরীরটা আজ ভালো নেই, তবু তুমি তর্কাতর্কি করছো? কেন, পারো না কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরে থাকতে?

তারপরই তিনি মুখ ফিরিয়ে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমরা যথারীতি যথাসময়ে মহাকরণে গেলাম তাঁর পিছনে পিছনে। আমি যখন গিয়ে পৌঁছলাম, তখন তাঁর ঘরে উঁকি মেরে দেখি, ফাইলের মধ্যে ডুবে গেছেন। আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম, সত্যি কি তিনি অসুস্থ? না ঐ সব অযথা তর্কজাল বিস্তার-করা লোকগুলোকে তিনি এড়াবার জন্য কথাটা বলেছিলেন? মুখখানা একটু শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে বটে, কিন্তু এ ছাড়া আর কিছু লক্ষিত হচ্ছিল না যা থেকে বোঝা যায় তিনি অসুস্থ। সকালে এক ঘণ্টা কাজ করার পর একটু কফি আর বিস্কুট খেতেন, সেদিনও তাই খেলেন। ১৯৬১ সালে আমেরিকা থেকে ফিরে আসার পর আমেরিকানদের ধরনে খাবার দাবার খেতে পছন্দ করছিলেন। তাঁর এক বয়স্ক বন্ধু ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ মিত্রকে একবার

তিনি এ নিয়ে বলেও ছিলেন যে, মধ্যাহ্নে বা রাতের বেলা খাবার সময় একবারে সব খাবার না খেয়ে মাঝে মাঝে টুকটাক করে খাওয়ার অভ্যাসটা অনেক ভালো। বিশেষ করে বয়স যাদের বেশি, তাদের পক্ষে খুবই ভালো এই অভ্যাস।

দুপুরবেলা আমার সহকর্মী যতীন্দ্রনারায়ণ বসু এসে পৌঁছতে আমি বাড়ি চলে এলাম দুপুরবেলাকার আহারটা সেরে নিতে।

বিকেলবেলা আবার যখন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি গেলাম, তখন টেলিফোন অপারেটার দত্ত জানালো যে কর্তা আজ শীগ্‌গির শিগ্‌গির বাড়ি ফিরে আসছেন। ঠিক তাই হলো। মিনিট কয়েকের মধ্যেই দেখলাম তাঁর গাড়িখানা ভিতরে যথাস্থানে এসে দাঁড়ালো। আমরা যেমন এই সময় তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াতাম, চলতাম তাঁর সঙ্গে লিফট পর্যন্ত, যদি কোনো নির্দেশ থাকে তা শুনে নেবার জন্য—তেমনি আজও গেলাম, দেখলাম লিফটের দিকে হেঁটে আসছেন খুব আস্তে আস্তে। নিজের শোবার ঘরে পৌঁছবার পরক্ষণেই ইণ্টার কম-এর মাধ্যমে আমাদের বললেন, তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডাঃ যোগেশচন্দ্র গুপ্তকে খবর দিতে, তিনি যেন এখখুনি তাঁর ই সি জি মেসিনটা নিয়ে চলে আসেন। ডাঃ গুপ্ত নিজেই অসুস্থ ছিলেন বলে তাঁকে পাওয়া গেল না। মুখ্যমন্ত্রী তাই এরপর কথা বললেন তাঁর স্বাস্থ্য কৃত্যকের অধিকর্তা লেঃ কর্ণেল এন সি চ্যাটার্জীর সঙ্গে। হৃদ্‌রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ ভুবন সিংহ থাকতেন ওঁর বাড়ির খুব কাছে। তিনি শীগগিরই এসে পড়লেন। ডাঃ সিংহ ই সি জি যন্ত্র এনেছিলেন, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর শোবার ঘরের বৈদ্যুতিক সুইচ ইত্যাদিতে কোনো গোলযোগ থাকায় ইলেকট্রো কার্ডিওগ্রাফের অঙ্কপাত পরিষ্কার ফুটে উঠলো না। ডাঃ সিংহ বললেন, অন্য একজন কার্ডিওলজিস্টকে তাঁর মেসিন নিয়ে আসতে বলে দিন।

সেই মতো ডাঃ ডি পি বসু এলেন তাঁর যন্ত্র নিয়ে। এ সব কিছুই ঘটে গেল আধ ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে। কার্ডিওগ্রাফ রেকর্ড থেকে দেখা গেল যে ডাঃ রায় খুব বাড়াবাড়ি ধরনের মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্যার্কশন দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন। সেজন্য বিশেষজ্ঞ দুজন ডাঃ রায়কে বললেন, ব্যথা কমাবার জন্য পেথিডিন ইনজেকশন নিতে। তখন তাঁর জ্ঞান পুরোপুরিই রয়েছে। কিন্তু ঐ সময় কোনো রকম ওষুধ নিতে রোগী রাজী হচ্ছিলেন না। ভুবন সিংহকে রেখে ডাঃ বসু তাড়াতাড়ি ছুটে গেলেন ডাঃ জে সি গুপ্তের বাড়িতে তাঁকে ই সি জি

রেকর্ডটা দেখাতে। চিত্রটা এত ভয়াবহ যে ডাঃ গুপ্ত দেখে আঁতকে উঠলেন। নিজে অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও তখখুনি ছুটে এলেন ডাঃ বসুর সঙ্গে। ডাঃ রায়কে হয়ত পেথিডিন আর নয়ত মরফিন নিতে জোর করতে লাগলেন। অনেকবার অনুরোধ উপরোধ করবার পর শেষপর্যন্ত রোগী রাজী হলেন একটা ইনজেকশন নিতে। এ পর্যন্ত খুব শান্ত ভাবেই তিনি যন্ত্রণা সহ্য করে আসছিলেন। পেথিডিন দেবার পরই ঘুমিয়ে পড়লেন। রাত সাড়ে আটটা অর্থাৎ ঘণ্টা দুই ওঁকে পর্যবেক্ষণে রাখার পর ডাঃ ডি পি বসু নেমে এলেন আমাদের ঘরে। আমি সরাসরি জিজ্ঞাসা করলাম, কেমন আছেন উনি? ওঁর রোগটাই বা কী?

ওঁর ই সি জি যন্ত্রটাকে দেখিয়ে বললাম, এটা দেখে বুঝতে পারছি রোগটা কী হতে পারে। কিন্তু তবু আপনার নিজের মুখ থেকে কথাটা শুনতে চাই।

ডাঃ বসু তাঁর বুকে হাত রাখলেন, বোঝাতে চাইলেন যে ডাঃ রায় হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি বললেন, উনি এখন ঘুমুচ্ছেন। বেশ কয়েকটা দিনের জন্য ওঁর পুরোপুরি বিশ্রাম দরকার। আমি বললাম, কিন্তু কাল রবিবার হলেও তাঁর বাড়িতেই বেশ কয়েকটা সাক্ষাৎকার আছে। এ ব্যাপারে আমরা কী করবো বলে দিন?

ডাঃ বসু বললেন, সমস্ত সাক্ষাৎকার-টাক্ষাৎকার বাতিল করে দিন। তাঁকে পুরোপুরি বিশ্রাম নিতে হবে বিছানায় শুয়ে থেকে। কোনোমতেই কোনো ধকল সহ্য করা তাঁর চলবে না। আমাদের মুশকিলটা হয়েছে কি জানেন? উনি হচ্ছেন ডাক্তার হিসাবে আমাদের মধ্যে সব থেকে বড়ো, সব থেকে সিনিয়র, সেজন্য ওঁর চিকিৎসা করতে গিয়ে আমরা অসুবিধায় পড়ে যাচ্ছি। কোনো বিশেষ ধরনের চিকিৎসায় ওঁকে রাজী করানো, সে কি সোজা কাজ মশাই?

এই বলে ডাঃ বসু চলে গেলেন পরদিন সকালে আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। সারা বাড়ি জুড়ে অখণ্ড নীরবতা বিরাজ করতে লাগলো। ঐ রাত্রে আমি নিজে যখন বাড়ি রওনা হলাম, তখন রাত প্রায় এগারোটা।

পরদিন সকালে এসে প্রথমেই আমরা একটা নোটিশ টাঙিয়ে দিলাম, মুখ্যমন্ত্রী অসুস্থ, আর সেজন্য যতদিন না তিনি সেরে উঠছেন, ততদিন রোগী দেখতে পারবেন না। এর পরে আমার কাজ হলো তাঁর ঐ দিনের জন্য নির্দিষ্ট আধা ডজন সাক্ষাৎকার ইত্যাদি বাতিল করে দেওয়া ফোন করে করে। সেটা করা হলো। সাড়ে আটটার পর তিনজন কার্ডিওলজিষ্টই একের পর এক এসে

গেলেন। কয়েকজন নাম করা ডাক্তার নিজে থেকেই এসে গেলেন। আমি তাঁদের ভিতরে নিয়ে গেলাম। এদের মধ্যে ডাঃ শৈলেন সেন অন্যতম। কিছুক্ষণ পরেই আমার ডাক পড়লো ওপরে। দোতলায় উঠে অবাক হয়ে দেখি ধুতি আর সার্ট পরে ডাঃ রায় ডাক্তারদের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। ওদের তিনি বলছেন, আমি তোমাদের একটা আশ্বাস দিতে পারি, আমি মরছি না। আমার আরও কিছু কাজ করবার আছে।

এ কথা বলে আমার দিকে সরে এলেন বললেন, প্রথম যাঁর আসবার কথা তিনি কখন আসছেন ?

প্রশ্ন শুনে আমি হকচকিয়ে গেলাম—এ রকম অবস্থায় পড়তে হবে বলে জানতাম না। বললাম, প্রথম যার আসবার কথা তিনি এরই মধ্যে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি আসছেন না। দ্বিতীয় জন হচ্ছেন পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার। এঁকে এবং আর সবাইকে আমরা জানিয়ে দিয়েছি সাক্ষাৎকার বাতিল করা হয়েছে।

আর যাবে কোথায়, কথাটা শুনে যেন তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন ! ডাক্তারদের সামনেই আমাকে প্রচণ্ড ধমক দিলেন। তারপরে বললেন, এখ্‌খুনি তাঁদের ফোনে খবর দাও, নির্ধারিত সময় মতো তাঁরা যেন ঠিক আসেন। দোতলাতেই তাঁদের নিয়ে আসবে, এখানকার বৈঠকখানায় বসেই তাদের সঙ্গে কথা বলবো।

ডাক্তাররা ওঁর প্রত্যেকটি কথাই শুনেছিলেন। ওঁদের নির্দেশ মতো আমি সাক্ষাৎকার বাতিল করে দিয়েছিলাম, কিন্তু আমার হয়ে ওঁরা একটি কথাও বললেন না। সেজন্য মনে একটু দুঃখও হলো। ভারাক্রান্ত মন নিয়েই নিচে নেমে এলাম। তাঁর রাগ দেখে আমার তাঁর মন্ত্রিত্বকালীন প্রথম দিককার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল—রেগে গেলে এই রকমই চেঁচিয়ে উঠতেন। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রতিককালে ওটা একেবারে থেমেই গিয়েছিল বলা চলে। আমরা ও অধ্যায় প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম।

কার্ডিওগ্রাফ রিপোর্টে তাঁর কোনো অবনতি দেখা গেল না। তিনি পূর্ব নির্ধারিত সময় ধরে সাক্ষাৎকারগুলো করে গেলেন। সন্ধ্যাবেলা আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, ডাক্তাররা যতদিন না অনুমতি দিচ্ছে ততদিন আমি রোগী দেখতেও পারবো না, অফিসেও যেতে পারবো না। কিন্তু খুব জরুরী

অন্তিম শয্যায় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়

সরকারী কাগজপত্র একবার সকালে আরেকবার বিকেলের দিকে নির্দেশের জন্য পাঠাতে পারো।

খুব সীমিত সংখ্যক সাক্ষাৎকারের অনুমতি ছিল বিশেষ করে তাঁর সহকর্মী ও অফিসারদের ব্যাপারে। অবশ্য মুখ্য সচিব ছিলেন এর ব্যতিক্রম। ডাঃ রায় আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন খুব কোমল গলায়। সম্ভবত সকাল বেলার ঘটনার জন্য তিনি মনে মনে অপ্রতিভ হয়েছিলেন। যাই হোক, তাঁর আত্মীয়-স্বজনরা দেখলেন—যা তাঁর পক্ষে করা দরকার, তা তিনি করতে চাইছেন না, বা কারো কথা শুনছেনও না। তখন তাঁরা তাঁর বয়স্ক ও সিনিয়র বন্ধু লেঃ কর্নেল ললিতমোহন ব্যানার্জীকে খবর দিলেন। ইনিই জীবিতদের মধ্যে একমাত্র ব্যক্তি, যাঁর কথা ডাঃ রায় ফেলতে পারতেন না। ১৯৫৩-৫৪ সালে তাঁর যখন হৃদ্‌রোগ হয়েছিল, তখন যেমন করেছিলেন, ঠিক তেমনি এবারও ডাঃ ব্যানার্জী এলেন তাঁর কাছে থাকতে।

ডাঃ জে. সি. গুপ্ত রোজ সকালে তাঁকে পরীক্ষা করে সাড়ে দশটা নাগাদ আসতেন আমাদের ঘরে। এসে রাজ্যপালের জন্য ডাঃ রায়ের শারীরিক অবস্থা কেমন সে সম্বন্ধে ছোট্ট একটা বুলেটিন লিখতেন। তাঁর লেখা হয়ে গেলে ওটা আমি 'গোপনীয়' লেখা খামে পুরে পাঠিয়ে দিতাম। এই দৈনিক বুলেটিনের কথা জানতাম শুধু আমরা দুজন। আর এ থেকেই আমরা জানতে পারতাম তাঁর হার্টের অবস্থা ক্রমশই খারাপের দিকে যাচ্ছে, যদিও বাইরে তার কোনো প্রকাশ নেই।

তাঁর রোগের প্রকোপের দিন তাঁকে দোতলার বৈঠকখানার সংলগ্ন ছোট ঘরখানায় নিয়ে যাওয়া হলো। এ ঘরে বৈদ্যুতিক সংযোগের কোনো গোলমাল না থাকায় ই. সি. জি. রেকর্ড বিনা বাধায় করার সুবিধা ছিল। প্রথম দুদিন রোগ ও মৃত্যুকে তিনি জয় করতে চেষ্টা করেছিলেন অসাধারণ শক্তি দিয়ে, মাত্র ইচ্ছা-শক্তি প্রয়োগ করে। কিন্তু ছোট ঘরে আসার পর তিনি ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়তে লাগলেন। ডাক্তারদের কাছে বিশেষ করে ডাঃ ব্যানার্জীর নিষেধাজ্ঞার কাছে নিজেকে সঁপে দিলেন। সারা অসুখের সময়টা তিনি অফিস-সংক্রান্ত হালকা কাজ করলেন, সামান্য দু একটা চিঠির ডিকটেশন দিলেন। খুব সীমিত সংখ্যক সাক্ষাৎকারীর সঙ্গে কথা বললেন। আর জরুরী ফাইলগুলোর নিষ্পত্তি করলেন। এটুকু না করে তিনি থাকতে পারতেন না, এ ছিল তাঁর

মানসিক খাদ্য আর বলকারক ঔষধের মতো। তাঁর টেলিফোনের ওপরে আমরা কঠোর বাধানিষেধ আরোপ করেছিলাম। তিনি নিজে থেকে কাউকে ফোন করতেন না। অসংখ্য লোক ফোন করে তাঁর খোঁজখবর নিতেন, তার মধ্যে কংগ্রেসের কর্তাব্যক্তিও একজন ছিলেন। রোজ ফোন করে তাঁর অসুখের কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চাইতেন। রোগশয্যায় শুয়েই তিনি একটা মহৎ কাজ করলেন। দেশের অন্যতম বৃহৎ ঔষধের কারখানার মালিক একটি বিশিষ্ট পরিবারের সম্পত্তি নিয়ে ভাইদের মধ্যে গোলমাল বাধলে আপসে তার মীমাংসা করে দিলেন তিনি। এজন্য একদিন তারা সবাই তাঁর কাছে এসেছিল।

মন্ত্রিসভার সাপ্তাহিক বৈঠক ধার্য হলো ২০শে জুন সকাল ১১টায়। তাঁর সভাপতিত্বে এটাই শেষ মন্ত্রিসভার বৈঠক। তাঁর সহকর্মী প্রফুল্লচন্দ্র সেন ও অন্যান্যরা খুবই সচেতন ছিলেন, যাতে ডাঃ রায়ের ওপর কোন রকম চাপ না পড়ে। মুখ্য সচিব বৈঠকের জন্য খুব সংক্ষিপ্ত কার্যসূচি তৈরি করে দিয়েছিলেন। পুরো বৈঠকটা শেষ হতে আধঘণ্টাও সময় লাগে নি। ইতিমধ্যে তাঁর এই গুরুতর অসুখের খবরটা কাগজওয়ালাদের কাছে খুব গোপন রাখা হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রীর অসুখের খবর কাগজে প্রথম বেরুলো ২৫শে জুন। কলকাতার কাগজগুলো এইটুকু মাত্র প্রকাশ করলো যে তিনি অসুস্থ এবং আশা করা যায় ২৭শে জুন থেকে আবার তিনি অফিস করতে পারবেন। কিন্তু ঐ ২৭শে জুনই আবার খবর বেরুলো তিনি নিম্ন রক্তচাপ রোগে ভুগছেন, আর সেজন্য তাঁর কার্যসূচি জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত স্থগিত রাখা হলো।

২৯শে জুন রাত্রে আমাকে ওপরে ডেকে পাঠানো হলো, মুখ্যমন্ত্রী একটা চিঠির ডিকটেশন দিতে চান। তার আগে বিকেলের দিকে তাঁর কাছে ডাকে আসা মাত্র খানকতক চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, ঠিক যে কখানার মতো পাঠাতে ডাক্তারদের নির্দেশ ছিল। এর মধ্যে মাত্র একটি চিঠির ব্যাপারেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতে চাইছিলেন। অন্য চিঠিগুলির ব্যবস্থা তিনি নিজেই করেছেন, চিঠির মাথায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের বিভাগের নাম লিখে। এটাই তাঁর অভ্যাস ছিল। বাড়িতে দৈনিক চিঠি আসতো ৫০ থেকে ১০০, কখনো কখনো তারও বেশি। সে সবের মাথায় যা লেখবার লিখে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রীদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। কিন্তু যে চিঠির কথা বলছি সেটা একটি ছোট্ট চিঠি, বাংলায় লেখা ; লিখেছে একটি গরীব ছাত্র। ছাত্রটি বিজ্ঞানে ইনটারমিডিয়েট

পাশ করেছে ভালভাবে। এখন চাইছে যাদবপুর ইনজিনীয়ারিং কলেজে ইনজিনীয়ারিং ডিগ্রি কোর্সে ভর্তি হতে। ঐ কলেজের পরিচালকমণ্ডলীর সভাপতি এবং মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তিনি যাতে এটি করে দেন তার জন্য চিঠিতে প্রার্থনা। সাধারণ ভাবে এই ধরনের চিঠি রেকটরের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। কিন্তু ঐ দিন তিনি তা করলেন না। তিনি ডিকটেশন দিয়ে একটি চিঠি লিখলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডাঃ ত্রিগুণা সেনের উদ্দেশ্যে। তাতে ছিল:

"প্রিয় ত্রিগুণা,

আমি গরীব অথচ মেধাবী একটি ছাত্রের চিঠি এই সঙ্গে পাঠালাম। ছেলেটি পরীক্ষায় মোটামুটি ভালোই নম্বর পেয়েছে। আমি খুশি হবো যদি তুমি এর বিষয়টা বিবেচনা করে একে অবৈতনিক ছাত্র হিসাবে ডিগ্রি কোর্সে ভর্তি করে নাও।"

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে তিনিও ছেলেটিকে চিনতেন না, ছেলেটিও তাঁকে ব্যক্তিগত ভাবে চিনতো না। ছেলেটি এমন একজনের কাছেই প্রার্থনা জানিয়েছিল, যিনি সারা জীবন ধরে গরীব ছাত্রদের উপকার করার চেষ্টা করে গেছেন। নিয়তির কী বিধান, এটাই তাঁর শেষ সরকারী কাজ এবং এটাই শেষ চিঠি। ত্রিগুণা সেন পরে আমাকে বলেছিলেন, তাঁর শেষ ইচ্ছার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ঐ ছেলেটিকে তিনি ডিগ্রি কোর্সে অবৈতনিক ছাত্র হিসাবেই ভর্তি করে নিয়েছিলেন।

সারা শনিবারটা (৩০শে জুন) তিনি প্রকৃতপক্ষে বিশ্রাম নিয়েই কাটালেন। পরের দিন রবিবার তাঁর ৮১তম জন্মদিন পালিত হবে সারা দিন ধরে। সে বিষয়ে তাঁর অনুরাগীরা, বিশেষ করে কংগ্রেসী বন্ধুরা তারই কার্যসূচি চূড়ান্ত করছিল বাইরে বসে। মন্দিরে মসজিদে গীর্জায় প্রার্থনা-সভা হবে বলে স্থির হয়েছিল। ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের একটি অংশ সমষ্টিগতভাবে ঐ দিন রক্তদান করবে, আর সেজন্য তারা তাঁর অনুমতি চাইলো। তিনি বললেন, এটা ভালো। হাসপাতালের রোগীদের জন্য রক্তদান খুবই ভালো কথা।

রাষ্ট্রপতির আগমন

ডাঃ রায়ের ৮১তম জন্মদিন উপলক্ষে মহাজাতি সদনে যে জনসভা হবে তাতে যোগদান করবার জন্য স্পেশাল ট্রেনে করে কলকাতায় এলেন এই শনিবার

দিনই ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণ। হাওড়া ষ্টেশনে নেমে রাজ্যপালকে সঙ্গে নিয়ে রাষ্ট্রপতি সরাসরি এলেন মুখ্যমন্ত্রীকে দেখতে। তিনি যে আসছেন মুখ্যমন্ত্রীকে তা জানানো হয়েছিল। রাষ্ট্রপতি ও তাঁর সাঙ্গ-পাঙ্গদের নিয়ে আমরা যখন ওপরে গেলাম, তখন দেখি তিনি পোশাক আশাক বদলে প্রস্তুত হয়ে আছেন। বেশ তাজা দেখাচ্ছিল তাঁকে। রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালকে তিনি স্বাগত জানালেন বৈঠকখানার দরজার কাছে। রাষ্ট্রপতি আর তিনি প্রায় পনেরো মিনিট ধরে কথাবার্তা বললেন। গাড়িতে ওঠবার আগে রাষ্ট্রপতি অপেক্ষমান সাংবাদিকদের বললেন, ডাঃ রায়কে অনেক ভালো দেখাচ্ছে।

কিন্তু আসলে তাঁর অবস্থা ভালো ছিল না। কোনো একটি কাজে আমি ওপরে গেছি। হঠাৎ শুনতে পেলাম কর্ণেল ললিতমোহন ব্যানার্জী তাঁকে তাঁর অভ্যস্ত নিচু অথচ দৃঢ় গলায় বলছেন, খুব বেশি শারীরিক ধকল নিচ্ছো। তোমার যা এখন অবস্থা তাতে এটা করা তোমার কোনমতেই উচিত নয়।

সোফার ওপর বসে পড়ে ডাঃ রায় বললেন, দেখুন, অপনি খুব ভালো সার্জেন হতে পারেন, কিন্তু হৃদ্‌রোগের কী জানেন ? আমি হৃদ্‌রোগের চিকিৎসা করে আসছি তিরিশ বছর ধরে। আমি জানি কিসে কী হয়। কোনো ঔষধই আমার আর কোনো ভালো করতে পারবে না।

বুঝলাম, বাঁচার সব আশাই তিনি ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর বাইরের আচরণ দিয়ে তাঁর কাছের লোকজনদেরও বুঝতে দেন নি যে তাঁর জীবনীশক্তি দ্রুত লোপ হয়ে আসছে। সেদিন একমাত্র ঐ বিরল মুহূর্তে নিজের মনের কথা বলে ফেললেন এমন একটি মানুষের কাছে, যাঁকে তিনি নিজের দাদার মতো ভক্তি শ্রদ্ধা করে আসছেন। আমি চুপচাপ ওখান থেকে চলে এলাম, ঘুণাক্ষরেও কথাটা কাউকে বলি নি তিনি বেঁচে থাকা পর্যন্ত।

অনেকেই হয়ত জানেন না, তাঁর এই আট দিনের অসুখের সময় তাঁর মালিশকারী লালমোহন ঘোষ তাঁকে কী অক্লান্ত সেবাটাই না করেছিল। ১৯৩০ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় আলিপুর জেলে সহবন্দী থাকার সময় লালমোহন তাঁর সংস্রবে এসেছিল। ঐখানেই ডাঃ রায় তাকে মাসাজ বা মালিশ করার কায়দা কানুন শিখিয়ে দিয়েছিলেন। লালমোহন পরে আমাকে বলেছে, বিধান রায় ছাড়াও জেলে থাকার সময় সে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ও

বিধানচন্দ্রের শেষ যাত্রা : কলকাতার রাজপথে

জে এম সেনগুপ্তকে মালিশ করে দিয়েছে। যাই হোক, সেই সময় থেকে তিরিশটি বছর লালমোহন ছিল ডাঃ রায়ের মালিশকারী।

ঐ শনিবারেই রাত তখন প্রায় আটটা হবে, বাড়ি তখন প্রায় খালি, আমরা দেখলাম, ডাঃ রায়ের চিকিৎসা সংক্রান্ত সহকারী অনিল রায় ওপরে যাচ্ছেন তাঁর মেডিক্যাল ব্যাগটা নিয়ে। খানিক পরেই তিনি নিচে নামলেন একটি চিকিৎসাবিষয়ক বই হাতে নিয়ে। বইখানা ডাঃ রায়ের হাতে দিলেন, তিনি ওটি দেখতে চেয়েছিলেন। পরে অনিল রায় আমার ঘরে আসায় তাঁর কাছ থেকে ব্যাপারটা জানতে পারলাম। ডাঃ গুপ্ত আগেভাগেই একটা পেথিড্রিন ইনজেকশন রাত্রিবেলা রোগীকে দিতে হবে বলে নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এতে গলা শুকিয়ে যেতে পারে মনে করে ইনজেকশনটা নিতে ডাঃ রায় একটু ইতস্ততঃ করছিলেন। অনিল রায়কে ডেকে তাই বলেছিলেন ফার্মাকোপিয়া বইখানা নিয়ে আসতে। বইখানার পৃষ্ঠা ওল্টাতে ওল্টাতে অনিল রায়ের সঙ্গে আলোচনা করে ডাঃ রায় শেষ পর্যন্ত ইনজেকশন নিতে রাজি হলেন। ইনজেকশন দেওয়ার পর অনিল রায় আমাদের ঘরে এসে বললেন, ইনজেকশন দেওয়া হলে উনি সস্নেহে আমার দিকে তাকিয়ে কী বললেন জানেন? বললেন, বেঁচে থাকো, দীর্ঘকাল বেঁচে থাকো!

এতে অনিল রায় নিজেই খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর আজীবনের সহকারীর কাছ থেকে নেওয়া এই তাঁর শেষ সেবা। হয়ত এটা বুঝেছিলেন বলেই ডাঃ রায় এ কথাটা বলে থাকবেন।

সে রাত্রে অনিল রায়ের বারবার পুরনো কথা মনে পড়ছিল। আমরাও ডাঃ রায়ের চিকিৎসক জীবনের প্রথম দিককার কথা জানতে চাইলাম। অনিল রায় ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন, এই শতাব্দীর প্রথম দিককার দশকে যখন তিনি ডাক্তারীর সর্বোচ্চ বিলাতী ডিগ্রি এম আর সি পি এবং এফ আর সি এস নিয়ে ইংল্যাণ্ড থেকে দেশে ফিরে এলেন, তখন এখানকার ব্রিটিশ সার্জেন জেনারেল তাঁকে কলকাতার ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলে ফার্মাকোলজির অধ্যাপকের পদ দিলেন—যদিও তাঁর যুগপৎ এম ডি এবং এম আর সি পি থাকায় তিনি প্রফেসর অফ মেডিসিন পদ পাবার সম্পূর্ণ যোগ্য ও অধিকারী ছিলেন। ফার্মাকোলোজিস্ট হিসাবে তিনি মাঝে মাঝে এমন সব দুষ্প্রাপ্য ঔষধের ব্যবস্থাপত্র দিতেন, যেগুলি তখন খুব কম ওষুধের দোকানই দিতে পারতো।

এখানে বলা দরকার, ডাঃ রায় অনিল রায়কে নিজেই একদিন কথায় কথায় বলেছিলেন, সেই সময় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজের পরিচালক সমিতিকে বলেছিলেন যে, যদি আগে কলেজে ডাঃ রায়কে প্রফেসর অফ মেডিসিন করে তাঁরা আনতে পারেন, তাহলে তাঁদের কলেজকে স্বীকৃতি দেবার কথা বিশ্ববিদ্যালয় বিবেচনা করে দেখতে পারেন। এই কথাটা তাঁদেরই এক বন্ধু তাঁকে ফোন করে জানিয়েছিলেন। সেই সময় ঐ পদের জন্য মাসিক ভাতা ছিল মাত্র ১৫০ টাকা। ডাঃ রায় সরকারী চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে ঐ কাজে যোগ দিতে তৎক্ষণাৎ রাজী হলেন, যদিও সার্জেন্ট জেনারেল বলেছিলেন—অত দ্রুত সিদ্ধান্ত নিও না।

ডাঃ রায় ঐ টাকা মাসে মাসে ছাত্র কল্যাণ তহবিলে দান করতেন তাঁর মা বাবার নামে। যাই হোক, তাঁর কর্মক্ষেত্রের এই উন্নতি চিকিৎসক হিসাবে তাঁর সামনে একটি নূতন জীবিকা ক্ষেত্রের দ্বার খুলে দিয়েছিল।

অনিল রায়ের কাছ থেকে ঐ সব কথা শুনছিলাম। এমন সময় মুখ্যমন্ত্রী আমাকে ওপরে ডেকে পাঠালেন। আমি তাঁর শোবার ঘরে যখন ঢুকলাম তখন রাত প্রায় সাড়ে ন'টা হবে, তিনি বিছানায় একটু কুঁকড়ে শুয়ে ছিলেন, আমাকে দেখে ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন—জন্মদিনে যাঁরা আসবেন, তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে পেরে উঠবো না। যেখানে যেখানে ভালো বুঝবে নোটিশ টাঙিয়ে দেবে।

বলে, নিজেই আমাকে ইংরাজী ও বাংলায় ডিকটেশন দিয়ে লেখালেন :

> আমার জন্মদিনে যাঁরা আমাকে অভিনন্দন জানাতে আসছেন তাঁদের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ডাক্তারদের নির্দেশ অনুসারে আমি নিজে তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে অক্ষম।—
>
> বিধানচন্দ্র রায়

এই কয়টি কথা বলতেই তিনি হাঁপিয়ে উঠলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে দম নিয়ে তারপরে বললেন—তুমি আজ সকাল সকাল বাড়ি যাও। কালকে বহুলোক আসবে, তাদের অভ্যর্থনা জানাতে হিমসিম খেয়ে যাবে। কাল বরং সকাল-সকাল এসো।

তাঁর মৃত্যুর আগের রাত্রে দেওয়া এই-ই ছিল আমার প্রতি তাঁর শেষ আদেশ। সেদিনকার সেই নির্মম রবিবার—১লা জুলাই—তাঁর জন্মদিনও বটে,

মৃত্যুদিনও বটে—সকাল সাতটায় ঘুম থেকে উঠলেন ডাঃ রায়। আগের রাতটা মোটামুটি ভালোই ঘুমিয়েছিলেন। উঠে, স্নান সেরে নিলেন, বিছানায় বসে মিনিট দশেক বসে ব্রহ্মস্তোত্রম্ পড়ে প্রার্থনা করলেন। নটার সময় এক কাপ দুধ ও কিছু ফল খেলেন। ততক্ষণে তিনি খবর পেয়ে গেছেন যে দলে দলে লোক আসছে ফুল আর মিষ্টি নিয়ে। তারা আসছে বটে, কিন্তু কোনো গোলমাল নেই, হৈ চৈ নেই, নোটিশ দেখে তারা শৃংখলার সঙ্গে তাদের কাজ করে চলে যাচ্ছে। ফুল আর ফল যথারীতি বিভিন্ন হাসপাতালে রোগীদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হতে লাগলো। বাড়ির মধ্যে সবাই কথা বলছে ফিস ফিস করে, আর মনে মনে প্রার্থনা জানাচ্ছে, ওঁর অসুখ ভাল হয়ে যাক, উনি শিগ্‌গির শিগ্‌গির সেরে উঠুন।

তারপর একে একে আসতে লাগলেন ডাক্তাররা, জে সি গুপ্ত, ডি পি বসু অমর মুখার্জী, এল এম ব্যানার্জী এবং অন্যান্যরা। এঁরা সমবেত ভাবে রোগীকে পরীক্ষা করলেন। বিপদ একেবারে সামনেই এমন আশঙ্কা তাঁরা বাহ্যত প্রকাশ করলেন না, বেলা ১টায় আবার আসবেন বলে একে একে চলে গেলেন। রয়ে গেলেন শুধু ডাঃ অমর মুখার্জী। আমার ঘরে যথারীতি এসেছিলেন ডাঃ জে সি গুপ্ত, তখন বেলা হবে ১০টা, রাজ্যপালের জন্য রোজকার বুলেটিন লিখলেন, যা আমি খামে মুড়ে ব্যক্তিগত এবং গোপনীয় বলে চিহ্ন দিয়ে পাঠিয়ে দিলাম। এই বুলেটিন দেখে আমি বুঝলাম ডাঃ রায় কী ভীষণ অসুস্থ ছিলেন সেদিন।

প্রার্থনা এবং ধ্যানের পর তাঁকে একটু শান্ত দেখাচ্ছিল। তাঁর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু এ এন হালদারকে ডেকে পাঠালেন, আর যেন অন্তরের কোন্ নিভৃত তাগিদে বলে উঠলেন,—দেখ, জীবনটাকে কাটিয়ে গেলাম পুরোপুরি। আমার যা লক্ষ্য ছিল তা পূর্ণ হয়েছে। আর কিছুই আমার করবার নেই।

শান্ত-সমাহিত, কোথাও কোনো বেদনার চিহ্ন নেই তাঁর মধ্যে। ১১-৩০ পর্যন্ত শারীরিক অবস্থার কোনো অবনতি হয় নি, কিন্তু পায়খানা সেরে আসবার পরে হৃদ্‌রোগের আক্রমণ হলো প্রচণ্ড। তিনি শ্রান্ত হয়ে পড়লেন, জানাতে লাগলেন হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। ঔষধ চাইলেন। অক্সিজেন তৈরি করা ছিল, সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া হলো। সঙ্গে সঙ্গেই ডাক্তার অমর মুখার্জী তাঁকে মরফিন আর অ্যাট্রোফিন ইনজেকশন দিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হোলো না—১১-৫৫

মিনিটে জীবনদীপ দপ করে নিভে গেল। তাঁর বাড়িটা ক্লিনিক হবে, আর সেই ক্লিনিকে প্রথম রোগী ডাঃ রায় নিজেই।

তাঁর মৃত্যুর খবর সর্বপ্রথম প্রচার করলো অল ইণ্ডিয়া রেডিও বেলা ১২টার পরে—একটি বিশেষ ঘোষণার মাধ্যমে। রাজ্য সরকার ঘোষণা করলেন সাতদিনের শোক দিবস। ভারত সরকার ও অন্যান্য রাজ্য সরকার তাঁর স্মৃতির প্রতি সম্মান দেখাতে ২রা জুলাই সোমবার ছুটি ঘোষণা করলেন। সারা দেশ জুড়ে পতাকা অর্ধনমিত রইলো। তাঁর মরদেহ দর্শন করার জন্য আবাল-বৃদ্ধবনিতার এত ভীড় হলো যে, সেই ভীড় ঠেকানো একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো। খবর পেয়ে প্রথম যিনি আসেন, তিনি মুখ্যসচিব রণজিৎ গুপ্ত। তারপরে এলেন রাজ্যপাল, মন্ত্রিমণ্ডলী, প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি অতুল্য ঘোষ আর কিছু সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারী। উপরে বসে মিলিত ভাবে শবদাহ সংক্রান্ত একটা কর্মসূচি ছকে ফেলা হ'লো। শবদেহ পরে বিধান সভা ভবনে নিয়ে রাখা হ'লো। দূর দূর থেকে যে সব লোক অবিশ্রান্ত আসছে ট্রেনে বাসে ট্যাক্সিতে, অথবা অদূর থেকে আসছে পায়ে হেঁটে, তারা যেন ভালো ভাবে দেখতে পায়।

পরদিন সকাল সাড়ে ছ'টায় রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ, ভারত সরকারের প্রতিনিধিস্বরূপ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী কৃষ্ণ মেনন, রাজ্যপাল পদ্মজা নাইডু—এঁরা একে একে জাতীয় পতাকা দ্বারা আচ্ছাদিত ওঁর মরদেহে পুষ্পার্ঘ্য স্থাপন করলেন। তারপর আমরা যারা এতদিন তাঁর আশেপাশে ছিলাম, তাঁকে খাটশুদ্ধ বাইরে আনলাম। রাধাকৃষ্ণণ দেশবাসীর পক্ষ থেকে এবং নিজের পক্ষ থেকে তাঁর শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার পক্ষে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন ক্যাবিনেট সেক্রেটারি এস এস খেরা। প্রধানমন্ত্রী নেহেরু এই জন্য বিশেষ ভাবে তাঁকে পাঠিয়েছিলেন। প্রফুল্ল সেন তাঁর পক্ষ থেকে এবং তাঁর সহযোগী মন্ত্রিমণ্ডলীর পক্ষ থেকে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করলেন। ব্যক্তিগত ভাবে পুষ্পার্ঘ্য দিলেন অশোক সেন, হুমায়ুন কবীর, জয় শুকলাল হাতি এবং কূটনৈতিক প্রতিনি[illegible]। এই সমস্ত [illegible] গেল মিনিট পনেরোর মধ্যেই।

শববাহী শকটে যখন শবদেহ রক্ষা করা হচ্ছিল, তখন জনতা সমবেত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো—বন্দে মাতরম্—

আমি ও আমার অন্যান্য কর্মীরা শববাহী শকটে উঠেছিলাম। ডাঃ রায় ইউ ডি কলোন খুব ভালবাসতেন। আমরা কয়েক শিশি ইউ ডি কলোন তাঁর শরীরে ছিটাতে হবে বলে সঙ্গে নিয়েছিলাম।

এর পর শুরু হোলো শেষ যাত্রা। বোধ হয় এ ধরনের ব্যাপারে কলকাতায় দীর্ঘতম মিছিলের এই একটি। প্রতিরক্ষা বিভাগের সৈনিকরা বিপরীত-ভাবে বন্দুক ধরে শকটের আগে আগে চললেন। বিধানসভা-ভবন থেকে কেওড়াতলা, সাত মাইলের এই যাত্রায় কাতারে কাতারে লোক এসেছিল, তারা অভিজাত নয়, পুঁজিপতিও নয়, সাধারণ মানুষ। এসেছিল সজল চোখে ব্যথাভরা বুকে, বস্তি থেকে, ঝুপড়ি থেকে, ভাঙাচোরা দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত কুটির থেকে।

বিধানসভা-ভবন থেকে শবযাত্রা এলো মহাকরণে। সেখান থেকে সকাল আটটা নাগাদ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, এখানে তিনি এক সময় উপাচার্য ছিলেন। এখান থেকে যাওয়া হলো কলকাতা কর্পোরেশনে, সেখানেও তিনি মেয়র ছিলেন কোনো এক সময়ে। তারপর শবযাত্রা ধীরে ধীরে সোজা চলতে লাগলো দক্ষিণে, কেওড়াতলা শ্মশানের দিকে। আমি শকট থেকে দেখেছিলাম কাতারে কাতারে মানুষ, পথে, বাড়ির বারান্দায়, বাড়ির জানলায়, দরজায়, ছাদে, এমন কি গাছের মাথায়। দেখতে দেখতে আমার বুকের মধ্য দিয়ে আপনিই কান্নার মতো বেরিয়ে এলো :

হে ঈশ্বর, হে পরম করুণাময়,
অন্ততঃ একবার তাঁকে জাগিয়ে দাও তাঁর চিরনিদ্রা থেকে,
তিনি দেখুন তাঁর দেশবাসী অকৃতজ্ঞ নয়,
তাঁরা সবাই তাঁকে তাঁদের শ্রদ্ধা জানাচ্ছে,
এটা তিনি একবার দেখুন, দেখে আবার চিরনিদ্রায় অভিভূত হোন।